

## এক

ছোট বরফ দ্বীপ আই.আই. ফাইভের সাতশো ফিট ওপরে চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা। কন্ট্রোল সামনে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে পাইলট ম্যাট ইসটন। নিচে কিছুই দেখা যায় না, ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে ঠাণ্ডা প্রকৃতি। তার পিছনে, কার্গো কমপার্টমেন্টে দু'সারিতে বারোটা সীট, পারকা পরা বারোজন লোক বসে আছে।

ওরা সবাই ইউ.এস. কোস্টগার্ড সার্ভিসের লোক, এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে বাছাই করা হয়েছে ওদের। লেনিনগ্রাদ থেকে রাশিয়ানরা আর্কটিকে একটা স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্ট পাঠিয়েছে, কারণ তা না হলে অভিযানের ধরনটা অসামরিক থাকে না। ইচ্ছে করলে তারা সামরিক বাহিনী পাঠাতে পারত, কিন্তু তা পাঠালে আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঝুঁকি থাকত, কয়েক মাস পর মস্কোয় শীর্ষ বৈঠক বসার কথা রয়েছে বলে সে ঝুঁকি তারা নিতে চায়নি। ওয়াশিংটনও একই সাবধানতা অবলম্বন করেছে সেই একই কারণে। কোনভাবেই ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্টের ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

পাইলটের কেবিন ঘেঁষে আরও এক জোড়া সীট দখল করে

রয়েছে দু'জন আরোহী, একজন ডাক্তার, অপরজন নার্স। ডা. পল ফ্লেমিং, বক্ত্রিশ, একহারা চেহারার সুদর্শন প্রেমিক। সে তার হবু রাশিয়ান রোগী ইভেনকো রুস্তভের জন্যে সাথে করে মেডিকেল কিট আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে প্লেনের বাইরে তাকিয়ে আছে ডা. ফ্লেমিং, মেঘের মত ভেসে যেতে দেখছে গাঢ় কুয়াশা। তার পাশের সীটে বসে আছে নার্স এরিকা ফোলি। দু'জন ওরা দু'জনের হাত ধরে আছে।

দু'জনেই ওরা কোস্টগার্ড সার্ভিসে চাকরি করে, কিন্তু আর্কটিকে পাঠাবার জন্যে জরুরী তলব পেয়েছিল একা ডা. ফ্লেমিং। নার্সদের মধ্যে নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ দিলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা ভেবে না-ও যেতে চাইতে পারে, তাই স্বেচ্ছাসেবিকা চাওয়া হয়। একজনই এগিয়ে আসে এবং তাকেই পাঠানো হয়েছে।

পল ফ্লেমিং আর এরিকার মধ্যে তিন বছর ধরে প্রেম চলছে। আগামী মাসের পনেরো তারিখে ওদের বিয়ে। এরিকা স্বেচ্ছায় যেতে চেয়েছে শুনে দিশেহারা বোধ করে পল। তার আপত্তি শুনে এরিকা জবাব দেয়, 'ধরা পড়ে গেলে তো! এতক্ষণ বলছিলে কাজটা মোটেও বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যে-ই আমি যেতে চাইছি অমনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে। ওসব ধানাইপানাই ছাড়ো, তোমার সাথে যাচ্ছি আমি। নাম প্রত্যাহার করার কথা ফের যদি মুখে আনো, আমি তাহলে বিয়ের তারিখটাও অনির্দিষ্টকালের জন্যে পিছিয়ে দেয়ার কথা তুলব।'

দু'বছর নয় মাস সতেরো দিন সাধনার পর এরিকাকে রাজি করিয়েছে ফ্লেমিং, কাজেই এরপর চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নেয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল কি?

মিষ্টি চেহারার এরিকা শুধু মিষ্টভাষী নয়, তার হাবভাব এবং অঙ্গভঙ্গিতে এমন একটা মাধুর্য আছে যে কেউ একবার তার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারে না। মার্কিন সমাজে কুমারী যুবতী দুর্লভ, অথচ এরিকা তাই। তাকে সামান্য একটা চুমো খাওয়ার ভাগ্য আজ পর্যন্ত কোন পুরুষের হয়নি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিজের কথা নয়, এরিকার কথাই ভাবছে পল। এই উদ্ধার অভিযান কতখানি বিপজ্জনক ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না, এরিকার যদি কিছু ঘটে...

'তোমার কি মনে হয়, ক্যাপটেন ম্যাট ল্যান্ড করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল এরিকা, পলকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত রাখতে চাইছে সে।

পলও ঠিক তাই চাইছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। ওকে আমি চিনি, হার মানার লোক নয়। যতক্ষণ না এয়ারস্ট্রিপ দেখতে পায় চক্রর দিতেই থাকবে। পাইলট হিসেবে ওর জুড়ি মেলা ভার।'

কিন্তু পাইলটের কেবিনে পরিবেশটা থমথমে। ম্যাট ইসটন আশার কোন আলো দেখছে না। কুয়াশার ভেতর কোথাও কোন ফাঁক নেই, নিচে কোথায় কি আছে দেখবে কিভাবে? অসহায় বোধ করল সে। ওপর দিকে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার, নিচে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। ফুয়েল গজের দিকে তাকাল সে। প্রচুর রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ চক্রর দিতে পারবে প্লেন। যখন দেখবে কার্টিস ফিল্ডে ফিরে যাবার মত ফুয়েল আছে, তখন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত...

পাইলটের চিন্তায় বাধা পড়ল। এডওয়ার্ড ড্রেক, কো-পাইলট পাশ থেকে বলল, 'এখন আমারই সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি ল্যান্ডিং লাইট দেখেছিলাম আমি?'

‘মনে হচ্ছে ফিরে যেতে চাও, ড্রেক?’ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল পাইলট। ‘আলোটা কি সত্যি দেখোনি?’

‘দেখেছি।’

‘ব্যস। চক্কর আমরা দিতে থাকব।’

আই.আই.ফাইভের বেস লীডার ড. কর্ডন সুইচ অন করার পর থেকেই একটা ল্যান্ডিং লাইটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। উদ্বেগে কাতর হয়ে আছে ও। কুয়াশার ভেতর ল্যান্ডিং লাইটটাকে সবুজাভ আভার মত লাগছে। এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় ড. কর্ডনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঘাঁটির ঘরগুলো থেকে সিকি মাইল দূরে। উদ্বেগে কাতর আরও পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছে ওখানে। হঠাৎ করে আবার শুনতে পাওয়া গেল ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ। গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করল ড. কর্ডন। ‘ধরেই নিয়েছিলাম হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেছে।’

সত্যিই, মনে মনে রানাও ভাবল। একটু হলেও কুয়াশা যেন পাতলা হয়েছে। প্লেনটা শুধু একবার ল্যান্ড করতে পারলেই যথেষ্ট, তারপর আবার টেক-অফ করতে না পারলে না-ই পারল। কার্টিস ফিল্ডে জেনারেল ফচের সাথে কথা হয়েছে রানার, তখনই ওকে জানানো হয়েছে, একটা কোস্টগার্ড ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়ে থাকবে। রানার বিশ্বাস, এই প্লেনের ডিটাচমেন্টের বারোজন সশস্ত্র লোক নিশ্চয়ই আছে। দলে ওই বারোজন যোগ হলে কে আর গ্রাহ্য করে কর্নেল বলটুয়েভকে। তখন দু’পক্ষের শক্তি প্রায় সমান সমান দাঁড়াবে।

‘কি মনে হয় আপনার, এই অবস্থায় ল্যান্ড করতে পারবে পাইলট?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ড. কর্ডন।

যেন কুয়াশায় চারপাশ ঢাকা ভৌতিক পরিবেশে জোরে কথা বলা মানা। বাতাস নেই বললেই চলে, অথচ কোথাও স্থির হয়ে নেই কুয়াশা। কখনও ঢেউ-এর মত এগিয়ে আসছে, কখনও ঢেউ ভেঙে গিয়ে পাহাড়, হাতি, তিমি, টাওয়ার, বিশাল দানব বা টানেলের আকৃতি নিচ্ছে। আর ঠাণ্ডা! গায়ে আগুন ধরার অভিজ্ঞতা আছে যার শুধু বুঝি তাকেই বোঝানো সম্ভব আর্কটিকের এই ঠাণ্ডার কি জ্বালা। বুটের ভেতর অনবরত পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করছে ওরা, তা না হলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্থির হয়ে নেই-হাত, পা, কোমর, ঘাড় সব সময় নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখছে। খানিক পরই একেবারে মাথার ওপর চলে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, সেই সাথে মনে হলো কুয়াশা যেন আরও একটু হালকা হয়েছে। ‘এখনও ল্যান্ড করার কথা ভাবছে না পাইলট,’ বিড়বিড় করল রানা। ‘ওপর থেকে কি দেখছে না দেখছে কে জানে...’

প্লেন নিয়ে আরও নিচে নেমে এসেছে পাইলট, পাঁচশো ফিট ওপর থেকে নিচটা আগের চেয়ে একটু ভাল দেখাল। দূর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে প্লেনের নাক আরও একটু নিচের দিকে তাক করল সে। শুধু কো-পাইলট ড্রেক পাইলটের এই আওয়াজের অর্থ জানে। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ক্যাপটেন ম্যাট ইসটন। এ-ধরনের কোন ঝুঁকি নেয়ার সময় নিজের অজান্তেই আওয়াজটা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

কুয়াশা হালকা হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ডিং লাইট দেখতে পেয়েছে

পাইলট। জানে, এই শুভ পরিস্থিতির আয়ু বেশিক্ষণ নয়, যে-কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন ডেউ এসে আবার সব ঢেকে দিতে পারে। ক্ষীণ আলোর সমান্তরাল দুটো রেখা এতই অস্পষ্ট, মনে হলো চোখের ভুল। আর যদি চোখের ভুল না হয়, এয়ারস্ট্রিপটা কোথায় আন্দাজ করতে পারছে সে। যা থাকে কপালে, রেখা জোড়ার মাঝখানে ল্যান্ড করবে সে।

‘আমরা নামছি,’ শান্ত গলায় বলল সে। ‘ওদের জানাও।’

সীট ছেড়ে কার্গো কমপার্টমেন্টে ঢুকল কো-পাইলট, চোদ্দজন আরোহীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘সীট-বেল্ট বাঁধুন, আমরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছি...’

‘দেখলে তো, বলেছিলাম না?’ এরিকার হাতে চাপ দিয়ে বলল পল। ‘ক্যাপটেন ঠিকই ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।’ এরিকার দিকে ঝুঁকল সে খানিক, যেন মনে হলো চুমো খেতে যাচ্ছে। আশ্চর্য, সেটা ধরতে না পারলেও, নিজে থেকেই পলের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল এরিকা।

প্রেমিকার কপালে আলতো করে ছোট্ট একটা চুমো খেলো পল। এরিকা রাগা হয়ে উঠল, সরে বসল একটু, কিন্তু কেউ কারও চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরাল না।

ওদিকে, কন্ট্রোল কেবিনে ঘামতে শুরু করেছে পাইলট ম্যাট ইসটন। প্লেনের ডানা একদিকে কাত করে নিয়ে আই.আই. ফাইভ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে। এয়ারস্ট্রিপের দিকে সরাসরি ফিরে আসবে, এটা তারই প্রস্তুতি। ল্যান্ডিং লাইট অদৃশ্য হলেও, মনে মনে প্রার্থনা করেছে সে, অর্ধ বৃত্ত রচনা শেষ করে ফেরার সময় আবার যেন ওগুলো দেখতে পায়।

নিচে পোলার প্যাক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। প্লেন সিধে করে নিল ইসটন। কুয়াশার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ, শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল সে। শালার আলোগুলো আগের চেয়েও অস্পষ্ট, মনে হলো তার। কুয়াশার অনেক নিচে ঝাপসা একটা ভাব, আলো কিনা বলা কঠিন। ডাইভ দিল প্লেন, ঝাপসা ভাবটুকু দ্রুত ছুটে আসছে কাছে। গিয়ার আর ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে সে। দু’জোড়া প্রপেলার কুয়াশায় আলোড়ন তুলে ঘুরছে। এঞ্জিনের আওয়াজে কোন উত্থান বা পতন নেই। ঠিক এ-ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আরও অনেক বার যেতে হয়েছে ক্যাপটেন ইসটনকে। আর্কটিকের বিভিন্ন অংশে আই.আই.ফাইভে পাঁচবার ল্যান্ড করেছে সে—প্রতিবারই এই অক্ষাংশ থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে।

সীমানা পেরোনো চলবে না!—নিজেকে সাবধান করে দিল ম্যাট ইসটন। ল্যান্ড করার জন্যে যথেষ্ট লম্বা এয়ারস্ট্রিপ, শুধু যদি ঠিক সময়ে টাচ ডাউন করতে পারে প্লেন। ঝাপসা ভাবগুলো হয়ে উঠল আভা-দু’সারি। মসৃণ বরফ স্পর্শ করল স্কিড। হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইল প্লেন, মনে হলো ডিগবাজি খেতে যাচ্ছে। তারপর মনে হলো স্কিডগুলো বরফের ওপর পিছলাতে শুরু করেছে। দু’সারি আভা দ্রুত বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে দু’পাশ দিয়ে, কিন্তু কোথায় কোন্ দিকে চলেছে প্লেন বোঝা যাচ্ছে না। সামনে যখন কোন বাধা নেই, কি আর বিপদ ঘটতে পারে! প্রপেলারের বাতাস খাবলা মারছে তুষারে, দু’পাশে মেঘের মত উড়ছে তুষারকণা, আভাগুলো ঢাকা পড়ে গেল। প্লেনের গতি মন্থর হয়ে এল। ব্রেক কষে এবার থামার প্রস্তুতি নিল পাইলট।

এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রানা আর ড. কর্ডন এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বুঝল, পাইলট ল্যান্ড করতে আসছে। ‘পিছিয়ে আসুন,’ কথাটা শুনে রানার পিছু পিছু ছুটল ড. কর্ডন। এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসে আবার যখন ওরা ঘুরল, প্রথমবারের মত প্লেনের আলো দেখতে পাওয়া গেল-ওদের দিকে ঝুঁকে আছে, স্লো-মোশান ছবির ভঙ্গিতে নেমে আসছে নিচে।

‘ঈশ্বর!’ গুণ্ডিয়ে উঠল ড. কর্ডন। ‘স্ট্রিপের মাঝখানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, সীমানা পেরিয়ে যাবে!’

‘কি জানি!’ বিড়বিড় করল রানা। কুয়াশায় দূরত্ব আন্দাজ করা অসম্ভব। নিচে দাঁড়িয়ে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, ওপর থেকে নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার, তা না হলে ল্যান্ড করতে আসত না পাইলট। ডানা দুটো দেখতে পেল রানা, প্রতিটিতে একটা করে আলো। দুই খুদে আলোর মাঝখানে গাঢ় একটা আকৃতি, এয়ারস্ট্রিপ ধরে তুমুল গতিতে ছুটে আসছে। নিম্নরূপ আর্কটিক রাতে এঞ্জিনের আওয়াজ বিরতিহীন বিস্ফোরণের মত শোনা। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বেরিয়ে এল প্লেন। ওদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল স্ট্রিপের শেষ প্রান্তের দিকে। রানার যেন মনে হলো এঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে স্কিগলোর হিসহিস শুনতে পেয়েছে ও।

কুয়াশার ভেতর আবার ঝাপসা হতে শুরু করল প্লেন। এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে যেতে শুনল ওরা। দু’এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়বে ওদের বাহন। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট, প্রপেলারের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এল। এখনও ওরা প্লেনটাকে দেখতে পাচ্ছে, ঝাপসা, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

কাঠামোটা হঠাৎ করে বদলাল। বৃকে হেঁটে এগোচ্ছিল প্লেন, হঠাৎ বরফে নাক দিয়ে খাড়া হয়ে গেল, আকাশ ছুঁতে চাইল লেজ। ভোজবাজির মত ঘটে গেল ঘটনাটা। আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল লেজ। সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কায় বুটের তলায় ঝাঁকি খেলো বরফ। বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, তালা লেগে গেল কানে। কুয়াশার গাঢ় পর্দা চিরে বেরিয়ে এল আগুনের লকলকে শিখা, মুহূর্তের জন্যে ঝাঁপিয়ে গেল রানার চোখ। তারপর শুধু আগুনের চড়চড় আওয়াজ, আর কালো ধোঁয়া।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি থামার পর স্লো-ক্যাটের জানালা খুলে পাইপ থেকে তামাক ফেলল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ‘কি, বলিনি, জুনায়েভ?’ সহকারীর উদ্দেশ্যে শান্ত, সম্ভ্রষ্ট গলায় বলল সে, ‘প্লেনে করে পালাতে পারবে না ওরা।’

একজনও বাঁচল না। এতই প্রচণ্ড তাপ, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে একটা টানেল তৈরি হলো, টানেলের শেষ মাথায় আকাশ আর চাঁদের হাসি। একটু পরই টানেলটা ভরে উঠল কালো ধোঁয়ায়। হিম কার্পেটের ওপর পুড়ে ছাই হচ্ছে প্লেনটা। হঠাৎ করেই নিভে গেল আগুন, থাকল শুধু কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। পেট্রল, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, আর মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেল রানার।

ইতিমধ্যে ধোঁয়ার স্তম্ভটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে এসেছে রানা, ওর পিছু নিয়ে এতক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ড. কর্ডন। ‘কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে...’

‘কি করে আশা করেন!’

‘মি. রানা, এটা দেখুন...,’ কাঁপা গলায় বলল ড. কর্ডন, তেল মাখানো কি একটা তোবড়ানো জিনিস রয়েছে তার হাতে। জিনিসটার ভাঁজ খুলতেই চেনা গেল। নার্সরা পরে, একটা ক্যাপ। ‘প্লেনে একজন নার্সও আছে...’

‘ছিল।’

নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠল ড. কর্ডন, ‘কেন, কেন? সবই তো ঠিক ছিল-স্ট্রিপে নিরাপদে নামব, স্পীড কমল, থামার ঠিক আগের মুহূর্তে কি এমন ঘটল যে...’

‘এদিকে আসুন।’ এয়ারস্ট্রিপ ধরে কয়েক পা এগোল রানা, ঝুঁকে বড়সড় একটা জিনিসের গায়ে হাত রাখল। জিনিসটা কি চেনা যাচ্ছে না, বরফে ঢাকা। কাছাকাছি স্কিড-এর দাগ দেখা গেল। ‘প্লেন ত্র্যাশ করার এটাই কারণ।’ সিধে হয়ে জিনিসটার গায়ে বুটের কয়েকটা লাথি মারল ও, বরফের আবরণ খসে বেরিয়ে এল পাথর। ‘এই বোল্ডারটায় ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেছে প্লেন।’ প্লেনের একটা স্কিড ওই ওদিকে পড়ে আছে, বোল্ডারের সাথে ধাক্কা লাগায় ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকল ড. কর্ডন। তারপর অবিশ্বাস আর বিস্ময় ঝরে পড়ল তার গলা থেকে, ‘স্লো-প্লাউ দিয়ে মাত্র দু’দিন আগে স্ট্রিপ পরিষ্কার করেছি। আমি নিজে ছিলাম। ওটা ছিল না, থাকতে পারে না!’

‘শুধু এই একটাই নয়,’ বলে কয়েক পা এগিয়ে আরও একটা বরফ-ঢাকা বোল্ডার দেখাল রানা। হাত তুলে খানিক দূরে ড. কর্ডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। ‘ওখানে আরেকটা।’

এয়ারস্ট্রিপের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে তিন নম্বর বোল্ডারটাও দেখতে পেল ওরা। এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ল্যাম্পের আলো ফেলল ড. কর্ডন। লাথি মেরে সেটার গা থেকে বরফ খসাল রানা। ‘খুঁজলে হয়তো আরও পাওয়া যাবে, সবগুলো আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।’ ড. কর্ডন রাগের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল রানা, ‘কারণটা আর কিছুই নয়, স্ট্রিপ পরিষ্কার করার সময় ওগুলো এখানে ছিল না।’

‘তারমানে আপনি বলতে চান...’

‘হ্যাঁ। ক্যাম্পের পিছনের পাহাড়ে ছিল ওগুলো। পাথর তো আর সিকি মাইল পথ হেঁটে আসতে পারে না, কেউ ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছে। যদি কোন প্লেন ল্যান্ড করতে আসে, এই ভেবে। স্যাভোটার্জ, ড. কর্ডন। আবার। আল্লাই জানে ক’জন ছিল প্লেনে।’

‘বাস্টার্ডস!’

‘শান্ত হোন। ক্যাম্পে ফিরে যাই চলুন।’

‘আমেরিকার প্রতিটি খবরের কাগজে খবরটা যাতে ছাপা হয়...’

‘বোকার মত কথা বলবেন না।’ ড. কর্ডনের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা। ‘প্রমাণ কই?’

‘কেন, বোল্ডারগুলো প্রমাণ নয়?’

‘রাশিয়ানরা বলবে ওগুলো ওখানে আগে থেকেই ছিল-বাতাসের ধাক্কায় বরফ সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। ওরা বরং পাল্টা অভিযোগ করে বলবে, স্ট্রিপটা আপনারা ঠিকমত পরিষ্কার করেননি।’

‘তারমানে আপনি বলতে চান...’

‘সম্পূর্ণ অন্য কথা। এ-ধরনের দুর্ঘটনার আয়োজন আরও করা হয়েছে কিনা দেখা দরকার।’

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ঘুরছে ক্যাটারপিলার ট্রাক। বরফে দাঁত বসিয়ে এগিয়ে চলেছে স্লো-ক্যাট। ক্যাবের সামনেটায় আলো ফেলছে একটা হেডলাইট, জানালার বাইরে বসানো দ্বিতীয় হেডলাইটের আলো তির্যকভাবে নিচের দিকটা আলোকিত করে রাখছে। বরফের ওপর তির্যক আলোটা যেখানে পড়ছে, সামনের দিকে ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে আছে ড. কর্ডন। খানিক পর এই আলোটার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে তাকে। এই আলোই তাকে ঝপ করে বিশ ফিট নেমে যাওয়া খাদটা দেখতে পেতে সাহায্য করবে। খাদের নিচ থেকেই শুরু হয়েছে সীমাহীন পোলার প্যাক।

ফার পারকা আর ফার হুড পরে থাকায় এঞ্জিনের আওয়াজ তেমন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ড. কর্ডন। ঘড়ি দেখল, কাঁটায় কাঁটায় আটটা। সময়ের হিসেবে কোন ভুল হয়নি, নিজের হাতে অন করা এয়ারস্ট্রিপের ল্যান্ডিং লাইটগুলোর একটা দেখতে পাবার সময় হয়ে এসেছে। বড় লিভারটা ঘোরাল সে, ভারী ট্রাকের নাক একটু ঘুরে গেল। দিক বদলের সাথে সাথে চেক করল মাইলোমিটার। ড. কর্ডন শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু বিপদের কথা মনে রেখে পাশের সীটে লোড করা একটা রাইফেল রাখতে হয়েছে তাকে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে নীল ক্যাপটা—কে জানে কেমন দেখতে ছিল নার্স মেয়েটা! চোখ আর ভুরু কুঁচকে তাকাল

সে। উইন্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেছে, পরিষ্কার করার বদলে গ্লাস আরও নোংরা করে তুলছে ওয়াইপার। ক্যাট থামিয়ে ন্যাকড়া হাতে নেমে পড়ল সে।

চেউ খেলানো কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে স্লো-ক্যাটের ওপর দিয়ে, বাহনের পিছন দিকটা সম্পূর্ণ আড়ালে ঢাকা পড়ল। গ্লাসে ন্যাকড়া ঘষার সময় সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল ড. কর্ডন। চারদিকে কুয়াশা, কাছেপিঠে গোটা রাশিয়ান আর্মি লুকিয়ে থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। তাড়াতাড়ি গ্লাস পরিষ্কার করে ক্যাবে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিকটা হলেও স্বস্তি আর নিরাপত্তা বোধ ফিরে এল। মাইলোমিটার চেক করে বড় লিভারটা ঘোরাল, ধীরে ধীরে আবার এগোতে শুরু করল স্লো-ক্যাট। কাজটার বিপজ্জনক পর্যায় শুরু হলো এবার।

লিভারের ওপর ঝুঁকে তির্যক আলোর ওপর চোখ রাখল সে। হিসেব যদি ভুল না হয়ে থাকে, খাদের কাছাকাছি চলে এসেছে ক্যাট। প্ল্যানটা যদিও রানার, কাজটা সারার দায়িত্ব আর কাউকে না দিয়ে নিজে নিয়েছে ড. কর্ডন। স্লো-ক্যাটকে র্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, র্যাম্প বেয়ে নামা হবে পোলার প্যাকে, তারপর বরফ-দ্বীপ আই.আই. ফাইভের পাশ ঘেঁষে প্যাক ধরে খানিকদূর, এই সিকি মাইলটাক, এগোনো। তির্যক আলোর সাহায্যে খাদের দিকে একটা চোখ রাখবে সে, তাতে সীমাহীন বরফ রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকবে না।

এরপর স্লো-ক্যাট রেখে র্যাম্পের দিকে রওনা হবে ড. কর্ডন, পায়ে হেঁটে পোলার প্যাক থেকে ফিরে আসবে আই.আই. ফাইভে। স্লো-ক্যাট পোলার প্যাকে পড়ে থাকবে উত্তর দিকে মুখ

করে, স্টিয়ারিং মেকানিজম একেজো অবস্থায়। রাশিয়ানরা ওটা দেখে ভাববে, দ্বীপ থেকে কেউ পালিয়েছে। ধরে নেবে প্লেনটা ক্র্যাশ করায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তাই ভুল করে পশ্চিমের বদলে উত্তর দিকে গেছে ওরা।

এক হাতেই একটা সিগারেট ধরাল ড. কর্ডন, ভয় আর নিঃসঙ্গতা-বোধ একটু যেন দূর হলো। তারপর হঠাৎ করেই দিক বদল করল সে। তির্যক আলোয় খাদটা দেখতে পেয়েছে। দ্বীপ-প্রাচীরের কিনারা ঘেঁষে এগোল স্লো-ক্যাট। বিপদের ঝুঁকি এড়াবার জন্যে খাদের কিনারা থেকে বারো গজ সরে এল সে। এবার ক্যাবের মাথায় কাঠের থামে বসানো হেডলাইটের আলোয় সামনে, দূরে তাকাল সে। র‍্যাম্পটা এখন থেকে খুব বেশি দূরে হবার কথা নয়।

‘পুব...পুব...পুবদিকে! র‍্যাম্প, র‍্যাম্প!’

মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল জুনায়েভ। বরফ-দ্বীপ আই.আই.ফাইভকে ঘিরে থাকা পোলার প্যাকে ওদের লোকজন রয়েছে, সাথে মার্কিন ঝাঁচের ওয়াকি-টকি ট্রান্সমিটার। স্লো-ক্যাটটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে, এইমাত্র তাদের জানিয়ে দিল জুনায়েভ। এখন তারা কয়েক দিক থেকে স্লো-ক্যাট আর র‍্যাম্পের দিকে এগোবে।

কুয়াশার ভেতর স্থির হয়ে আছে কর্নেলের স্লো-ক্যাট। কর্নেলের পাশের সীটে রয়েছে জুনায়েভ। তাদের পিছনের কমপার্টমেন্টে, রাডার অপারেটর তার স্ক্যানার-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দ্বীপের ওপর দিয়ে ড. কর্ডনের বাহনটাকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখছে সে। তার মাথার ওপর,

ছাদে, ধীরে ধীরে ঘুরছে রাডার উইং। পোলার প্যাকে মৃত্যুপুরীর জমাট নিষ্করতা, দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে আই.আই. ফাইভের দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছে কর্নেল বলটুয়েভ।

‘আপনার কি মনে হয়, কর্নেল কমরেড, ইভেনকো ওদের সাথে যাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

‘বেকুব!’

‘তা তো বটেই!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল জুনায়েভ। ‘ব্যটা ধরে নিয়েছে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া খুব সহজ। বেঙ্গ্‌মান, নেমকহারাম, ইহুদি জাতটাই...’

বাধা দিল কর্নেল, ‘বেকুব আমি তোমাকে বলেছি, জুনায়েভ,’ ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। আড়চোখে লক্ষ করল, হাঁ হয়ে গেল জুনায়েভের মুখ। ‘ইভেনকো কোথায় তাই জানি না, জিজ্ঞেস করছ ওদের সাথে পালাচ্ছে কিনা!’

জুনায়েভ মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আবার মুখ খুলল কর্নেল, ‘ওদের সাথে থাকতে পারে সে, নাও পারে। যদি থাকে, সমস্যার সমাধান করা যাবে। যদি না থাকে, ওদের ছেড়ে যাওয়া ক্যাম্প গিয়ে উঠব আমরা, অপেক্ষা করব তার জন্যে।’ জানালা দিয়ে বাঁ দিকে তাকাল সে। কুয়াশা সরে যেতেই আরেকটা স্লো-ক্যাট দেখা গেল, চুপচাপ এঞ্জিন বন্ধ করে সেটাও স্থির হয়ে আছে। আরোহীর সংখ্যা আট, চারজনের কাছে রয়েছে অটোমেটিক উইপন। সময় দেখল কর্নেল। আটটা পাঁচ। আটটা পনেরোর মধ্যে দাবার বোর্ড থেকে আরও একটা ঘুঁটি তুলে নেয়া হবে, মুচকি হেসে ভাবল সে।



র‍্যাম্পে উঠে এল ড. কর্ডন।

সামনের ট্র্যাক নিচের দিকে ঝুঁকছে টের পেয়েই সাবধান হয়ে গেল সে। তিন বছর আগে পাহাড় থেকে পাথর এনে র‍্যাম্পটা তৈরি করেছিল তারা, পাথুরে অবলম্বনের ওপর দ্বীপ-প্রাচীরের গা ঘেঁষে ক্রমশ বাঁকা, চওড়া, এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা। ডান দিকে খাদ, আর কিনারা। ভারী বাহনটাকে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে ঘোরাল ড. কর্ডন, কাছাকাছি থাকল দ্বীপ-প্রাচীরের।

ব্রেক করল, এঞ্জিন চালু থাকল, বাইরে তাকাল জানালা দিয়ে। তির্যক আলোয় নিচে বা সামনে কোথাও কঠিন বরফের নাম-নিশানা নেই। ঢালু হয়ে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে র‍্যাম্প, মনে হলো পাহাড়ের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দস্তানার ভেতর ঘামে চটচট করছে হাত। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল। ঝুঁকিটা না নিলে কেমন হয়? এখানেই যদি ক্যাটকে ফেলে ফিরে যায় ক‍্যাম্পে?

রাশিয়ানদের বোকা বানানো কঠিন। নাহ, নিখুঁত হওয়া চাই কাজটা।

‘ধুস শালা, যা আছে কপালে!’

পোলার প্যাকে নিঃসঙ্গ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এই অভ্যেসটা হয়ে গেছে, একা একা কথা বলা। বিপজ্জনক দিকটার সবকিছু আড়াল করে রেখেছে কুয়াশা। অপরদিকে, হেডলাইটের আলোয় ঝাপসা মত সাদাটে দেখা যাচ্ছে দ্বীপ-প্রাচীর। ওটার কাছ ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে, খাদের দিকে তাকাবেই না।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথ ধরে এগোল ড. কর্ডন। নাজুক পরিস্থিতি, কারণ সামনের ক্যাটারপিলারগুলোকে অনুসরণ করে

পিছনের ট্র্যাকগুলোকে ঠিকমত বাঁক নিয়ে নেমে আসতে হবে। ঝাপসা বরফ-পাঁচিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। স্লো-ক্যাট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সীটের কিনারায় ঝুলে মত আছে। স্লো-ক্যাটের ডান দিকের ট্র্যাক খাদের কিনারা থেকে এক ফুট দূরেও নয়। হামাগুড়ি দিয়ে, ধীরে ধীরে এগোল স্লো-ক্যাট, লিভারটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে সে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিড়বিড় করল একবার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ক্যাটের মতিগতি এখনও ঠিক আছে, সুন্দর নেমে যাচ্ছে র‍্যাম্প বেয়ে।

ছাঁৎ করে উঠল বুক। ক্যাট ঠিকভাবেই এগোচ্ছে, খাদের কিনারা থেকে দশ ইঞ্চি দূরে রয়েছে ডান দিকের ট্র্যাক। অথচ যা ঘটছে তাও দুঃস্বপ্ন নয়। ব্যাপারটা কেন ঘটছে, প্রথমে টেরই পেল না ড. কর্ডন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কাত হতে শুরু করল ক্যাট, উল্টে যাচ্ছে।

বরফই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। অবলম্বন হিসেবে যে পাথরগুলো র‍্যাম্পের নিচে বসানো হয়েছিল, সেগুলোর নিচে ধসে যেতে শুরু করল বরফ। ক্যাটের অতিরিক্ত ওজন সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করল। কন্ট্রোল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ড. কর্ডন, এমনি সময়ে কাত হয়ে গেল ক্যাট, কিনারা থেকে খসে পড়ল রূপ করে।

অনেকটা অভ্যাসবশত, কিনারা থেকে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, এঞ্জিন অফ করে দিল ড. কর্ডন। পরমুহূর্তে তার মাথা নিচের দিকে আর পা ওপর দিকে হয়ে গেল। বিশ ফিট নেমে এল ক্যাট, প্যাকের শক্ত বরফে পড়ল ছাদ, ভারী ট্র্যাক চ্যাপটা করে দিল খুদে ক্যাব। সেই সাথে ভেঙে চুরে, ফেটে, গুঁড়িয়ে চ্যাপটা

হয়ে গেল হাড়, মাংস, কাঁচ, আর খাতু।

দ্বীপের অপর প্রান্তে, এক মাইল দূরে, ড. কর্ডনের এই করুণ পরিণতির কথা জানা হলো না রানার। নিজের দল নিয়ে দ্বীপ থেকে পোলার প্যাকে নেমে এসেছে ও। সপাং সপাং চাবুক খেয়ে ছুটছে কুকুরগুলো। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

## দুই

দুনিয়াটা একদিন এরকমই দেখতে ছিল, ভবিষ্যতেও হয়তো কোন দিন এরকম দেখাবে। প্রাণহীন, বন্ধা, জমাট বরফ-সূর্যের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মৃত গ্রহ, অসীম শূন্যে নিঃসঙ্গ পথচারী। চারদিকে তাকিয়ে রানা যেন মানব-জাতির বিলুপ্তি চাক্ষুষ করল।

ক্ষীণ বাতাসের মৃদু নাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেছে কুয়াশা। ক্ষীণ কিন্তু হিমশীতল, সরাসরি উত্তর মেরু থেকে আসছে। কুয়াশা সরে যাওয়ায় জমাট বরফ রাজ্য চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে যতদূর দৃষ্টি চলে। কোথাও কিছু নেই, শুধু বরফ, আর বরফ। মরুভূমিতে কিছু না কিছু গজায়, নিঃসঙ্গ মরুদ্যান থাকে, দু'এক জায়গায় কাঁটা-ঝোপ দেখা যায়, কোথাও টলটল করে নীল গরম পানি। এখানে সে-সব কিছু নেই, আছে শুধু ঠাণ্ডা বরফ।

ওদের সামনে প্রেশার রিজ বুলে আছে, বালিয়াড়ির মত ঢেউ খেলানো, দশ থেকে বিশ ফিট উঁচু। নিয়াজের কম্পাসের ওপর বিশ্বাস রেখে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। স্নেজ দুটোকে প্রাণপণে

টেনে নিয়ে চলেছে কুকুরগুলো। গন্তব্য সুদূর গ্রীনল্যান্ড, একশো মাইল দূরে। এখনও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল নয় রানা, মাঝে মধ্যেই ঝোঁক চাপছে পশ্চিমের বদলে দক্ষিণে যায়। দক্ষিণে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা-আইসবার্গ অ্যালি।

ঘন্টাখানেক হলো পর্দা তুলে নিয়েছে কুয়াশা, এখনও রাশিয়ানদের ছায়া চোখে পড়েনি। হতে পারে কর্নেল বলটুয়েভের লোকজন এখনও হয়তো আই.আই. ফাইভের চৌহদ্দি পাহারা দিচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভ আসবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে। স্নেজ চালাবার ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা, ছুটে তার পাশে চলে এল নিয়াজ। ‘ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারের খবর কি, নিয়াজ?’ জিজ্ঞেস করল ও।

‘মহাশয়ের পশ্চাদেশে বোধহয় ব্যাথা,’ ফাজলামি করে বলল নিয়াজ। ‘তুমি জেরা করার পর সেই যে হাউকাউ শুরু করেছেন, থামাথামি নেই। বিনয়ের স্নেজে এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন, যেন চেঙ্গিস খান। তোমার অনুমতি পেলে মনের খানিকটা ঝাল মেটানো যেত।’

‘পরে। জানো তো না কি উপাদানে তৈরি, ঘাঁটালে পিছিয়ে দেবে আমাদের।’ হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল রানা। উত্তর-পূব থেকে গাঢ় একটা আলোক বিন্দু এগিয়ে আসছে, সোজা ওদের দিকে। কুৎসিত একটা পাখির মত রাতের আকাশ চিরে আসছে ওটা, এখনও এত দূরে যে রোটর ডিস্ক দেখা গেল না বা এঞ্জিনের আওয়াজও শোনা গেল না।

‘হেলিকপ্টার! গেট আন্ডার কাভার...!’ একই সাথে সপাং করে উঠল রানার হাতের চাবুক। জোরে, আরও জোরে ছুটল

কুকুরগুলো, যেন বুঝতে পেরেছে সামনের প্রেশার রিজগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিতে হবে।

বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল নিয়াজ। ইভেনকো রুস্তভকে স্নেজ থেকে নেমে ছুটতে বলছে সে। ইহুদি ভদ্রলোক চলন্ত স্নেজ থেকে নামতে গিয়ে বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করার নেই, সবাই তাঁকে ফেলে এগিয়ে গেছে, নিজের ভাষায় অভিশাপ দিতে দিতে দাঁড়ালেন তিনি, লম্বা পা ফেলে ছুটলেন। দ্রুত এগিয়ে আসছে যান্ত্রিক ফড়িং, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। প্রথম বরফ-পাঁচিলের একটা ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে গেল রানার স্নেজ, একটা করিডরের ভেতর থামল কুকুরগুলো। পিছু পিছু করিডরে ঢুকল বিনয়ের স্নেজ, রুশ বিজ্ঞানী তখনও উন্মুক্ত বরফ প্রান্তরে, অথচ একেবারে কাছে চলে এসেছে রাশিয়ান হেলিকপ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ল নিয়াজ, জানে, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভের হাত ধরে হাঁচকা একটা টান দিল সে, তাকে নিয়ে ছুটল আবার। বরফ-পাঁচিলের কাছাকাছি এসে পিঠে ধাক্কা খেলেন ওশেনোগ্রাফার। নিরাপদ আড়ালে ছিটকে পড়লেন তিনি।

রুস্তভাসে অপেক্ষা করছে সবাই, কুকুরগুলো পর্যন্ত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে-হাঁপাচ্ছে।

খুব নিচে দিয়ে উড়ে আসছে রুশ ফড়িং, পাঁচিলের জন্যে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। বেশি হলে বরফ থেকে দুশো ফিট উঁচুতে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। পনেরো ফিট উঁচু বরফ-পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পাঁচিলের মাথা ওদের দিকে ঝুলে আছে ভাঙতে শুরু করা

চেউয়ের মত। এঞ্জিনের আওয়াজ এখনও বাড়ছে, নালার ভেতরটা কাঁপছে। হঠাৎ বামেলা শুরু করল বিনয়ের একজোড়া কুকুর। এই আওয়াজের ওপর ওদের ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক, কারণ হেলিকপ্টারই ওগুলোকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কুয়াশার কিনারায়। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সামনে ছুটতে চাইল কুকুর দুটো, রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চায়। একটার মাথায় প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল বিনয়, ঝট করে বিনয়ের দিকে ঘুরল সেটা, ভীতিকর ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। করিডরের ভেতর কুকুরগুলো ছোটোছুটি করলে ওপর থেকে ওগুলোকে দেখা যাবে। কিছু নড়াচড়া করলে সেটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

উদ্বেগের সাথে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, নিজের টীম ছেড়ে নড়তে পারছে না। পরবর্তী দৃশ্যটা বিস্মিত করল ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ইভেনকো রুস্তভ, হাত বাড়িয়ে বিদ্রোহী কুকুরটার গলায় হাত বুলাল, রুশ ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বলে অভয় দিল সেটাকে। শান্ত হয়ে গেল কুকুরটা, তার অপর সঙ্গী আদরটুকুতে ভাগ বসাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় করিডরের ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা ছায়া।

এতক্ষণ উদ্বেগ ছিল, এবার বাসা বাঁধল ভয়। নিজেদের অজান্তেই আবার দম বন্ধ করল ওরা। এমনকি কুকুরগুলোও চুপ হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ স্থির। হেলিকপ্টার দেখেনি কেউ, দেখেছে তার ছায়া। মনে হলো পশ্চিম দিকে উড়ে গেল সেটা। ‘আমি না ফেরা পর্যন্ত নড়বে না কেউ,’ নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল রানা। খানিক দূর হেঁটে এসে থামল ও, পাঁচিলের মাথা এখানটায় বেঁকে নেই। বরফের গায়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে, ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল

চুড়ায়।

নজর রাখার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা। ওর সামনে আরও অনেক প্রশ্নের রিজ চেউ খেলে রয়েছে, নিচুগুলোর ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে। আধ মাইল পর আবার শুরু হয়েছে সমতল বরফ। স্লেজ চলবে ওখানে চমৎকার, কিন্তু পথে রাশিয়ানরা রয়েছে।

দলগুলো ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বারোটা, একটার কাছ থেকে আরেকটা যথেষ্ট দূরে। বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তরের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, বহুদূর গ্রীনল্যান্ডের দিকে। দলগুলোর সামনে, একজোড়া হেলিকপ্টার উড়ছে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা কপ্টার ল্যান্ড করল সমতল বরফে, একটা স্লেজ টিমের কাছাকাছি। রোটর থামার আগেই ছড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল কুকুর। পিছু পিছু নামল লোকজন আর স্লেজ। ওদের কাজ সারার নৈপুণ্য আর দ্রুতগতি দেখে একরকম মুগ্ধই হলো রানা। দশ সেকেন্ড হয়েছে উঁকি দিতে শুরু করেছে ও, আবার আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার, কোর্স বদলে ফিরে চলল উত্তর-পূবে। করিডরে নেমে, সবার কাছে ফিরে এল রানা। প্রায় সাথে সাথেই ঝড় শুরু হলো—বিতর্কের!

‘যাক বাবা, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি,’ হাঁফ ছাড়ল বিনয়। মৃদু হাসল রানা।

‘ওদের আসল কাজ ছিল আরও স্লেজ টিম নামানো।’

রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল নিয়াজ। ‘মূর্তিমান দুঃসংবাদ।’

‘আরও স্লেজ!’ বিনয় হতভম্ব।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘পশ্চিম দিকে, আধ মাইলও হবে না, বারোটা পর্যন্ত সার্চ টীম গুনেছি। মাথার ওপর টহলে রয়েছে হেলিকপ্টার।’

‘এদিকে আসছে?’

মাথা নাড়ল রানা।

বিনয় জোর দিয়ে বলল, ‘তাহলে আমরা ওদের পিছু পিছু, আস্তে-বীরে যেতে পারি, কি বলো?’

আবার মাথা নাড়ল রানা। ‘প্যাকের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় খোলা, সমতল মাঠ দেখেছিলাম, মনে আছে? ওই মাঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওটা পেরোতে গেলেই দেখে ফেলবে। তারপর কি হবে ভাবতে পারো?’

‘দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে বলটু,’ মন্তব্য করল নিয়াজ।

অনিদ্রায় ক্লান্ত, প্লেন দুর্ঘটনার দৃশ্য এখনও ভুলতে পারেনি, তিক্তমেজাজ নিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল বিনয়। ‘তুমি ভুল করছ, রানা,’ শান্ত সুরে বলল সে। ‘শুধু পশ্চিম দিকেই নিরাপদ আশ্রয় পাব আমরা। বাঁচতে হলে গ্রীনল্যান্ড উপকূলে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন ভয় নেই। রাশিয়ানরা তো আর গ্রীনল্যান্ড আক্রমণ করতে পারবে না।’

‘নিখুঁত প্ল্যান,’ বলল রানা। ‘শুধু...’

‘ভুলে যাওয়া হচ্ছে,’ রানার কথা কেড়ে নিয়ে বলল নিয়াজ, ‘রাশিয়ানরা পথে বাধা দেবে আমাদের।’

‘বরফের মাঠটা বিশাল, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব,’ যুক্তি দেখাল বিনয়।

‘হয়তো,’ বলল রানা। ‘কিন্তু হেলিকপ্টারগুলোকে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তাহলে তুমিই বলো কি করব আমরা?’ বাঁবোর সাথে জানতে চাইল বিনয়। ‘উত্তর দিকে গিয়ে ব্লাডি পোলে মারা পড়ব? পুবে গিয়ে আই.আই.ফাইভে কয়েদ হব, বলটু যেখানে অপেক্ষা করছে? দক্ষিণে...’

‘দক্ষিণে,’ মাথা বাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সাথে ওদের কথাবার্তা শুনছিল ইভেনকো রুস্তভ, হঠাৎ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘দক্ষিণে? এ তো স্রেফ পাগলামি...!’

‘আপনার সাথে কেউ আলোচনা করছে না,’ বিরক্তিভরে হাত ঝাপটা মেরে বলল বিনয়। রানার দিকে ফিরল আবার। ‘দক্ষিণে গেলে সোজা আইসফিল্ডের কিনারায় গিয়ে পৌঁছব আমরা, সোজা আইসবার্গ-অ্যালিতে। তারপর? স্লেজ পানিতে ভাসে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।’

মাথা নাড়ল নিয়াজ। ‘মাফ চাই, বাবা, এর উত্তর দেয়ার সাধ্য আমার নেই।’

‘মাথা ঠাণ্ডা করো, বিনয়,’ বলল রানা। ‘আইসব্রেকার কিউটে চড়ব আমরা। এরই মধ্যে আইসবার্গ অ্যালির দিকে রওনা হয়ে গেছে ওটা। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে ভেবে জেনারেল ফচের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থাটা আগেই করে রাখা হয়েছে।’

বিমূঢ় হয়ে পড়ল বিনয়। ‘তুমি সত্যি বিশ্বাস করো কিউটের দেখা পাব আমরা?’

‘টেম্‌ মেরিডিয়ান ধরে আসছে কিউট, নিজেদের পজিশন চেক করার জন্যে বার কয়েক তারাগুলোকে দেখে নিতে হবে।’ কথা শেষ করে নিজের টীম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, যেন আর কোন আলোচনা নেই।

‘দোস্তু বিনয় কি ফিউজ হয়ে গেল?’ কৌতূহল প্রকাশ করল নিয়াজ।

না, বিনয়ের কথা এখনও শেষ হয়নি। ‘তুমি এমন সুরে কথা বলছ, রানা, আমরা যেন ঢাকা থেকে গারো পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছি। তুমি ভাল করেই জানো, স্টার-ফিক্স নিখুঁত হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা যেন-এক পিনের মাথা আরেক পিনের মাথাকে খুঁজছে, মাঝখানে প্রায় একশো মাইল ফারাক।’

আরেকটু হলে হাততালি দিয়ে ফেলেছিল নিয়াজ। ‘তর্কবাগীশ বিনয়ের জুড়ি মেলা ভার।’

হাত তুলে নিজের স্লেজটা দেখাল রানা। ‘বিজ্ঞানের সামান্য একটু সাহায্য পাব আমরা। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের সাথে ইলিয়ট হোমিং বীকন রয়েছে। কিউট রেঞ্জের মধ্যে এসে গেলে রেডিফন সেট অন করে সিগন্যাল পাঠাব। কিউটে হেলিকপ্টার আছে, সিগন্যাল অনুসরণ করে আমাদের কাছে চলে আসবে ওটা। এবার সম্ভব?’

‘ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,’ মুখ ভার করে বলল বিনয়। নিয়াজের দিকে ফিরল সে। ‘তুমি কি বলো?’

‘সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই,’ বলল নিয়াজ। ‘আলোচনা শুরুর আগে, রানা সবচেয়ে খারাপ কি করবে বলে ভেবেছিলে তুমি?’

‘দক্ষিণ দিকে যেতে চাইবে...’

‘কাজেই বলটুও ঠিক তাই ভাববে,’ বলল নিয়াজ। ‘অর্থাৎ আমরা দক্ষিণ দিকে যেতে পারি এ-সম্ভাবনা তার মাথাতেই আসবে না।’

দস্তানা পরা হাত কচলাচ্ছে ইভেনকো। হঠাৎ রাগে বিস্ফোরিত হলো। ‘আপনার মধ্যে, মি. মাসুদ রানা, এ-ধরনের পাগলামি আমি আশা করি না!’

‘প্রতিভাবানরা একটু পাগলাটেই হয়,’ ফোড়ন কাটল নিয়াজ। ‘আপনি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারেন না?’

নিয়াজের কথায় কান না দিয়ে রানাকে আবার বলল ইভেনকো, ‘মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, কিন্তু...’

‘যদি অনুমতি দেন, ভুলটা সংশোধন করতে চাই,’ আবার নিয়াজই মুখ খুলল। ‘আসলে আপনি আস্থা এনেছেন আমেরিকানদের ওপর...’

‘তা সত্যি,’ স্বীকার গেল ইভেনকো। ‘মুক্ত দুনিয়া বলতে তো আমেরিকাকেই বোঝায়। কিন্তু মিস্টার মাসুদ রানার ওপরও আমার আস্থা আছে।’

‘আচ্ছা, বলুন তো, বাংলাদেশ কোথায়?’ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল বিনয়।

মুখ খুলল ইভেনকো, তারপর আবার বন্ধ করল।

‘ঠিক আছে, বলুন তো, আপনার হিরো কোথায় মানুষ হয়েছে?’

‘অবশ্যই আমেরিকায়,’ বেশ জোর দিয়ে বলল ইভেনকো।

‘তা না হলে...’

নিয়াজ হাসল। ‘আপনি বিশাল সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বাংলাদেশ বা রানা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি জানেন না, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে আমেরিকার কোন অবদান ছিল না, বরং রাশিয়ার ছিল। যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না, তার ভক্ত হন কিভাবে? কিভাবে সে আপনার হিরো হয়? আসলে আমার কথাই ঠিক, আপনি আমেরিকার ভক্ত। রানা আমেরিকানদের পোষ্য ধরে নেয়ায় তারও আপনি ভক্ত হয়ে পড়েছেন।’

স্লানমুখে ইভেনকো বলল, ‘মি. রানা, আপনার সহকারী আমাকে সম্ভবত অপমান করছেন...’

তার এই অভিযোগের উত্তরে কেউ কিছু বলল না। বিনয় বলল, ‘আমেরিকাকে তো চেনেন না, ওখানে কিছু দিন থাকলে টের পাবেন...’

‘আমেরিকা এতই যদি খারাপ, আপনারা তাহলে তাদের কথামত আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ইভেনকো।

‘আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে,’ বলল নিয়াজ। ‘কাজটা আমরা নিতে চাইনি।’

‘অন্যান্য আরও কারণও আছে,’ বলল বিনয়, ‘সব আপনাকে জানানো সম্ভব নয়।’ এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, ‘দক্ষিণে যেতে আপত্তি থাকলে ফিরতি পথ ধরে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে পারেন আপনি। আপনার জন্যেই একের পর এক বিপদে পড়তে হচ্ছে আমাদের। আমাদের লীডার যা বলেছে তাই হবে। দক্ষিণেই

যাব আমরা।’

তাড়া লাগিয়ে কুকুরগুলোকে দাঁড় করাল বিনয়, পিঠে চাবুকের বাড়ি খেয়ে রানার স্নেজকে অনুসরণ করল ওগুলো। পাঁচ মিনিট এগোবার পর নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নিল ওরা। সমতল বরফ প্রান্তর ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল। একনাগাড়ে দু’ঘণ্টা ছুটল স্নেজ। নালা আর প্রেশার রিজ পেরোল একের পর এক। তারপর কিছু সময়ের জন্যে বিরতি। আগেই ঠিক করা ওয়েভলেঞ্চে সিগন্যাল পাঠাল নিয়াজ, এই সিগন্যালের জন্যে কার্টিস ফিল্ডে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জেনারেল ফচ।

‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...’

কার্টিস ফিল্ড থেকে উত্তর পাবার জন্যে পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরতে হলো। এতটা সময় লাগায় ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ল বৈকি, কারণ রশ্মি ঘাঁটি এন.পি. সেভেনটিনের মনিটর সেট রেডিওর অস্তিত্ব ও অবস্থান জেনে নিতে পারবে—অন্তত পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে নেয়া উচিত। ঝুঁকিটা না নিয়েও কোন উপায় ছিল না। পেলিকান শব্দটা দিয়ে জেনারেল ফচকে জানিয়ে দেয়া হলো ইভেনকো রশ্মি এখন রানার হাতে, ওয়াশিংটন সিটি ব্যাংকে রানা এজেন্সির অ্যাকাউন্টে এক বিলিয়ন ডলার জমা দিতে হবে। টাকাটা জমা পড়ল কিনা সে-খবর সময় মত পেয়ে যাবে রানা, সে-ব্যবস্থা করাই আছে। আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের মানে, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। রেডিফন এরিয়াল নামিয়ে সেটের ভেতর ঢোকাল নিয়াজ, তারপর আকাশের দিকে তাকাল।

‘দু’ঘণ্টার ভেতর কোন রাশিয়ান প্লেন দেখিনি,’ বলল সে।

বিনয়ের স্নেজ থেকে কথা বলল ইভেনকো, ‘আমেরিকান প্লেনও।’

‘আমেরিকান পাইলটরা শীতের ছুটিতে দেশে ফিরে গেছে,’ বলল নিয়াজ। ‘কিউটের ক্যাপটেন না গেলেই বাঁচি।’

\*

‘...আর্জেন্ট ইউ পেনিট্রেন্ট আইসফিল্ড ফর পসিবল রিসিভো। ম্যাক্সিমাম রিস্ক মাস্ট বি অ্যাকসেসেপ্টেড। রিপিট। মাস্ট বি অ্যাকসেসেপ্টেড।’

ওয়াশিংটন থেকে তিন দিন আগে পেলেও, এখনও মেসেজটাকে সহজভাবে নিতে পারছেন না ইউ.এস. নেভীর কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। ছ’হাজার পাঁচশো পনেরো টনী আইসব্রেকার কিউটের ক্যাপটেন তিনি। যতই তিনি ভাবছেন, মেসেজের শেষ অংশটুকু ততই তাঁকে উদ্ভিগ্ন করে তুলছে। চরম ঝুঁকি নিতে হবে কথাটার মানে কি? এদিকের পানিতে আসা মানেই তো চরম ঝুঁকি নেয়া! নাকি ওয়াশিংটনে বসে কর্তা ব্যক্তির ভাবেন বরফে চাপা পড়ে বা আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ না ডোবা পর্যন্ত প্রমাণ হয় না যে চরম ঝুঁকি নেয়া হয়েছে?

তেতাল্লিশ বছর বয়স ক্যাপটেনের, পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কাঁধ, চুল আর ভুরু কুচকুচে কালো। ভাবলেশহীন চেহারা, যদিও গম্ভীর দেখায় না। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা যায় শুধু যখন ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়েন। তখন তাঁর গলাও শুকিয়ে যায়, বিয়ারের ক্যান খুলতে হয় দু’চারটে।

‘একটু দেখবেন, স্যার?’ কেন্ রাসেল, মেট, রাডারস্কোপ-এর সামনে থেকে এক পা পিছিয়ে এসে কোটের কলার তুলে দিল

ঘাড়ে। কিউটের উঁচু ব্রিজ গরম রাখার জন্যে হিটিং সিস্টেম আছে, কিন্তু সিস্টেমে বোধহয় কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আর্কটিক আবহাওয়াই বোধহয় দায়ী। খোলা ডেকে অমানুষিক পরিশ্রম করছে একদল লোক, কোদালে বরফ তুলে জাহাজের কিনারা দিয়ে নিচে ফেলছে। যত ফেলছে ততই আবার জমছে, যেন ভোজবাজির মত বাতাসই হয়ে উঠছে নিরেট বরফ। সাত্ত্বনা এইটুকুই যে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে আইসব্রেকার। আর্কটিক সাগরের ভাসমান বরফখণ্ড তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ইচ্ছে করছে না, তবু রাডারস্কোপে চোখ রাখলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। তিন ঘণ্টা আগে শেষবার যখন রাবার হুডের ভেতর মাথা গলিয়ে তাকিয়েছিলেন, স্কোপে ব্লিপ দেখা গিয়েছিল। দূরত্ব আর দিক হিসেব করে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ব্লিপগুলো কোন জাহাজের নয়। উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্বে কোন জাহাজ থাকতে পারে না। এবার কোন ব্লিপ দেখা গেল না। নিরেট, নিভাঁজ বরফ-রাজ্যে সব কিছুই যেন স্থির।

‘ব্যারিয়ার,’ কোন দরকার ছিল না, তবু বলল কেন্ রাসেল।  
‘একেবারে সামনে।’

মেসেজের শেষ অংশটার কথা আবার মনে পড়ে গেল কমান্ডারের।

ব্লিপ দেখতে না পাবার এটা একটা কারণ, জানেন তিনি—এই ব্যারিয়ার। আইসফিল্ডের নিরেট একটা প্যাঁচিল কিউটের পথে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ভাসমান বরফখণ্ডগুলোকে দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই প্যাঁচিলের দিকেই এগোচ্ছে

আইসব্রেকার। স্পিটবার্জেন থেকে গ্রীনল্যান্ড পর্যন্ত লম্বা এই প্যাঁচিল। মুশকিল হলো, যেভাবে হোক আইসফিল্ডে ঢোকার জন্যে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে তাদের। আইসফিল্ড সী লেভেল থেকে সামান্য একটু উঁচু কি উঁচু নয়, এরকম একটা জায়গা চাই। সামান্য উঁচু হলে কিউটের বো বরফ ভেঙে ঠিকই ঢুকে যাবে ভেতরে। আশার কথা এইটুকু, সামনে কি আছে দেখার জন্যে রাডার রয়েছে তাঁদের। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তিনি, ঈশ্বর, কুয়াশা দিয়ো না।

দু’ঘণ্টা পর আইসফিল্ড থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াশা উঠতে শুরু করল। ব্রিজের সামনে, ক্রিয়ার-ভিশন প্যানেলে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান, পালা করে ঘন ঘন সামনে আর ডেকের দিকে তাকাচ্ছেন। দুটোর একটা দৃশ্যও তাঁকে উৎসাহিত করল না। ফোর-পীকে দ্রুত বরফ জমছে, নতুন একটা দল হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে তবু। বরফ ঢাকা রেইলের ওপর দিয়ে গুঁড়ো বরফ ফেলছে তারা, যতটুকু ফেলছে তারচেয়ে জমছে বেশি। শূন্য থেকে টেমপারেচার পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে।

‘পোলার বেয়ার...!’

ব্রিজ থেকে স্টারবোর্ড সাইডে বরফ-প্রাচীরের মাথায় তাকিয়ে আছে মেট কেন্ রাসেল। ব্রিজের মতই উঁচু প্যাঁচিলটা, মাত্র কয়েক কেবল দূরে। নিচের ফোর ডেক থেকে মখ তুলে তাকাল লোকজন, প্যাঁচিলটাকে মনে হলো কোন দালানের খাড়া গা। চাঁদের আলোয় তিনটে ঝাপসা হলদেটে মূর্তি তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। আইসফিল্ডের কিনারায় তিনটে পোলার বেয়ার, কৃকের সদ্য ফেলা



আবজ্ঞনার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসেছে পাঁচিলের মাথায়।

খুব ধীরে চলছে এঞ্জিন, কিন্তু আওয়াজটা জোরাল আর নিয়মিত, বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তির লাগাম টেনে রাখা হয়েছে। এঞ্জিন ঠিক থাকলে যত বিপদই আসুক, তোয়াক্কা করেন না কমান্ডার। কিন্তু সামনের দৃশ্য তাঁর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। ‘রাসেল, খাঁচায় উঠে যাও। ওপর থেকে তাকালে তবে যদি ভেতরে ঢোকান পথ চোখে পড়ে।’ নির্দেশটা তিনি অনিচ্ছার সাথে দিলেন।

অনিচ্ছা নিয়েই একশো ফিট উঁচু মই বেয়ে খাঁচায় উঠে গেল মেট। মাস্তুলের মাথায় এটা কিউটের অবজারভেশন পোস্ট। কুয়াশা উঠছে, নিচের দিকে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রী, এই পরিস্থিতিতে আসমানের ওপর এই ঠাঁই নরকের চেয়ে কম কিসে। ছোট্ট একটা ঘর, চামড়া-মোড়া টুলে বসল রাসেল। বিয়ের পরদিন জরুরী ডাক পেয়ে কিউটে চড়ে সাগরে ভাসতে হয়েছে তাকে। বন্দরে ফিরে যাচ্ছিল, এই সময় আবার জাহাজের কোর্স বদলাবার আদেশ পায় ওরা। বন্দরে আর ফেরা হলো না। অথচ নতুন বউ বসে আছে ওর পথ চেয়ে। ক্যাপটেনের মতই, মাসুদ রানা নামের অচেনা লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করতে পারছে না রাসেল।

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে চোখ রেখে দ্রুত একবার সামনেটা দেখে নিল সে। মাথায় হারনেস গলাল, অ্যাডজাস্ট করল মাইক, তারপর কথা বলল ব্রিজের সাথে, ‘পজিশনে, স্যার। সামনে বড় একটা আইসবার্গ।’

‘দেখেছি আমরা,’ তার বেয়ে কমান্ডারের গলা ভেসে এল। ‘ঢোকান কোন পথ দেখছ?’

‘কোথায়! পাথুরে পাহাড়ের মত নিরেট, স্যার।’

‘দেখতে থাকো।’

খাঁচার ভেতর নিরাপদ সে, জানে রাসেল, তবু নানা রকম ভয় এসে বামেলা করতে লাগল। মাস্তুলটা যদি ভেঙে পড়ে? চোখ বুজল সে, সরাসরি নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরছে। হঠাৎ যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে? লোহার মই বেয়ে কোন রকমে একজন লোক উঠতে পারে, সে কি কাঁধে করে নামাতে পারবে অসাড় ভারী একটা দেহ? জোর করে চোখ মেলল সে, হাত বাড়িয়ে কাঁচের দেয়ালগুলো ছুঁয়ে আশ্বস্ত হতে চাইল। ব্রিজে থাকতে মনে হয়েছিল হিটিং সিস্টেম ভালমত কাজ করছে না, আর খাঁচায় ওঠার পর মনে হচ্ছে সিস্টেমটা কোন কাজই করছে না।

ডেক থেকে একশো ফিট ওপরে রয়েছে সে, চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল। জাহাজ চলছে বলে মনেই হয় না। ভাসমান বরফ আকারে এক একটা বাড়ি, ওপর থেকে জমাট চিনির বিরাট স্তূপের মত দেখতে লাগল। কিউটের বো ধাক্কা দিয়ে স্তূপগুলোকে ভাঙছে, ভাঙা টুকরোগুলো দু’পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে আইসব্রেকারকে। আরও সামনে ঝুঁকে আছে দৈত্যাকার পাঁচিল, মাথার দিকে তাকাতে হলে মুখ তুলতে হচ্ছে রাসেলকে। আপাত দৃষ্টিতে অচল, যেন সাগরতলে নোঙর ফেলে আছে। কিন্তু আইসবার্গ থেমে নেই, ভেসে চলেছে দক্ষিণ দিকে। উল্টো দিকে, উত্তরে চলেছে কিউট।

প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে ঝুঁকে দু’পাশে তাকাল রাসেল। ওর ওপরে, বড়সড় রাডার উইং সমান গতিতে ঘুরে চলেছে, অনবরত ওয়ার্নিং ইকো ট্রান্সমিট করছে ব্রিজের হুড

পরানো স্কোপে। স্টারবোর্ডের দিকে ধীরবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে বরফ-পাঁচিল। পাঁচিলের মাথা থেকে পোলার বৈয়ারগুলো অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। নিচের ডেকে এত বেশি বরফ যে জাহাজ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, সাগর আর জাহাজের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। সুইচ অন করে মেসেজ পাঠাল সে, ‘ঘন কুয়াশা আসছে, স্যার। সিকি মাইল দূরে, নাক বরাবর।’

ত্রিশ মিনিট পর, এক অর্থে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল রাসেল। ঘন কুয়াশায় কিছুই সে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কামড় খেয়ে হাত আর পায়ে যে অসাড় ভাব দেখা দিয়েছিল, সেটা এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রক্ত চলাচল চালু রাখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, জগিং শুরু করল। কাঁচের দেয়ালগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। বাইরের কিছু দেখার একটাই মাত্র উপায় আছে, ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেল। কিন্তু প্যানেলে তাকিয়ে কুয়াশা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার। নিচে তাকিয়ে ডেক দেখতে চেষ্টা করল। নেই।

ভয় হতে লাগল, কোথায় রয়েছে সে! সাত আসমানে, নাকি অন্ধকার রাতে কোন প্লেনের কেবিনে?

‘তুমি বরং নেমে এসো, রাসেল,’ আদেশ করলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান।

‘কিন্তু যদি কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করে...’

‘বেশ। পনেরো মিনিট। তারপর নেমে এসো।’

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে গাল চেপে ধরে তাকাল রাসেল। মনে হলো বরফে ছাঁকা খেলো গালের চামড়া। কাঁচের গা ভিজে গেছে, তার ওপর কুয়াশায় ঝাপসা, কিছুই দেখতে পেল না। জাহাজ প্রায়

অচলই বলা চলে, রাডার উইং-এর সাহায্যে ধীর, অতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে-টের পাওয়া যায় কি যায় না। সামনে যদি কোন আইসবার্গ থাকে, রাডারের ধাতব চোখ প্রতিধ্বনি পাঠিয়ে সতর্ক করে দেবে।

কিন্তু রাডার মেকানিজম এই আবহাওয়ায় নির্ভুলতার কোন রকম গ্যারান্টি দেয় না, ডেপুটি মেট বেন ক্যাফম্যানের সে-কথা ভাল করেই জানা আছে। অভিজ্ঞ রাডার অপারেটর সে, ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্কোপে। পিং পিং পিং আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ। ওই আওয়াজ শুনেই শুধু বোঝা যাবে বড়সড় কিছু একটা রয়েছে বো-র সামনে।

একঘেয়ে শব্দে নামেমাত্র চালু রয়েছে ইঞ্জিন। জাহাজের সবচেয়ে লম্বা আর নিঃসঙ্গ মানুষ, কেন্ রাসেল, ঢেউ খেলানো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকল সম্মোহিতের মত।

‘রাসেল?’ ব্রিজ থেকে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

‘কিছুই রিপোর্ট করার নেই, স্যার।’ চারদিকের দেয়ালে গাল চেপে ধরে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রাসেল। মনে হলো সামনের কুয়াশা একটু যেন পাতলা হতে শুরু করেছে। এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তবে গাঢ় কুয়াশার ভেতর নতুন ধরনের একটা আলোড়ন পরিবর্তনের আভাস দেয়। ক্ষীণ একটু বাতাস বইছে না তো? লাফানো বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল সে। আবার প্যানেলে মুখ-গাল চেপে ধরল। হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই; কিছু একটা তাড়া করছে কুয়াশাকে।

পিং পিং সতর্ক-সঙ্কেত অনেক দেরিতে এল, এল হঠাৎ করে। স্কোপের কাঁটা এক নিমেষে পুরো এক চক্রর ঘুরে গেল, আচমকা

ফুটে উঠল নতুন একটা আকৃতি। ঝট করে মাথা তুলল বেন ক্যাফম্যান। চিৎকার দিল।

কেন্ রাসেল বোধহয় আসতেই দেখেনি ওটাকে। যদি দেখেও থাকে, তারপর আর আধ সেকেন্ডও সময় পায়নি। বরফের থাবা, পাঁচিলের মাথা থেকে লম্বা হয়ে কিউটের পথ পর্যন্ত বেরিয়ে আসা বাহু ডেক থেকে আশি ফুট উঁচু ছিল। ধীরগতিতে হলেও, সরাসরি সেই থাবার মধ্যে গিয়ে পড়ল আইসব্রেকার। মাস্তুলটা ঘঁ্যাচ করে কেটে গেল, অবজারভেশন পোস্ট আর রাডার উইং সহ মাস্তুলের মাথা নিচের অংশ থেকে চোখের পলকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে সংঘর্ষের আওয়াজ পেল ওরা, আর্টচিৎকার বেরিয়ে এল ক্যাফম্যানের গলা চিরে। খাঁচার ভেতর বন্দী কেন্ রাসেল প্রায় একশো ফিট ওপর থেকে স্টারবোর্ড সাইডে পড়ল। ডেক রেইলের গায়ে ধাক্কা খেলো খাঁচা, ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল, একটা টুকরো রাসেলকে নিয়ে ঝপ করে পড়ল হিম পানিতে। রাডার সহ মাস্তুলের মাথার ওজন হবে পাঁচ টন, পানিতে পড়ার সাথে সাথে তলিয়ে গেল। সাগরের গভীরতা এখানে নয় থেকে দশ হাজার ফিট।

নিহতদের তালিকায় যোগ হলো আরও একজনের নাম। তাকে নিয়ে এরইমধ্যে মারা গেছে বিশজন। বাকিরা-সিকিউরিটি গার্ড পিটার আন্তভ, মাইকেল জনসন, ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের মোলোজন আরোহী, এবং ড. কর্ডন।

কিউট এখন অন্ধ। রাডার নেই। তাকে গ্রাস করেছে কুয়াশা, ঘিরে আছে বরফ। আইসফিল্ডের কিনারায় আটকা পড়েছে আইসব্রেকার, যে আইসফিল্ডকে ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

যে-কোন বিচারে, চরম ঝুঁকি নিয়ে এত দূর চলে এসেছে কিউট, যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছে। আর কত? যে যাই বলুক, এরপর আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। কমান্ডার হ্যারি গোল্ডের সামনে একটাই পথ এখন খোলা-বো ঘুরিয়ে নিয়ে বন্দরে ফিরে যাবার চেষ্টা করা।

কার্টিস ফিল্ডে উৎসবমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। কোড-সিগন্যাল-‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান’ রিসিভ করেছেন জেনারেল ফচ, আনন্দে বগল বাজাচ্ছেন তিনি। ‘ইভেনকো রপ্তভ আমাদের হাতে! রানা তাকে নিয়ে দক্ষিণে আসছে কিউটে ওঠার জন্যে।’

কার্টিস ফিল্ডে ছোট্ট অফিসটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে জেনারেলকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। জানালার নিচে তিনটে হিটার জ্বলছে, ভেতরটা গরম। সিগন্যাল এই একটাই পাননি তিনি।

তাঁর সহকারী টমাস উড দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বসের দিকে তাকিয়ে আছে।

পায়চারি করতে করতে জেনারেল আবার বললেন, ‘আই.আই.ফাইভের পশ্চিমে গিজগিজ করছে রাশিয়ান সিকিউরিটি।’ নিভে যাওয়া চুরটে ঘন ঘন টান দিলেন, জ্বলজ্বল করছে মুখের চেহারা। ‘বরফের ওপর হেলিকপ্টার রয়েছে ওদের, প্যাকে রয়েছে স্লেজ-টীম। স্লো-ক্যাটও আছে।’

‘পরিস্থিতি ঘোলাটে,’ মন্তব্য করল টমাস।

‘ওয়াশিংটনে বসে বলেছিলেন, অপারেশনটা পানির মত সহজ,

মনে আছে?’ খেঁকিয়ে উঠলেন ফচ। ঘরে ঢুকল এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলার হাওয়ার্ড ম্যাকলিন। ‘ঠিক সময়েই এসেছ। উপকূল আর আই. আই. ফাইভের মাঝখানে গোটা এলাকায় ইনটেনসিভ এয়ার সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। যে মেশিনগুলো তুমি পাঠিয়েছ, তিন ভাগের এক ভাগ নজর রাখবে আই.আই. ফাইভের উত্তরে...’ সাথে করে নিয়ে আসা ম্যাপটা দেয়ালে আগেই ঝোলানো হয়েছে, সেটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘এখানে...আর এখানে।’

‘দক্ষিণে?’ জিজ্ঞেস করল হাওয়ার্ড ম্যাকলিন।

‘না! নন-স্টপ সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। পাইলটরা যাবে, ফিরবে, ফুয়েল নেবে, আবার যাবে...কোন বিরতি ছাড়া চলতেই থাকবে এভাবে।’

‘কিন্তু পাইলটদেরও একটা সহায়কতা আছে...’, প্রতিবাদের সুরে শুরু করল হাওয়ার্ড।

‘সেটা কতটুকু, জানার এমন সুযোগ আর পাবে না,’ উত্তরে বললেন জেনারেল ফচ। ‘জানার পর সেটা আরও বাড়িয়ে নিতে বলবে।’

‘বুঝলাম না,’ হাওয়ার্ড বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করল টমাস, ‘রানা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তাহলে উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠাবার মানে কি?’

‘তুমি যখন বোঝোনি, বলটুয়েভও বুঝবে না। পোলার প্যাকে রানাকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ভাগ্য যদি না সহায় হয়। কাজেই সে-চেষ্টা বাদ দিচ্ছি আমরা। তার বদলে রাশিয়ানদের ভুল বোঝাবার কাজটা জরুরী।’ জানালার

বাইরে দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল, রোটর আর এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন জেনারেল। ‘বরফের ওপর বলটুয়েভের হেলিকপ্টার আছে, দু’ঘণ্টার মধ্যে আমাদের প্লেনের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে ওদের পাইলটরা।’

‘বেশ। তারপর?’

‘কি ভাববে বলটু? ভাববে, আমেরিকানরা ইভেনকো রুস্তভকে খুঁজছে। ভাববে, কোথায় তাকে খুঁজতে হবে আমেরিকানরা তা জানে।’

‘ফলে দক্ষিণ থেকে সে তার হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনবে?’

‘ঠিক তাই। রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে আসার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে রানা।’

মাথা ঝাঁকাল টমাস। ‘প্ল্যানটা ভাল, তবে...’

‘ভাল নয়, চমৎকার!’ ধমকে উঠলেন জেনারেল। ‘বলটুকে আসলে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি আমরা—রানা উত্তর বা পশ্চিম দিকে যাচ্ছে!’

## তিন

‘উত্তর না পশ্চিম?’

রুশ আর্কটিক ঘাঁটি, এন.পি.সেভেনটিন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপনমনে বিড়বিড় করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। টেবিলে পকেট সংস্করণ দাবার ছক মেলা রয়েছে, পাশে একটা

খোলা বই। উনিশশো ছেষটি সালে সান্তা মোনিকায় ফিশার-স্প্যাসফি দাবা খেলার রেকর্ড রয়েছে বইটায়। উর্বর মস্তিষ্ক, তিনটে কাজ একসাথে সারতে পারে বলে প্রায়ই গর্ব করে কর্নেল। এই যেমন এখন-নিজের খেলা খেলছে, আরেকজনের খেলা পরীক্ষা করছে, সেই সাথে চলতি অপারেশন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করছে।

‘সব ক’টা হেলিকপ্টার আকাশে,’ চেয়ারের পিছন থেকে রিপোর্ট করল জুনায়েভ। ‘আই.আই.ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর রাখছে ওগুলো-সব ক’টা, শুধু ছয়টা বাদে। এই ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছেন।’

মার্কিন স্নো-ক্যাট র‍্যাম্পে ধ্বংস হবার পর আই.আই.ফাইভ থেকে দ্বিতীয়বার ঘুরে এসেছে ওরা। দেখে এসেছে বরফ-দ্বীপ পরিত্যক্ত, কেউ নেই সেখানে। বলটুয়েভের জানার কথা নয়, গুন্টার রডেনবার্গ আর জেমস কাজম্যান রয়ে গেছে ওখানে। ইভেনকো রুস্তভ যদি আসে, ভেবে ছোট একটা ডিটাচমেন্ট ওখানে রেখে এসেছে কর্নেল। এন.পি.সেভেনটিনে ফিরে আসার পরপরই লেনিনগ্রাদ রেকর্ডস থেকে একটা মেসেজ পায় সে। মেসেজটা তাকে হতভম্ব করে তোলে।

‘আমরা যে বারবার রানার দল রানার দল করছি, জানো ওরা ক’জন?’ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কর্নেল। ‘লেনিনগ্রাদ থেকে খবর এসেছে, নিয়াজ আর বিনয়, মাত্র এই দু’জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে আর্কটিকে এসেছে মাসুদ রানা।’

‘মাত্র তিনজন? ইভেনকো রুস্তভকে নিতে এসেছে?’ জুনায়েভের চেহারায় রাজ্যের অবিশ্বাস।

‘হ্যাঁ, তিনজন খুব কম লোক,’ বলল কর্নেল। ‘কিন্তু কোন কোন লোক একাই অনেক, এ-কথা জানো তো? ওদের দু’জনকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো জন ধরো, আর রানা একাই একশো-কত হলো? সংখ্যায় তিনজন, কিন্তু শক্তিতে দুশো। এবার সুবিধেগুলো হিসেব করো। সংখ্যায় কম, কাজেই কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় কম। ইভেনকো সাথে থাকলে চারজন, চারজন লোককে পোলার প্যাকে খুঁজে পাওয়া সহজ, না কঠিন, জুনায়েভ? কতটুকু কঠিন?’

‘প্রায় অসম্ভব, কর্নেল কমরেড।’

‘বারবার প্রমাণও হচ্ছে তাই,’ বলল কর্নেল। ‘দু’দিন আগে যে ছবিটা তোলা হয়েছে, মনে আছে? একদল লোক কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে পড়ছিল?’ হঠাৎ করেই মেঝেতে পা ঠুকল সে। ‘সব ক’টা কপ্টারকে কোডেড সিগন্যাল পাঠাও-ওরা আসলে ছোট একটা দলকে খুঁজছে। সম্ভবত একজোড়া স্লেজ-টীম আর চারজন লোক।’

‘যে ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছিলেন...’

‘ওগুলো দক্ষিণে যাবে-আই.আই.ফাইভের দক্ষিণে।’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, আমেরিকানরা উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর...!’

কর্নেল হুঙ্কার ছাড়ল, ‘এখনও তুমি যাওনি?’

একা হতেই পায়চারি শুরু করল সে। কিছু উদ্ভট সিদ্ধান্ত কখনোই সে ব্যাখ্যা করে না। জেনারেল দ্য গলের মত নিজের চারপাশে রহস্যের একটা অদৃশ্য বলয় তৈরি করে রাখতে পছন্দ করে। পরে যদি সিদ্ধান্তগুলো ভুল প্রমাণিত হয়, গা বাঁচানোর পথ খোলা থাকে। কি সে করতে চাইছিল তাই যদি কেউ না জানে, কোথায় ভুল করেছে ধরবে কিভাবে?

তবে কর্নেলের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা। মারমানস্ক থেকে বাইসন বন্মারে চড়ে আসার সময় জেনারেল ফচের ডোশিয়ে পড়েছে সে। জেনারেল ফচ ডিসেপশন অপারেশনে স্পেশালিস্ট। এ-ব্যাপারে মাসুদ রানা আরও এক কাঠি বাড়া। আমেরিকানরা আই.আই. ফাইভের উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠিয়েছে, এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্য করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়, ওদিকের এলাকাগুলো চেক করা না হলে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। কিন্তু আসলে দক্ষিণ দিকটাই তার মনোযোগ কাড়তে শুরু করেছে।

খানিক পর ফিরে এল জুনায়েভ। ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করেছে ওগুলো।’

‘চমৎকার! এবার হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভায় সিগন্যাল পাঠাও, আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটের পজিশন জানতে বলো ওদের।’

আবার বিস্ময় বোধ করল জুনায়েভ, কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস হলো না। ব্যস্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কেন যেন মনে হলো কর্নেলের, রানার সাথে অচিরেই আবার দেখা হতে যাচ্ছে তার। ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। পায়চারি থামিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ঘোড়ার চাল দিল আড়াই ঘর।

রানা কোন যুক্তি মানছে না। বলা ভাল, যেন পণ করেছে কারও কথাই শুনবে না ও। সহকর্মী আর কুকুরগুলোকে অমানুষিক খাটাচ্ছে, গোঁয়ারের মত জেদ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের

দিকে। কড়া নির্দেশ, কোন কারণেই থামা চলবে না। না বিশ্রামের জন্যে, না কিছু মুখে দেয়ার জন্যে। জোড়া স্নেজ-টীম টেবু মেরিডিয়ান ধরে বিরতিহীন ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে, ক্রমশ কাছ চলে আসছে আইসফিল্ডের কিনারা, আইসবার্গ অ্যাগলি।

চারদিক থেকে ওদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে প্রেশার রিজ, এবড়োখেবড়ো বরফের বিশাল প্রাচীর একেকটা। নালা-পথ ধরে ছুটছে কুকুরগুলো, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে সাদা প্রকৃতি। নিজের স্নেজ-টীম নিয়ে সামনে রয়েছে রানা, নির্দয়ভাবে মুহূর্মুহ চাবুক মারছে কুকুরগুলোর পিঠে। প্রাণপণে ছুটছে ওগুলো, শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে। বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছে বিনয়ের টীম, তার পাশে থাকার জন্যে ঝড়ের বেগে ছুটতে হচ্ছে নিয়াজকে।

‘এর কোন মানে হয়?’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘ওর সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বিনয়।

ছোট্ট গতি বাড়িয়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ। ‘রানা, কুকুরগুলোর বিশ্রাম দরকার। এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না...’

ফার ছড়ের ফাঁকে যতটুকু দেখা যায়, কঠোর রানার চেহারা। বার কয়েক সপাং সপাং করে উঠল হাতের চাবুক। কুকুরগুলো আরও একটু বাড়িয়ে দিল ছোট্ট গতি। সামনে মোড় নিয়েছে নালা, গতি যাতে মন্থর না হয় সেজন্যে বারবার চাবুক মারল রানা। মাত্র একদিকের রানার-এ ভর করে বাঁক নিল স্নেজ, বরফের ছাল তুলে একই গতিতে ছুটল। নিয়াজের কথা যেন

শুনতেই পায়নি ও।

‘আরেকবার ভাবো,’ অনুরোধের সুরে বলল আবার নিয়াজ।  
‘আমাদেরও বিশ্রাম দরকার। কিউট এখনও অনেক দূরে। আজ রাতে ওখানে আমরা পৌঁছুতে পারব না...!’

পাল্টা চিৎকার করল রানা, ‘বাঁচতে হলে ছুটতে হবে। তোমরা চাও বিশ্রামের জন্যে থেমে চির বিশ্রামের ঝুঁকি নিই?’

‘রুস্তভ সাহেবের কথা ভেবে দেখেছ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।  
‘উনি আর পারছেন না।’

তাড়াতাড়ি পিছন দিকে তাকাল রানা। বিনয় আর তার স্নেজ-টীমের পিছনে রয়েছে ইভেনকো রুস্তভ। পিছিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা, তবে ছুটছে এখনও। নজর বুলিয়েই বুঝল রানা, ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। একটু হয়তো নিষ্ঠুর, কিন্তু কৌশলটা কাজ দিচ্ছে, ভাবল ও। ওরই নির্দেশে সবার পিছনে থাকতে হয়েছে রুশ বিজ্ঞানীকে। যে-কোন একটা স্নেজে জায়গা দেয়া যেত তাঁকে, কিন্তু হিতে বিপরীত হত তাতে, গোটা দলটাকে পিছিয়ে দিত লোকটা। এরইমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের স্বভাবই হলো প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁত বের করে জেদ ধরা। স্নেজে ঠাঁই না পাওয়ায় সারাক্ষণ তার মনে একটা ভয় কাজ করছে, তাকে একা ফেলেই না চলে যায় ওরা। তিন ঘণ্টা আগে রানা বলেছিল, ‘ওঁকে একটা আতঙ্কের মধ্যে রাখতে হবে, তা না হলে প্রতি পদে বাধা দেবেন উনি।’

‘ওঁর বয়স হয়েছে...’, আবার শুরু করল নিয়াজ।

‘ব্যাপারটা যে পিকনিক পার্টি হবে না, জেনেই নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়েছেন উনি,’ বলল রানা। ‘দু’চারবার আছাড় না খাওয়া

পর্যন্ত ওঁর সাথে কেউ কথা বোলো না। আমার সাথেও নয়,...স্নেজ চালাচ্ছি।’

পিছিয়ে পড়ল নিয়াজ। রানার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, কারও কথা শুনবে না। ওর সাথে সামনে ছোট্টা ছাড়া উপায় নেই।

আসলে রানার মেজাজ মোটেও বিগড়ায়নি। নিয়াজকে চুপ করাবার সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিয়েছে ও। বিশ্রামহীন এই ছুটে চলা, এ-ও যুক্তিহীন কোন জেদ নয়। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখেছে রানা, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল কোন রাশিয়ান হেলিকপ্টার দেখেনি ওরা। কারণটা ওর জানা নেই। তবে চাঁদের আলোয় আকাশ পরিষ্কার থাকায় সুযোগটা হাতছাড়া করা চলে না। যতটা সম্ভব দক্ষিণে সরে যেতে হবে ওদের। তবেই যদি বলটুয়েভের হেলিকপ্টারগুলোকে ফাঁকি দেয়া যায়।

কিউটের সাথে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না রানা, ভেবে রেখেছে। কাউকে বলেনি, কারণ তর্ক বেধে যাবে। ওর নিজের মনেও সন্দেহ আছে, আজ রাতে কিউটের দেখা না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে আশা ছাড়েনি এখনও। সবাইকে নিয়ে এভাবেই সামনের দিকে ছুটবে ও, যতক্ষণ না কিউটের সাথে যোগাযোগ হয়। কিংবা যতক্ষণ না কুকুরগুলো বরফের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এক ঘণ্টা পর দক্ষিণ-পূবে উঁকি দিল আমেরিকান প্লেন।

‘হল্ট!’

পিছনের ওদেরকে সাবধান করার জন্যে ঝট করে হাত তুলল

রানা, সীসার মত ভারী লাগল হাতটাকে। কুকুরগুলোকে দাঁড় করিয়ে নিয়াজের হাতে চাবুকটা ধরিয়ে দিল, তারপর বাঁ দিকের প্রেশার রিজে ওঠার জন্যে খামচাখামচি শুরু করল। যেখানেই পা রাখে, ভেঙে যায় বরফ। দস্তানা পরা হাত পিছলে নেমে আসে। এতই ক্লান্ত, মনে হলো কয়েক সেকেন্ড নয়, কয়েক বছর ধরে পাহাড়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ও। দূর থেকে ভেসে আসা এঞ্জিনের আওয়াজ জোর তাগাদা দিচ্ছে-তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! আওয়াজটা অন্য রকম, সোভিয়েত হেলিকপ্টারের ভোঁতা ভট ভট নয়। একরোখা চেষ্টায় অবশেষে পাঁচিলের মাথা নাগালের মধ্যে চলে এল। তারপর খুব সহজেই উঠতে পারল রানা। নাইট-গ্লাস চোয়াল আর বুকের মাঝখানে আটকে গিয়েছিল, ব্যথাটা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না। গ্লাস জোড়া চোখে তুলে দূরে তাকাল।

স্থির হয়ে থাকা ঢেউ আকৃতির প্রেশার রিজের প্রায় শেষ সীমানায় চলে এসেছে ওরা, খানিক সামনে থেকে শুরু হয়েছে জমাট সাগরের সমতল বিস্তার। দু'হাজার ফিট ওপরে রয়েছে প্লেনটা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যাচ্ছে, একটু পর ওদের আধ মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। ফোকাসিং মেকানিজম হাতড়াতে শুরু করল রানা-আমেরিকান, না রাশিয়ান? কাঠামোটা ঝাপসা দেখাল, ভাবল ফোকাস অ্যাডজাস্ট হয়নি। তারপর বুঝল, তা না, আসলে ক্লান্ত চোখ অসহযোগিতা করেছে। হাত দিয়ে রগড়ে আবার গ্লাসে চোখ রাখল, লেন্সে পরিষ্কার ধরা পড়ল প্লেন, ফিউজিলাজে সাদা তারকা-চিহ্ন আঁকা। মার্কিন!

‘নিয়াজ! স্মোক ফ্ল্যায়ার! জলদি! আমেরিকান...’

নালায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আনন্দ আর বিস্ময়ের ধাক্কায় এক

সেকেন্ড কেউ নড়তে পারল না। ইতিমধ্যে প্রথম ডগ-টীমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইভেনকো রশ্মিভ, তার হাতে হ্যান্ডেলবার আর চাবুক ধরিয়ে দিয়ে স্মোক ফ্ল্যায়ার খুঁজতে শুরু করল নিয়াজ।

‘জলদি!’ তাগাদা দিল রানা।

ফ্ল্যায়ার নিয়ে পাঁচিলে উঠতে চেষ্টা করল নিয়াজ। অর্ধেকটা উঠল, রানার বাড়ানো হাতে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে পা পিছলে নেমে এল নালায়। দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ভাগ্য আর প্রকৃতি নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে ওদের নিয়ে।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠতে পারল নিয়াজ, আগেই তার কাছ থেকে স্মোক ফ্ল্যায়ার নিয়ে নিয়েছে রানা। কিন্তু হাত দুটো ঠাণ্ডায় অসাড়া হয়ে আছে, বারবার পড়ে গেল ফ্ল্যায়ারটা। বার কয়েক চেষ্টা করার পরও জ্বলল না। টেঁচিয়ে উঠল রানা, ‘এটা নষ্ট, আরেকটা দাও!’

ছুটে রানার স্নেজের কাছে চলে এল বিনয়, নিয়াজও খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এল নালায়। ওরা যখন ফ্ল্যায়ার খুঁজছে, প্লেনের ডানায় লাল আর সবুজ আলো ঘুরতে শুরু করেছে। নতুন কোর্স ধরে দক্ষিণ দিকে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে প্লেন। ‘জলদি করো, ফর গডস সেক!’ গর্জে উঠল রানা। বিনয়ের হাতে একটা ফ্ল্যায়ার দেখল ও। ‘ওখান থেকেই, ওখান থেকেই-তাড়াতাড়ি!’

জ্বলে উঠল ফ্ল্যায়ার, গাঢ় ধোঁয়া ছাড়ল, শান্ত বাতাস ভেদ করে হুস করে উঠে গেল আকাশে। লাল আর নীল আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। প্রতিমুহূর্তে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সাথে আরও দূরে সরে যাচ্ছে প্লেনটাও। প্রতি মুহূর্তে ছোট হয়ে আসছে সেটা। চাঁদের আলোয় এক সময় খুদে একটা বিন্দুর মত



দেখাল ওটাকে। বরফের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচিলের মাথায়, রানার পাশে উঠে এল বিনয় আর নিয়াজ।

‘এখনও চলে যায়নি...’ যেন নিজেকে আশ্বাস দিল নিয়াজ। ‘পিছন দিকে তাকাও, ভাই,’ পাইলটের উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করছে সে। ‘চোদ্দপুরুষের দোহাই লাগে, একবার পেছন ফেরো!’ ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল রূপালি বিন্দুটা। শুধু এঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল আরও কিছুক্ষণ, তারপর সেটাও মিলিয়ে গেল দূরে।

‘রুটিন ওয়েদার ফ্লাইট,’ বলল রানা। ‘আমাদের খোঁজে আসেনি।’

‘অবজারভার লোকটাকে ধরতে পারলে চড় লাগাব,’ রাগে ফুঁসে উঠল বিনয়। ‘আমাদের বোধহয় রেডিও ব্যবহার করা উচিত ছিল।’

‘পাগল নাকি!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। ‘রেঞ্জের মধ্যে কিউট না এলে রেডিও ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। সামনে সেট নিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত অপারেটর, রেডিও অন করলেই লোকেশন জেনে ফেলবে। গेट রেডি!’

নিঃশব্দে রওনা হলো ওরা, মাথার ওপর এখনও জ্বলজ্বল করছে লাল নীল আলোকমালা। সবাই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে, এমনকি কুকুরগুলোকেও বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। দুর্গম পথ পিছনে ফেলে সমতল জমি সাগরে নেমে এল স্লেজ, এখন থেকে খুব দ্রুত আর সহজে এগোনো যাবে, তবু মন খারাপ সবার।

আসলে হতাশা আর ক্লান্তিতে রানার বুদ্ধিশুদ্ধি খানিকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। হাড়ের প্রতিটি জয়েন্টে টনটনে ব্যথা, অসাড় পেশী,

চোখ জোড়া এমন জ্বালা করছে যেন লংকাগুঁড়ো ঘষে দিয়েছে কেউ। হ্যান্ডেলবার ধরে আছে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে মুঠো থেকে ছুটে যেতে পারে। ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। শুধু বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহে ছুটে চলেছে ও সামনে। শরীরের শেষ শক্তিতুকু থাকতে থামা চলবে না ওদের। শুধু নিজের কথা নয়, সবার কথাই ভাবতে হবে ওকে।

‘লুক আউট!’ গলা ফাটল নিয়াজ।

‘কেউ নড়বে না!’ বিস্ফোরিত হলো রানা।

অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল স্লেজ দুটো। ওদের পিছনে আর্কটিক রাতের নিস্তব্ধতা এঞ্জিনের ভোঁতা ভট ভট আওয়াজে ভেঙে খান খান হলো। তারপর ছায়াটা দেখা গেল। স্থূল আকৃতির কালো ছায়া। জোড়া রোটর, একটার ওপর আরেকটা। লেজের দিকে একজোড়া ফিন। ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপর দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। টুইন জেট সাবমেরিন কিলার। রাশিয়ানদের লেটেস্ট হেলিকপ্টার।

‘খোদার দোহাই, নোড়ো না কেউ!’ আবার সাবধান করল রানা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, সেই সাথে বাঁক নিতে শুরু করে আরও ওপরে উঠছে। রুশ আরোহীরা ওদেরকে নাও দেখে থাকতে পারে। আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল গতিতে উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে, আচমকা প্রেশার রিজের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসেছিল খোলা প্রান্তরে-ওদেরকে দেখতে পাবার জন্যে রুশ অবজারভারের তীক্ষ্ণ চোখ থাকতে হবে। কয়েক সেকেন্ড পর জানা গেল, তাই আছে। ফিরে আসছে হেলিকপ্টার।

সর্বনাশ ঘটিয়েছে স্মোক ফ্লয়ার। আমেরিকান পাইলটের

চোখে ধরা না পড়লেও, কাছাকাছি কোথাও থেকে রুশ হেলিকপ্টারকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ফিরে আসছে। আগের চেয়ে ধীর গতিতে আসছে, অনেক উঁচু দিয়ে। তারমানে শুধু যে স্লেজগুলো দেখেছে তাই নয়, কাঁধে ঝোলানো রাইফেলগুলোও দৃষ্টি এড়ায়নি। তা না হলে পঞ্চাশ ফিট থেকে দুশো ফিটে উঠে যেত না।

‘কি করবে ওটা?’ জিজ্ঞেস করল বিনয়।

‘কতজন লোক আছে তার ওপর নির্ভর করে,’ বিড়বিড় করল রানা।

দলের দায়িত্ব নিয়াজকে দিয়ে খানিক দূরে সরে দাঁড়াল ও, একা। রাইফেলটা হাতেই থাকল। আজরাইলের মত এগিয়ে এল স্থলকায় সাবমেরিন কিলার। মাথার ওপর চলে আসার পর মনে হলো, রোটরের আওয়াজে পায়ের নিচে বরফ কাঁপছে। রাইফেল তুলল রানা, মাজল্ অনুসরণ করল কিলারকে।

শূন্যে স্থির হতে যাচ্ছিল কিলার, রানার ভাবগতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে একদিকে কাত হয়ে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল, পিছনে রেখে গেল সাদাটে ধোঁয়া।

কিস্ত না, এত সহজে বিদায় নিতে ফিরে আসেনি পাইলট। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঘুরতে লাগল কিলার। ওটার ওপর চোখ রাখার জন্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরতে হলো ওদেরকেও। হঠাৎ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘সাবধান! ওরা টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে দেখছে আমাদের...!’

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে চোখে নাইট-গ্লাস তুলল রানা। ‘রাইফেল নামাও!’ নিয়াজকে নির্দেশ দিল ও। নিজের জায়গায়

দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখল, হেলিকপ্টারের দরজার গায়ে বসানো জানালা খুলে গেছে, চাঁদের আলোয় ভেতরে দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে একটা মাজল্। ‘সিনে-ক্যামেরা,’ আবার বলল রানা। ‘আমাদের ছবি তুলছে—ভয় পাবার কিছু নেই। ক্যামেরায় ওটা টেলি-ফটো লেন্স ব্যবহার করছে ওরা।’

‘নিয়মও তো তাই,’ মন্তব্য করল নিয়াজ, ‘ছবি শুধু হিরো আর ভিলেনদের তোলা হয়!’

রুশ সাবমেরিন কিলার কোর্স বদলে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব দিকে। এঞ্জিনের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল। স্লেজের কাছে ফিরে এসে নিয়াজের কাছ থেকে হ্যান্ডেলবার নিল রানা।

‘আমি জানি কেন ল্যান্ড করেনি,’ বলল নিয়াজ।

‘লোকজন কম বলে।’ দূরে তাকাল রানা, সমতল বরফের পর, বহু দূরে, আবার শুরু হয়েছে প্রেশার রিজ। ‘ফিরে এসে আবার যদি খোলা জায়গায় পায় আমাদের, একজনও বাঁচব না।’

ফিরে যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার শুধু লোকবল নয়, সাথে অস্ত্রবলও থাকবে।

## চার

বন্ধ ঘরের ভেতর ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধ। প্রজেক্টরের মৃদু গুঞ্জন। অকস্মাৎ টেঁচিয়ে উঠল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, ‘ফ্রেমটা ধরে রাখো!’

প্রজেক্টর থামাল অপারেটর, পর্দায় স্থির হয়ে গেল ছবি।

চারজন লোক, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। একজন লোকের হাতে রাইফেল, অপরজনের চোখে নাইট-গ্লাস। পর্দার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একটা ছায়ামূর্তি-বলটুয়েভ। ছায়ামূর্তির একটা হাত লম্বা হলো, আঙুল দিয়ে পর্দার একজন লোককে দেখাল। লোকটা একটা স্লেজের হ্যান্ডেলবার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘সেই শালা, আমার পেনশন বাজি রেখে বলতে পারি,’ নিস্তব্ধ কামরায় গমগম করে উঠল তার ভারী গলা। ‘ইভেনকো রস্তুভ! বেঙ্গমান!’

অস্বকার থেকে মৃদু প্রতিবাদ জানাল নিকিতা জুনায়েভ, ‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, ওদের কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না...’

‘মুখে পেছাব করি!’ মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ‘কুভাটার প্রতিটি নড়াচড়া আমার মুখস্থ। দেখছ না একপাশে কেমন কাত করে রেখেছে মাথাটা, বানচোতের এই ভঙ্গিটা আমার চেনা আছে।’ চোখে নাইট-গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার ওপর মোটা একটা আঙুল রাখল সে। ‘আর এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু। মাতৃভূমির মুখে কলঙ্ক মাখিয়েছে। মিগ একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে গোটা রাশিয়াকে। মাসুদ রানা। বাকি দু’জন ওর চেলা, আমেরিকানদের আর্কটিক রিসার্চ বেসে গবেষণা করে-বিনয় মুখার্জি আর নিয়াজ মাহমুদ।’

‘আমরা তাহলে উত্তর আর পশ্চিম থেকে প্লেনগুলোকে ফিরিয়ে আনব, কর্নেল কমরেড?’ জিঙ্গেস করল জুনায়েভ।

‘ব্যটাচ্ছেলে, আগে তুমি ঘরের আলো জ্বালো,’ নির্দেশ দিল কর্নেল। আলো জ্বলে উঠতেই চোখে হাতচাপা দিল সে, তারপর পিছনে বসা একজন লোকের দিকে তাকাল। ‘খুস্কায়েভ, আবার

তুমি ওদের খুঁজে বের করতে পারবে?’

খুস্কায়েভ, আটাশ, মারমানস্ক থেকে নিয়ে আসা ডিটাচমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছে। চেহারায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। কয়েক পা এগিয়ে ওয়াল-ম্যাপের সামনে চলে এল, আঁক কাটা একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল, ‘এখানে, কর্নেল। স্টার-ফিক্স নির্ভুল হলো...’

‘তারমানে পারবে?’ অধৈর্য হয়ে আবার জানতে চাইল কর্নেল।

‘একবার যখন পেরেছি...,’ কর্নেলের চেহারা দেখে চুপ করে গেল খুস্কায়েভ।

‘সে কৃতিত্ব তোমার নয়,’ কঠিন সুরে বলল কর্নেল। ‘পাঁচ মাইল দূরে থেকে স্মোক ফ্ল্যার দেখে ওদিকে গিয়েছিলে।’ আপন মনে মাথা নাড়ল সে। ‘কে জানে কেন স্মোক ফ্ল্যার ছাড়ল ওরা-হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট।’

‘হ্যাঁ, কর্নেল কমরেড,’ আমতা আমতা করে বলল খুস্কায়েভ, ‘বলা যায় ভাগ্যই আমাদেরকে সাহায্য করেছিল...’

‘ভাগ্যের সাহায্য আবার কিভাবে পেতে পারো, আমার কাছ থেকে জেনে নাও!’ খুস্কায়েভের হাত থেকে পেন্সিলটা কেড়ে নিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল কর্নেল। ‘ওরা আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটে চড়বে বলে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। কিউট রয়েছে এখানে,’ ম্যাপের গায়ে একটা আঁক কাটল সে। ‘আই.আই. ফাইভ আর কিউটের মাঝখানে একটা সরল রেখা আঁকো,’ নিজেই আঁকল সে। ‘কি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, টেঙ্ক মেরিডিয়ান ধরে এগোচ্ছে ওরা।’

খুস্কায়েভের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘তাহলে তো পানির

মত সহজ হয়ে গেল কাজটা। টেবু মেরিডিয়ান ধরে গেলেই...'

'চোপ!' মেঝেতে পা ঠুকে গর্জে উঠল কর্নেল। 'ফের যখন আমি কোন কাজে ডাকব, আসার আগে মাথাটা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে নেবে। বুদ্ধিশুদ্ধি যাও একটু আছে, তাও শুষে নিচ্ছে চুলগুলো। আমাদের বোকা বানাবার জন্যে কোর্স বদল করবে ওরা, বুঝলে হাঁদারাম? হয় ওরা দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবে নাহয় দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাবে।' রানার দলকে যেখানে দেখা গেছে সেখান থেকে দুটো আলাদা রেখা আঁকল সে। 'পরে আবার ওরা ফিরে আসবে দক্ষিণে। স্টার-ফিক্সে ভুল থাকবে ধরে নিয়ে, আইসফিল্ড ভেসে চলেছে মনে রেখে, ত্রিভুজ আঁকলাম, এর ভেতরই ওদের তুমি দেখতে পাবে।'

'জী, কর্নেল কমরেড,' খুস্কায়েভ ঢোক গিলে বলল। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে...'

'আমার সব কথাতেই যুক্তি থাকে,' পিছন ফিরে জুনায়েভের দিকে তাকাল কর্নেল। 'এবার প্রত্যেক হেলিকপ্টারে সশস্ত্র লোক থাকবে।'

'কিন্তু সবগুলো হেলিকপ্টারে দেব কিভাবে? অত লোক...'

'আমি বলেছি সবগুলো হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনতে হবে?'' মেঝেতে আবার পা ঠুকল কর্নেল। 'তা করলে জেনালের ফচ বুঝে নেবে তার ডিসেপশন অপারেশন ফেল করেছে। আই.আই.ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম থেকে কয়েকটা রিফুয়েলের জন্যে ফিরে আসুক। দেরি না করে আবার ওগুলো টেক-অফ করবে, চলে যাবে আমার ত্রিভুজে নজর রাখার জন্যে।'

কর্নেল আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই তাড়াহুড়ো করে

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। পাইপ কামড়ে ধরে ওয়াল-ম্যাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এবার কোথায় যাবে, মি. মাসুদ রানা? ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখোনি!' ঠোঁটে নির্দয় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল তার।

\*

যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে ওরা। সারাক্ষণ রাশিয়ান হেলিকপ্টারের আওয়াজ আসছে কানে। কখনও একেবারে কাছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে মাথার ওপর চলে আসবে। কখনও অনেক দূরে, মৌমাছির গুঞ্জনের মত অস্পষ্ট। ক্লান্ত শরীর নিয়ে একের পর এক নালা ধরে এগোচ্ছে দলটা, পাশে প্রেশার রিজের আড়াল। এঞ্জিনের আওয়াজ যখন বহুদূরে, স্নায়ুর ওপর তখন যেন বেশি চাপ পড়ে-গভীর মনোযোগের সাথে, কান খাড়া করে শুনতে হয়। মনে হয়, না জানি কখন বাড়তে শুরু করে শব্দটা। কে জানে এদিকেই আসছে কিনা।

ওগুলো যখন কাছাকাছি চলে আসে, বিরতিহীন একঘেয়ে হয়ে ওঠে এঞ্জিনের আওয়াজ, কাঁপতে শুরু করে বরফ-পাঁচিল, নাড়া খায় পায়ের তলায় নালার বরফ। শুধু সময়ের ব্যাপার, জানে রানা, আগে হোক বা পরে রাশিয়ানদের চোখে ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে। বিনয় আর নিয়াজের যুক্তি মেনে নিয়ে দলটাকে যদি দাঁড় করিয়ে রাখে ও, নালার ভেতর রাশিয়ানরা ওদেরকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাতে পিছিয়ে থাকতে হবে, কিউটের সাথে যোগাযোগের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

কিউটে পৌঁছতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

কিন্তু সচল বস্তু আকাশ থেকে সহজে চোখে পড়ে।

পিছিয়ে পড়ার চেয়ে রাশিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকিটাই নিচ্ছে রানা।

কিন্তু ক্লাস্তি ওদেরকে ক্ষমা করছে না। সন্ধ্যা দশটার দিকে চারজনেরই ভেঙে পড়ার মত অবস্থা দাঁড়াল। হাত-পা আর চলে না, চোখ আধবোজা হয়ে আছে, শিরায় শিরায় অচল হয়ে পড়ছে রক্ত। এরই মধ্যে দু'বার কেঁদে ফেলেছে ইভেনকো রক্তভ, রানার কাছে করুণা আবেদন জানিয়ে বলেছে, আর পারছে না।

কিন্তু রানা নির্মম। পরিস্কার বলে দিয়েছে, 'হয় সাথে থাকুন, না হয় পথ হারিয়ে পটল তুলুন।'

জবাব শুনে চটে উঠল বিজ্ঞানী। স্নেজের সাথে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো পাঠানোই হয়েছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

মনে মনে বলল রানা, কিন্তু কথা ছিল কে.জি.বি. গোপনে সহযোগিতা করবে। অথচ তাদের টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। স্পেশাল সিকিউরিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও তারা দেয়নি, দিলে বলটুয়েভ গং এভাবে ওদের প্রাণের শত্রু হয়ে উঠত না। 'পরিস্থিতি বদলে গেছে, মি. ইভেনকো। প্রশ্ন এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার। কাজেই ইচ্ছে হলে আসুন, না হয় থেকে যান-কোনটাতেই আমাদের আপত্তি নেই।'

ইভেনকো পিছিয়ে পড়ল, চট করে একবার পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখে নিল রানা। বিনয়ের স্নেজের পাশে রয়েছে ইভেনকো, আগের মতই ছুটছে। ওদের পিছনে রয়েছে নিয়াজ, সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তারাগুলোর অবস্থান জানার চেষ্টা করছে। ইভেনকোকে ফেলে রেখে যাবার কোন ইচ্ছেই নেই রানার, ভদ্রলোক অচল হয়ে

পড়লে বাধ্য হয়ে তখন স্নেজে তুলে নিতে হবে। তবে আশ্চর্য বটে, বরফে একাকী মরার ভয় দেখানোয় তার সমস্ত ক্লাস্তি কোথায় যেন উবে গেল, স্নেজের সাথে দৌড়াতে আর কোন আপত্তি করল না।

কিন্তু স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দিল, কেউ তার মেজাজকে বশে রাখতে পারছে না। মুখ খোলার উপায় নেই, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ওঠে। রাত ঠিক দশটার পরপরই নিয়াজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এবার তাদের থামতেই হবে। তার স্থির বিশ্বাস, রানার কথামত চললে নির্ঘাত মরতে হবে সবাইকে। যেভাবে হোক বোঝাতে হবে ওকে, ভাগ্য ওদের সাথে বেঈমানী করেছে, সামনে এগিয়ে আর কোন লাভ নেই। ব্যাগে সেক্সট্যান্ট ভরে বিনয়ের স্নেজ থেকে নামল সে, ছুটে চলে এল রানার স্নেজের পাশে। 'আরেকটা প্লেন আসছে, রানা,' বলল সে। 'থামো। রিজের মাথায় চড়ে দেখে আসি...'

'শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট,' উত্তরে বলল রানা। 'প্লেনটা অনেক দূরে...'

'কিন্তু এদিকেই আসছে! আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছ না, আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে? মাথার ওপর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ফর গডস সেক, কেন?'

হ্যান্ডেলবারটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল রানা, বাঁঝের সাথে জবাব দিল, 'কারণ বলটুর খেলার ঘুঁটি হতে চাই না। কি ঘটছে বুঝতে পারছ না? এলোপাতাড়ি আসা-যাওয়া করছে ওরা, আন্দাজের ওপর। আমরা কোথায় ওরা জানে না।'

‘এভাবে আসা-যাওয়া করতে করতেই দেখে ফেলবে...’

‘ভাগ্য যদি খুব ভাল হয়। নালার ভেতর রয়েছে আমরা, কোন প্লেন কাছাকাছি চলে এলে পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াব। মাথার ওপর দিয়ে উঠে গেলেও দেখতে পাওয়া সহজ হবে না।’

‘আর যদি দেখে ফেলে?’

‘তখন ভাবব কি করা যায়।’

‘ভাবলেও তখন কোন উপায় বেরবে না।’

‘বোকার মত কথা বলছ,’ বলল রানা। ‘বিপদ যত গুরুতরই হোক, উদ্ধার পাবার উপায় একটা না একটা থাকেই, তুমি সেটা দেখতে পাবে কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন।’

রানার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে কেমন যেন খতমত খেয়ে গেল নিয়াজ, মনে হলো রানার এই গুণটা তার নিজের ভেতর থাকলে ভাল হত।

গভীর করে শ্বাস টানল রানা, নিয়াজের দিকে তাকাল। মুহূর্তের অন্যমনস্কতার জন্যে কাত হয়ে গেল স্লেজ, দু’হাতে হ্যাভেলবার টেনে ধরে কোন রকমে শেষরক্ষা করল। সামনের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, ‘আরও অনেক দূর এগোতে হবে আমাদের, কর্নেল বলটু যাতে মনে করে অত দক্ষিণে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার আগে বিশ্রামের কথা ভুলে যাও। জানি, হেলিকপ্টারগুলো আমাদের খুঁজছে। আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করাও ওদের একটা উদ্দেশ্য, এঞ্জিনের আওয়াজ কানে ঢুকলেই আমরা যাতে অস্থির হয়ে উঠি। প্রতিবার শুধু শুনলেই আমরা যদি থামি, পিছিয়ে পড়ব না? ওরা চাইছেও ঠিক তাই। আমরা যাতে কিউটে পৌঁছুতে না পারি...’ হেলিকপ্টারের আওয়াজ

হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল রানা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল, ‘আড়াল নাও!’

কুকুরগুলোকে দাঁড় করানো হলো, লম্বা হয়ে পাশে শুয়ে পড়ে বিনয় শান্ত করার চেষ্টা করল ওগুলোকে। কয়েক সেকেন্ড পরই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা হেলিকপ্টার, এঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড় হলো। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, নালার দুশো ফিট ওপর দিয়ে কালো ছায়ার মত সঁাৎ করে বেরিয়ে গেল। তারপরও স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ওরা, জানে না শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে কিনা। ওদের দেখে থাকলে আবার ফিরে আসবে ওটা।

নাড়াচড়া নেই, হিম শরীরের ভেতর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে অবশ, উঠে দাঁড়াবার শক্তি আছে কিনা সন্দেহ। হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে সরে যেতে আবার অস্থির হয়ে উঠল কুকুরগুলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, হেলিকপ্টার ফিরে আসল না দেখে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা। রানাকে আরেকবার বোঝাবার চেষ্টা করল নিয়াজ। ‘রানা, ভেবে দেখো। পেটে কিছু না পড়লে...’

রানা অন্যমনস্ক, চুপচাপ শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। কোন আওয়াজ পেল না ও। ক্লান্ত পা ফেলে বরফ-পাঁচিলের দিকে এগোল। পাঁচিলে ওঠার জন্যে বারবার চেষ্টা করল, প্রতিবার পা পিছলে নেমে এল নিচে। আপনমনে কাঁধ বাঁকিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল নিয়াজ। পাঁচিলের মাথায় উঠল রানা। নাইট-গ্লাস পরিস্কার করে চোখে তুলল। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল ও। ঝাপসা দিগন্তরেখার ওপর চোখ বুলাল, তারপর একটু

নিচু করল গ্লাস। ঝাড়া এক মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে নালার দিকে তাকাল। ‘উঠে এসো, নিয়াজ। দেখো।’

‘খবর?’ কর্নেল বলটুয়েভ জানতে চাইল।

‘নেই।’ খুস্কায়েভ ঘরের দরজা বন্ধ করল। ‘এইমাত্র ফিরে এলাম—ওদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।’

‘আশা ছেড়ে দেব, বলছ?’ মেঝেতে পা ঠুকে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। জুনায়েভ তাকে চেনে, নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সে। ‘তুমি একটা কাপুরুষ, খুস্কায়েভ। একটা ডিটাচমেন্টের লীডার হবার যোগ্যতা তোমার নেই। এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে পারে সে—ই জেতে। ঝামেলা শেষ হলে তোমার চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাব আমি। নিশ্চয়ই খেতে যাচ্ছ? ভুলে যাও, খুস্কায়েভ। পরবর্তী যে হেলিকপ্টার টেক-অফ করছে ওটায় থাকছ তুমি।’ খুস্কায়েভ ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। ‘ওরা কিউটে পৌঁছে গেলে ব্যাপারটা সত্যি জটিল হয়ে উঠবে, জুনায়েভ।’

খতমত খেয়ে গেল জুনায়েভ। এই প্রথম কর্নেল কমরেড আশঙ্কা প্রকাশ করল, জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছানো রানার পক্ষে অসম্ভব নয়। ‘জটিল, কমরেড কর্নেল?’ জিজ্ঞেস করল সে, তারপর বলল, ‘ইভেনকো যদি কোন আমেরিকান জাহাজে একবার চড়তে পারে, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।’

‘অসম্ভব?’ ঠাণ্ডা গলায় বলল কর্নেল, মাথা নাড়ল। ‘আমি তা মনে করি না। ঝামেলা হবে, কিন্তু অসম্ভব নয়।’

সরাসরি তর্কে না গিয়ে মিনমিন করে জুনায়েভ বলল, ‘ভাগ্য যদি আমাদের সাহায্য করে...’

‘ভাগ্যের আমি নিকুচি করি!’ গর্জে উঠল কর্নেল। ‘তুমি জানো না, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি আমি?’ টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মারল সে। ‘কৌশল বদল করছি। এখন থেকে কিউটের উত্তর দিকটায় চোখ রাখব। যে-পথ দিয়ে কিউটের দিকে আসবে ওরা। টার্গেটকে দেখামাত্র কাছাকাছি, নিরাপদ দূরত্বে ল্যান্ড করবে আমাদের হেলিকপ্টার। নিচে বরফ নরম কি শক্ত জানতে চাই না আমি। যেভাবে পারে ল্যান্ড করতে হবে।’

‘ইভেনকোর সাথে যারা আছে তারা যদি বাধা দেয়?’

‘সেজন্যেই আমার দ্বিতীয় নির্দেশটা এখুনি সবাইকে জানিয়ে দেবে তুমি। সশস্ত্র প্রতিটি দলের লীডারকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবে। খবরদার, পাইলট যেন শুনতে না পায়। ইভেনকোর সাথে যারা আছে তাদের আমরা চাই না। তারা ঝামেলা, কাজেই হারিয়ে গেলে আমরা খুশি হব। সহজ সমাধান, বরফের নিচে পুঁতে ফেলা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গভীর কোন ফাটল পাওয়া যায়—লাশগুলো নিচে ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কুকুরগুলোকেও মারতে হবে, বিষ মেশানো খাবার দিয়ে। স্নেজ দুটোরও কোন অস্তিত্ব রাখা চলবে না। মাঝরাতের মধ্যে, জুনায়েভ! যদি সম্ভব হয় তারও আগে...’

নিশ্চয়ই মরীচিকা, প্রথমবার দেখে ভাবল রানা। আকৃতিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর আর দেখা গেল না। লেস অ্যাডজাস্ট করতে আবার ফিরে এল। না, দৃষ্টিভ্রম নয়। নিয়াজকে পাঁচিলের ওপর

উঠতে বলল ও।

রানার শান্ত গলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, বরফের পিছলা ঢাল বেয়ে কিভাবে যে মাত্র একবারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠে এল, বলতে পারবে না নিয়াজ। চোখে গ্লাস তোলার জন্যে হুড নামাল মুখ থেকে।

‘ওদিকে! দেখে বলো, ভৌতিক কিছু না তো?’

নাইট-গ্লাস ধরা আঙুলগুলো কাঁপছে নিয়াজের। সামনে আরও তিন মাইল প্রেশার রিজ ঢেউ খেলে রয়েছে, যেন ঝড়ের ছোবল খেয়ে ফুঁসে ওঠা সাগর আচমকা মাঝপথে জমাট বরফ হয়ে গেছে। আরও সামনে সমতল বরফের বিস্তার, তারই মাঝখানে গৈঁথে রয়েছে মরীচিকা-চাঁদের আলোয় এমন একটা দৃশ্য, ফটো তোলা হলে অবাস্তব দেখাবে। ‘গুড গড!’ স্তম্ভিত নিয়াজ ফিসফিস করে উঠল।

উঁচু মাস্তুল আর উঁচু ব্রিজ নিয়ে একটা জাহাজ বরফ আর তুষারে তৈরি। দেখতে অনেকটা জন্মদিনের কেকের মত, নাইট-গ্লাসে নিয়াজ দেখল, জাহাজের বো ওর দিকে তাক করা রয়েছে। গোটা জাহাজ চকচক করছে, যেন সাদা কাঁচে মোড়া। মাস্তুল থেকে বরফের ঝুরি ডেক পর্যন্ত নেমে এসেছে। বো-টা অস্বাভাবিক উঁচু, যেন বিশাল কোন ঢেউয়ের মাথায় চড়ে রয়েছে। কিন্তু জাহাজটা সম্পূর্ণ স্থির, পোলার প্যাকে শক্তভাবে গাঁথা। ওটা যে পরিত্যক্ত নয় তার একমাত্র প্রমাণ, মাস্তুলের ডগায় আলো জ্বলছে। মরীচিকা হতেই পারে না। আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট ওটা, সবচেয়ে কাছের সাগর থেকে দশ মাইল দূরে চলে এসেছে, আটকা পড়েছে পোলার প্যাকে।

‘গুড গড!’ আবার বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘রিপিট করছ কেন, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ নাকি?’

এক পাক নেচে উল্টোটা প্রমাণ করল নিয়াজ।

‘সবিনয়ে জানতে চাইছ,’ নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল বিনয়, ‘...’

‘আবে হালা অহনও বুঝবার পারো নাই? হালায় কিউট বরফের মইদ্যে...’

কুকুরগুলোর কাছে ইভেনকো রক্তভকে রেখে পাঁচিলে উঠল বিনয়। ‘যদি ঠাট্টা হয় রে!’

নাইট-গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিয়াজ বলল, ‘নিজের চোখেই দেখ।’

গ্লাস চোখে তুলল বিনয়, এক সেকেন্ড পর সবিস্ময়ে বলল, ‘এত ভেতরে ওটা ঢুকল কিভাবে?’

‘টোকেনি, টোকানো হয়েছে,’ বলল রানা। ‘শক্তির নাম সাহস। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবে শুনেছি তাঁর সাহসের তুলনা হয় না। আমাদের কাছাকাছি আসার জন্যে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বরফ ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি বলো তো? জাহাজের রাডার দেখা যাচ্ছে না।’

‘লোকটা যে বেপরোয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল নিয়াজ। ‘কত দূরে, আন্দাজ করতে পারো?’

‘সাত মাইলের কম নয়,’ বলল রানা। ‘এগোনের ব্যাপারে আর কোন আপত্তি আছে?’

প্রথম দু’মাইল ঝড়ের বেগে এগোল ওরা, গত কয়েক ঘণ্টায়



এই গতি একবারও তুলতে পারেনি। সামনে আর এক মাইল দুর্গম পথ, তারপরই খোলা, সমতল বরফের বিস্তার। মাথার ওপর রাশিয়ানদের হেলিকপ্টার নেই, কাজেই রানা সিদ্ধান্ত নিল ইলিয়ট হোমিং বীকন অন করে সিগন্যাল পাঠানো যেতে পারে। সিগন্যাল পেলেই হেলিকপ্টার পাঠাবে কিউট।

পরিশ্রান্ত বলেই কনকনে ঠাণ্ডা অসহ্য হয়ে উঠল। চারদিক এখনও পরিষ্কার, শুধু স্লেজ-টীমের মাথার ওপর ঝুলে আছে হালকা কুয়াশা, ঝোঁয়াটে বাস্পের মত। জনপ্রিয় ধারণা, আর্কটিকে চব্বিশ ঘণ্টা ঝড়-ঝঞ্ঝা লেগে আছে, এই অক্ষাংশে তা সত্যি নয়। এ শুধু পৃথিবীর শীতলতম জায়গার একটা।

একটা নালার ভেতর থামল ওরা। বিনয় সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এই গোলকধাঁধায় হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। তবু নিয়াজকে ট্রান্সমিটার বের করার নির্দেশ দিল রানা। ‘ওরা একজন একজন করে আমাদের তুলে নেবে, বিনয়,’ ব্যাখ্যা করল ও। ‘তারপর কুকুরগুলোকে খোলা বরফে নিয়ে যাব আমি।’ ক্যানভাসের ভেতর থেকে ট্রান্সমিটার বের করছে নিয়াজ, নালার ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটেতে ছুটেতে নেমে এল ইভেনকো। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ইভেনকো হাঁপাচ্ছে। রানার মুখের কাছে হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ‘আর যখন বিপদের কোন ভয় নেই, এবার আমার সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন!’

‘মানে?’ চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা, ডান বুটের ডগা দিয়ে বরফে খোঁচা মারছে। তেমন শক্ত মনে হলো না। বোধহয় ওর সন্দেহই ঠিক, নালার দু’পাশে প্রেশার রিজ খুব বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। এখানে মস্ত একটা ফাটল ছিল,

সেটা বন্ধ করে মাথাচাড়া দিয়েছে বরফ-পাঁচিল।

‘আমার টিউব! তোমরা আমার টিউব চুরি করেছ!’ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ল ইভেনকো, পারকার পকেট থেকে ভারী একটা টিউব বের করে রানার মুখের সামনে নাড়ল।

‘আপনার হাতেই তো রয়েছে ওটা,’ বলল রানা, বুটের ডগা হঠাৎ করে বরফের ভেতর সঁধিয়ে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠল। গর্ত থেকে বুট তোলার পর দেখা গেল ডগা থেকে কালচে পানি বরছে। নরম বরফ এখানে। ইভেনকো এতই উত্তেজিত যে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না।

‘এটা সেই টিউব নয়...!’

‘আরেকটার কথা বলছেন, যেটার ভেতরে মেরিলিন চার্ট ছিল?’ সরাসরি ইভেনকোর দিকে তাকাল রানা। ‘ওটা আমাদের কাছে থাকাই নিরাপদ। শুধু শুধু টেঁচামেচি করবেন না।’

‘তারমানে? আমার জিনিস...’

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, ‘কথা না বাড়িয়ে নিয়াজকে একটু সাহায্য করবেন, প্লিজ?’

ট্রান্সমিটার কাঁধে নিয়ে নালা ধরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে নিয়াজ, সমতল কোন জায়গার খোঁজে। এরইমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে সে। জিনিসটা ভারী, বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। সাবধানে পা ফেলছে সে, পিছলা ঢালে পা হড়কালে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আরও খানিকদূর এগোবার পর একদিকের পাঁচিলের গায়ে একটা ফাঁক দেখল সে, মেঝেটা সমতল। ধীরে ধীরে ফাঁকের মাঝখানে ট্রান্সমিটার নামাল। রানার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছে ইভেনকো।

‘এরকম একটা অন্যায় আমি মেনে নেব কেন? আমার জিনিস আপনারা কেন লুকাবেন? ওটার জন্যেই ওয়াশিংটনে আমার দাম...’

রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছে ইভেনকো, বিনয়ের সহ্য হলো না। হেঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল সে, বলল, ‘দাম? কিউটে না ওঠা পর্যন্ত কারও এক কানাকড়ি দাম নেই। রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছেন, এর মানে কি? স্বাভাবিক ভদ্রতা কাকে বলে তাও ভুলে গেছেন? যান, নিয়াজের সাথে ধরাধরি করে ট্রান্সমিটারটা নিয়ে আসুন।’

‘তোমরা আমেরিকান নও, অথচ...,’ গজগজ করতে করতে চলে গেল ইভেনকো।

নিচু গলায় রানা বলল, ‘বিনয়, পায়ের নিচে নরম বরফ। সাবধানে থাকতে হবে।’

‘নরমই তো হবার কথা,’ বলল বিনয়। ‘সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছি না!’

হঠাৎ আত্ননাদ করে উঠল ইভেনকো। দু’জনেই ওরা ঝট করে সেদিকে তাকাল। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল ইভেনকো। প্রায় সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। ‘সেরেছে!’ অসহায় বোধ করল রানা। ‘ভদ্রলোকের গোড়ালি ভেঙে গেছে।’

সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে তৈরি হয়েছে নিয়াজ, ইভেনকোর চিৎকার শুনে সেট ফেলে ছুটে এল।

হাড় না ভাঙলেও, মারাত্মক চোট পেয়েছে ইভেনকো-গোড়ালিতেই। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা, ফোঁপাচ্ছে। নিয়াজ তার বগলের নিচে হাত গলিয়ে বসার ভঙ্গিতে

খানিকটা তুলল, তারপর টেনে নিয়ে এল পাঁচিলের কাছে। পাঁচিলে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল ইভেনকো। একটা গর্তে পা দেবে গিয়েছিল, বুট থেকে কালচে পানি বরছে। মুখ তুলে রানা আর বিনয়ের দিকে তাকাল নিয়াজ। ‘রানা! এদিকে নরম বরফ! মি. ইভেনকোর গোড়ালি মচকে গেছে, হাঁটতে পারবেন না!’

ছুটল বিনয়। ধরাধরি করে একটা স্লেজে তোলা হলো ইভেনকোকে। রানাও পৌঁছল। চেহায়ায় ব্যথা আর অভিমানের ছাপ নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল ইভেনকো, রানার দিকে তাকাবে না।

‘সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী,’ মনে করিয়ে দিল রানা।

ঢাল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল নিয়াজ, সাথে বিনয়। দেখে শুনে পা ফেলছে ওরা, বরফের পাতলা আবরণে পা পড়লে চিরকালের জন্যে সাগরের অতলতলে তলিয়ে যেতে পারে। পাঁচিলের ফাঁকটার কাছে পৌঁছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নিয়াজ। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? পরমুহূর্তে গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। পিছিয়ে পড়েছিল বিনয়, ছুটল সে। রেডিফন সেট নরম বরফে ডুবে গেছে। ট্রান্সমিটারের প্রায় সবটুকু অদৃশ্য হয়েছে, ওপরে খাড়া হয়ে রয়েছে শুধু এরিয়াল। বরফে হাঁটু গেড়ে বসল নিয়াজ, পাগলের মত হাত দিয়ে বরফ খুঁড়তে শুরু করল। ট্রান্সমিটার বেরুল না, গাদা গাদা বুদ্ধদের সাথে উঠে এল কালচে পানি। ভেতরে দস্তানা পরা হাত গলিয়ে দিয়েও ট্রান্সমিটারের স্পর্শ পেল না সে। মরিয়া হয়ে এরিয়াল ধরে টান দিল, মট করে ভেঙে গেল সেটা। চারপাশ থেকে কাদাটে বরফ এসে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা।

একমাত্র ট্রান্সমিটারটা গ্রাস করল প্রকৃতি। কিউটের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় থাকল না।

‘মৌচাকের ব্যবস্থা করেছ?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। পোলার প্যাক থেকে হাজার ফিট ওপরে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছে সে। সাবমেরিন কিলার দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। খুস্কায়ের হেলিকপ্টার রয়েছে আরও দক্ষিণে, রেডিও-টেলিফোনে তার সাথে সরাসরি কথা হচ্ছে বলে কিউটের ছদ্মনাম মৌচাক ব্যবহার করছে ওরা।

‘মৌচাককে স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে,’ জবাব দিল খুস্কায়ের।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কর্নেলের গলা থেকে, সেট অফ করে দিয়ে নিচে বরফের দিকে তাকাল সে। তার ধারণা, ঘটনা প্রবাহ নাটকীয় মোড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত, ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকার একটা তাগাদা অনুভব করছে সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে আমরা মুঠোয় পাব ওদের,’ আপনমনে বিড়বিড় করল।

জুনায়েভের স্বভাবই হলো খারাপ দিকগুলো আগে চিন্তা করা। ‘কিন্তু এখনও ওদের দেখতে পাইনি আমরা।’

জুনায়েভকে থামাবার জন্যে চোখ গরম করে তাকাল কর্নেল। শব্দজটে কান ঝালাপালা হলো তার। চেহারা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মেসেজটা রিসিভ করল সে। তারপর পাইলটের দিকে তাকাল। ‘আরও জোরে চালাতে পারো না, নাকি বরফে নোঙর ফেলে আছ?’ ঝট করে জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে,

বলিনি? এইমাত্র টার্গেট দেখতে পেয়েছে ওরা।’

‘রানা! শকুনটা ল্যান্ড করতে আসছে!’

‘জানতাম।’ বরফ-পাঁচিলের ওপর থেকে চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, পরিষ্কার দেখল সাবমেরিন কিলার নিচে নামছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে, সমতল বরফের ওপর ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ওটা।

শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে ওরা। এর আগে হেলিকপ্টারটা দু’বার উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। নামার জন্যে ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রুশ পাইলট, কিউট আর ওদের মাঝখানে। চোখ থেকে গ্লাস নামাল রানা। ঘুঁটি আরও একটা চেলেছে কর্নেল বলটুয়েভ-বরফ মোড়া জাহাজের মাস্তুলের কাছাকাছি ঝুলে রয়েছে দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার, কিউট থেকে যাতে কোন হেলিকপ্টার টেক-অফ করতে না পারে।

‘প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম,’ রানার একপাশ থেকে তিক্ত গলায় বলল বিনয়। ‘আর ঘণ্টা দুই সময় পেলেই...’

রানার আরেক পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে নিয়াজ। থমথম করছে তার চেহারা।

‘দুঃখে কাতর হয়ে কোন লাভ নেই,’ বলল রানা। ‘কি করতে হবে আমি জানি।’

কুকুরগুলো হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠায় তাড়াহুড়ো করে নালায় নেমে গেল বিনয়। প্রথম সাবমেরিন কিলার এখনও নামছে, এঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজ প্রেশার রিজে বাড়ি খেয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি শুরু করল। ধীরে ধীরে বরফে নামল সেটা, রোটর

ঘুরছে। দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নিচের বরফে নামল লোকজন, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। পারকা পরা বেচপ আকৃতি নিয়ে, চাঁদের আলোয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তারা, এগিয়ে আসছে প্রেশার রিজগুলোর দিকে। অপারেশনের দ্রুতগতি আর সুশৃঙ্খল ভাব লক্ষ করে আবার মুগ্ধ হলো রানা।

‘এত লোক!’ নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলে বলল নিয়াজ। ‘আমার ধারণাই ছিল না সাবমেরিন কিলারে এত লোক ধরে।’

‘কি করতে হবে তুমি জানো,’ নিয়াজকে মনে করিয়ে দিল রানা। ‘ইভেনকোর ওপর কড়া নজর রাখবে। এখন যদি ভদ্রলোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, মাথায় বাড়ি।’

‘রানা, আরেকবার ভেবে দেখো। তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো!’

‘ওদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকলে সবাইকে মরতে হবে,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘ওরা শুধু ইভেনকোকে নিতে এসেছে, আমাদের নাম খরচের খাতায় টুকে রাখবে।’

বরফ-পাঁচিল থেকে পিছলে নেমে এল রানা, হাতে রাইফেল নিয়ে নালা ধরে ছুটল। পিছন থেকে সবাই তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় আর ইভেনকোকে নির্দেশ দিল নিয়াজ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে-যার কাজে মন দিল ওরা।

দু’পাশে বরফ-পাঁচিল উঁচু হয়ে থাকলেও মাথা নিচু আর শিরদাঁড়া বাঁকা করে ছুটছে রানা। সামনে নরম বরফ থাকলে বিপদ হবে, জানে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। জরুরী অবস্থায় সমস্ত ক্লাস্তি কোথায় যেন উবে গেছে, নিজেকে সতেজ আর প্রাণবন্ত

লাগছে ওর। ভাবনা-চিন্তায় কোন জড়তা নেই, হাত-পায়ের ওপর রয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ‘আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো,’ কথাটা মিথ্যে বলেনি নিয়াজ-সোজা রাশিয়ানদের দিকে ছুটছে রানা।

ঝুঁকি নিচ্ছে রানা, কিন্তু বোকাম মত নয়। এ-ধরনের সঙ্কটে অনেকের বুদ্ধি খোলে, কিন্তু সাহসের অভাব দেখা দেয়। রানা সাহসী যুবক, ওর রক্তে রয়েছে ঝুঁকির নেশা। একা নিজের কথা ভাবতে অভ্যস্ত নয়, সেজন্যেই কঠিন যে-কোন অভিযানে ওকেই নেতৃত্ব দেয় মানুষ। ইভেনকো সহ সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচাবার দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে। কাজেই শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্যে সহজ বুদ্ধিটা কাজে লাগাচ্ছে ও। নালা এদিকে একটা নয়, অসংখ্য। রাশিয়ানরা একটা ধরে আসবেও না। সাবমেরিন কিলার থেকে বিশজনকে নামতে দেখেছে ও, তাদের সবার সামনে একা ওকে দাঁড়াতে হবে না। বিস্ময়ের ধাক্কায় শত্রুপক্ষ ঘাবড়ে যাবে, এই ভরসায় ছুটছে রানা। রাশিয়ানরা জানে সংখ্যায় ওরা মাত্র চারজন, জানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ছোট্ট দলটা। এই পরিস্থিতিতে ওদের একজন তাদের দিকে ছুটে আসবে কল্পনা করা যায় না।

এঁকেবেঁকে, ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে নালা। খানিক পরপরই বাঁক নিতে হলো, কিন্তু ছোট্টা গতি কমল না। পাঁচিলের মাথা থেকে নালাগুলো দেখে নেয়া আছে, রানা জানে সবগুলোই গিয়ে মিশেছে বরফের সমতল বিস্তারে। কোথাও কোথাও হিম করিডর গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, কোথাও বাঁক নিলেই গায়ে জড়াচ্ছে চাঁদের কোমল আলো। একটু পরই গতি মন্থর করতে হবে ওকে, কারণ এগিয়ে আসা রাশিয়ানদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ও। ছুটছে,

সেই সাথে হেলিকপ্টার এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ শুনছে। পাইলট কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, আবার চালু নাও হতে পারে ভেবে এঞ্জিন বন্ধই করেনি সে।

খামল রানা, তারপর সাবধানে, এক পা এক পা করে এগোল। রাশিয়ানদের সাথে দেখা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও, ফাঁক-ফোকরগুলো ভাল করে দেখে রাখছে—গা ঢাকা দেয়ার দরকার হলে কাজে লাগবে। অবশ্য আগেভাগে যদি পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় তবেই লুকোবার সুযোগ মিলবে। ওরা যে অ্যামেচার, কোন সন্দেহ নেই। সোভিয়েত স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টগুলোকে আর্কটিকে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হলেও, পোলার প্যাকে পায়ের হেঁটে অভিযানে বেরবার ট্রেনিং দেয়া হয়নি। দু’হাতে রাইফেলটা ধরে আছে রানা, বাঁক নিয়ে সামনে বেরিয়ে এল রুশ সৈনিক।

দু’জনেই চমকাল। কিন্তু রাশিয়ান লোকটা হেলিকপ্টারের এত কাছাকাছি কাউকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি। সে তার অটোমেটিক রাইফেল কাঁধে রেখেছে। কাঁধ থেকে সেটা নামাতে যাওয়াই তার ভুল হলো। রানার মাথায় কোন চিন্তা খেলে যাওয়ার আগেই শরীরে খেলে গেল বিদ্যুৎ। রাইফেলটা হাতে ঘুরে গেল, ভারী বাট-পেট রুশ সৈনিকের মুখের দিকে তাক করে ধরল ও। চ্যাপ্টা বাঁটটাকে আসতে দেখল লোকটা, ঠিক মাথা বরাবর। শেষ মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, মাথা বাঁচলেও, মুখ বাঁচল না। নাকের পাশে আর চোয়ালে রাইফেলের বাঁট পড়ল, ধাক্কা খেয়ে বরফের ওপর আছাড় খেলো সে। সামনে বাড়ল রানা।

চিৎ হয়ে পড়েছে লোকটা, বরফে ঠুকে গেছে মাথার পিছনটা।

তবে ফার হুড়ে মাথা ঢাকা থাকায় মোটেও ব্যথা পায়নি। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল, হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে দূরে। রানার বুট পরা পা তার মুখের সামনে থামতেই দু’হাত দিয়ে একটা পা জড়িয়ে ধরল সে। তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিল একপাশে।

রাইফেলের বাঁটটা খাড়াভাবে সজোরে নামাল রানা। শক্ত কপালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বাঁট। রানার পা জড়িয়ে ধরা হাত দুটো নিখর হয়ে গেল। অজ্ঞান লোকটাকে পরীক্ষা করল রানা। মারা যাবার সম্ভাবনা কম। তবে জ্ঞান ফিরে পেতে সময় নেবে। ওর সঙ্গীরা আঘাতগুলো দেখে ধরে নেবে পা পিছলে শক্ত বরফে আছাড় খেয়েছে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। বুটের ধাক্কা লোকটাকে উপুড় করল রানা।

এরপর আরও বড় ঝুঁকি নিল ও, আবার ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে। শত্রুপক্ষের কৌশলটা আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। বিশজন সশস্ত্র লোক ছড়িয়ে পড়েছে খোলা বরফ প্রান্তরে, দশ-বারোটা নালা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে তারা। কেউ যদি ফেরারীদের দেখতে পায়, ফাঁকা গুলি করে বাকি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সাথে সাথে আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে এসে ছোট্ট দলটাকে ঘিরে ফেলবে তারা। সামনে বাঁক দেখেও ছোট্ট গতি কমালো না রানা, বাঁক নেয়ার সাথে সাথে এক ফালি আলো দেখতে পেল সামনে। নালা থেকে বেরবার পথ পেয়ে গেছে ও, সামনে খোলা বরফের বিস্তার।

মাত্র একশো গজ দূরে সাবমেরিন কিলার, জোড়া ফিন রানার দিকে মুখ করা। পাইলটের কেবিন রয়েছে উল্টোদিকে। রোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা। নালা থেকে উঁকি দিয়ে বাইরেটা

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। খোলা জায়গায় কোন পাহারাদার নেই। বিশজনের একটা দল চারজনকে ধরতে যাচ্ছে, কল্লনাতেও ঠাঁই পায়নি চারজনের একজন বিপদ হয়ে এগিয়ে আসতে পারে। সরাসরি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরল রানা।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ও, দৃঢ় কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে সাবমেরিন কিলারের পিছনটা। কাজটা এক ধরনের পাগলামি হয়ে যাচ্ছে, জানে রানা। পাইলট পিছন দিকে তাকাবে না এটা ধরে নিয়ে জুয়া খেলছে ও। পাইলট যদি তাকায়ও, ওকে হাঁটতে দেখে ততটা সতর্ক হবে না যতটা সতর্ক হবে ওকে ছুটতে দেখলে। শুধু একটা লিভার টানার অপেক্ষা, সাথে সাথে খাড়াভাবে আকাশে উঠে যাবে হেলিকপ্টার। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার। হাঁটার গতি আরও কমিয়ে দিল রানা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানার মনে হলো, ভাগ্য আজ প্রসন্ন। ওর প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে। ফার হুড আর পারকা হুবহু রাশিয়ানদের মত দেখতে না হলেও, মিল আছে। অমিল যে-টুকু আছে, চাঁদের আবছা আলোয় পাইলটের চোখে পড়ার কথা নয়। যত কাছে চলে এল ততই বাড়তে লাগল রোটরের আওয়াজ, ততই দৌড়ের ঝাঁক চাপল শিরায় শিরায়। আর বিশ গজ বাকি। রানার প্রতিটি পেশী, প্রতিটি লোমকূপ নিঃশব্দে চিৎকার করছে। কিন্তু তবু রানা শান্ত, খানিকটা অলস ভঙ্গিতে হাঁটতেই লাগল। সাবমেরিন কিলারের লেজটা পুরানো ধাঁচের, আগেকার দিনে বাইপ্লেনে যেমন থাকত। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে লেজটাকে পাশ কাটাল রানা। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ধাপ বেয়ে

উঠল। দম বন্ধ। বিপজ্জনক কিছু ঘটলে এখনই ঘটবে। বরফের পাতলা আবরণে মোড়া রয়েছে কেবিনের জানালা। দস্তানা পরা হাত মুঠো করে জানালায় আঘাত করল ও।

হেলিকপ্টারের সাথে রানাও কাঁপছে। জানালায় ঘুসি মারায় কোন লাভ হলো না। দ্বিতীয়বার আঘাত করল রানা। মাথা নিচু করে আছে ও, জানে ভেতর থেকে কাঁচের ওপর নাক ঠেকিয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করবে পাইলট। নিজেদের লোক নয় বুঝতে পারলে খুন করার জন্যে খেপে উঠবে।

সাঁধ্য করে একপাশে সরে গেল জানালা, অমনি রাইফেলের নলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা। গরম বাতাস লাগল মুখে। হেলমেট পরা একটা ফার মোড়া মূর্তি সীটের ওপর পিছিয়ে গেল। ‘বেরোও!’ রুশ ভাষায় বলল রানা, রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার। ‘তা না হলে গুলি খেয়ে মরো! জলদি!’ শুধু মুখে নয়, ইঙ্গিতেও লোকটাকে কন্ট্রোল কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার তাগাদা দিল রানা। জানালার ফ্রেমে হেলান দিল ও, রাইফেলের মাজল্ ঠেকাল লোকটার পাজরে। রুশ পাইলট গগলস পরে আছে, তবু চোখ দেখে তাকে যুবক বলেই মনে হলো। পঁচিশ, তার বেশি বয়স হবে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এই বয়সেই বীরত্ব দেখাবার ঝাঁক থাকে। একটা লিভারের দিকে হাত বাড়াল পাইলট।

লিভারে টান পড়লেই বরফ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়বে সাবমেরিন কিলার। ঝুলে থাকতে হবে রানাকে। কিংবা ঝাঁকি খেয়ে নিচের বরফে পড়ে যাবে, সেই সাথে সান্ধ হবে ভবলীলা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে গর্জে উঠল ও, ‘গুলি করলাম!’

মৃত্যু ভয় বড় ভয়। পাইলটের হাত স্থির হয়ে গেল। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি সে। লোকটা কি ভাবছে পরিষ্কার ধরতে পারল রানা। আড়চোখে পাশে তাকাল সে, মাজ্‌ল্টা দেখে নিল। ভাবছে, গুলি খেয়েও বাঁচার আশা আছে কিনা। ক্যালিবার দেখে ভয় পেল সে, লিভার থেকে সরিয়ে আনল হাত। ‘দাঁড়াও! বেরোও!’ হিংস্র হয়ে উঠেছে রানা। নালা থেকে ওদের কেউ বেরিয়ে এলেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। হেলিকপ্টারের জানালায় বুলে থাকা একজন লোককে গুলি করে মারা ডালে বসে থাকা পাখি শিকারের চেয়েও সহজ।

যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েই হেডসেট খুলে ধীরে ধীরে সীট ছাড়ল পাইলট। তার শান্ত ভঙ্গি সতর্ক করে দিল রানাকে।

সীট থেকে খানিকটা উঠে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল পাইলট, গগলসে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো পড়ায় চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। ‘বেরিয়ে এসো,’ কর্কশ গলায় বলল রানা। ‘তাড়াতাড়ি করো!’ পাইলট কাছে সরে এল, সেই সাথে রাইফেলটা একটু একটু করে নিজের দিকে টেনে নিল রানা, বাঁটটা ঢুকে যাচ্ছে বগলের তলায়। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে দরজার হাতল ধরে আছে ও। ট্রিগার গার্ডে আঙুল। হাতলে ঠেলা দিতেই দরজা একপাশে সরে যেতে শুরু করল। ধীর, অলস ভাবে হাত দুটো দু’পাশে মেলে দিল পাইলট, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

আস্তে আস্তে রানা আর দরজার দিকে এগিয়ে এল পাইলট। একটু পাশ ফিরল, যেন রানার ইঙ্গিতে লাফ দিয়ে বরফে নামতে যাচ্ছে। তারপর, ঘুরন্ত রোটরের তলা থেকে লাফ দিল সে। লাফ দিল বরফের দিকে নয়, রানার রাইফেল লক্ষ্য করে।

তৈরি ছিল রানা, কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। এরকম একটা ব্যাপার ঘটে যাবে, ঘুণাঙ্করেও টের পায়নি। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে, দরজার হাতল ধরে বুলে পড়ল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পাইলট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেলল। দরজা দিয়ে বেরুল সে খাড়া ভাবে, পুরোপুরি সিধে অবস্থায়। নিজের রোটরে গলা পেতে দিল লোকটা। ইস্পাতের ঘুরন্ত পাত জবাই করল তাকে।

বুলন্ত অবস্থায় নিচের দিকে তাকিয়ে বমি পেল রানার। পেট, গলা, আর গালের পেশীগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। পরপর কয়েকটা জোরাল ঢোক গিলে বমি ভাবটাকে ঠেকাল বটে, কিন্তু মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ধড়টা নিচে বরফে পড়ে আছে। সাদা বরফে লাল রক্তের স্রোত। রোটরের ধাক্কা খেয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছে মাথাটা আল্লাই মালুম। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের রোটরে মুণ্ডুহীন হলো পাইলট। তবে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘরের ভেতরই ঘটে, পাইলটের ঘর বলতে তো হেলিকপ্টারকেই বোঝায়। রানা কাঁপছে, ভাইব্রেশনই একমাত্র কারণ নয়। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। পাইলটের সীটে বসে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল।

সিকোরস্কির কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে অনেক মিল আছে। বেশিরভাগ ডায়াল আর লিভার চিনতে পারল রানা। অলটিচুড রীডিংগুলো মিটারে লেখা রয়েছে। কিন্তু দুটো সুইচ আর একটা লিভার সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগল। পাইলট যে লিভারে হাত দিয়েছিল সেটা ধরল রানা। কিছুই ঘটল না। আরও একটা চাপ দিল। সাথে সাথে বরফ থেকে শূন্যে উঠে পড়ল সাবমেরিন

কিলার। লিভারটা নিজের দিকে টানল ও। ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার, আবার নামল বরফে। হুক থেকে স্পায়ার হেলমেটটা নামিয়ে দ্রুত হাতে পরে নিল। একটু ঢিলে হলো হেলমেট। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো মাঝে মধ্যে ঝাঁপিয়ে দিচ্ছে চোখ, কেমন যেন ঝাপসা লাগছে সব কিছু। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। অনিদ্রা আর ক্লান্তি। বিশ্রাম না পাওয়ায় গোলমাল করছে চোখ দুটো।

কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিল রানা। অলসভঙ্গিতে কয়েকটা সুইচ অন করল, সামনে ঠেলল কয়েকটা লিভার। মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি, যে-কোন মুহূর্তে রাশিয়ানরা ওদের স্নেজ-টীমের কাছে পৌঁছে যাবে। থ্রটল খুলে দিল রানা। জোড়া এঞ্জিন গর্জে উঠল। বড় করে শ্বাস নিল ও, তারপর ঠেলে দিল ওপরে ওঠার লিভারটা।

## পাঁচ

সগর্জনে, খাড়াভাবে ওপরে উঠল সাবমেরিন কিলার। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, মেশিনটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এত দ্রুত উঠবে ভাবতে পারেনি। অলটিমিটারে একশো মিটার রীডিং দেখে শূন্যে থামাল হেলিকপ্টার। তারপর সামনে খানিকদূর এগিয়ে দিক বদল করল। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দূরে তাকাল, আইসব্রেকার কিউটকে বিস্তীর্ণ বরফের মাঝখানে খেলনার মত লাগছে দেখতে। দিক বদল সম্পূর্ণ হবার আগেই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। ছোট্ট একটা লিভার, অচেনা, স্পর্শ করা

মাত্র তীব্র ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার। রানা অনুভব করল, প্যানেলের পিছনে ভয়ঙ্কর শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, লিভারটা ছুঁতে যা দেরি, অমনি তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।

প্রেশার রিজের অনেক ওপরে রয়েছে রানা, একটা করিডরে দু'জন লোককে দেখতে পেল। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে স্নেজ-টীমের খোঁজে আরও সামনে তাকাল ও। নিয়াজকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, পিছিয়ে গিয়ে নিরাপদ একটা জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ওরা। শুধু ওখানেই ল্যান্ড করতে পারবে হেলিকপ্টার। প্রেশার রিজের গোলকধাঁধার মাঝখানে সমতল বরফের খুদে একটা প্ল্যাটফর্ম।

আরও কয়েকজন রাশিয়ানকে দেখল রানা। উড়ে এল তাদের মাথার ওপর দিয়ে। মুখ তুলে তাকাল তারা। আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে ভুলটা ধরতে পারল ও। প্ল্যাটফর্ম ফেলে এসেছে পিছনে। দিক বদলে আবার ফিরে চলল সাবমেরিন কিলার।

ভয় ভয় করছে। প্ল্যাটফর্মে রাশিয়ানদের চেয়ে আগে পৌঁছুতে হবে ওকে। নাকি এরই মধ্যে রাশিয়ানদের একটা দল পৌঁছে গেছে সেখানে? ফার মোড়া আরও কয়েকজন লোককে দেখা গেল। ছুটছে তারা, মুখ তুলে ওপরে তাকাল। মনে হলো, নালাগুলোর ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে লোকগুলো। সবাই একই দিকে ছুটছে না।

ছায়ার ভেতর সাদা বৃত্তটা অবশেষে চোখে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে মূর্তি, একজোড়া স্নেজ-টীম, এক পাল কুকুর। একটা মূর্তি ঘন ঘন হাত নাড়ছে।

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে বরফের ঢাল, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে



গেছে। সেই ঢালের মাথায় আচমকা পাঁচজন রাশিয়ানকে দেখা গেল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, তাকিয়ে আছে নিচের প্ল্যাটফর্মের দিকে।

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। অনেক দেরি করে পৌঁচেছে ও।

নিচে নামছে হেলিকপ্টার। প্রায় খাড়াভাবে। তারপর হঠাৎ রাশিয়ানদের দিকে ছুটল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো। কি ভাবছে ওরা কে জানে। পাইলটকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু হেলমেট আর গগলস পরে থাকায় চেনার উপায় নেই। তবে মেশিনটা নিজেদের। পাইলটের কি মাথা খারাপ হলো? সরাসরি এভাবে ছুটে আসার মানে কি?

আরও নিচে নামল রানা। স্কিডগুলো ঢালের মাথা প্রায় ছুঁয়ে যাবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচানো ফরজ মনে করল লোকগুলো। রানাও স্বস্তিরোধ করল। প্রয়োজন ছাড়া, একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই। পাইলটের উদ্দেশ্য ভাল নয় বুঝতে পেরে ঝেঁড়ে দৌড় দিল লোকগুলো।

আবার ওপরে উঠল রানা, ঘুরল। পাঁচজনের দলটা চওড়া একটা করিডর ধরে ছুটছে। ডাইভ দিল সাবমেরিন কিলার, করিডরের ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ছুটল। হেলিকপ্টার ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো, যে যেদিকে পারে বাঁক নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ওদেরকে পিছনে ফেলে এসে ঘাড় ফেরাল রানা। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছুটছে সবাই। পালিয়ে বাঁচছে।

একটা কথা ভেবে মজাই লাগল রানার। গুলি করা তো দূরের

কথা, কেউ ওর দিকে রাইফেল পর্যন্ত তোলেনি। নিজেদের সম্পদ, কার না দরদ থাকে। লোকগুলোকে আরও দু'বার ধাওয়া করল ও। বরফ মোড়া খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে অনেক দূর চলে গেল গোটা দল। এরপর প্ল্যাটফর্মে নামল হেলিকপ্টার।

তাড়াছড়ো করে নামতে গিয়ে বরফে আছাড় খেলো রানা। সময়ের ব্যাপার মাত্র, একজোট হয়ে আবার ফিরে আসবে রাশিয়ানরা। 'কুকুরগুলোকে আগে তোলো,' ছুটে আসছিল বিনয়, নির্দেশ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'সাবধান, রোটরের কথা ভুলে যেয়ো না।' কুকুরগুলোর বাঁধন আগেই খুলে দেয়া হয়েছে, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ওগুলোকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। একটু দূরে সরে গেছে রানা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকের ঢালের মাথায় লক্ষ রাখছে। রাইফেলটা দু'হাতে ধরা। স্নেজ দুটো তোলার পর দরজা থেকে হাঁক ছাড়ল নিয়াজ, 'আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু পাইলট না থাকায় আমরা অচল।'

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে কপ্টারের দিকে ছুটল রানা।

সোজা এক হাজার ফিট উঠে এল রানা, রাইফেল রেঞ্জের বাইরে। ট্র্যাপপারেন্ট, গম্বুজ আকৃতির কন্ট্রোল কেবিনের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে নিয়াজ, কুকুরগুলোর মাঝখানে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বিনয়। ইভেনকো রশ্মিভ সবার পিছনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে।

'এবার আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'কিউটে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, টিউবটা এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।'

‘আপনার জিনিস মানে?’ রানা নয়, জবাব দিল নিয়াজ। ‘আপনি নিজেও তো এখন আর আপনার নন। আপনি তো বিক্রি হয়ে গেছেন। ভুলে যাবেন না, আমেরিকানদের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম বা আপনি, আমাদের কাছে পণ্য ছাড়া কিছু নয়। এই দুটো জিনিস আমেরিকানদের হাতে তুলে দিতে পারলে ওরা আমাদেরকে এক বিলিয়ন ডলার ফি দেবে। কাজেই মাইক্রোফিল্মটা আমাদের কাছে আছে, থাকবেও।’

ইভেনকো রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রানা, ‘আর মেরিলিন চার্টের যে মাইক্রোফিল্ম আপনি নিয়ে এসেছেন সেটা যদি নকল বা অসম্পূর্ণ হয়, আমেরিকানরা শুধু যে আপনাকে কান ধরে ওঠ-বোস করাবে তাই নয়, আমাদের ফি-ও অর্ধেক কমিয়ে দেবে।’ রানা আর নিয়াজ, দু’জনেই বাড়িয়ে বলছে। অভিযান সফল হোক বা না হোক, ওদের ফি ওরা পাবেই।

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হবার কথা, কিন্তু না-সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ইভেনকো রস্তুভ ক্ষীণ হাসল। ‘কি বললেন? নকল মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসেছি? হাহ্-হা! তাহলে গুনুন বলি কি ঘটেছিল। লেনিনগ্রাদ থেকে চার্টের দুটো মাইক্রোফিল্ম নিয়ে আসি আমি। একটা রাখি এন.পি. সেভেনটিনে আমার ঘরে, অপরটা থাকে টেপ দিয়ে আমার উরুর সাথে আটকানো। এন.পি. সেভেনটিনে এক লোককে আমি কে.জি.বি-র এজেন্ট বলে সন্দেহ করতাম। জানতাম, আমি না থাকলে মাঝে মধ্যে আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালায়। একদিন টের পেলাম, ঘরে রাখা মাইক্রোফিল্মটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে। ভাল করে পরীক্ষা করে আমার সন্দেহ

হলো, ওটা আমার রাখা জিনিসই নয়। সম্ভবত আমারটার বদলে নকল একটা চার্টের মাইক্রোফিল্ম রেখে গেছে। কে.জি.বি-র এজেন্ট হঠাৎ করে ফিনল্যান্ডে চলে যাওয়ায় আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।’

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, ‘চার্টটা আপনার তৈরি, অথচ আসল না নকল চিনতে পারেন না?’

‘কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে নকলগুলো এমনভাবে তৈরি করেছে, চিনতে পারা সত্যি কঠিন।’

‘তারপর? নকল চার্টের মাইক্রোফিল্মটা কি করলেন?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘নষ্ট করে ফেললাম,’ সাথে সাথে জবাব দিল ইভেনকো। ‘কাজেই, যা বলছিলাম, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মই নিয়ে এসেছি আমি।’

কিউটের দিকে রওনা হবার আগে রশ শিকিউরিটি এজেন্টদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে দখল করা সাবমেরিন কিলার। তবে ইভেনকো রস্তুভের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে রানা। কে.জি.বি. আর স্পেশাল শিকিউরিটির মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়, জানা আছে ওর। ইভেনকোর ওপর নজর রাখার জন্যে কে.জি.বি. লোক পাঠিয়েছিল, লোকটা ইভেনকোর ঘরে ঢুকে আসল চার্টের জায়গায় নকল চার্ট রেখে ফিরে গেছে ফিনল্যান্ডে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। ইভেনকোর কাছে আসল চার্ট আরও একটা ছিল। সেটাই নিয়ে এসেছে সে।

ইভেনকোকে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে কে.জি.বি. এজেন্ট জন মিলার রানাকে অনুরোধ করেছিল। কে.জি.বি.

ইভেনকোকে নকল চার্ট গছিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছে। রানা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল, ইভেনকো রওনা হলে রাশিয়ানরা বাধা দেয়ার ভান করবে, সত্যিসত্যি বাধা দেবে না। কিন্তু ঘটছে ঠিক উল্টোটা। কেন? রহস্যটা কোথায়?

তবে কি কে.জি.বি. স্পেশাল সিকিউরিটিকে তাদের প্ল্যানের কথা জানায়নি? বা জানাবার সুযোগ পায়নি? রহস্যের চাবি সম্ভবত ফিনল্যান্ডে রয়েছে। কিংবা জন মিলার বলতে পারবে কেন কিভাবে কি ঘটল।

নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করল রানা। আসল মেরিলিন চার্ট আমেরিকানদের হাতে পড়লে রাশিয়ানদের যে শুধু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে তাই নয়, দুই পরাশক্তির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যও নষ্ট হবে। এ-ধরনের একটা চার্ট আমেরিকানদেরও আছে, সেটা যদি রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ থাকত তাহলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু সে সুযোগ যখন নেই, মেরিলিন চার্ট আমেরিকানরা পেতে পারে না।

‘ঠিক আছে,’ হঠাৎ আবার মুখ খুলল ইভেনকো, ‘মাইক্রোফিল্মটা আপনাদের কাছেই থাকুক। কিন্তু দয়া করে টিউবটা আমাকে ফেরত দিন। ওতে মূল্যবান কোর রয়েছে...’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো। মাইক্রোফিল্ম নয়, টিউবটা ফেরত চাইছে ইভেনকো!

‘বাক্স থেকে বের করতে হবে,’ বলল নিয়াজ। ‘কিউটে পৌঁছে নিই, আপনার টিউব আপনি পেয়ে যাবেন।’

জবাব শুনে ভারি সম্বুস্ত দেখাল ইভেনকোকে। নিয়াজের চেহারা নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তার আর রানার

মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন করেছে ইভেনকো।

এক হাজার ফিট ওপর থেকে ভৌতিক জাহাজ বলে মনে হলো কিউটকে। কিংবদন্তীর সেই পরিত্যক্ত জাহাজের মত, কোন নাবিক ছাড়াই মহাসাগরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিউট অবশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে না, নিরেট বরফে আটকা পড়ে আছে। আরও কাছে পৌঁছে রানা দেখল, জাহাজের পিছনে সাগরের গাঢ় খানিকটা পানি টলটল করছে, ওই পথেই পোলার প্যাক ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে কিউট। কিন্তু টলটলে পানির সামনে আবার নিরেট বরফের বিস্তার দেখা গেল। বরফ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর আইসফিল্ড জাহাজের পিছনে আবার জোড়া লেগে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে পিছু হটার পথ।

হঠাৎই কথাটা মনে করিয়ে দিল নিয়াজ, ‘দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার এখনও জাহাজের ওপর ঝুলছে।’

‘জানি,’ বলল রানা। ‘ওটাকে ভাগাতে হবে।’

স্টিক টানল রানা, জাহাজের দিকে খানিকটা নামল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেক দেখা গেল, আরেকটা রশ কপ্টারকে আসতে দেখে ত্রুরা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। দু’একজন নাবিকের হাতে রাইফেলও দেখা গেল। উঁচু ব্রিজের সামনের দিকে, জাহাজের প্রায় পিছনের অংশে, লম্বিং প্যাডে বসে রয়েছে মার্কিন হেলিকপ্টার, একটা সিকোরস্কি। সিকোরস্কির ঠিক মাথার ওপর শূন্যে ঝুলছে রশ সাবমেরিন কিলার। যতক্ষণ ওখানে থাকবে ওটা, প্যাড থেকে উঠতে পারবে না সিকোরস্কি। উঠতে গেলেই একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লাগবে। কুকুরগুলোর

গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বিনয় মন্তব্য করল, ‘দ্বিতীয় সাব-কিলারের পাইলট ভাবছে আমরা তার বন্ধু আসছি।’

‘বাঁশ নিয়ে!’ বলল নিয়াজ।

‘ওরা কিন্তু আমাদের ক্র্যাশ করাবার চেষ্টা করতে পারে...’, ফোল্ডিং চেয়ার থেকে আঁতকে উঠল ইভেনকো। যেন হঠাৎ করে বিপদটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিচলিত হয়ে পড়েছে। ভাল করে দেখার জন্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, আহত গোড়ালির ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্যে ভর দিল একটা রেইলে।

‘আপনি বসুন, ইভেনকো!’ ধমকের সুরে বলল রানা। ‘বিনয় কি বলল শুনতে পাননি? পাইলট ভাবছে আমরা রাশিয়ান। আপনাকে দেখতে পেলে...’

‘খুব সাবধানে, রানা,’ সতর্ক করে দিল নিয়াজ। ‘দু’জোড়া রোটর কাছাকাছি ঘুরবে। বাতাসের ঘূর্ণি পরস্পরকে কাছে টানতে পারে।’

‘ঝুঁকি না নিয়ে উপায় আছে, বলো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘ল্যান্ড করার আগে ওটাকে ওখান থেকে সরাতে হবে।’ প্রায় জাহাজের ওপর পৌঁছে গেছে ওরা। ধীরগতিতে এগোচ্ছে সাবমেরিন কিলার, ডেক থেকে পাঁচশো ফিট ওপরে রয়েছে। চারশো ফিট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে দ্বিতীয়টা।

বরফ মোড়া রেইলের পাশে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে নাবিকরা, মুখ তুলে আগন্তুক সাবমেরিন কিলারকে দেখছে। কি না কি ঘটবে ভেবে সবাই উদ্ভিন্ন। কন্ট্রোল কেবিনের কাঁচ মোড়া ছাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সরাসরি নিচে তাকিয়ে আছে নিয়াজ, দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরতে দেখছে। হিম বাতাসে তুমুল

আলোড়ন তুলে ঘুরছে রোটরের পাতগুলো। ‘রানা,’ যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার। ‘আন্তে-ধীরে গাড়নটার পাশে নামতে পারবে?’

‘পারব। কেন?’

ভাঁজ করা টুল-কিট পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল নিয়াজ, ভেতর থেকে বের করল বড়সড় ইস্পাতের মাক্সি রেশ্ম। ‘এটা দিয়ে শালার গম্বুজে একটা খোঁচা মারব।’

‘যা করে আল্লা,’ উৎসাহ দেখাল রানা। ‘চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু জানালা খুলতে হবে। সাবধান, নিউটনের থিওরিটা প্রমাণ করতে যেয়ো না।’

‘আমি রেডি,’ বলল নিয়াজ। ‘ওটার খুব কাছে নেমো না।’ একজোড়া কুকুরকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। শক্ত হাতে মাক্সি রেশ্ম ধরে জানালা খুলে ফেলল। গরম কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়ে চোখে মুখে ছাঁকা দিল ঠাণ্ডা বাতাস, কপ্টার নিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে রানা। হুটুটা মাথার পিছনে সরিয়ে দিতেই নিয়াজের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল বাতাসে উড়তে শুরু করল। জানালার বাইরে ঝুঁকে পড়ল সে। কেবিনের ভেতর কথা নেই কারও মুখে। রুদ্ধস্থানে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে। ফোল্ডিং সীটের কিনারায় ঝুলে রয়েছে ইভেনকো। প্রায় অচেনা একটা মেশিন, নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিল রানা। সমগ্র অস্তিত্ব টান টান হয়ে আছে ওর। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, এক চুল এদিক ওদিক হয়ে গেলে সবাইকে নিয়ে পটল তুলতে হবে।

নামছে তো নামছেই, এই নামার যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে নিয়াজ দেখতে পেল, কিউটের ডেক উঠে আসছে ওপরে।

সার সার কালো মাথা পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে। ব্রিজের জানালা থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ পরা একটা মাথা, সম্ভবত ক্যাপটেন, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল নিয়াজ, আবার তাকাল রোটরের দিকে। দ্বিতীয় সাব-কিলারের রোটরও উঠে আসছে ওর দিকে।

প্রতিটি মুহূর্ত মাপজোকের মধ্যে রয়েছে রানা। দ্বিতীয় সাব-কিলারের যতটা সম্ভব কাছে নামতে হবে, অথচ রোটরের সাথে রোটরের ধাক্কা লাগা চলবে না। মাঝখানে ফাঁকটা থাকবে নেহাতই নগণ্য, তা না হলে মাক্সি রেক্স নাগাল পাবে না গম্বুজের।

হিম বাতাস নিয়াজের চোখে-মুখে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে, এরইমধ্যে অসাড় হয়ে গেছে পেশী আর চামড়া। সীসার মত ভারী লাগল চোখের পাতা, আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসছে। জানালার ফ্রেম ধরে আরও একটু বাইরের দিকে ঝুঁকল সে। নিঃশব্দে চিৎকার করছে বিনয়, আর নয়, আর নয়! নিচে গম্বুজ, তার ভেতরে হেলমেট পরা পাইলটের বাপসা মূর্তি দেখতে পেল নিয়াজ। গম্বুজের কিনারায় বরফ জমেছে। হেলমেট নড়ে উঠল, স্লান মুখ তুলে ওপরে তাকাল রুশ পাইলট। লোকটার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারল নিয়াজ। বন্ধু বেশে শত্রু, এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে পাইলট। তা না হলে এভাবে ঠিক গায়ের ওপর নেমে আসছে কেন! জায়গা ছেড়ে সরে যাবার কোন নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি। এখন আর নড়াচড়ার সময় নেই।

পরিস্থিতি এখন ঠিক উল্টো। রুশ পাইলট এতক্ষণ অচল করে রেখেছিল আমেরিকান হেলিকপ্টারটাকে, প্যাড থেকে উঠতে দেয়নি। কিন্তু এখন সে নিজেই ফাটা বাঁশে আটকা পড়েছে। না

পারছে নিচে নামতে, না পারছে ওপরে উঠতে। ওপর থেকে একটু একটু করে এখনও নামছে বেদখল সাব-কিলার।

রানা ভেবেছিল ধীরে ধীরে ওদেরকে নামতে দেখলে পাইলটের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে, সময় থাকতে ভয়ে পালিয়ে যাবে সে। মাঝখানের ব্যবধান যখন পঞ্চাশ ফিট ছিল, ইচ্ছে করলে সরে যেতে পারত লোকটা। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ে রুশ পাইলটের স্নায়ু ভাঙেনি, অসাড় হয়ে গেছে। কি করলে ভাল হবে বুঝতে না পেরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল সে, কিছুই করল না। হেলিকপ্টার নিয়ে নামতে থাকল রানা, দূরত্ব কমতে থাকল। ওর মেশিনের স্কিডগুলো রুশ পাইলটের মাথার ওপর ঝুলছে। স্কিডগুলো ট্রান্সপারেন্ট গম্বুজ থেকে মাত্র কয়েক ফিট ওপরে।

বাতাসে এখন তুমুল আলোড়ন। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান অনুভব করছে নিয়াজ, জানালার ফ্রেম থেকে হাত ফসকালেই ঝপ করে নিচের রোটরের গায়ে পড়বে। স্রেফ কুচিকুচি হয়ে যাবে গোটা শরীর। ভয় পেয়ে কেবিনের ভেতর ফিরে এল সে, বন্ধ করে দিল জানালা। বাতাসের ঘূর্ণি এখন আরও একটা সমস্যার সৃষ্টি করল। কপ্টার এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে। বাতাসের টানে দুটো কপ্টার পরস্পরের দিকে এগোলে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।

হঠাৎ করেই কপ্টার দুটোকে পাশাপাশি দেখা গেল। আবার জানালা খুলল নিয়াজ।

শুধু পাইলট নয়, পাশে একজন অবজারভারও রয়েছে। হেডসেট অপারেট করছে লোকটা, ওদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে, সেই সাথে অনবরত খই ফুটছে মুখে। কোথাও

সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সে। ঠিক এই সময় বাট করে উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করতে গেল ইভেনকো রুস্তভ।

‘বসুন!’ গর্জে উঠল রানা। রুশ পাইলট আত্মহত্যার ঝুঁকি নেবে কিনা জানা নেই, কিন্তু ইভেনকোকে দেখতে পেলে কি করে বসে বলা কঠিন। হয়তো নির্দেশ দেয়া আছে, ইভেনকোকে দেখামাত্র প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে খুন করতে হবে।

দুটো কপ্টার পাশাপাশি স্থির হয়ে আছে। রানা সামনের দিকে ছুটে যাবার জন্যে তৈরি, ওর সমস্ত মনোযোগ সামনে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা মাস্তুলের দিকে। যাই ঘটুক, ওটাকে এড়িয়ে যেতে হবে। ‘গো অ্যাহেড, নিয়াজ,’ চিৎকার করল ও। ‘কাজটা শেষ করো।’

হঠাৎ করেই ওদের নিচে পরিষ্কার হয়ে গেল কিউটের ডেক। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতেই হোক, বা কমান্ডারের নির্দেশেই হোক, হঠাৎ আমেরিকান নাবিকরা দৌড় দিল। চোখের নিমেষে আড়ালে গা ঢাকা দিল তারা। নিয়াজের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হাত রয়েছে লিভারে-ঠেলে দিলেই সামনের দিকে ছুটবে হেলিকপ্টার। কেবিনের ভেতর যান্ত্রিক আওয়াজ অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ওদেরটা নয়, পাশের কপ্টারও বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরও ভাল করে দেখার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকাল নিয়াজ। পাশের কপ্টারের গম্বুজ মাত্র কয়েক গজ দূরে। রেঞ্চ যাতে নাগাল পায়, জানালার ফ্রেম ধরে আরও খানিকটা বাইরে ঝুলে পড়ল সে। ডান হাতে রয়েছে রেঞ্চ। হাতটা লম্বা করে দিল মাথার ওপর। তারপর বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে গম্বুজ লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল

প্রাণপণ শক্তিতে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে রেঞ্চটা ছুঁড়ে দিল নিয়াজ। মনে হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, গম্বুজের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কাঁচ, কিন্তু এ-কাঁচ ভাঙে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, গম্বুজেই আঘাত করেছে রেঞ্চ, কিন্তু ভাঙল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নিয়াজ। কাজ হয়েছে। প্রচণ্ড আঘাতে শত সহস্র চিড় ধরেছে কাঁচের গায়ে। গম্বুজ এখন আর ট্রান্সপারেন্ট নয়, দুধের মত সাদাটে হয়ে গেছে-সম্পূর্ণ ঝাপসা। পাইলট আর অবজারভারকে এখন অন্ধই বলা চলে, চোখ থাকতেও। গম্বুজের বাইরে কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না। লিভার ঠেলে দিল রানা, অকস্মাৎ গতি পেয়ে সামনের দিকে ছুটল হেলিকপ্টার। খাড়া পাইপের মত মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এল। নিচে এখন বরফের আদিগন্ত বিস্তার।

প্রতিটি হেলিকপ্টারের পিছনে একটা ছোট রোটর থাকে, টেইল রোটর ছাড়া কোন হেলিকপ্টার উড়তে পারে না। রুশ পাইলট তার টেইল রোটরের কথা কয়েক সেকেন্ড ভুলে ছিল, আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হলো।

রানাও ধারণা করেছিল, রুশ পাইলট ভুল করবে। ভুল করা স্বাভাবিক। চারদিকের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, আচমকা ঝাপসা হয়ে গেল সব। দৃশ্যমান জগৎ বলতে কেবিনের ভেতরটা, বাকি সব দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাইলট আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

মাস্তুলকে এড়িয়ে জাহাজের ওপর থেকে সরে যেতে হবে তাকে, ফিরে যেতে হবে বরফের ওপর। লিভার ঠেলে সে, কাঁপা

হাতে। দিক হারিয়ে ফেলেছে, মাস্তুলটা ঠিক কোথায় জানে না। তবু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে জাহাজের ওপর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। চিড় ধরা গম্বুজের ভেতর থেকে মাস্তুলটাকে দেখতে পেল সে, আবছা, একেবারে শেষ মুহূর্তে। দক্ষ পাইলট, রোটরের সাথে মাস্তুলের ধাক্কা লাগতে লাগতেও লাগল না। মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল সে, ভুলটা হলো সেখানেই। টেইল রোটরের কথা মনে থাকলে এত তীক্ষ্ণ বাঁক নিত না। টেইল রোটর চুমো খেলো মাস্তুলটাকে, সাথে সাথে গোটা মেকানিজম খসে পড়ল হেলিকপ্টার থেকে।

তাল হারিয়ে লাটুর মত ঘুরতে লাগল সাবমেরিন কিলার। কেবিনের ভেতর সেই সাথে ঘুরছে পাইলট আর অবজারভার। শুধু ঘুরছে যে তাই নয়, প্রতি মুহূর্তে ঘোরার গতি বাড়তে লাগল। ভাল চক্করে পড়েছে দু'জন, স্ট্র্যাপ দিয়ে সীটের সাথে আটকানো শরীরের ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই গতিতে ঘোরার মেয়াদ লম্বা হলে যে-কোন মানুষ পাগল হয়ে যাবে। এক অর্থে ওদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে, বেশিক্ষণ ঘুরতে হলো না। যে ছন্দে, যে তালে ঘুরছিল সাব-কিলার সেটা অলক্ষণ টিকল, তারপরই কাত হয়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। গোপ্তা দিয়ে নেমে এল বরফে। সংঘর্ষের সময়ও রোটর ঘুরছিল। কিউট থেকে তিনশো গজ দূরে আছাড় খেলো ফিউজিলাজ। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। কাগজের মত ছিঁড়ে চারদিকে উড়ে গেল রোটরের পাত। বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাংক। আগুনের শিখা লাল চাদরের মত লকলকিয়ে উঠল। তারপর কালো ধোঁয়া; উত্তুরে বাতাস পেয়ে সাদা বরফের ওপর নাচতে লাগল কোমর দুলিয়ে।

রুশ হেলিকপ্টারের বিনাশ আরও একজন চাম্ফুষ করল। দু'মাইল দূরে, তিন হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে আরেকটা সাব-কিলার। পাইলটের পাশে বসে রয়েছে কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ধীরে ধীরে চোখ থেকে নাইট-গ্লাসটা নামাল সে। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট।

‘কি ঘটল?’ পিছন থেকে জানতে চাইল জুনায়েভ। ‘ওদিকে আগুন কিসের?’

‘চোপ!’ বাঘের মত গর্জে উঠল কর্নেল। ‘আমাকে ভাবতে দাও!’

শোকে কাতর হয়ে পড়েছে কর্নেল। কি ঘটছে দেখার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা আগে কিউটের দিকে রওনা দিয়েছিল সে। আসার পথে একটা মেসেজ পায়, তাতে বলা হয়-মাসুদ রানার টীমকে খুঁজে বের করা হয়েছে, সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টের লোকেরা ল্যান্ড করেছে বরফে, মাসুদ রানা যাতে কিউটে পৌঁছতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেসেজ পেয়ে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছিল সে।

কিউটের কাছাকাছি পৌঁছে কর্নেল দেখে, জাহাজের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের একটা সাব-কিলার। রেডিও-টেলিফোনে পাইলটকে নির্দেশ দেয় সে, নট নডনচডন, গ্যাট হয়ে বসে থাকো ওখানে। তারপরই দ্বিতীয় সাব-কিলার এল। কি ঘটছে কিছুই বুঝল না কর্নেল। রুশ পাইলট রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করল। প্রথম দিকে চুপচাপ শুনে গেল সে, বাধা দিল না। ‘ওটা আমাদেরই সাব-কিলার, অথচ হুমকির মত মাথার ওপর নেমে

আসছে...ভেতরে কয়েকজন মানুষ...জানালা খুলে রেখেছে...ইভেনকো, ইভেনকো! পরিষ্কার দেখলাম...অনেক কুকুর...তিনজন লোক, চিনি না...।’ এরপর মেসেজ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। কারণটা কি জানার জন্যে চোখে নাইট-গ্লাস তুলেছিল কর্নেল। পরিষ্কার না হলেও, হেলিকপ্টারটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে সে।

তার পিছন থেকে জুনায়েভ লক্ষ করল, কর্নেলের কাঁধ শক্ত হয়ে গেল। বাট্ করে ঘুরল কর্নেল, ভয় পেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল জুনায়েভ। ‘রিসার্চ শিপ রিগায় সিগন্যাল পাঠাও। বলো আমি আসছি। ফুল পাওয়ার দিয়ে রেডিও-জ্যামিং শুরু করতে বলো। সমস্ত জাহাজ তাই করবে। রিগা হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। কিউটই আমাদের কাছে আসবে।’

‘টেকনিকালার...পেলিকান, টেকনিকালার...পেলিকান...’

কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে মাঝরাতে রানার দুটো মেসেজ পেলেন জেনারেল ফচ। প্রথম মেসেজটা পেয়ে উল্লাসে অধীর হলেন তিনি, মুখের ভেতর রসুনের যে কোয়াটা ছিল আরেকটু হলে গলায় আটকে যাচ্ছিল। ঢোক গিলে সেটাকে পেটে চালান করে দিয়ে টমাসকে বললেন, ‘ইভেনকো এখন আমাদের হাতে, টীম নিয়ে রানা কিউটে পৌঁছে গেছে!’ অপারেটরকে বললেন, ‘ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলব, লাইন লাগাও।’ আইসক্যাপে রয়েছে রিমোট ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং স্টেশন, তার সাহায্যে হট লাইন জ্যাক্ত হয়ে উঠল। ওয়াশিংটন, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে এক মিনিট কথা বললেন জেনারেল ফচ। তিনি চান, কিউটকে

বন্দরে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা শিপের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, ‘ইভেনকোকে নিয়ে রানা যখন কিউটে উঠতে পেরেছে, এরপর আর কিছু ঘটতে পারে না। রাশিয়ানদের এত সাহস নেই যে মার্কিন জাহাজের গায়ে টোকা দেবে।’

হট লাইন অফ হয়ে যেতে পাঁচচারি শুরু করলেন জেনারেল ফচ। বারবার মুখ তুলে ওয়াল-ম্যাপের দিকে তাকালেন। আই.আই. ফাইভের আশপাশে যতগুলো জাহাজ রয়েছে সবগুলোর পজিশন লক্ষ করছেন।

নিম্নত্বতা ভাঙল টমাস। ‘আপনি যে সিগার ধরালেন, স্যার, তারমানে কি রানার মেসেজ পেয়ে সেলিব্রেট করছেন...?’

‘তুমি একটা ইমপসিবল ক্যারেঙ্টার হয়ে উঠছ,’ খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল।

টমাস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরও পাঁচচারি থামালেন না। নিজের অজান্তেই বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ম্যাপের দিকে। অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি, জানেন বিছানায় গিয়েও ঘুমাতে পারবেন না। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত। ওদের ধারণা, আর কিছু ঘটতে পারে না। কিন্তু, আসলে, ঘটনা এই তো মাত্র ঘটতে শুরু করেছে। ওয়াশিংটনকে বোঝাবার সাধ্য তার নেই। প্রেসিডেন্ট চীন সফরে রয়েছেন, তাই নিয়ে সবাই ওরা ব্যস্ত।

দ্বিতীয় মেসেজটা কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে নয়, সরাসরি রানার কাছ থেকে এল। আবার জ্যাক্ত হয়ে উঠল হট লাইন, এবার সুইটজারল্যান্ড থেকে সোহানা কথা বলল রানার সাথে। হ্যাঁ, রানা



এজেন্সির অ্যাকাউন্টে মার্কিন সরকারের দেয়া এক বিলিয়ন ডলারের চেক জমা হয়েছে। পুরো টাকাটা ইতিমধ্যে ঢাকায় ট্রান্সফারও করেছে সোহানা। রানার কয়েকটা নির্দেশ দ্রুত হাতে লিখে নিল সে। ফিনল্যান্ডে নতুন কে.জি.বি. এজেন্ট গেছে, জন মিলারের কাছ থেকে তার পরিচয় জানতে হবে, ইত্যাদি।

হটলাইনে চুমোর শব্দ হলো, দুই প্রান্ত থেকেই, তারপর ক্লিক শব্দের সাথে কেটে গেল যোগাযোগ।

## ছয়

ঘুসি তুলে পাইলটকে মারতে গেল কর্নেল বলটু। ‘ল্যান্ড করো। বলছি, ল্যান্ড করো! একদিন তো ওটায় নামতে হবে!’ গলা নয়, যেন বজ্রপাতের আওয়াজ, হেলিকপ্টারের গর্জন সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ রিগার ওপর ঝুলে রয়েছে সাবমেরিন কিলার, ঘুসি খাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না পাইলট। বেয়াদপ বাতাসের ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে পড়ল কপ্টার, ছিটকে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে সীটের পিঠ আঁকড়ে ধরল কর্নেল। ব্লাডি অ্যামেচার, মনে মনে ইংরেজিতে গাল পাড়ল সে। ফ্লাইং স্কুল থেকে পাইলট হয়ে আজকাল যারা বেরোচ্ছে, বিপদের সময় দেশটাকে নির্ঘাত ডোবাবে। তার পিছনে সীটের ওপর কুঁকড়ে বসে রয়েছে জুনায়েভ। এমনিতেই আকাশে উঠলে বমি পায় বেচারির, তার

ওপর উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া ওদের নিয়ে তামাশা করছে।

কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল পাইলট, কর্নেলের দিকে না তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, ‘বসাটাই নিরাপদ, কমরেড কর্নেল...’

‘কাপুরুষ! অযোগ্য!’ পা ঠুকল কর্নেল, মনে হলো ঝাঁকি খেলো সাব-কিলার। ‘নিরাপত্তা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো? বুদ্ধি কাঁহিকে, এতক্ষণ ধরে কি বলছি?’ তেড়ে মারতে গেল আবার। ‘নামো জাহাজে!’

‘কর্নেল কমরেড,’ গৌ ধরে বসল পাইলট, ‘ল্যান্ডিং কন্ডিশন অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব। যথেষ্ট ফ্যুয়েল আছে, যতক্ষণ খুশি আকাশে থাকতে পারব...’

অবজারভারের সীটে বসল কর্নেল, পাইলটের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একের পর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল, ‘আমি তোমাকে আদেশ করছি, জাহাজে ল্যান্ড করো। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বুঝেছ? নামো!’

অসহায় দেখাল পাইলটকে, ভাবটা-হায়, এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম!

মুখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল কর্নেল। ভীতিকর দৃশ্য, সন্দেহ নেই। বিশাল রিসার্চ শিপের প্রকাণ্ড রাডার টাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, ব্রিজের সামনে কিম্বৃত আকারের মসজিদ যেন, জাহাজের সাথে মাতালের মত দুলছে। বিরাট আকৃতির ঢেউ, একের পর এক আসছে, প্রতিটির মাথায় চড়ে নাচছে জাহাজ। যখন কাত হয়ে পড়ে, মনে হয় গম্বুজ আকৃতির রাডার মাস্ট সাগর ছুঁতে চাইছে। আইসফিল্ডের কাছাকাছি বলে, ঢেউ আর স্রোতের সাথে জাহাজের দু’পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বরফের

চাঁই।

তিনশো ফিট ওপরে রয়েছে কপ্টার। নামতে শুরু করল।

রাডার মেকানিজম লক্ষ্য করে নামছে পাইলট। ওটার ঠিক সামনেই ল্যান্ডিং প্যাড। জাহাজের ডেক যখন কোন দিকে কাত হয়ে নেই, ঠিক সেই সময় প্যাডে ল্যান্ড করতে হবে। তা না হলে প্যাডে নামার সাথে সাথে উল্টে যাবে কপ্টার, ডিগবাজি খেয়ে রেইল ভেঙে পড়বে গিয়ে সাগরে। পানি থেকে হিম বাষ্প উঠছে, ঝাপসা হয়ে গেল উইন্ডস্ক্রীন। গায়ে কর্নেলের দৃষ্টি অনুভব করল সে, গরম আঁচের মত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামছে সে। উইন্ডস্ক্রীনের সামনে বিশাল পেডুলামের মত কি যেন ঝুলে রয়েছে। মাস্টহেড, ডগায় রাডার উইং সহ। গোটা মাস্তুলের গায়ে গিজগিজ করছে ইলেকট্রনিক গিয়ার। রুশ কর্মকর্তারা রিগাকে রিসার্চ শিপ বললেও, আসলে ওটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা জাহাজ।

কপ্টার আরও নিচে নেমে এল। দৃষ্টিপথের প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকল রাডার ডোম, জাহাজের সাথে দুলাচ্ছে। পাইলট তাকিয়ে আছে আরও সামনে, মাস্টহেডের দিকে। মাস্টহেড কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে। পুরোপুরি সিধে হলে বুঝতে হবে অদৃশ্য ল্যান্ডিং প্যাড কোন দিকে ঢালু হয়ে নেই। অবস্থাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে টিকবে, তারপর মাস্টহেড কাত হতে শুরু করবে আরেক দিকে, সেই সাথে কাত হবে প্যাডও। আভারক্যারিজের নিচে ঝুলে থাকা ফিডগুলো প্যাড স্পর্শ করল। ছুটে এল অপেক্ষারত টেকনিশিয়ানরা। অ্যাংকর রিঙগুলো ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দেয়া হলো দ্রুত হাতে। রোটর ঘুরছে, দরজা খুলে

ফেলল কর্নেল। কাঁধের ওপর দিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল সে। ‘দেখলে তো! চেষ্টা না করলে জানাও যায় না নিজের ক্ষমতা!’ রোটরের তলায় মাথা নিচু করে দাঁড়াল সে, লাফ দিয়ে পড়ল জাহাজের ডেকে। জাহাজ আবার কাত হতে শুরু করেছে, রেইল ধরে হাঁচট খেতে খেতে এগোল। রেইল উপকে থাবা মারল লোনা পানি, দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পানি সরে যেতে পারকার ভাঁজ থেকে বরফের টুকরো ঝাড়ল। মই বেয়ে ব্রিজে ওঠার সময় যোঁৎ করে আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, যেন বিরূপ প্রকৃতির ওপর ঝাল ঝাড়ল। দরজা খুলে গেল, ভেতরে দেখা গেল ক্যাপটেন লিউনিদ ট্রাভকিনকে।

‘কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ!’ গা থেকে পানি ঝরছে, ভিজে পারকা খুলে মেঝেতে ফেলে নিজের পরিচয় দিল কর্নেল। ‘আপনি ট্রাভকিন? ভাল। নতুন কাপড়, প্লিজ। কচ্ছপের মত একটু একটু করে উত্তর যাবার মানে কি?’

ক্যাপটেন ট্রাভকিন রোগা-পাতলা, চোখ জোড়া বুদ্ধি-দীপ্ত। জাহাজের ওপর দিয়ে কি রকম ধকল যাচ্ছে ভাল করেই জানে। কোন ব্যাপারেই অস্থির হবার লোক নয় সে। নতুন কাপড়-চোপড় আনার নির্দেশ দিয়ে, কর্নেলকে নিয়ে ব্রিজের পিছনে চার্টরুমে ঢুকল। চার্টের ওপর ঝুঁকে কাজ করছিল এক লোক, তাকে বিদায় করে দিল সে। দরজা বন্ধ করল। তারপর শান্ত গলায় বলল, ‘আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই...’

‘প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হলো!’

‘কি নিয়ে প্রতিবাদ তাই এখনও বলিনি...!’ বিস্মিত দেখাল ট্রাভকিনকে।

‘শুনতে চাই না!’

‘কিন্তু কমরেড কর্নেল, এদিকের সাগর বিপজ্জনক! এই আকারের জাহাজ নিয়ে...!’

‘নতুন কিছু বলার আছে?’ আবার বাধা দিল কর্নেল। দস্তানা খুলে সাইড টেবিলে রাখল। জ্যাকেটের পকেট থেকে স্টীল-রিম চশমা বের করে পরল, বাঁকল চার্ট টেবিলের দিকে। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আঁক কাটল চার্টে। ‘শেষবার যখন দেখেছি, এখানে ছিল আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট। এই মুহূর্তে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে...’ চার্টের গায়ে মোটা একটা রেখা আঁকল সে। ‘আমরা উত্তর দিকে যাব।’ রেখাটা ধরে আবার উঠতে লাগল পেন্সিল। ‘কাজেই নতুন কোর্সে জাহাজ চালান। ফুল স্পীডে।’

ক্যাপ খুলে চার্টের ওপর ফেলল ট্রাভকিন, কর্নেল যাতে আর কোন আঁক কাটতে না পারে। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে কর্নেলের দিকে তাকাল সে। ‘এই জাহাজ আমার নির্দেশে চলে, কমরেড কর্নেল। জাহাজে আপনাকে জায়গা দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর। নির্দেশ আছে আপনাকে সাহায্য করার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনার কথা মত জাহাজ চালাতে হবে আমাকে...’

‘অবোধ, অবোধ শিশু!’ কৃত্রিম হতাশায় ম্লান দেখাল কর্নেলকে। ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল সে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে পায়ের বুট খুলল। ‘কার স্বার্থ দেখেন আপনি, ক্যাপটেন? নিশ্চয়ই দেশের?’

‘অবশ্যই!’

‘আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের

জন্যে আর্কটিকে এসেছি?’

‘কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না,’ বলল ট্রাভকিন। ‘জাহাজ নিয়ে উত্তরে যাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রিগা আমাদের অত্যাধুনিক রিসার্চ শিপ। তৈরি করতে কয়েক মিলিয়ন রুবল খরচ হয়েছে। জাহাজের নিরাপত্তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে। উত্তরে আইসবার্গের হুড়াহুড়ি...’

‘কিউট গেল কিভাবে? শেষ দিকে তার রাডার পর্যন্ত ছিল না! তোমার মাস্টহেডের মাথায় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট রয়েছে, ওগুলো ব্যবহার করো।’ পায়ে শুধু মোজা, উঠে দাঁড়িয়ে চার্টরুমের এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করতে লাগল। ‘রেডিও-জ্যামিং অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। খানিকক্ষণ জ্যামিং বন্ধ রেখে ক্যারিয়ার নার্ভায় জরুরী একটা সিগন্যাল পাঠাতে হবে-সমস্ত হেলিকপ্টারের এখন একটাই কাজ, কিউটের বর্তমান পজিশন জানা। যে পাইলট প্রথম দেখতে পাবে, রিপোর্ট করার জন্যে সোজা এখানে চলে আসবে সে।’

‘কেন?’ শান্ত প্রকৃতির ক্যাপটেনকে অশান্ত দেখাল। ‘এ-ধরনের পাগলামির মানে কি? আপনি যখন আমার কথা শুনবেনই না, আমার প্রতিবাদ এখন আমি মস্তোকেয় জানাব...’

কর্নেলকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ক্যাপটেন।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল কর্নেল। ‘রেডিও অন করার সুযোগ কাউকে আমি দিচ্ছি না। জ্যামিং বন্ধ রাখা হবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, কারণ হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে আমার সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী। কিউট দক্ষিণে যাচ্ছে, ওখানে গিজগিজ করছে আইসবার্গ। রাডার নেই, অন্ধের মত হাতড়ে

এগোতে হবে কিউটকে। বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। রেডিও-জ্যামিং বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ওদেরকে। আমার জন্যে চা আনতে বলুন, ট্রাভকিন। গোটা ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে শুনবেন তারপর।’ নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু থেমে শেষ কথাটা উচ্চারণ করল সে, ‘কি হবে না হবে সে পরে দেখা যাবে, কিন্তু আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। কিউটকে আমরা বাধা দেব। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে? আমার তা মনে হয় না। ক’জন বাংলাদেশীর জন্যে আমেরিকা অত বড় ঝুঁকি নেবে এ আমি বিশ্বাস করি না।’

নিরেট বরফের সাথে ইম্পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘুম ভেঙে গেল রানার। শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পও বুঝি এরকম ঝাঁকি খাওয়াতে পারবে না, বুঝি বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরিরও সাধ্য নেই এরকম আওয়াজের সাথে পাল্লা দেয়। পোলার প্যাক ভেঙে এগোবার চেষ্টা করছে কিউটের বো। আর একা শুধু রানাই প্রলয়কাণ্ডের সম্পূর্ণ ধাক্কা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওর কেবিনটা বো-র ঠিক নিচেই। জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় আরেকটা কেবিন খালি ছিল, নিয়াজ আর বিনয় ঠাই নিয়েছে সেখানে। ইভেনকো রুস্তভ অসুস্থ, সিক-বেতে চিকিৎসা চলছে তার।

দুই হাতে চোখ রগড়ে ইম্পাতের দেয়ালের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেল-মোটা পাত ভেঙে বরফের পাহাড় চাপা দেবে ওকে, তা সম্ভব নয়। কিউট আইসব্রেকার, বরফ ভাঙাই তার কাজ। হাতঘড়ি দেখল ও। ভোর চারটে। তারমানে জাহাজে ওঠার পর মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

একসাথে একশো বজ্রপাতের সমান আওয়াজ ছিল সেটা, ঘুমটা তাতেই ভেঙেছে। এই মুহূর্তে অমন জোরাল শব্দ নেই, তবে বরফের সাথে ইম্পাতের সংঘর্ষ অবিরাম চলছেই। ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি ফিরে আসছে, এই সময় দরজা খুলে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল অ্যাকটিং মেট বেন কাফম্যান। তার হাতে এক মগ ধূমায়িত কফি।

‘এই আওয়াজের মধ্যে আপনি ঘুমাচ্ছেন দেখে দু’বার আপনার পালস পরীক্ষা করে গেছি,’ মৃদু হেসে বলল সে। ‘মানুষ এতটা ক্লান্ত হতে পারে, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না।’ তাল সামলাবার জন্যে দু’পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, খালি হাতটা বান্ধহেডের কিনারা আঁকড়ে ধরে আছে। ‘পরবর্তী ধাক্কা লাগার আগে একটু গিলে ফেলুন।’

‘ধন্যবাদ।’ মগটা নিয়ে সাবধানে চুমুক দিল রানা, মনে হলো জিভের ছাল তুলে নিয়ে গলা দিয়ে নেমে গেল তরল আগুন। ‘আমার বন্ধুদের খবর কি? কমরেড রুস্তভ কেমন আছেন?’

‘হয় জেগে আছেন নাহয় মারা গেছেন,’ সকৌতুকে বলল কাফম্যান। ‘ওঁদের পালস পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়নি। ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছেন দরজা।’ রানা অনুমান করল গোপন একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছে নিয়াজ, তাকে সাহায্য করছে বিনয়। ‘আর ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জার কমরেড রুস্তভের জ্ঞান নেই।’ রানার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে হাসল সে। ‘না-না, ভয়ের কিছু নেই। উনি প্রলাপ বকছিলেন, বামেলা এড়াবার জন্যে ক্যাপটেনের নির্দেশে আমাদের ডাক্তার তাঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।’

‘প্রলাপ বকছিলেন মানে?’

‘আমার টিউব, আমার টিউব করছিলেন, কি ছাই বলতে চান বোঝাতে পারছিলেন না...’

‘আমি বুঝেছি,’ বিড়বিড় করে বলল রানা, অ্যাকটিং মেট শুনতে পেল না।

কাফম্যান বেশ লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বয়স হবে চল্লিশের মত। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে কঠোর প্রকৃতির মনে হলেও, ভাল করে তাকালে তার কালো চোখে কৌতুকের ঝিলিক লক্ষ করা যায়। লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখার ফাঁকে আরেকবার মগে চুমুক দিল রানা। আমেরিকান কফি, ভারি কড়া।

দরজার কাছে ফিরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফম্যান, ঘুরল। ‘সাবধান! ধাক্কা আসছে আবার!’ দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরল সে। সামনে এগোচ্ছে আইসব্রেকার, এঞ্জিনগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে গজরাচ্ছে। কেবিন দেয়ালের সামনেই বো। বো-র ঠিক সামনে কোথাও রয়েছে নিরেট বরফ। কালো পানি কেটে ইম্পাতের বো এগোচ্ছে। শূন্যে, সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, মগটা অর্ধেক খালি; অপর হাতটা বাল্কের কিনারায়।

ধাক্কা দিল জাহাজ।

প্রবল ঝাঁকিতে মনে হলো ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে কেবিন। দরজার ফ্রেম থেকে হ্যাঁচকা টান খেয়ে কাফম্যানের হাত ছুটে গেল, কেবিনের ভেতর ছিটকে পড়ল সে। দেয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল, কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে নিজের দিকে টানল রানা। দু’জনেই উপলব্ধি করল, নতুন জীবন পেল অ্যাকটিং মেট। রানার

মনে হলো, বো ভেঙে যাচ্ছে, বোঁকে যাচ্ছে ইম্পাতের পাত, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত দেয়াল দিয়ে ছড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে জ্যাস্ট বরফের সচল পাহাড়। যদিও মনে মনে জানে, সে-ধরনের কিছু ঘটতে পারে না। জাহাজ থামল, এঞ্জিনগুলো এখনও আক্রোশে গজরাচ্ছে। উল্টোদিকের বাল্কহেডে ছড়িয়ে পড়েছে কফি, সেদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও, ‘আমরা কি আদৌ কোথাও যাচ্ছি?’

‘এমন গতিতে, যাওয়া বলা হাস্যকর,’ দু’হাতে বাল্কহেড জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে কাফম্যান। ‘ধন্যবাদ, মি. রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা চাপা দিল রানা।

‘প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই কাণ্ড চলছে,’ বলল কাফম্যান। ‘ঈশ্বর জানেন এই অবস্থায় কিভাবে আপনার ঘুম হলো। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান? নিরেট বরফের মাঝখানে আটকা পড়েছি আমরা। মুশকিল হলো, আমরা যে শুধু রাডার হারিয়েছি তাই নয়, ওটার সাথে অবজারভেশন কেজটাও হারিয়েছে। খাঁচার ভেতর মেট ছিল, সে-ও মারা গেছে—সেজন্যেই তো আমি অ্যাকটিং মেট। কেন্ রাসেল, বেচারী! আসলে অনেক উঁচুতে একজন লোক থাকা দরকার, ঠিক কোন্ দিক থেকে বরফে ধাক্কা দেয়া উচিত হবে দেখার জন্যে। কিন্তু খাঁচাই নেই, কোথায় লোক পাঠাব!’

কাপড় পরছে রানা। বরফ থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে জাহাজ। বুট আর পারকা পরে সিধে হলো ও। আবার কাঁপতে শুরু করল কেবিন। বরফের বজ্র-আঁটুনি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। টন টন নিরেট বরফ প্রতি মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ছে বো-র সামনে। ‘ব্রিজে গিয়ে দেখি আমার কিছু করার আছে কিনা,’ বলল রানা। কাফম্যানের দিকে সরাসরি তাকাল ও। ‘ব্যাপারটা কি আমার কল্পনা? নাকি সত্যি আমাদের আসতে দেখে খুশি হয়নি জুরা?’

কাফম্যানের চেহারা একটু স্নান হলো। অস্বস্তি বোধ করল সে। ‘ও-সব আপনি গ্রাহ্য করবেন না,’ গলার সুরে ইতস্তত ভাব। ‘আসল কথা, ফেব্রুয়ারিতে এত উত্তরে আসতে চাননি ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। গুজব, তাকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে।’ হঠাৎ কৌতুকে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখ। ‘আপনারা যদি বরফের ওপর মারা যেতেন, আমাদের তাহলে এত ভেতরে ঢুকতে হত না-রাইট?’

‘আপনারা তাহলে সেটাই কামনা করেছিলেন?’

‘সবাই কি আর, দু’একজন করে থাকতে পারে,’ বলল কাফম্যান। ‘ও কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেল না। ব্রিজের দিকে যাবার সময় নিজের চারপাশে বৈরী পরিবেশের আঁচ অনুভব করল রানা। শুধু অন্ধ একজন লোক এই শত্রুতা অনুভব করবে না। যে ক’জন নাবিককে পাশ কাটিয়ে এল, কেউ ওকে আসতে দেখেছে বলে মনে হলো না। তাগড়া এক যোয়ান, দৈত্যাকৃতি, হাঁটু গেড়ে বসে কম্প্যানিয়নওয়ারের মেঝে পরিষ্কার করছে, আচমকা রানার পায়ের সামনে ঠক করে বসিয়ে দিল বালতিটা।

‘সরাও ওটা, হিগিন!’ অ্যাকটিং মেট ধমকে উঠল।

মুখ তুলে তাকাল দৈত্য। ‘তোমাকে দেখতে পাইনি,

কাফম্যান...’, তাড়াতাড়ি বালতিটা সরিয়ে নিল সে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রানা ভাবল, আইসবার্গ অ্যালিতে পাঠানো হয়েছে ওদেরকে, সেটাই ওদের রাগের একমাত্র কারণ হতে পারে না। এর পিছনে আরও কোন কারণ আছে। কাফম্যান তাকে সবকথা বলেনি। কেন্ রাসেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করা হচ্ছে ওকে-টীম লীডার মাসুদ রানাকে।

মর্মান্তিক কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, নিজেকে সাবধান করে দিল রানা। আইসব্রেকারে যারা চাকরি করতে আসে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ক্রাইম রেকর্ড থাকে। হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছাড়া এই পেশায় কেউ আসে না। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের মন্তব্যও উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

‘আপনার জায়গায় আমি হলে, কেবিন থেকে বেরুতাম না, মি. রানা। আপনার বিশ্রাম দরকার।’

উঁচু ব্রিজ থেকে সামনের বরফ ভাল দেখা যায়। আরেকটা ধাক্কা দেয়ার জন্যে চ্যানেল ধরে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। চ্যানেলের যেটুকু অংশ বরফ-মুক্ত, তা যথেষ্ট চওড়া ছিল, পোলার প্যাকে আঘাত করার জন্যে জাহাজ ঘোরাতে অসুবিধে হয়নি। বরফ ভেঙে দক্ষিণ দিকে যেতে পারলে তবেই উদ্ধার। চ্যানেলের শেষ মাথাটা এবড়োখেবড়ো, খেঁতলে আছে বরফ, কিন্তু এখনও অটুট-কিউটের বো আবার আঘাত করতেও সেখানে কোন ফাটলের সৃষ্টি হলো না।

রেইল থেকে দস্তানা পরা হাত তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা। ‘বছরের এই সময়ে বরফ বাড়তেই থাকবে। তাড়াতাড়ি বেরুতে না পারলে বসন্ত পর্যন্ত আটকা পড়ে থাকব...’

‘আপনি আমাকে জ্ঞানদান করছেন?’ ক্যাপের নিচে ক্যাপটেনের কাঁচাপাকা ভুরু প্রজাপতির ডানার মত নেচে উঠল। ‘জাহাজ আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে শুধু আপনাদের জন্যে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। দয়া করে কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না।’

পাল্টা ঝাঁঝ দেখাতে পারে রানা, বলতে পারে আপনাদেরই একটা উপকার করে দিচ্ছি আমরা, কিন্তু তাতে শুধু সময়েরই অপচয় ঘটবে। সম্পূর্ণ শান্ত থাকল ও, কিন্তু কণ্ঠস্বরে দৃঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল, ‘ওপরে কোথাও একজন লোক রাখা দরকার আপনার, ক্যাপটেন। অন্তত আশি ফিট উঁচুতে। সে আপনাকে গাইড করবে, বলে দেবে বরফের কোথায় আপনি আঘাত করবেন। ধাক্কা দেয়ার পর কোথাও যদি সামান্য চিড় ধরে, একমাত্র সে-ই দেখতে পাবে...’

‘আসুন আমার সাথে!’ রানার কথা শুনে ক্যাপটেনের রাগ যেন আরও এক ডিগ্রী বাড়ল। জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে ব্রিজের পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনি। পিচ্ছিল মই, ধাপগুলো থেকে খানিক আগে বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। ডেকে অনেক মানুষ, কোদাল দিয়ে বরফ তুলে জাহাজের বাইরে ফেলছে। রানা দেখল, কিউটের সিকোরস্কি ল্যান্ড করার জন্যে ফিরছে। ‘রুশদের ওপর চোখ বুলিয়ে এল,’ ক্যাপটেন বললেন। ‘আপনি যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টা আগে একটা সাব-কিলার ওদেরকে তুলে নিয়েছে।’ বিশাল মাস্তুলের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। ‘নজর ফেলে দেখুন,’ বাঘের মত গরগর করে উঠলেন ক্যাপটেন।

বিশাল কাঠামোটা খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে, চাঁদের

আলোয় সবটুকু দেখা গেল। থামের ডগা এবড়োখেবড়ো আর ভাঙা, কিন্তু ক্রস-ট্রী অক্ষত রয়েছে। এত নিচে থেকেও বোঝা গেল, ক্রস-ট্রীর গায়ে বরফের আবরণ জমেছে। দু’জন নাবিক বরফের প্রকাণ্ড একটা চাঁই ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ সেটা ফেলে দিল। সময় মত সরিয়ে না নিলে রানার ডান পা ছাতু হয়ে যেত। ‘ফের করো,’ গর্জে উঠলেন হ্যারি গোল্ডম্যান, ‘তোমাদের আমি কয়েদ করব। যাও, পোর্ট সাইডে নিয়ে গিয়ে ফেলো ওটাকে।’ ক্রুরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, ‘রাসেলকে ওরা সবাই ভালবাসত।’

‘আর, তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছে ওরা।’

‘তা আমি বলিনি! এবার, ফর গডস সেক, মাস্তুলটা দেখুন! আপনি তো বলেই খালাস, কোন মানুষকে ওখানে উঠতে বলা যায়?’

মাস্তুলের গা ঘেঁষে একটা ধাতব মই ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রতিটি ধাপ বরফে মোড়া, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মাস্তুলের গোটা কাঠামো থেকে বরফের ঝুরি নেমে এসেছে, সবচেয়ে লম্বা ঝুরিটা নেমে এসেছে ক্রস-ট্রীর ডগা থেকে। ডেক থেকে মাস্তুলটাকে বরফের তৈরি একটা থামের মত লাগল। এটা বেয়ে কারও পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

‘বলেছি ওপরে একজন লোক থাকা দরকার, কাউকে পাঠাতে বলিনি,’ জবাব দিল রানা। ‘আমি নিজেই ওখানে উঠতে পারি। আমাকে আটকে রাখার জন্যে লেদার স্ট্র্যাপ দরকার, মাস্তুলকে ঘিরে থাকবে ক্যানভাস প্যাড, আর ব্রিজের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা টেলিফোন সেট...’

‘আর আপনার লাশ দেশে পাঠাবার জন্যে একটা কফিন,’  
রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কে যেন বলল পিছন থেকে।

‘ও শেরম্যান, কপ্টারের পাইলট,’ একটু ভারী গলায় বললেন  
ক্যাপটেন।

রানা জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম একজন লোক সৌজন্য  
দেখিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল। একহারা চেহারা, শেরম্যানের বয়স  
হবে রানারই মত। কথার খেঁই ধরে আবার বলল সে, ‘আপনার  
তো বরফে থাকতেই মরে যাওয়ার কথা ছিল, মি. রানা। দৈবাৎ  
যখন বেঁচেই গেছেন, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছানো পর্যন্ত  
কেবিনেই বন্দী থাকুনগে। একদিন না একদিন সেখানে আমরা  
পৌঁছুবোই।’

চেহারায় অকারণ আক্রোশ নিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকিয়ে  
আছেন ক্যাপটেন। ‘মানলাম ওখানে একজনের থাকা দরকার,  
কিন্তু থুথু ফেলা ছাড়া আপনি ওখানে কি কাজে আসবেন?’

‘কিউটের সিসটার শিপ ফ্র্যাংকেনস্টাইনে এই কাজই  
করেছিলাম,’ জবাবে বলল রানা। ‘বাফিন বে-র উত্তরে, বছর  
তিনেক আগে। স্মিথ সাউন্ডে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, এই একই  
সমস্যায় পড়ে যায়-সামনে নিরেট বরফ। এলাকাটা আমি চিনি,  
কাজেই গাইড করে এগিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি।’

‘বব হাডসনের জাহাজ ওটা।’ নতুন দৃষ্টিতে রানার দিকে  
তাকালেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। মাত্র এক সেকেন্ড,  
তারপরই চোখ ফিরিয়ে মাস্তুলে চোখ তুললেন। ‘মাস্তুলে আগেই  
প্যাড জড়ানো হয়েছে, টেলিফোন বক্সও তোলা  
হয়েছে-আইসফিল্ডে নজর বুলাবার জন্যে কাফম্যান একবার

উঠেছিল। কিন্তু প্যাকে ধাক্কা দেয়ার আগে ওকে নামিয়ে আনি।’

‘হ্যাঁ, বব হাডসনই তখন ফ্র্যাংকেনস্টাইনের ক্যাপটেন  
ছিলেন,’ শুকনো গলায় বলল রানা। ‘পরে তিনি আমাকে একটা  
সার্টিফিকেট দেন, লোকে যাতে বিশ্বাস করে স্মিথ সাউন্ডে আমার  
চেয়ে ভাল গাইড আর কেউ নেই। রেডিও জ্যামিঙের ব্যাপারটা  
আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে  
যাওয়া দরকার আমাদের।’

‘কমরেডদের মেজাজ খারাপ থাকলে এই-ই করে। জাহাজ  
যখন বরফে ধাক্কা দেবে, মাস্তুলের ডগায় কেউ থাকলে কি অবস্থা  
হবে তার, আপনি জানেন? জেনে শুনে আপনাকে আমি মরতে  
পাঠাব?’

ডেকের চারদিকে তাকাল রানা। তুরা শাবল দিয়ে বরফ  
ভাঙছে, কোদাল দিয়ে সেই বরফ ফেলছে জাহাজের বাইরে। যার  
সাথেই চোখাচোখি হলো, বাট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল সে। থো  
করে থুথু ফেলল এক লোক, ক্যাপটেন তার দিকে কটমট করে  
তাকাতেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ‘মরলে,’ ক্ষীণ একটু  
হেসে বলল রানা, ‘অন্তত আপনার লোকেরা কেউ দুঃখ পাবে না।’

তিন ঘণ্টার ঘুমে ক্লান্তি দূর হয়নি, সারা শরীর ব্যথা করছে রানার।  
বরফ মোড়া মই বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠতে শুরু করল ও। উঠে  
যাচ্ছে মানুষ নয়, যেন কাপড়ের একটা বস্তা, লেদার চেস্ট-স্ট্র্যাপ  
পেঁচিয়ে রেখেছে শরীরটাকে। দ্বিতীয় স্ল্যাপ-ক্লিপ স্ট্র্যাপ দিয়ে  
মাস্তুলকে জড়িয়ে বাঁধা হবে, সেটা ঝুলছে। ফার হুডের নিচে ঠিক  
জায়গামত বসিয়ে নেয়া হয়েছে টেলিফোন হেডসেট। ওর নিচে,



ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দশ মিনিট আগের শত্রুতার পরিবেশ একটু যেন বদলে গেছে। কাজ থামিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, বিপজ্জনক মই বেয়ে উঠে যেতে দেখছে রানাকে। দ্বিতীয়বার ডেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল রানা, অবজ্ঞার সাথে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।—যা খুশি ভাবুক শালারা।

ডেক থেকে বিশ ফুট উঠে থামল ও, বুটের আঘাতে বরফ ভাঙতে গেল। পিছলে গেল পা, দস্তানা পরা হাত একটা ধাপ শক্ত করে ধরে আছে। বুটের প্রচণ্ড লাথি খেয়েও বরফ ভাঙল না। শক্ত বরফের তৈরি মই বেয়ে উঠছে ও। আবার উঠতে শুরু করে অনুভব করল, সাব-জিরো টেমপারেচার দু'জোড়া দস্তানা ভেদ করে আঙুলে কামড় বসাচ্ছে। মুখে হিম বাতাসের হাঁচকা খাওয়া বন্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে চামড়া আর পেশী। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, পানি গড়াচ্ছে দুই কোণ থেকে। মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। গলায় এমন ঠাণ্ডা লাগছে, যেন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

যত ওপরে উঠল রানা নির্দয় শীত ততই ওর স্বাভাবিক শক্তি কেড়ে নিতে থাকল। জ্যান্ত, কিন্তু থেমে থাকা এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ কখনও শুনছে কখনও শুনছে না। বো-র ওপর ফিট করা সার্চলাইটের আলো কখনও দেখছে কখনও দেখছে না। দক্ষিণে বরফের বিস্তারকে এই মনে হলো চুনকাম করা দেয়াল, তারপরই মনে হলো গুলি খাওয়া পাখির সাদা পালক।

চল্লিশ ফিট উঠেছে, চেস্ট-স্ট্রাপ থেকে বুলে পড়া স্ল্যাপ-ক্রিপ একটা ধাপে আটকে গেল। উঠে যাচ্ছে রানা, জানে না কি ঘটছে।

নিচের ধাপে এক পা, আরেক পা ওপরের ধাপে উঠছে, আচমকা শূন্য ঝাঁকি খেলো শরীর। ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হলো, তাল হারিয়ে ফেলল রানা। ওপরের ধাপে পৌঁছল না পা, নিচের দিকে হাঁচকা টান খেলো শরীর। নেমে এল বুট, নিচের একটা ধাপ ছুঁই ছুঁই করল, কিন্তু ছুঁলো না। আরেক ধাপ থেকে হড়কে গেল দ্বিতীয় পা। খসে পড়ল শরীর।

ডেক থেকে চল্লিশ ফিট ওপরে বুলে থাকল রানা, শুধু হাত দিয়ে ধরে আছে বরফ মোড়া মই। পিচ্ছিল, মসৃণ বরফ, দস্তানা পরা হাত স্থির হতে পারল না। পা দুটো শূন্য এলোপাতাড়ি ঝাঁকি খেলো, চোখে না দেখে ধাপের স্পর্শ পেতে চাইল ও। মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ। আতঙ্কের হিম শীতল ঢেউ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মই থেকে একটা হাত খসে গেল। পলকের জন্যে নিচের ডেক দেখতে পেল রানা। খুদে শরীরগুলো পাথর বলে ভুল হয়। দ্বিতীয় হাতটাও খসল, তবে শরীরটা নিচে নামতে শুরু করার আগেই একটা ধাপে ডান পা ঠেকল। দ্বিতীয় হাত আবার আঁকড়ে ধরল মই। ডান পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে বাঁ পা-টাকেও আরেক ধাপে তুলল ও। দম নেয়ার জন্যে থেমে আছে। নিচের দিকে আরেকবার তাকাল। মূর্তিগুলো এক চুল নড়ছে না এখনও। ডেকের প্রতিটি মানুষ মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আবার উঠতে শুরু করল ও।

ডেক থেকে আশি ফিট উঠে আবার থামল রানা। ইস্পাতের মই ক্রস-ট্রার ঠিক নিচেই শেষ হয়েছে। ক্রস-ট্রা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে, পেরিয়ে গিয়ে ওটার দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসতে হবে,

তারপর আরও ওপরে উঠে যাওয়া মাস্তুলের গায়ে বাঁধতে হবে চেস্ট-স্ট্র্যাপ। কোন ট্র্যাপ-ডোর নেই, কাজেই ক্রস-ট্রীকে পাশ কাটিয়ে উঠতে হবে ওকে। ঝুঁকিটা নেয়ার আগে হাত উঁচু করল রানা, ক্রস-ট্রীর ওপর দিকটা মুড়ে থাকা ক্যানভাস প্যাড পরীক্ষা করল। হাতের ছোঁয়ায় প্যাড ঘুরে গেল, তারমানে স্থির হয়ে বসার সুযোগ মিলবে না।

ক্রস-ট্রী পেরোতে দশ মিনিট লেগে গেল। দুই উরুর মাঝখানে থাকল মাস্তুল, দ্বিতীয় স্ট্র্যাপটা মাস্তুলের চারদিকে জড়িয়ে বাঁধা হলো। টেলিফোন বক্স আগেই তোলা হয়েছে, বক্সে টারমিনালগুলো জোড়া লাগানো হলো। হঠাৎ অনুভব করল রানা, কাপড়ের ভেতর ঘামের ধারাগুলো সড় সড় করে নামছে। গালে হাত দিতেই বরফের কুচি ঠেকল আঙুলে, হিম বাতাসে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমাট বেঁধে গেছে। ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করার আগে চারদিকে তাকাল রানা।

হুড খানিক তুলে কান দুটো বের করল ও। না, কল্পনা নয়। চারপাশের বরফে ভৌতিক তর্জন-গর্জনের আওয়াজ। যেন রাগে অন্ধ দানবকুল দাঁত কিড়মিড় করছে। তার সাথে শোনা গেল গুরুগম্ভীর ভরাট শব্দ, যেন আগ্নেয়গিরি থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে জ্যাস্ত লাভা। কিউটের আধ মাইল দূরে ব্যাপক আলোড়ন চোখে পড়ল। এত উঁচু আর দূর থেকে পাঁচিলগুলোকে নিচু দেখাচ্ছে-সচল পাঁচিল, একটার মাথায় চড়ছে আরেকটা, আরও উঁচু হয়ে চেউয়ের মত সরে যাচ্ছে কিউটের কাছ থেকে দূরে, দক্ষিণ দিকে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো ফিতের মত সরু জলরেখা টলটল করে উঠল, চওড়া হয়ে সরে যাচ্ছে দূরে।

বরফের তুমুল আলোড়ন মুহূর্তের জন্যে থামছে না। ঠোকাঠুকি, ফাটাফাটি, ধাক্কাধাক্কি, ছুটোছুটি চলছে তো চলছেই। সেইসাথে চওড়া হতে হতে এগিয়ে চলেছে সরু ফাটলটা। মস্তুরগতি, কিন্তু থেমে নেই। দূর অন্ধকার একটা রেখা, সাগর বলে চেনার উপায় নেই, সেদিকেই যাচ্ছে ওটা। বরফ ভেঙে ওই ফাটলে পৌঁছুতে হবে কিউটকে।

শরীরটা ঘোরাল রানা, মাস্তুলের সাথে আটকানো চেস্ট-স্ট্র্যাপ ওকে খসে পড়তে দিল না। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। পিছনে আধ মাইল চওড়া খোলা চ্যানেল। চ্যানেলের শেষ মাথায় রুশ হেলিকপ্টারের ধবংসাবশেষ দেখা গেল। ওটাতে চড়েই দলবল নিয়ে কিউটে পৌঁচেছে রানা। ইচ্ছে করেই কিউটের বো-র নিচে ল্যান্ড করেছিল ও, বাকি কাজটা ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সারেন। জাহাজ খানিকটা পিছিয়ে আসে, তারপর ছুটে গিয়ে ধাক্কা দেয় বরফের উঁচু প্ল্যাটফর্মে। কিনারায় ছিল সাব-কিলার, একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায় সেটা।

কিন্তু রুশ হেলিকপ্টারের ধবংসাবশেষ নয়, রানা তাকিয়ে আছে আরও দূরে। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

উত্তরে প্রবাহিত হতে শুরু করা বাতাসে ভর দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে কালো একটা পর্দা। ভাল করে তাকালে বোঝা যায়, গাঢ় বাষ্প। আই.আই. ফাইভ যে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল, তার সাথে এর কোন মিল নেই। নিশ্চিহ্ন কালো পাঁচিল, কয়েকশো ফিট উঁচু, জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। আর্কটিকের ভয়াবহ যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর্কটিকে বার কয়েক এলেও, এই বিপদের মধ্যে

আগে রানাকে পড়তে হয়নি। এ-ও কুয়াশা, তবে হিমেল আবহাওয়ায় জমাট বেঁধে গেছে। আবহাওয়ার এই বিপজ্জনক রূপ আর্কটিকে কদাচ দেখা যায়, আক্রান্ত মানুষ ফ্রস্ট বাইটের শিকার হতে পারে। মাস্তুলের মাথা থেকে নামার আগেই যদি এসে পড়ে কুয়াশা, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবার ভয় আছে। এরই মধ্যে প্রেশার রিজ জোন ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

‘ক্যাপটেন! রিভার্স হার!’ চিবুরের কাছে ঝুলে থাকা মাইকে দ্রুত কথা বলল রানা।

ক্যানভাস প্যাডে মোড়া মাস্তুল আঁকড়ে ধরল ও। এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। ঝাঁকি খেলো জাহাজ, পিছনের গাড়ি পানি কেটে পিছু হটছে। যা ভয় করেছিল তা ঘটল না—কোন ঝাঁকি না, শুধু মৃদু একটা দোল অনুভব করল ও। দু’পাশ থেকে পিছিয়ে গেল আইসফিল্ড, গাড়ি পানি দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে মস্তুর হলো কিউটের গতি, থামল। কি আসছে জানে রানা, তলপেটের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। তর তর করে নিচে নামার ঝাঁকটাকে দমন করে নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। নির্দেশ দিল, ‘হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!’

‘ও কে, মি. রানা, হিয়ার উই গো। হোল্ড অন টাইট।’

মাস্তুলটাকে আপন সন্তানের মত বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করল রানা, মাথাটা একপাশে সরিয়ে রেখেছে, ধাক্কা খাওয়ার জন্যে তৈরি। এঞ্জিনের পাওয়ার বাড়ল, কাঁপুনিটা উঠে এল মাস্তুল বেয়ে। সামনে এগোল কিউট। অনেক নিচে, উল্টোদিকে ছুটল আইসফিল্ড। জলরেখা ক্রমশ সরু হয়ে এল। সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, জানে, জলরেখা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে

নিরেট বরফে ধাক্কা খাবে জাহাজ।

সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কা একসাথে এল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো গোটা জাহাজ, শরীরে ঘন ঘন হাতুড়ির বাড়ি খেলো রানা। ক্যানভাস প্যাড ছিল বলে, তা না হলে রানার কাঁধ আর বুকের হাড় পাউডার হয়ে যেত। জাহাজের কাঁপুনির সাথে ধীরে ধীরে মাস্তুলের কাঁপুনিও কমে এল। ধাক্কা দিয়ে স্থির হয়ে গেল আইসব্রেকার। বরফে গুঁথে আছে।

পেশী টিল করল রানা, সামনে তাকাল। জাহাজের বো-র সামনে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু লম্বায় মাত্র কয়েক ফিট। ফাটলের দু’পাশে তাকাল রানা, আশা, আরও হয়তো কোথাও চিড় ধরেছে।

না।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ক্যাপটেন কিছু বলছেন। এক হাতে মাস্তুলটা আরও শক্ত করে ধরল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে আধ মাইল দূরে তাকাল। আগের সেই ফাটলটা আরও চওড়া হচ্ছে। গলায় উদ্বেগ নিয়ে আবার ওকে ডাকলেন ক্যাপটেন। ‘মি. রানা, শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?’

‘ঠিক আছি আমি। প্রথমবার তেমন কাজ হয়নি। পারলে একই জায়গায় আবার আঘাত করতে হবে।’

‘রিভার্স?’

‘হ্যাঁ।’

এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। মাস্তুলের ডগায় বসে অনুভব করল রানা, বরফ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে আইসব্রেকার। প্রচণ্ড ধাক্কা ফাঁক হয়ে গেছে বরফ, জাহাজের বো-কে ভেতরে

চুকিয়ে নিয়ে চারদিক থেকে চেপে বসে আটকে ফেলেছে ওটাকে। সব ক'টা এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিছু হটার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিউট। ধীরে ধীরে এঞ্জিনের গর্জন কমে এল। একটু পর দ্বিতীয়বার বাড়তে শুরু করল। রানার মনে হলো এবারও ব্যর্থ হয়েছেন ক্যাপটেন, এই সময় বরফের কঠিন থাবা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল জাহাজ। বো-র কাছে নিরেট বরফ বিস্তারিত হলো, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল বিস্তারনের শব্দ। পিছু হটছে জাহাজ, পোর্ট সাইডের বরফে গাঢ় রঙ লেগে রয়েছে।

পিছন দিকে তাকাল রানা। গোটা প্রেশার রিজ এলাকা ঢেকে ফেলার কাজ শেষ, সমতল বরফের বিস্তারকে গ্রাস করতে আসছে কুয়াশা। খুব বেশি দূরে নেই, জাহাজ ঢাকা পড়ে যাবে। কিউট না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর নির্দেশ দিল, 'হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!'

ক্যাপটেন এবার চ্যানেল ধরে আগের চেয়ে বেশি পিছিয়ে এসেছেন, বরফের গায়ে ধাক্কা দেয়ার সময় গতি যাতে বেশি পাওয়া যায়। প্যাড মোড়া মাস্তুলকে আলিঙ্গন করল রানা। আধবোজা হয়ে আছে চোখ, নিচের দিকে দৃষ্টি। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে জাহাজের দু'পাশে জলরেখা। রানা জানে না, ডেকে বেরিয়ে এসেছে নিয়াজ আর বিনয়, আতঙ্কে বিকৃত চেহারা নিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে রয়েছে দু'জনেই।

জলরেখা অদৃশ্য হলো। মাস্তুলের সাথে গাছের পাতার মত কেঁপে উঠল রানা। এবার আগের চেয়ে জোরে বরফের গায়ে হুমড়ি খেয়েছে জাহাজ।

এভাবে একের পর এক আঘাত হানা হলো। জায়গা বদল

করল রানা, বরফ ভাঙার জন্যে জাহাজটাকে ব্যক্তিগত হাতুড়ির মত ব্যবহার করল। আধ ঘণ্টা চলল এভাবে। তারপর মনে হলো, কিছু একটা ঘটছে। চিড় ধরতে শুরু করেছে বরফে, আঁকাবাঁকা গাঢ় রেখা ফুটছে গায়ে।

ঘটনা আরও ঘটছে। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এল রানার। এক দুই পল ভ্রান্তির ঘোরের মধ্যে থাকছে, ভুলে যাচ্ছে কোথায় সে, কি করছে এখানে। অসহ্য ঠাণ্ডাই আসল কারণ। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া, ক্যানভাস প্যাডে বারবার ঘষা খাওয়ার ফল। ওদিকে, কালো পর্দা দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই কুয়াশা ওকে মেরে ফেলার আগে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে ওদের। 'রিভার্স, ক্যাপটেন!' কর্কশ গলায় মাইকে চিৎকার করল রানা। 'এবার একেবারে চ্যানেলের শেষ মাথায় নিয়ে চলুন।'

পিছু হটল জাহাজ। খুব বেশি পিছনে চলে এল। কালো কুয়াশার একটা বাহু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, যেখানে রুশ সাব-কিলার চ্যাপ্টা হয়েছিল। বাহুটা ওপর দিকে উঠে এসে মাস্তুলের মাথা পেঁচাতে শুরু করল। দেখতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল নিয়াজের। রেইল ধরে কাঁপতে লাগল সে, ভয়ে নয়, রাগে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অভদ্র ভাষায় চিৎকার করে উঠল, 'ইউ স্টুপিড ইডিয়ট-গেট হার মুভিং! রানা কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে!' কোন আরোহী ক্যাপটেনের সাথে এভাবে কথা বলে না।

হঠাৎ করেই রানার চারপাশের জগৎ ছোট হয়ে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য হলো সব। আইসফিল্ড গায়েব হলো, নিখোঁজ হলো নিচের পানি, হারিয়ে গেল ডেক। জাহাজ সামনে এগোল, কিন্তু আগেই এগিয়ে গেছে কুয়াশা, ফলে বেরিয়ে আসা গেল না।

পেট আর বুকের সাথে মাস্তুল জড়িয়ে ধরল ও, শ্বাস টানল বড় করে। বাতাসের সাথে ভারী, নোংরা, হিম ঠাণ্ডা কুয়াশা ঢুকল ফুসফুসে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করল ও, মনে হলো ভেতরটা যেন তরল বরফে ভরাট হয়ে গেছে। বাতাসের জন্যে ছটফট করতে লাগল। মনে হলো, সারা শরীরে ভারী কি যেন চেপে বসছে, মাস্তুলের মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছে ও। এগিয়ে চলেছে জাহাজ, হঠাৎ করে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। নিজের অজান্তে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ দুটো খুলল ও। পারকার গায়ে রাশ রাশ বরফ কুচি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। বরফের আবরণ ঢেকে ফেলছে ওকে।

‘মি. রানা, আপনি কথা বলুন, মি. রানা আপনি...’, অস্থির ক্যাপটেন মুহূর্তের জন্যে থামছেন না।

‘শান্ত হোন। এবারের ধাক্কায় কাজ হবে।’ দম নেয়ার জন্যে থামল রানা। ‘যে ফাটলটা আমরা তৈরি করেছি তার পঞ্চাশ গজ এদিকে, পোর্ট সাইডের বরফে গুঁতো মারবেন। কি চাইছি বুঝতে পারছেন?’

‘ফাটলের পঞ্চাশ গজ এদিকে!’ ক্যাপটেনের মনে হলো রানার কথা ভুল শুনেছেন তিনি।

‘হ্যাঁ। পোর্ট সাইড! পঞ্চাশ গজ! জাহাজকে আমি ধাক্কা খাইয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইছি স্টারবোর্ডের একটা ফাটলের মুখে। ফুল পাওয়ার!’

‘ফুল পাওয়ার! আপনাকে আমি খুন করব...’

পাল্টা ধমক দিল রানা, ‘প্রলাপ বকবেন না। বজ্জাত জাহাজটাকে রেসের ঘোড়ার মত ছোটান। ফুল পাওয়ার!’

‘ও কে! এ আপনার...সিদ্ধান্ত!’ শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ক্যাপটেন, সিদ্ধান্তের জায়গায় মরণ ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন।

রেসের ঘোড়ার মত টগবগিয়ে সামনে ছুটল কিউট। এর আগে এঞ্জিনের এমন দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ শোনা যায়নি। গাঢ় পানি দু’পাশে সরিয়ে দিয়ে, বো-র ধাক্কায় পানিতে ঢেউ তুলে, পরবর্তী ধাক্কা মারতে যাচ্ছে ব্যারিয়ারে। অদ্ভুতই বলা যায় রানার প্ল্যান, এ-ধরনের কৌশল সাধারণত কেউ কাজে লাগায় না। দ্রুতগতি জাহাজ সমস্ত ওজন সহ পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে আঘাত হানবে, নিরেট বরফে ধাক্কা খেয়ে কিউটের নাক বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করবে। অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ হবার আগেই স্টারবোর্ড সাইডের নির্দিষ্ট একটা বরফ টুকরোর সাথে সংঘর্ষ হবে বো-র। এই কৌশল ছাড়া সরাসরি বা অন্য কোনভাবে টুকরোটোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। এই টুকরোর ওপরই রয়েছে আঁকাবাঁকা রেখা, বহুদূর লক্ষ্য হয়ে মিশেছে গিয়ে ক্রমশ চওড়া হতে থাকা ফাটলে।

মাস্তুলের ডগা থেকে ক্যাপটেনকে গাইড করছে রানা। পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে ধাক্কা না লাগলে সব ভেস্তে যাবে, কারণ তা না হলে স্টারবোর্ডের টুকরোটোর ঠিক জায়গায় বো-র গুঁতো লাগবে না। ডেকে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সমস্ত লোককে ডেক থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাপটেন। সর্বশক্তিতে ছুটে গিয়ে আঘাত খাবে আইসব্রেকার, খোলা ডেকে থাকা মানে ছিটকে পানিতে পড়া, নাহয় রেইলের সাথে বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটানো।

ব্রিজে উঠে এসেছে নিয়াজ, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রস-ট্রীর ওপর খুদে মূর্তিটাকে রানা বলে চেনা যায় না। ফুল পাওয়ার!—ক্ষমতা থাকলে ক্যাপটেনের নির্দেশ বাতিল করে দিত সে।

মাস্তুলের ডগা থেকে পোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বরফের শক্ত স্তর জমেছে ওর কাপড়চোপড়ে, স্তরটা আরও মোটা হচ্ছে। ক্যাপটেনকে শেষ নির্দেশ দিল ও, ‘যদি দেখেন জাহাজ থামছে না, থামবার দরকার নেই। চিড় ধরা বরফ গুঁড়িয়ে গিয়ে পথ করে দিতে পারে।’ প্রতি মুহূর্তে জাহাজের গতি বাড়ল। বরফের তর্জন-গর্জন চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের একটানা হুঙ্কারে। অসুস্থ বোধ করল রানা। বারবার শুধু নিজেকে মনে করিয়ে দিল, মাস্তুলটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। ধাক্কাটা এই সময় লাগল।

পোর্ট সাইড ব্যারিয়ারে তির্যকভাবে আঘাত করল কিউট। ব্যারিয়ার যেন পাল্টা ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিল জাহাজকে, প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে স্টারবোর্ড সাইডে বাড়ি খেলো বো। রানার নির্দেশে ক্যাপটেন তার জাহাজটাকে বিশাল একটা বিলিয়ার্ড বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন—মেরেছেন যেদিকে, তার ঠিক উল্টোদিকে যেন আঘাত করে বল, চিড়গুলোর কাছাকাছি। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে অন্য একটা আওয়াজ শোনা গেল, ভাঙচুরের পালা শুরু হয়েছে। পিছনের কয়েক হাজার টন শরীর নিয়ে বরফের ওপর চড়াও হয়েছে বো, সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে হেলেদুলে সামনে ছুটে চায়।

মাস্তুলের ওপর রানা ওদিকে মরতে বসেছে। চাবুকের মত

সপাং সপাং আওয়াজ তুলে এদিক ওদিক দুলছে মাস্তুল, যে-কোন মুহূর্তে গোড়া থেকে মট করে ভেঙে যাবে বলে মনে হলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সহ্য করতে পারল রানা, তারপর সমস্ত হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেল ওর। অবিশ্বাস্য গতিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাস্তুল, একবার এদিক, একবার ওদিক। রানার পেশীতে কোন জোর থাকল না, মনে হলো ঝাঁকি খেয়ে মাথার ভেতর মগজটুকু আকৃতি বদল করেছে। দাঁতগুলো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে আসতে চাইল মুখের বাইরে। হাত-পা খুলে আসতে চাইল শরীর থেকে।

প্রাণপণ চেষ্টা করার পর চোখ একটু খুলতে পারল রানা। হাত দুটো এখনও মাস্তুল জড়িয়ে রয়েছে। সব কিছু ঝাপসা দেখল ও। জাহাজ থেমে রয়েছে নাকি চলছে বোঝা গেল না। নিচের দিকে তাকিয়ে বিশাল একটা ফাটল দেখতে পেল। চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে, এই সময় বুকের কাছে ঝুলে থাকা মাইকটা চোখে পড়ল। নিজের অজান্তেই কথা বলে উঠল ও, ‘চালিয়ে যান, ক্যাপটেন, থামবেন না!’ মুখের ভেতর লোনা স্বাদ—রক্ত। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তীব্র ব্যথা। শিরদাঁড়া ভেঙে গেল নাকি? ‘ফুল স্পীড অ্যাহেড, ক্যাপটেন! ফুল স্পীড...!’

বরফের ভেতর জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে টের পেয়ে ক্যাপটেন আর নতুন কোন নির্দেশ দেননি, কাজেই যেদিকে খুশি এগিয়ে চলেছে কিউট। বো-র সামনে পড়ে বরফের বিশাল বিশাল চাঁই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, কোন কোনটা দু’টুকরো হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দু’পাশে। গায়ের জোরে ক্রমশ ভেতরে ঢুকছে আইসব্রেকার। বোর ধাক্কা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে ব্যারিয়ার, নিজের তৈরি পথ ধরে হেলেদুলে এগোচ্ছে কিউট। ডেকের নিচে চীফ এঞ্জিনিয়ার

তার গজের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, ডেঞ্জার পয়েন্ট ছাড়িয়ে গিয়ে খরখর করে কাঁপছে কাঁটা। ক্যাপটেন সাবধান না হলে বয়লারগুলো যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে।

ব্রিজ থেকে আগের নির্দেশই রিপিট করলেন ক্যাপটেন, ‘ফুল পাওয়ার!’ তাঁর এই নতুন নির্দেশে জাহাজ যেন এবার সত্যি অদম্য হয়ে উঠল। বো উঠে গেল বরফের ওপর, স্রেফ শক্তি আর ভার চাপিয়ে তছনছ করে দিল নিরেট বাধা। মাস্তুলের মাথা থেকে এতক্ষণে টের পেল রানা কি ঘটছে। সামনে ফাঁক হয়ে গেছে আইসফিল্ড, ফাঁকটা চওড়া ফাটলের দিকে ছুটছে। আর কোন চিন্তা নেই, পরম স্বস্তির সাথে উপলব্ধি করল ও। এভাবেই ফাটল ধরে সাগরে পৌঁছে যাবে জাহাজ। সেই সাথে জ্ঞান হারাল ও।

মাস্তুল থেকে খসে পড়ল হাত। ক্রস-ট্রী থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল শরীর। চেস্ট-স্ট্র্যাপের সাথে শূন্যে পেডুলামের মত ঝুলতে লাগল রানা।

রানাকে নামাবার জন্যে ওপরে উঠল দৈত্য হিগিন, এই লোকই রানার সামনে বালতি বসিয়ে দিয়েছিল। মাস্তুল বেয়ে কে আগে উঠবে তাই নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করেছে নিয়াজ আর বিনয়, এই সময় ওদের দু’জনকেই অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, ‘গরিলা থাকতে তোমরা কেন?’ সত্যি কথা বলতে কি, গোটা জাহাজে সে-ই বোধহয় এই কাজের জন্যে একমাত্র যোগ্য লোক। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু, কিন্তু চওড়ায় দ্বিগুণ। শুধুই পেশী, চর্বির ছিটেফোঁটাও নেই শরীরে। মাস্তুল দুলছে, অথচ প্রায় তরতর করে উঠে গেল হিগিন। জাহাজ থামেনি, আগের মতই

বরফ ভেঙে এগিয়ে চলেছে।

‘রানা কি মারা গেছে?’ নিয়াজের পাশ থেকে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল বিনয়, দু’জনেই ওরা মই ধরে স্থির হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় আশি ফিট ওপরে দুলছে রানা। দুলছে মাস্তুলের সাথে, শরীরে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই-অন্তত আছে কিনা ডেক থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

‘এত সহজে মারা যাবে?’ ফোঁস করে উঠল নিয়াজ। তার গলার স্বরে খানিকটা হলেও অভিমান ফুটে উঠল, যেন বলতে চায় এভাবে ওদেরকে একা ফেলে বিনা নোটিশে মারা যাবার কোন অধিকার রানার নেই। ‘আমি ভাবছি অন্য কথা,’ আবার বলল সে। ‘স্ট্র্যাপটা ওর ভার বেশিক্ষণ সহিতে পারবে না।’

হিগিনকে এখন ছোট দেখাচ্ছে। এখনও উঠে যাচ্ছে সে। ডেকে অনেক লোকের ভিড়, সবাই ওপর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোট নাড়ছে। কি হয় বলা কঠিন। মাস্তুল যেভাবে এদিক ওদিক দুলছে, হিগিন পড়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রত্নস্থাসে একবার রানার দিকে, একবার হিগিনের দিকে তাকাল নিয়াজ। হঠাৎ চোখ নামিয়ে দু’হাতে মুখ ঢাকল বিনয়।

ক্রস-ট্রীর কাছে পৌঁছে গেল হিগিন। ভুলের খেসারত মৃত্যু, অত ওপর থেকে কেউ পড়লে, পড়ার আগেই বলে দেয়া যায় লোকটা মারা গেছে।

ক্রস-ট্রীর নিচে পৌঁছে থামল হিগিন। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কিউটের বো অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে উঠল। উঁচু হলো ধীরে ধীরে, কিন্তু নামল সবগে। রেইল থেকে হাত ছুটে গিয়ে বরফ মোড়া ডেকে আছাড় খেলো নিয়াজ। পিছলে গেল

শরীরটা, দূরে একটা বাঁকহেডের গায়ে গিয়ে থামল। দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, দেখল সাহায্যের জন্যে ছুটে আসছে বিনয়। কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিল নিয়াজ। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে দু'জনেই মাস্তুল থেকে খসে পড়েছে। নিশ্চয়ই জাহাজে পড়েনি।

একটা হাত বাড়াল নিয়াজ। ‘আমাকে তোলো, বিনয়...’

বিনয়ের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াল সে, একটা রেইল ধরে সিঁধে হলো। ভয়ে ওপর দিকে তাকাচ্ছে না। হঠাৎ খেয়াল হলো, বিনয় কোন্ সাহসে তাকিয়ে রয়েছে?

চোখ তুলল নিয়াজ। মাস্তুলের ডগায় কেউ নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, দেখল, ডগা থেকে অনেক নিচে নেমে এসেছে হিগিন, তার চওড়া কাঁধে ঘুমন্ত শিশুর মত নেতিয়ে রয়েছে রানা। মাস্তুল থেকে খুলে চেস্ট-স্ট্র্যাপটা নিজের কাঁধে জড়িয়ে নিয়েছে হিগিন, পিঠ থেকে রানা যাতে পড়ে না যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছানাবড়া হয়ে উঠল নিয়াজের চোখ-লোকটা মানুষ, নাকি আর কিছু? মইটাকে ইম্পাতের বলে চেনার উপায় নেই, প্রতিটি ইঞ্চি বরফের পুরু স্তরে মোড়া। জাহাজের সাথে বিরতিহীন দুলছে আর কাঁপছে। পিঠে ওই ভার নিয়ে লোকটা নামছে কিভাবে?

পিঠে রানা থাকায় ধাপে জোরাল চাপ দিতে পারল হিগিন, বরফের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে এল ইম্পাত। ধাপে বরফ থাকা অবস্থায় রানাকে নিয়ে নামতে পারত না সে, পা পিছলে পড়ে যেত।

নিরাপদেই নেমে এল হিগিন। তার চেহারা গম্ভীর, থমথমে। রানা কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সাহস হারিয়ে ফেলল

নিয়াজ। তারপর হঠাৎ দেখল, সে বাদে বাকি সবাই রানা আর হিগিনকে সাহায্য করছে। বলতে গেলে জুদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

ফাটলে পড়ল কিউট। বো-তে পানি পেয়ে সাবলীল হলো জাহাজের গতি।

## সাত

‘মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে? কি ঘটবে?’

রিসার্চ শিপ রিগার ব্রিজে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে রাডারের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। পাশেই দৈত্যাকৃতি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ব্রিজটা বিশাল, হেলমসম্যানের সামনে ইম্পাতের মত শক্ত অভঙ্গুর কাঁচের প্রকাণ্ড দেয়াল। দেয়াল জুড়ে সাজানো রয়েছে নেভিগেশন সহজ করার জন্যে যাবতীয় জটিল যন্ত্রপাতি। রুশ রিসার্চ শিপের সাথে তুলনা করলে রাডারহীন সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউটকে মাস্কাতা আমলের বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

শক্তিশালী ডিজেল মটরগুলোর ভাইব্রেশন মৃদু গুঞ্জনের মত শোনায। ব্রিজের সামনে ফিট করা পাঁচ-সাতটা সার্চ-লাইট ঘন কুয়াশাকে আলোকিত করে রেখেছে।

আচমকা ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ। বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে ডেকের দিকে তাকাল ট্রাভকিন। না, হাতির পা ইম্পাত মোড়া ব্রিজের মেঝের কোন ক্ষতি করতে



পারেনি।

কয়েক হাত দূর থেকে হেলমসম্যান ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ কর্নেলের চোখ রাঙানি লক্ষ করে নিজের কাজে মন দিল সে। এবার ক্যাপটেনের দিকে ফিরল কর্নেল। ‘আমার কথা আপনি শুনতে পাননি?’ হুমকির মত শোনাল তার কর্ণস্বর।

ক্যাপটেন নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। বগড়ার মধ্যে না গিয়ে মৃদু স্বরে বলল সে, ‘বলুন।’

‘কি ঘটবে?’ প্রশ্নটা আবার করল বলটুয়েভ, ‘আমরা যদি কুয়াশা থেকে বেরিয়ে কিউটের পেটে একটা রামধাক্কা মারি বো দিয়ে?’

বিড়বিড় করে ট্রাভকিন বলল, ‘আপনি একটা বন্ধ উন্মাদ!’

সাগরে পৌঁছেছে কিউট। ডুবে যাচ্ছে।

চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, ঘনকালো কুয়াশার পর্দার ওপর কোথাও চাঁদ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। সার্চ-লাইটের আলোয় শুধু সামনের দিকটা খানিকদূর পরিষ্কার, উদ্ভাসিত হয়ে আছে ভীতিকর দৃশ্য।

ব্রিজ, মাস্তুল, রেইল, আর ডেক স্ফটিকের মত বরফের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। গোটা আবহাওয়া জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রা-৩৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট, অর্থাৎ ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে একান্তর ডিগ্রী নিচে। হিম-শীতল সাগরের চেয়ে বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা। বাতাস নয়, তরল বরফ কালো মেঘের মত ভেসে রয়েছে জাহাজের ওপর। ডেকে পাঁচশো টনের বেশি

বরফ জমেছে, স্তূপ হয়ে আছে পোর্ট সাইডে। সন্দেহ নেই উল্টে যাবে কিউট। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আইসব্রেকার ডুবছে।

ডেকে গুরু হয়েছো মরণগণ যুদ্ধ। আবহাওয়া আর তুষারের সাথে মানুষের লড়াই। একান্ত জরুরী কাজে যারা ব্যস্ত তারা বাদে বাকি সবাই উঠে এসেছে ওপরে। বাঁচার একটাই উপায়, সময় থাকতে জাহাজ থেকে ফেলতে হবে বরফ। যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছে ক্রুরা, বিপদের গুরুত্ব তাদের জানা আছে। প্রতি মুহূর্তে কয়েক মণ বরফ রেইলের ওপর দিয়ে সাগরে ফেলেছে তারা, কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশি নতুন বরফ জমেছে ডেকে। অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখছে না তারা। বান্ধহেড ল্যাম্পের আলো ঝাপসা হয়ে আছে, কারণ ল্যাম্পের কাঁচে জমাট বেঁধেছে বরফের স্তর। সিঁধে হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কেউ, বরফের ভারে পেটের দিকে বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। বাতাসের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, অথচ শ্বাস টানতে পারছে না-টানলেই গলার ভেতর তরল বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

বরফে তৈরি মানুষ ওরা, প্রত্যেকের কাপড়চোপড় ঢাকা পড়েছে শক্ত আবরণে। অতিরিক্ত বিশ থেকে পঁচিশ সের ওজন বইতে হচ্ছে। শাবল, কোদাল, আর হাতুড়ি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ চলছে। বরফ ভাঙো, তোলো, ফেলো। ডেক জুড়ে দলে দলে কাজ করছে লোকজন। অবিরাম, বিরতিহীন। মত্তরগতি এঞ্জিনের আওয়াজ বরফ ভাঙার শব্দে চাপা পড়ছে। অশান্ত সাগর যেন লগি দিয়ে ঠেলে ওপরে তুলছে কিউটের সামনের দিক, পরমুহূর্তে লগি সরিয়ে নিতেই প্রচণ্ডবেগে আছাড় খাচ্ছে। তখন আর কাজ করার উপায় থাকছে না ক্রুদের, লাইফ-লাইন ধরে তাল

সামলাতে হয়, তা না হলে রেইল টপকে সাগরে পড়তে হবে।

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই।

টেকির মত ঠাণ্ডা-নামা করছে জাহাজের বো, সার্চ-লাইটের আলোয় উথালপাথাল সাগর ফুঁসছে। উঁচু ব্রিজ থেকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান, মাঝ-আকাশ থেকে ডেকে বরফ পড়তে দেখছেন—কালো কুয়াশা স্ফটিক হয়ে নেমে আসছে নিচে। ‘আমরা হারছি, কাফম্যান,’ গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। ‘যতটা বরফ ফেলতে পারছি তারচেয়ে বেশি জমা হচ্ছে।’

পোর্ট উইন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকাটিং মেট কাফম্যান। ডেকে প্রায় রেইল সমান উঁচু হয়ে রয়েছে বরফ। আর্মার গ্লাসে মুখ চেপে ভাল করে তাকাতে গেল সে, ঠাণ্ডা ছঁাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল। খুব জোরে বরফে শাবল গাঁথতে গিয়ে বিপদে পড়ল একজন ত্রু। দূর থেকে ঠিক চেনা গেল না, সম্ভবত হিগিন। তার ডান হাতের দস্তানা খুলে গেল, বরফের ভাঁজে আটকা পড়ল কজি পর্যন্ত। দ্বিতীয় দস্তানাটা হাতে রয়েছে বটে, তবু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হবে বেচারী। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সে, কজিসহ আঙুলগুলো বগলের তলায় চেপে ধরেছে। সবচেয়ে কাছের সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাফম্যান ভাবল, হয়তো শেষ রক্ষা হবে না—হাতটা বরফে পরিণত হলে কেটে ফেলে দিতে হবে। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারল কিনা দেখা হলো না। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে ছড়িয়ে পড়ল ঝর্নার মত একরাশ পানি, মাঝপথে পরিণত হলো বরফে, ঝামঝাম করে শিলাবৃষ্টি হলো কাঁচে। ঝাপসা হয়ে গেল দৃশ্যটা।

‘শুনলাম মি. মাসুদ রানা ভাল আছেন,’ বললেন গোল্ডম্যান।

‘হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে উঠছেন,’ কাফম্যান বলল। ‘ভদ্রলোক এই কাঁচের মত, অভঙ্গুর!’

নিয়াজের কেবিনে একা বসে রয়েছে রানা। জাহাজের খোলার সাথে ঘষা খাচ্ছে ভাসমান বরফের চাঁই, তারই ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ শুনছে একমনে। কেবিন পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ও। জানে, বরফ সরাবার জন্যে অমানুষিক খাটছে ত্রুরা, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। জাহাজ উল্টে গেলে কেউ ওরা বাঁচবে না, তবু বিপদটার কথা ভুলে গিয়ে অন্য কথা ভাবছে রানা।

কর্নেল বলটুয়েভের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল। তিন ঘণ্টা আগে প্রথম যখন জ্ঞান ফিরল, ওকে দেখতে এসেছিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

‘আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ওরা, মি. রানা—সোভিয়েত ট্রলার।’ ক্যাপটেনের আঙুল ছিল ভাঁজ খোলা চার্টের ওপর। ‘আমাদের পথের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।’

‘রাডার নেই, জানলেন কিভাবে।’

‘নিজের চোখে দেখে এসেছে শেরম্যান। কুয়াশা তখনও আসেনি, সিকোরস্কি নিয়ে ফুয়েল লিমিটের শেষ মাথা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল ও। শুধু যে ট্রলারগুলোকে দেখেছে তাই নয়, ঠিক এখানটায় আরও বড় কি যেন একটা আছে।’

‘ত্রিশ মাইল দূরে। রিসার্চ শিপ রিগা?’

‘হতে পারে। ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি শেরম্যান, ও তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় জাহাজটা। তবে গম্বুজ আকৃতির রাডার ডোম মত কিছু একটা

দেখেছে। রিগায় এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে, আমাদের স্যাটেলাইটগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখন লক্ষ রাখতে হবে ওদের যখন আমরা পাশ কাটাতে কোন দুর্ঘটনা যেন না ঘটে...’

নড়েচড়ে বাক্ষে আরও আরাম করে বসল রানা। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম কথা হয়েছে জাহাজের ডাক্তারের সাথে। ওর কোন হাড় ভাঙেনি দেখে ডাক্তার নাকি নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরীক্ষা করেছিল, স্বপ্ন দেখছে না তো! হাড় না ভাঙার কারণ, পরে ডাক্তার উপলব্ধি করে, রানার পরনের গরম কাপড়চোপড় আর ক্যানভাস প্যাড। মাস্তুলের সাথে ধাক্কা না খেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়েছিল শরীরটা, সেটাও একটা কারণ। যাবার সময় ডাক্তার ওকে বলে গেছে, ‘তবু সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে আপনাকে, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই কেবিন থেকে বেরুতে পারবেন না।’

আপনমনে হাসল রানা। ডাক্তার জানে না, চার দেয়ালের ভেতর বন্দী থাকার মানুষ নয় সে। সত্যি, সারা শরীর খেঁতলে গেছে ওর; শুধু ব্যথা নয়, সেই সাথে অনুভব করছে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ধড়টা। তবু এই বিপদের সময় চুপ করে বসে থাকা যায় না। নিয়াজের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। জরুরী কথা আছে। তারপর ব্রিজে যাবে...

উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে কর্নেল বলটুয়েভের কথা ভাবল রানা। আই.আই. ফাইভের একটা ঘরে মিনিট কয়েক লোকটাকে দেখেছে ও। চোখের সামনে বিশাল একটা দেহ ভেসে উঠল, কামানো মাথা, অস্বাভাবিক চওড়া মুখ, চেহারায় মঙ্গোলীয়

ছাপ। নিষ্ঠুর, প্রতিশোধপরায়ণ একজন মানুষ।

কিউটের সামনে ছয়টা সোভিয়েত ট্রলার রয়েছে। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। কিউটে ইভেনকো রক্ষণভ রয়েছে। আর রয়েছে মেরিলিন চার্ট। এ-সব জানা আছে কর্নেল বলটুয়েভের। ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বললেন, দেখতে হবে যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। কিন্তু রানা ভাবছে সম্পূর্ণ অন্য কথা।

কর্নেল বলটুয়েভের নির্দেশে রিসার্চ শিপ রিগা আর ট্রলারগুলো কিউটের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, লোকটা কি পরিমাণ ঝুঁকি নেবে? মার্কিন পতাকাবাহী একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে কি? কিংবা জাহাজে চড়াও হবার স্পর্ধা দেখাবে?

লোকটার মানসিক গঠন কি রকম, তার ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। যদি উন্মাদ হয়, সবই সম্ভব। উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাবার চেষ্টা করল রানা।

আরও একটা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় মেরিলিন চার্ট। সত্যিই কি আসল চার্টটা নিয়ে এসেছে ইভেনকো রক্ষণভ? টিউবের ভেতর থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটাকেই আসল চার্ট বলে দাবি করছে সে, তার এই দাবি কতটুকু সত্যি? ওটাই যদি আসল চার্ট হবে, সেটা নিজের কাছে রাখার জন্যে আরও জেদ ধরেনি কেন?

চার্টটা নয়, টিউবটা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কেন?

শুরুতে রানা ধারণা করেছিল, আসল চার্টটা ইভেনকো নিয়ে আসবে না, বা নিয়ে আসতে পারবে না। ব্যক্তিগত ভাবে ও চায় না, আসল চার্টটা আমেরিকানদের হাতে পড়ুক। তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। এখন, ইভেনকোর দাবি যদি মিথ্যে না হয়,

নতুন একটা দায়িত্ব চাপল ওর কাঁধে। আসল মেরিলিন চার্ট ফিরিয়ে দিতে হবে রাশিয়াকে।

কিন্তু তাহলে আমেরিকানদের বুঝ দেবে কিভাবে?

তারও আগে জানতে হবে, আসল চার্টটা কোথায়।

চিন্তা করতে করতে নিজের অজান্তেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল রানা।

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বা বলা যেতে পারে বিপদের সমস্ত ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে হাফ স্পীডে ছুটছে কিউট। দুই টেউয়ের মাঝখানে সরু একটা চালে নাক ঢুকিয়ে দিল বো, সবচেয়ে পোর্ট রেইলের ওপর ভেঙে পড়ল মস্ত একটা টেউ, সম্পূর্ণ ডুবে গেল রেইল। আবার যখন মাথাচাড়া দিল বো, পানির অর্ধেকই বরফে পরিণত হয়ে রয়ে গেল ডেকে।

দশ মিনিট আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হ্যারি গোল্ডম্যান। ‘ঝুঁকিটা নিতেই হবে। স্পীড বাড়িয়ে দেখা যাক কুয়াশা থেকে বেরুতে পারি কিনা।’

‘জাহাজ উল্টে...’, ক্যাপটেন বাট করে তাকাতো কথাটা শেষ করতে পারেনি কাফম্যান। ডুবে তো ওরা এমনিতেও যাচ্ছে, কাজেই চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

বরফ মোড়া রিগিঙের ভেতর দিয়ে শৌ শৌ বাতাস বইছে। গতিবেগ বেড়েছে, পঁয়ত্রিশ নট-এর কম নয়। টেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে এনে ডেকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিপুল জল-ফোঁটা। শূন্যে বরফ হয়ে উঠছে ওগুলো, ক্রুদের কুঁজো শরীরে সীসার তৈরি বুলেটের মত আঘাত করছে। বেঁচে থাকার যুদ্ধে হারছে ওরা,

প্রতিটি রণক্ষেত্রে। আগের অবস্থা এখনও বদলায়নি, যত বরফ ফেলছে নতুন করে জমছে তারচেয়ে বেশি। পোর্ট সাইডে রেইল সমান নিরেট হয়ে উঠেছে সাদা স্তূপ।

বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় আরও অশান্ত হয়ে উঠল সাগর। মাঝে মধ্যেই এক আধটা টেউ আসছে চল্লিশ ফিট উঁচু। জাহাজের ডেকে আছাড় খেয়ে ভাঙছে সেগুলো, যেন পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়া মাস্তুলের ডগা ছুঁতে চায়। ডেকে দাঁড়ানো ক্রুরা লাইফলাইন ধরে ঝুলে পড়ে, পানির ফিরতি তোড়ের সাথে ভেসে যাবার আতঙ্ক গ্রাস করে সবাইকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রচুর বরফ ফেলেছে ওরা, টেউয়ের পানি নেমে যাবার পর দেখা গেল খালি জায়গাগুলো আবার ভরাট হয়ে গেছে বরফে।

টেউগুলোর সাথে শক্ত বরফও থাকে। কোনটা লম্বা, কংক্রিট পিলারের মত, কোনটা ঢোকো বাক্স আকৃতির। লাইফ-লাইন আঁকড়ে ধরা ক্রুরা খোদার নাম জপতে থাকে, কারণ ওগুলোর একটা ধাক্কা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। পানির তোড়ের সাথে উঠে আসা এই রকম একটা বরফের ধাক্কায় ওদের এক লোক মারাও গেল। লাইফ-লাইন ধরে ঝুলে পড়েছিল সে, পানির তোড় তাকে ঠেসে ধরল একটা বাক্সহেডের গায়ে। পরমুহূর্তে টর্পেডোর মত ছুটে এসে তার মুখ, মাথা, আর বুক চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দিল দেড় মণ ওজনের একটুকরো বরফ।

লাশটা ভেসে গেল সাগরে।

‘ডেক খালি করা উচিত, স্যার,’ পনেরো মিনিট পর মুখ খুলল কাফম্যান।

‘কেন?’ অ্যাকটিং মেটের পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন, পোর্ট উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাতাই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। পোর্ট রেইল ডুবে গেছে আবার। লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বরফের ওপর, কিন্তু বরফ দেখা যাচ্ছে না। পানিতে সবার কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে। রেইল নেই, বরফ নেই, ওপর থেকে মনে হলো ব্রিজ একা নিজ থেকেই ভেসে আছে। পানির ছিটে বরফকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচে, ঝাপসা হয়ে গেল নিচের দৃশ্য। সরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কাঁচে চোখ রাখলেন ক্যাপটেন।

খানিক পর বো-র দিকে চোখ রাখার জন্যে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন তিনি। ‘না। ডেকে ওরা যেমন কাজ করছে করুক।’

‘কিন্তু, স্যার কিভাবে কাজ করবে ওরা! কোমর পর্যন্ত পানি...?’

‘এখনও কি তাই?’ অ্যাকটিং মেটকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘না, তা নয়, কিন্তু পরবর্তী টেউ এলেই আবার...’

‘ওরা কাজ করুক,’ কাফম্যানকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপটেন।

মনের গভীরে কাফম্যান জানে, ক্যাপটেন ঠিকই করছেন। প্রতি পাউন্ড বরফ ফেলার সাথে জাহাজের ভেসে থাকার সম্ভাবনা আরেকটু বাড়বে। ভেসে থাকতে পারলে আশা করা যায় এগিয়ে গিয়ে সামনে কোথাও নিরাপদ পরিবেশ পাওয়া যাবে। এই কালো কুয়াশার ভেতর থেকে বেরতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত।

পরবর্তী ষোলো ঘণ্টা পালা করে কাজ করল জুন্স। প্রতিটি টীম কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম পেল, ডেকের নিচে নেমে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলে গরম কাপড় পরল তারা, আগুনের ধারে বসে ভাজা

ভাজা করে নিল শরীর। দশ মিনিট, তারপরই আবার ফিরে আসতে হলো হিম নরকে। একদল ডেকে উঠল, আরেক দল নামল। যারা উঠল তারা বিদায় চেয়ে নিল, আর হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।

অসহ্য শীত, তীব্র বাতাস, ঢেউ, ঢেউয়ের সাথে ছুটে আসা বরফের চাঁই, এ-সবের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লড়ে গেল লোকগুলো। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের ব্যক্তিত্বই এই অসম্ভবকে সম্ভব করল। দৃঢ়চেতা ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই। একটা টীমে স্বেচ্ছায় নাম লেখাল নিয়াজ আর বিনয়। ওদিকে ইভেনকো রস্তুভ, যার জন্যে ওদের সবার আজ এই অবস্থা, সিক-বেতে গুয়ে গুয়ে ফলের রস আর সুপ খাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে তার, সেই থেকে ‘আমার টিউব, আমার টিউব’ করে জান দিচ্ছে। অনেক কষ্টে তাকে বিছানায় আটকে রেখেছে জাহাজের ডাক্তার।

কুয়াশার গ্রাস থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল ওরা। কি ঘটছে প্রথম টের পেল কাফম্যান। ডেকে নেমে, বরফের একটা চওড়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। তারপর জুন্সের দিকে ফিরল। সবাই বরফ ভাঙছে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই কারও। হাতের শাবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মইয়ের দিকে ছুটল কাফম্যান। ব্রিজে ঢুকল হাঁপাতে হাঁপাতে। ‘অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে! আমরা বেরিয়ে আসছি।’

‘হ্যাঁ, জানি,’ বললেন ক্যাপটেন। তাঁর চেহারায় স্বস্তি বা সন্তোষের ছায়া পর্যন্ত নেই, রিয়ার উইন্ডো দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছেন। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ,

ডেকে বরফের পাহাড়। তবে আবহাওয়ার মধ্যে আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। শৌ শৌ আওয়াজ একটু যেন কমেছে বাতাসের। ডেকের ওপর আবছা একটা আলো পড়ল, পরিষ্কার নয়—কুয়াশা সরে যাবার সাথে সাথে উঁকি দিতে শুরু করেছে চাঁদ। কুয়াশার গাঢ় পর্দা এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে জাহাজের পিছনে সেটা, দ্রুত সরে যাচ্ছে আরও দূরে।

রাত এগারোটায় সিঁড়ি বেয়ে ফোরডেকে উঠে এল রানা। এত ছুটোছুটি কেন? কি ঘটছে? ধীরে ধীরে হাঁটছে রানা, এখনও ক্লান্ত। আরও দু'জন নাবিক ছুটে পাশ কাটিয়ে গেল ওকে, খোলা ডেকে বেরিয়ে বরফের ওপর দিয়ে দৌড় দিল। ভয়ঙ্কর কোন দুঃসংবাদ না হলে পিচ্ছিল ডেকের ওপর দিয়ে এভাবে কেউ দৌড়ায় না।

ব্রিজে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এই আবহাওয়াতেও একটা জানালা খুলে রেখেছেন ক্যাপটেন, নাইট-গ্লাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। হেলমসম্যান, তারপর কাফম্যানের দিকে তাকাল রানা। ওদের চেহারা দেখে বুঝল, এই মুহূর্তে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। দু'জনেই উদ্বেগ আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীর পায়ে খোলা জানালার দিকে এগোল রানা। জিজ্ঞেস করতে হলো না, বাইরের একটা লুকআউট পয়েন্ট থেকে ভেসে এল এক লোকের রোমহর্ষক চিৎকার, 'আইসবার্গ অন দি পোর্ট বো! আইসবার্গ অন দি স্টারবোর্ড বো! আইসবার্গ অ্যাহেড!'

## আট

প্রশ্নটা আবার করল কর্নেল বলটুয়েভ।

'না!' বিস্ফোরিত হলো ট্রাভকিন। 'আমাকে মাফ করুন। এ নির্দেশ আমি দিতে পারব না। তারচেয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইব...'

'কে আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছে?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল কর্নেল।

'রেডিও-জ্যামিং থামাবার নির্দেশ দেব আমি,' ঝাঁঝের সাথে বলল ট্রাভকিন, 'তারপর মস্কোয় সিগন্যাল পাঠাব...'

'কি করে?' হাসি হাসি মুখ করে তাকাল কর্নেল। 'কি করে আপনি রেডিও জ্যামিং বন্ধ করার নির্দেশ দেন? আপনার এই জাহাজে স্পেশাল সিকিউরিটির একটা ডিটাচমেন্ট আছে, ভুলে গেছেন? জ্যামিং সেকশনের নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে তারা।'

ব্রিজের পেছনে চার্টরুমে দাঁড়িয়ে দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল তর্ক করছে ওরা। হিটিং সিস্টেম পুরোদমে চালু, রীতিমত ঘামছে কর্নেল। পারকা আগেই খুলে ফেলেছে, কামানো মাথা থেকে টুপিটাও নামাল এবার। রিসার্চ শিপ রিগার ক্যাপটেন ট্রাভকিনকে পথে আনতে বেগ পেতে হবে, আগেই ধারণা করেছিল সে। কাজেই চোটপাট না দেখিয়ে কৌশলে এগোচ্ছে।

'এটা একটা রিসার্চ শিপ, আমার ওপর নির্দেশ আছে সামুদ্রিক

গবেষণা...’

‘আরে রাখুন, মাকে মামা বাড়ির গল্প শোনাবেন না। আপনারা আমেরিকান স্যাটেলাইটের ওপর নজর রাখছিলেন। রিসার্চ, তা ঠিক, কিন্তু মিলিটারি রিসার্চ।’

‘কেন, ওশেনিক রিসার্চ আমরা করছি না? ওয়াটার টেমপারেচার, স্যালিনিটি...’

‘এ-সব গবেষণা বা পরীক্ষার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগে?’ নিজের কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে ট্রাভিকিনের মাথার দিকে আঙুল তুলল কর্নেল। ঘন ঘন নেড়ে সচল কাঁচি বানাল একজোড়া আঙুলকে, বোঝাতে চাইল ক্যাপটেনের উচিত মাথার চুল ফেলে দেয়া। ‘সাবমেরিন চালাবার কাজে, ঠিক? সবাই জানে, আপনারদের যোগাড় করা সমস্ত ডাটা আমাদের ইন্টেলিজেন্স দফতরে চলে যায়...’

‘আপনি যাই বলুন, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়!’ উত্তেজিত ট্রাভিকিন চড়া গলায় কথা বলছে। ‘আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটকে আমি ডোবাতে পারব না। আপনি বন্ধ একটা উন্মাদ! কিউটকে ডোবালে কেউ আমরা বাঁচব না...’

‘কেন? বাঁচব না কেন? কে জানবে? কিভাবে?’ মাথায় আবার হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসল কর্নেল বলটুয়েভ। ‘কিউট দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তার রাডার নেই। এটা আমরা জেনেছি দু’ঘণ্টা আগে, আমাদের একটা হেলিকপ্টার ওটাকে দেখে এসেছে। কিউটের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই—রেডিও-জ্যামিংয়ের ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে ওরা, হারিয়ে গেছে। ওটা এখন যদি নিজে থেকে ডুবে যায়?’

‘আপনি ভুলে যাচ্ছেন কিউটে একটা হেলিকপ্টার আছে!’

‘না, ভুলিনি।’ মুখ ঘুরিয়ে চার্ট টেবিলের দিকে এগোল কর্নেল। চোখে ফুটে ওঠা দ্বিধার ভাবটুকু গোপন রাখতে চাইল। কয়েক ঘণ্টা ধরে চিন্তা করছে সে, কিন্তু কিউটের হেলিকপ্টারটাকে একেজো করার উপায় দেখছে না। ‘বজ্রাত ইভেনকো আর মেরিলিন চার্ট রয়েছে কিউটে। সেজন্যেই দুটোর একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাদের। হয় ওগুলো ফেরত পেতে হবে, নاهয় ধ্বংস করতে হবে।’

‘কিন্তু আপনি যা করতে বলছেন...’

‘কই? আপনাকে তো আমি কিছু করতে বলিনি! তবে, কে না জানে যে এদিকের পানিতে বিজবিজ করছে আইসবার্গ-দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। তাছাড়া, আপনাকে তো আপনার পরিবারের কথাও ভাবতে হবে।’ শেষ কথাটা বলটুয়েভ নরম সুরে বলল।

‘আমার পরিবার! এর সাথে আমার পরিবারের সম্পর্ক কি?’

‘বিশেষ করে আপনার স্ত্রীর কথা বলতে চাইছি।’ অকস্মাৎ কাঠের মূর্তিতে পরিণত হলো কর্নেল। ‘সে তো ইহুদি...’

‘অসম্ভব! ডাহা মিথ্যে!’

কাঠের মূর্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। ‘ঠিক আছে, পুরো নয়, অর্ধেক। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপান্ন। ভদ্রমহিলার মা ছিলেন ইহুদি। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, লেনিনগ্রাদে যারা ইহুদি, তাদের খোঁজ-খবর রাখা আমার অনেক দায়িত্বের একটা?’

‘আমার কাজের মধ্যে আমার স্ত্রীকে টানবেন না...’

‘কমরেড ট্রাভিকিন, চুপ করুন! জেনেগুনে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চান? সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতার জন্যে আপনার স্ত্রীকে

শ্রোফতার করা হবে, তখন কি করবেন? যে-কোন ইহুদির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে তাকে আমি ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিতে পারি। স্ত্রীকে চিরকালের জন্যে হারাতে চান?’

‘কর্নেল কমরেড, আপনার স্পর্ধা...’

‘তারপর কি ঘটবে? মহিলা আশা করবেন, রাশিয়া থেকে পালিয়ে আপনিও তার কাছে আসবেন। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে, আপনি পালাতে পারবেন না। তখন আপনার সুন্দরী স্ত্রী নিজের জীবনের কথা ভাববেন। ভাববেন, যাকে আর পাব না তার জন্যে অপেক্ষা করে নিজের জীবন নষ্ট করি কেন! নতুন কোন পুরুষের দিকে চোখ পড়বে...’

‘বদমাশ...’

‘হতেই হয়,’ শান্ত ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। ‘আমার এই পেশায় ওটা একটা যোগ্যতা।’

ক্যাপটেন ট্রাভকিন দরদর করে ঘামছে, বিধবস্ত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কর্নেলের দিকে। বুঝে গেছে, কোন উপায় নেই, এই লোকের কথায় নাচতে হবে তাকে। ‘নিশ্চয়ই কোন বিকল্প আছে...’

‘মাথায় এলে জানাবেন আমাকে।’

‘আপনার হেলিকপ্টার ফিরে আসছে, মি. রানা,’ ভারী গলায় বললেন হ্যারি গোল্ডম্যান।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, রানার দু’পাশে নিয়াজ আর বিনয়। আপনার হেলিকপ্টার বলার কারণ, প্রস্তাবটা রানার ছিল—হেলিকপ্টার নিয়ে সামনেটায় একবার চোখ বুলিয়ে আসুক

শেরম্যান, যদি সে যেতে চায়। বলার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল শেরম্যান, কুয়াশা সরে যাবার পর থেকে মেশিন নিয়ে আকাশে ওঠার জন্যে ছটফট করছিল সে।

কালো কুয়াশা সরে গেলেও, হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়া সাগরে পানি ছুঁয়ে রয়েছে সী মিস্ট-ভারী সাদাটে কুয়াশা। চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছে আইসবার্গ, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দু’ঘণ্টা আগে চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউ ভেঙে এগোতে হয়েছে কিউটকে, এখন গুটি গুটি সামনে এগোচ্ছে ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কেটে। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। তুরা কেউ বসে নেই, তবু এখনও প্রচুর বরফ রয়েছে ডেকে।

বড় একটা আইসবার্গ, একশো ফিট উঁচু, পোর্ট বো থেকে সিকি মাইল দূরে ভাসছে। বার্গের খাড়া প্যাঁচিল এবড়োখেবড়ো, গুহা আকৃতির কিছু ফাটল রয়েছে গায়ে। সাদাটে কুয়াশার একটা বেস্ট ওটার কোমর জড়িয়ে রয়েছে, আরেকটা প্যাঁচ খেয়েছে গোড়ার দিকে, তবে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ছুঁচাল চূড়া ঝুঁকে রয়েছে ওদের দিকে। ছোট আরেকটা বার্গ, শৃঙ্গের কাছাকাছি স্প্যানিশ দুর্গের মত খাঁজ কাটা, সার সার জানালা, ভাসছে স্টারবোর্ড সাইডে—প্রায় একই দূরত্বে। ব্রিজ থেকে ওগুলোকে পিঠ-উঁচু দ্বীপের মত লাগল দেখতে—এই দেখা যায়, এই যায় না।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল ইভেনকো রস্তুভ। ‘আমার টিউব কোথায়? দিন!’ রানার দিকে ছুটে এল সে।

‘মি. ইভেনকো রস্তুভ!’ বিস্মিত হলেন ক্যাপটেন। ‘আপনি অসুস্থ! ডাক্তার আপনাকে ছাড়ল কোন আক্কেলে! প্লিজ, আপনি



আপনার সিক-বেডে ফিরে যান...’

‘দাঁড়ান, আগে সম্পত্তির দখল পাই, তারপর অন্য কথা!’  
ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে রানার দিকে মারমুখো হয়ে এগোল  
রুস্তভ। ‘যখনই ওটা চেয়েছি, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছেন  
আমাকে। একা ছিলাম, মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু এখন?  
ক্যাপটেন একজন আমেরিকান, আমি আমেরিকানদের কাছে  
আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। কাজেই তিনি আমার দলে। ক্যাপটেন...’

‘আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না...!’  
গোল্ডম্যান একবার রানা, একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন।

‘উত্তেজিত হবেন না,’ শান্ত গলায়, ক্ষীণ একটু হেসে রুশ  
বিজ্ঞানীকে বলল রানা। ‘ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি, ক্যাপটেন।  
ইভেনকো রুস্তভ সাথে করে একটা মূল্যবান ডকুমেন্ট নিয়ে  
এসেছেন—অন্তত উনি তাই বিশ্বাস করেন। নিরাপত্তার কথা ভেবে  
সেটা নিজেদের কাছে রাখি আমরা।’

‘নিরাপত্তার দোহাই এখন আর কোন কাজে আসবে না!’ চড়া  
গলায় বলল ইভেনকো রুস্তভ। ‘আমেরিকান জাহাজে উঠে পড়েছি,  
কারও বাপের সাধ্যও নেই টিউবটা কেড়ে নিতে আসে। দিন,  
আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে!’

‘অবশ্যই, মি. রুস্তভ,’ বলল রানা, তাকাল নিয়াজের দিকে।  
‘নিয়াজ, টিউবটা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দাও।’

পারকার পকেট থেকে লম্বা টিউবটা বের করল নিয়াজ।  
চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বাড়িয়ে দিল রুশ বিজ্ঞানীর দিকে।  
প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল ইভেনকো রুস্তভ।

‘মাইক্রোফিল্টা ভেতরে আছে তো?’ কঠিন সুরে প্রশ্ন করল

সে।

‘আছে।’

‘চোখে দেখে তারপর বিশ্বাস করব,’ গজগজ করতে করতে  
টিউবটা উল্টো করে ধরে কয়েকটা ঝাঁকি দিল রুস্তভ। এক টুকরো  
কোর পড়ল তালুতে, তারপর বেরিয়ে এল খারটি ফাইভ  
মিলিমিটার ফিলের একটা অংশ।

‘আশা করি আপনার জিনিস আপনি বুঝে পেয়েছেন, মি.  
রুস্তভ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘মাইক্রোফিলের নিচে আরও কোর ছিল, সব ঠিক আছে তো?  
এই কোর মহামূল্যবান...’

‘ঝাঁকি দিন, না থাকলে বেরাবে না,’ নরম সুরে বলল রানা।

রানার দিকে কটমট করে তাকালেন রুশ ওশেনোগ্রাফার।  
‘কেউ আপনার পরামর্শ চেয়েছে?’ ক্যাপটেনের দিকে ফিরলেন  
তিনি। ‘মি. গোল্ডম্যান, আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই  
আমি, প্লীজ। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। এই ভদ্রলোকদের  
দেখতে দিতে চাই না।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। ‘ব্যাপারটা কেমন  
হলো? মি. রানা আপনাকে এই আর্কটিক নরক থেকে উদ্ধার করে  
আনলেন, অথচ তাকেই আপনি অবিশ্বাস করছেন! ব্যাপারটা কি  
বলুন তো?’

ফোড়ন কাটল নিয়াজ, ‘আবার শর্ত দিয়েছিলেন, শুধু যদি  
মাসুদ রানাকে পাঠানো হয় তবেই তিনি আমেরিকায় পালিয়ে  
আসবেন। মাসুদ রানা নাকি ওনার হিরো...’

হঠাৎ খয়েরি দাঁত বের করে হাসল ইভেনকো রুস্তভ। ‘এখনও

আমি বিশ্বাস করি, মি. রানা অসমসাহসী যুবক। শক্ত, প্রায় অসম্ভব কাজ দিয়েও তার ওপর নির্ভর করা যায়। সেজন্যেই শর্ত দিয়েছিলাম, মি. রানাকে পাঠালে আমি আসব, নাহয় আসব না। কিন্তু তারমানে এই নয় যে উনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কি করে হন! মিগ-একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গেলেন উনি, সরাসরি আঘাত করলেন সি.আই.এ. ও জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে। ইসরায়েলের একজন শত্রু আমার বন্ধু বা শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না! ক্যাপটেন, দয়া করে আপনি ওদেরকে বলুন...’

‘তারচেয়ে আমরাই বরং চার্টরমে গিয়ে কথা বলি?’ রুস্তভকে নিয়ে চার্টরমে চলে গেলেন ক্যাপটেন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ছোট করে মাথা ঝাঁকাল নিয়াজ।

বিনয়, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ‘কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলে জাহাজে বিস্ফোরক আছে কিনা...’

‘পরে,’ বিড়বিড় করে বলল রানা। সিকোরস্কি আর তার পাইলট শেরম্যানকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে ও। এই শেষ ফ্লাইটে পাঠাবার প্রস্তাবটা ওর ছিল, ফিরে এসে জাহাজে ল্যান্ড না করা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। দু’মিনিট পর ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপটেন, আপদটাকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। রানার অনুরোধে বো-র কাছে শক্তিশালী একটা সার্চলাইট জ্বালার নির্দেশ দিলেন তিনি। চোখ ঝাঁখানো আলোর একটা স্তম্ভ প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেল আকাশের দিকে।

সিকোরস্কি এখনও অনেক দূরে, দক্ষিণের অন্ধকার আকাশে

খুদে একটা ব্লিপ মাত্র।

‘জাহাজগুলোকে দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে...’

‘এখনও যদি ওগুলো উত্তরের পথে থাকে, দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই,’ নিয়াজকে বলল রানা। ‘সাত সাতটা জাহাজ, তাই না?’

‘যেখানে খুশি থাক, আমি গ্রাহ্য করি না,’ ভারী গলায় বললেন গোম্বম্যান। ‘খোলা সাগরে রয়েছে আমরা, ওদের নাকের সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাব।’

ক্যাপটেনের অগোচরে কাফম্যানের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। দু’জনের চেহারাতেই সন্দেহের ছায়া। কাফম্যানও ভাবছে রাশিয়ানরা ঝামেলা করতে পারে।

চাঁদের আলোয় তেলের মত চকচক করছে সাগরে শান্ত পানি। এঞ্জিনের আওয়াজ ভারী, গমগমে; ধীরগতিতে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। কুয়াশা রয়েছে, তবে দূরে দূরে, আইসবার্গগুলোর চারদিকে। সিকোরস্কির ব্লিপ এক সময় কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল। একটু পর শোনা গেল এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন।

স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। একটা সার্চলাইটের আলো সবচেয়ে কাছের আইসবার্গের দিকে তাক করা। ভাসমান বরফের পাহাড় বলে মনে হলো না, বিশাল আকৃতি নিয়ে এ যেন একটা দুর্গ। দুর্গের কাঁধের কাছে লম্বা বারান্দা, বারান্দায় সার সার গরাদহীন জানালা। বারান্দার ওপরে আর নিচে বেশ কিছু সুড়ঙ্গ দেখা গেল, বরফ-পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিয়াজ তাকিয়ে আছে সেদিকে।

‘কি বিশাল, তাই না? গোস্ট বার্গ নয় তো?’

‘প্রার্থনা করো ভাই, তা যেন না হয়,’ আঁতকে ওঠার ভান করে বলল রানা। ‘গোস্ট বার্গ হলে তোমার একটা ধমকেই হুঁমুড় করে ভেঙে পড়বে।’

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাটা, ভাবল নিয়াজ, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস করানো কঠিন। কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, মানুষের গলার আওয়াজে ধসে পড়বে, সত্যি অবিশ্বাস্য। ব্যাপারটা এক্সিমোরা জানে, ভেলা নিয়ে গোস্ট বার্গকে পাশ কাটাবার সময় ঠোঁটে তালা দিয়ে রাখে তারা, জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলে না। গোস্ট বার্গ যত বিশালই হোক, তার ভিত আর কাঠামো যেমন ভঙ্গুর তেমনি দুর্বল। লক্ষ লক্ষ টন বরফ স্তূপ হয়ে আছে, ছুঁই ছুঁই করছে আকাশ, কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা-দমকা একটা বাতাসের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হতে পারে।

দুর্গের চূড়ায় আলোর খেলা দেখছে রানা। হঠাৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না।

আইসবার্গের চূড়া বিস্ফোরিত হলো।

এই ছিল, এই নেই-কাঁধ থেকে মাথাটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আইসবার্গের ওপরের অংশ সাদাটে বরফ-কণায় ঝাপসা হয়ে গেল। বিস্ফোরণের আওয়াজ চারপাশের আইসবার্গের ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। বরফের বড় বড় টুকরো আলোর স্তম্ভ থেকে খসে পড়ল সাগরে। চূড়ার অন্তত বিশ-পঁচিশ ফিট ধসে পড়েছে। গোল্ডম্যান দ্রুত নির্দেশ দিলেন, পোর্টের দিকে কয়েক ডিগ্রী ঘুরে গেল জাহাজ।

‘গোস্ট মনস্টার যাই হোক, মুণ্ডু বিস্ফোরিত হওয়ায় বার্গ মহাশয় আমাদের দেখতে পাবে না, আশা করি নিরাপদেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব।’

নিয়াজের কথা শেষ হতেই শেরম্যানের সিকোরস্কিকে দেখা গেল। চাঁদের আলোয় ঘুরন্ত রোটরের চাকতি আকৃতির ঝিলিক পরিষ্কার ধরা পড়ল চোখে। বোধহয় সিকি মাইলেরও কম দূরে, অনেক উঁচু থেকে দুশো ফিটে নামল, সোজাসুজি কিউটের দিকে এগিয়ে আসছে। পোর্ট সাইডে রয়েছে মুণ্ডুহীন আইসবার্গ, সেটার কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে হবে শেরম্যানকে।

সিকোরস্কি ল্যান্ড করার সময় এঞ্জিন মছুর করতে হবে, নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গের কোমর পেঁচিয়ে থাকা কুয়াশা ভেসে গেছে, ভিতের কাছ থেকে কুয়াশা ভেদ করে খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে বিশাল বরফের পাঁচিল।

ব্রিজে সবাই চুপচাপ, শুধু এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

মাঝখানে একবার নিস্তব্ধতা ভাঙল নিয়াজ, ‘নিশ্চয়ই রিগাকে দেখতে পেয়েছে পাইলট।’ প্রকাণ্ড আইসবার্গ এক কথায় বোমার মত বিস্ফোরিত হলো। ভেতরের চাপ সহিতে না পেরে স্রেফ বেলুনের মত ফেটে গেল। কিন্তু এবার শুধু মাথার দিকটা নয়, গোটাটাই অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে জাহাজের প্রতিটি লোকের কানে তালা লাগল, শক ওয়েতে থরথর করে কেঁপে উঠল ব্রিজ। ওভারহেড কম্পাসের আবরণ ভেঙে গেল, হেলমসম্যানের মাথায় বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল কাঁচ। কোর্স ঠিক রাখার জন্যে ছুটে গিয়ে হুইল আঁকড়ে ধরলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিরে আসতে লাগল বিস্ফোরণের আওয়াজ, প্রতিটি প্রতিধ্বনি নাড়া দিয়ে গেল কিউটকে। বার্গটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে পাঁচশো ফিট ওপর দিকে শুধু ফেনা, বাষ্প আর বরফ কণা দেখা গেল। সব যখন সী লেভেলে নেমে এল, টগবগে ফুটন্ত পানি ছাড়া দেখার কিছু পাওয়া গেল না। আইসবার্গ অদৃশ্য হয়েছে, সেই সাথে অদৃশ্য হয়েছে শেরম্যানের সিকোরস্কি।

হেলমসম্যানকে হুইল দিয়ে জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। বিষণ্ণ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি। সাগরকে সাগর বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ছোট একটা লেক-সবগুলো দিকে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আইসবার্গ। কোনটা দূরে, কোনটা তত দূরে নয়।

‘বিস্ফোরণের সময় ঠিক মাথার ওপর ছিল শেরম্যান...’

রানাকে থামিয়ে দিয়ে গোল্ডম্যান বললেন, ‘জানি।’ অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছেন তিনি। ‘ডিয়ার গড...শেরম্যান!’ পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তিনি তাকালেন না। ‘চমৎকার! আর কোন ধারণা যদি মাথায় থাকে, মি. রানা, ঢোক গিলে নিচে পাঠিয়ে দিন।’

ক্যাপটেনের কথায় রানা যে দুঃখ পেল তা নয়। মনটা শুধু আরেকটু খারাপ হয়ে গেল। নিয়াজ আর বিনয়কে ইশারায় ডাকল ও, নেমে এল ব্রিজ থেকে।

শেরম্যানের আকস্মিক মৃত্যু হতভম্ব করে দিয়েছে রানাকে। কিন্তু তারচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছে ও সিকোরস্কি ধ্বংস হওয়ায়।

রাডার নেই।

রেডিও থেকেও নেই। রেডিও-জ্যামিংয়ের ফলে একেজো হয়ে আছে সেট। কোন সিগন্যাল পাবে না, পাঠাতেও পারবে না।

বাইরের দুনিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল হেলিকপ্টারটা, গেল সেটাও।

দক্ষিণে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, তাকে বাদ দিলে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওরা।

এক ঘণ্টা পর আইসবার্গের সাথে ধাক্কা খেলো কিউট।

## নয়

‘একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, সাথে টাইমার মেকানিজম, আর কয়েকশো ফুট কেব্ল...’

‘কোথায় রাখে ওরা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বললে বিশ্বাস করবে না-মেইন ডেকের একটা কেবিনে।’ নিঃশব্দে হাসল বিনয়। ‘সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ, কাফম্যান নিজেই স্বীকার করল। কিন্তু দরকারের সময় অতগুলো সিঁড়ি আর মই বেয়ে ওপরে তোলা ঝামেলার ব্যাপার, তাই...’

‘কাজের লোকদের ভাবনা-চিন্তাই আলদা,’ কাফম্যানের প্রশংসা করল রানা। ‘দফতরে বসে কর্তারা নিয়ম বেঁধে দেয় ঠিকই, কিন্তু অভিযানে স্টাফদের সাথে নিয়মগুলো সঙ্গী হয় না।’

রানার কেবিনে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে তিনজন। অফিসার্স মেসে ডেকে না পাঠিয়ে লাঞ্চ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তারমানে সম্ভবত কষ্টার্জিত জনপ্রিয়তা আবার হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

‘আমাদের বোধহয় একঘরে করা হয়েছে,’ কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বলল নিয়াজ। ‘শেরম্যান মারা যাওয়ায় তোমাকে দায়ী করছে ওরা, রানা।’

‘ক্যাপটেনকে অসম্ভব মনে হলো,’ বলল রানা। ‘আসলে দুশ্চিন্তায় মেজাজ বিগড়ে আছে তাঁর। রুশ জাহাজগুলোকে নিয়ে আমাদের চেয়ে উনি কম উদ্বিগ্ন নন।’

‘আমার ভয় রিগাকে,’ বলল নিয়াজ।

‘আমারও,’ সমর্থন করল রানা। ‘ষোলো হাজার টন, তাই না? ট্রলারগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু...কি ব্যাপার, বিনয়? তোমার হাতে কি ওটা?’

বিনয়ের তালুতে একটা চাবি। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের চাবি। খোলা সাগরে রয়েছে, কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না, ক্যাপটেনের এই ধারণার সাথে একমত নয় কাফম্যান। ওকে সাথে নিয়ে কেবিনটায় ঢুকেছিলাম আমি। একজোড়া শোল্ডার-প্যাকে তোলা হয়েছে জেলিগনাইট, যদি প্রয়োজন হয়...’

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো জাহাজ, মনে হলো বান্ধহেড বিস্ফোরিত হবে। পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়ল কেবিন, পরমুহূর্তে সিধে হলো, তারপরই আবার কাত হলো স্টারবোর্ডের দিকে। প্রতি মুহূর্তে খরখর করে কাঁপছে জাহাজ, সেই সাথে আইসবার্গের ওপর জাহাজের চাপে বিকট শব্দে ভাঙছে বরফ।

আবার জাহাজ সিধে হতে শুরু করল। দরজার দিকে ছুটল নিয়াজ। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলল। বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, চিৎকার। পোর্ট সাইড থেকে বোমা ফাটার মত আওয়াজ এল, বরফ ভাঙছে। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল

আইসব্রেকার। এঞ্জিন নামমাত্র সচল, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বালবগুলো স্তান হয়ে গেল, প্রায় নিভু নিভু-কয়েক সেকেন্ড পর আবার জ্বলে উঠল সবটুকু উজ্জ্বলতা নিয়ে।

‘বরফে আটকে গেছি,’ গুঙিয়ে উঠল বিনয়।

দরজার কাছ থেকে নিয়াজ বলল, ‘যদি না গুঁতো মেরে থাকে রিগা...’

‘সম্ভবত আইসবার্গে ধাক্কা খেয়েছি,’ গায়ে পারকা চড়াতে চড়াতে বলল রানা। ‘চলো ব্রিজে যাই।’

নির্জন কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটল রানা, পারকার বোতাম লাগাবার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় থামল। ওপরের ডেক থেকে লোকজনের শোরগোল ভেসে এল। আতঙ্কটা কি নিয়ে বোঝা গেল না। ধাপগুলো বেয়ে ওপরে উঠল ও, দরজা খুলতেই ওকে গ্রাস করল সাদাটে কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর কালো ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করছে। কি ঘটছে আন্দাজ করা অসম্ভব। পোর্ট রেইলের সামনে দৃষ্টি চলে না। এমনকি পোর্ট রেইলটা পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা। হোঁচট খেতে খেতে মইয়ের দিকে এগোল ও। কুয়াশার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি ছুটে এসে ধাক্কা খেলো গায়ে। হিগিন।

‘আমরা গঁথে গেছি!’ আতঙ্কে কর্কশ শোনা হিগিনের গলা।

‘ডুবছি?’ রানার জ্যাকেটের তলায়, বগলে, টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা খুদে প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর আছে নিয়াজের দেয়া মাইক্রোফিল্ম। পারকার গায়ে হাত বুলিয়ে প্যাকেটটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল, নিজের অজান্তেই।

‘গড নোজ...’

মই বেয়ে উঠছে রানা, প্রায় মাথায় পৌছে গেছে, এই সময় বো-র সামনে কুয়াশায় আলোড়ন উঠল। ছাঁৎ করে উঠল বুক। হিমালয়ের মত কি যেন একটা, চোখে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল আবার। মনে হলো মাত্র কয়েক গজ সামনে।

সাবধানে ব্রিজে ঢুকল রানা, পিছু পিছু মই বেয়ে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। ব্রিজের সামনের দিকে, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গোল্ডম্যান। এরইমধ্যে হিম হয়ে গেছে ভেতরটা। হেলমসম্যান হুইল ধরে রয়েছে, যদিও জাহাজ কোথাও যাচ্ছে না।

এতক্ষণে খেয়াল হলো রানার, ডানে বা বামে নয়, জাহাজ ঢালু হয়ে রয়েছে পিছন দিকে। আরেকটা জানালা খুলে পোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকটিং মেট। সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

‘এদিকে একবার আসুন, মি. রানা,’ ডাকলেন তিনি। নরম সুর। ‘এরচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে না—আমরা একটা বাগের ঢালে উঠে পড়েছি।’

অবস্থাটা বুঝতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। কুয়াশার ভেতর দিয়ে খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিল কিউট, সন্ন্যাসী একটা ফাঁক গলে বিশাল এক আইসবার্গের পেটের ভেতর, ছোট একটা বে-তে ঢুকে পড়েছে। ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে, বে-র এক মাথা থেকে আরেক মাথায় আসতে মিনিট খানেক লেগেছে জাহাজের। আইসবার্গের ঢাল ক্রমশ নিচু হয়ে বে-র পানির তলায় তলিয়ে গেছে। খোলার সাথে ডুবন্ত ঢালের প্রথম ঘষা লাগার পরপরই ক্যাপটেন সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে

জাহাজের সামনের অংশ পানি থেকে উঠে পড়েছে।

কিউটের সামনের অংশ পানির ওপর, পিছনের অংশ পানিতে। এঞ্জিন বন্ধ করেও কোন লাভ হয়নি, পিছলে নেমে আসেনি বো। শুধু বো নয়, খোলার এক তৃতীয়াংশ পানির ওপর জেগে থাকা ঢালে উঠে পড়েছে। ছোট বে-র চারদিকে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে কুয়াশা আলোড়িত হলে আকাশ-ছোঁয়া আইসবার্গের খাড়া, মসৃণ পাঁচিল দেখা যায়।

‘যীশাস!’ ব্রিজের পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল কাফম্যান। ‘এর ভেতর আমরা ঢুকলাম কিভাবে!’

হুড়োহুড়ি করে পিছনের জানালার সামনে চলে এল সবাই। চোখ পিট পিট করলেন গোল্ডম্যান। আপাতত সামান্য একটু সরে গেছে কুয়াশা, জাহাজের পিছনে ছোট বে-র ফাঁকটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই ফাঁক গলেই আইসবার্গের পেটের ভেতর সঁধিয়েছে কিউট। ফাঁকের দু’দিকে আইসবার্গের উঁচু, চওড়া পাঁচিল। তাজ্জব ব্যাপার, এরকম সন্ন্যাসী একটা ফাঁক গলে কিভাবে ভেতরে ঢুকল জাহাজ! এক মুহূর্ত পরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল ফাঁকটা।

‘মাপজোকে যদি ভুল না হয়, আর ভাগ্য যদি বেঈমানী না করে,’ চিন্তিতভাবে বললেন ক্যাপটেন, ‘আবার সাগরে বেরোতে পারব আমরা। জাহাজের বেশিরভাগ অংশ এখনও পানিতে, প্রপেলার উল্টোদিকে ঘোরালাে ঢাল থেকে নেমে আসবে।’ বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ‘এমন উৎকট বিপদে কেউ কখনও পড়েছে!’

‘বরফ নেই, আপনি জানেন?’ রানাকে জিজ্ঞেস করল

কাফম্যান। ‘ঢালের সাথে খোলের ধাক্কা লাগতেই বাঁকি খেয়ে খসে পড়েছে সব। এদিকে আসুন, দেখে যান।’

পোর্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ঢাল থেকে সরে গেছে কুয়াশা। ডেকে ওঠার সময় পোর্ট রেইল দেখতে পায়নি ও, কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। নেই, দেখবে কোথেকে? সংঘর্ষের ধাক্কায় পোর্ট সাইডের রেইল সহ কয়েকশো মণ বরফ ঢালের ওপর ছিটকে পড়েছে। রেইলের ভাঙা টুকরো-টাকরা ঢালের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল। ঢালে কয়েকজন ফার মোড়া লোককেও দেখল রানা। রশির মই বেয়ে নেমেছে ওরা। কুয়াশার ভেতর ভূতের মত দেখাল ওদেরকে। ক্যাপটেনের নির্দেশে ঘুরেফিরে দেখছে ওরা, আইসবার্গটা কি ধরনের জানতে হবে।

মই বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি জাহাজে উঠে এল। চিনতে পারল রানা। নিয়াজ।

ব্রিজে ফিরে এসে নিয়াজ বলল, ‘না, গোস্ট বার্গ নয়...’

‘ঠিক জানো?’

‘অবশ্যই। বিনয় আর আমি যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠে দেখেছি—কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই, একেবারে নিরেট বরফ...’

‘সামনেটা এখন দেখা যাচ্ছে!’ ক্যাপটেনের উত্তেজিত গলা শুনে ব্রিজের সামনে ছুটে এল সবাই। বিরতিহীন মোচড় খেয়ে চলেছে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে দু’এক মুহূর্তের জন্যে ভেসে গিয়ে কোন কোন দিক উন্মোচিত করছে। বো-র সামনে থেকে কুয়াশা সরে যাওয়ায় আইসবার্গের বিশালত্ব ফুটে উঠল ওদের চোখের

সামনে। বো-র কাছ থেকে একশো গজ দূরে শেষ হয়েছে ঢাল, তারপর আইসবার্গের পাঁচিল খাড়া উঠে গেছে—কত উঁচু পর্যন্ত কে জানে! ওপর দিকের কুয়াশাও এবার অনেকটা সরে গেল, মনে হলো ওরা যেন বরফ ঢাকা হিমালয় দেখছে। চূড়া কত উঁচুতে বোঝার উপায় নেই, কারণ ওপরের দিকটা সাদাটে কুয়াশায় বাপসা হয়ে আছে।

নিখাদ, নিরেট বরফের প্রকাণ্ড দ্বীপে আটকা পড়েছে ওরা। লম্বায় দ্বীপটা আধ মাইল বা তারও বেশি হতে পারে।

‘লোকজনদের ডেকে নাও,’ কাফম্যানকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। ‘লাউডহেইলার ব্যবহার করো। চেষ্টা করে দেখব সাগরে বেরুনো যায় কিনা।’

‘এখনি বেরুতে চাইছেন?’ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...’, হঠাৎ থেমে গিয়ে ঝট করে রানার দিকে ফিরলেন গোল্ডম্যান। ‘চমৎকার কোন আইডিয়া, মি. রানা?’ তাঁর চেহারা ও কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল।

‘আইসবার্গের পেটে আটকা পড়ায় একদিক থেকে সুবিধেই হয়েছে,’ বলল রানা। ‘বুঝতে পারছেন না?’

‘আপনি যে অতি বুদ্ধিমান, সে আমি প্রথমেই টের পেয়েছি,’ গম্ভীর সুরে বললেন ক্যাপটেন। ‘কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।’

‘বলছিলাম কি,’ আরও নরম সুরে বলল রানা, ‘এখানে তো বেশ নিরাপদেই রয়েছে আমরা। সাগরে না বেরুলেও তো চলে...’

‘এভাবে আটকা পড়ে থাকব? কোথাও যাব না? আপনার বুঝি বাড়ি-ঘর নেই?’

‘কে বলল আমরা যাচ্ছি না?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। ‘আমরা থেমে নেই, যদিও কোথাও যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আইসবার্গটাকে দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিদিন বিশ মাইল গতিতে এগোচ্ছি আমরা...’

‘নটিক্যাল রেকর্ড ভাঙছি কি?’ ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘তার কি কোন দরকার আছে? ঘণ্টা কয়েক আগে শেরম্যান রিপোর্ট করেছিল, সোভিয়েত ট্রলারগুলো আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে আছে, আর রিগা আছে বিশ মাইল দক্ষিণে। এতক্ষণে আরও কাছে চলে এসেছে ওগুলো। আইসবার্গটা কিউটের জন্যে বিরাট একটা বাহনের কাজ করছে। যদি বার্গের সাথে থাকি, রাতের কোন এক সময় সোভিয়েত জাহাজগুলোকে পাশ কাটাব আমরা।’

‘বার্গের সাথে থাকা মানে আটকা পড়ে থাকা, নড়াচড়া করা যাবে না...’

‘কিছু আসে যায়? ওরা যদি আমাদের দেখতে না পায়? রিগায় আধুনিক রাডার রয়েছে বটে, কিন্তু আমরা কাছাকাছি পৌঁছলে স্ক্রীনে কী দেখতে পাবে ওরা? স্রেফ আরেকটা আইসবার্গ।’

‘বাহন হিসেবে আইসবার্গ?’ উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে ফেলল কাফম্যান। ‘ওয়ান্ডারফুল...’

‘ফুল!’ অ্যাকটিং মেটকে গাল পাড়লেন ক্যাপটেন। এঞ্জিন রুমের সাথে কথা বলার জন্যে ভয়েস-পাইপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কথা শেষ করে কাফম্যানের দিকে ফিরলেন। ‘চীফ এঞ্জিনিয়ার বলছে, এঞ্জিন রুমের কোথাও তেমন কোন ক্ষতি

হয়নি। গজগুলোর কাঁচ ভেঙে বা ফেটে গেছে, গরম বাষ্প ঝলসে গেছে একজনের হাত, ব্যস। ওদের ধারণা এঞ্জিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি, তবে চেক করে দেখব আমি। লোকগুলোকে ডেকে নিতে বলেছি, মনে আছে?’

‘এঞ্জিন চালু করবেন?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। ‘কাজটা উচিত হবে না। রিগার হাইড্রোফোনে ভাইব্রেশন ধরা পড়বে।’

রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কাফম্যানকে ক্যাপটেন জানানলেন, ‘আর তারপর, পিছু হটব আমরা, যে-পথ দিয়ে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যাব সাগরে।’

ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল নিকিতা জুনায়েভ। ‘কিউট খুব কাছে চলে এসেছে, কর্নেল কমরেড! হাইড্রোফোনে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে!’

ট্রাভকিনকে পাশে নিয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জুনায়েভকে বলল, ‘শান্ত হও, জুনায়েভ। পাঁচ মিনিট পর পর রিপোর্ট করবে আমাকে-যাও!’

জুনায়েভ চলে যেতে ধীরে ধীরে কর্নেলের দিকে ফিরল ট্রাভকিন। ‘এখন তাহলে আবার এঞ্জিন চালু করতে পারি। আপনাকে আগেই বলেছি, এদিকের পানিতে পাওয়ার ছাড়া ভেসে থাকা সাংঘাতিক বিপজ্জনক...’

‘আমি মারা গেলে,’ কোমল সুরে বলল কর্নেল।

‘তারমানে?’

‘তার আগে এঞ্জিন চালু করা যাবে না। সর্বাধুনিক রাডার রয়েছে আপনার। ব্যবহার করুন! নিঃশব্দে ভেসে যেতে হবে



আমাদের, কারণ তাহলেই শুধু হাইড্রোফোন অপারেটররা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ ঠিকমত শুনতে পারে। কিউটের সঠিক পজিশন জানতেই হবে আমাকে।’

পাইপটা মুখে তুলে জানালার সামনে চলে এল কর্নেল। একা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাপটেন ট্রাভকিন। ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে চোখ রেখে কুয়াশা আর সাগরের আলাদা একটা জগৎ দেখতে পেল কর্নেল। ওখানে কোথাও, দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে আইসবার্গ। ঠিক এই মুহূর্তে রাডার অপারেটররা দৈত্যাকৃতি বার্গগুলোর কোর্স জানার চেষ্টা করছে। গ্রীনল্যান্ড কারেন্টের সাথে বিরতিহীন দক্ষিণ দিকে ভেসে চলছে ওগুলো।

সবাই এখন জাহাজে। এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ব্রিজে যার যেখানে থাকার কথা সবাই উপস্থিত। প্রতিটি লুক-আউট পয়েন্টে লোক পাঠানো হয়েছে। আইসবার্গ থেকে নামার জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ।

পিছনে হাত বেঁধে জানালা দিয়ে কিউটের পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান। উদ্বেগ আর উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি, সমস্ত শরীর টান টান হয়ে আছে। উত্তেজনা বোধ করা স্বাভাবিক, কারণ একই সাথে দুটো বিপজ্জনক কাজ সারতে যাচ্ছেন তিনি। বরফের ঢাল থেকে কিউটকে নামাবেন, তারপর বে-র দুই বাহুর মাঝখানের সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন সাগরে।

ক্যাপটেন আর কাফম্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানাও জাহাজের পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। বে ছাড়িয়ে আরও দূরে

চলে গেছে ওর দৃষ্টি, কুয়াশার ভেতর। বার বার আড়চোখে রানার দিকে তাকাল কাফম্যান। ক্যাফটেন যা করতে যাচ্ছেন তাতে তার সমর্থন নেই, কিন্তু অ্যাকটিং মেট হিসেবে ক্যাপটেনের সাথে তর্ক করাও তার সাজে না।

এঞ্জিনগুলো আরও শক্তি সঞ্চয় করল। একটু পরই নড়ে উঠবে জাহাজ। পিছু হটবে। প্রপেলার যদি পারে, বরফের ঢাল থেকে নামিয়ে আনবে জাহাজকে।

স্টার্নে, লুক-আউট পয়েন্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল নিয়াজ। হঠাৎ দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল সে।

‘স্টপ ইট, ফর গডস সেক!’ তারস্বরে চিৎকার করল সে। ‘বন্ধ করুন, এঞ্জিন বন্ধ করুন!’

‘কেন?’ বোমার মত ফাটলেন যেন ক্যাপটেন।

‘বাইরে তাকান,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘কুয়াশার ভেতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে আসছে!’

‘কি?’ চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন।

‘জানি না,’ রুদ্ধশ্বাসে বলল নিয়াজ। ‘বিরিট বড় কি যেন একটা...’

‘আমি জানি কি,’ ভারী গলায় বলল রানা। ‘মি. গোল্ডম্যান, প্ল্যানটা বাতিল করুন। জাহাজ নড়লে বিপদ বাড়বে...’

‘ঈশ্বর বাঁচাও,’ বিড়বিড় করে উঠল কাফম্যান। ‘রিগা! রিগা আসছে আমাদের ধাক্কা...’

কিন্তু না। রিগা নয়। রিগা মাত্র ষোলোশো টনী জাহাজ, কিন্তু কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা যেটা এগিয়ে আসছে তার ওজন কয়েক লক্ষ টন, বাইশতলা একটা বিল্ডিংয়ের মত উঁচু। সচল

একটা বিল্ডিং, ওপরের অংশ যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কিউটের মাস্তুলকে ছাড়িয়ে গেছে। ধীর গতিতে কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসছে। ভয়াল-দর্শন এক আইসবার্গ।

স্টার্নের লুক-আউট পয়েন্ট থেকে লোকগুলো আত্ননাদ করে উঠল। জানালার বাইরে তাকালেন গোল্ডম্যান। বাকি সবাই তাঁর গা ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

সচল পাহাড় ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল ওরা। কুয়াশা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে বে-র দিকে। বে থেকে এখনও অনেকটা দূরে ওটা, কিন্তু তবু মনে হলো মূর্তিমান বিভীষিকার চূড়া, যতটুকু দেখা যায়, ঝুঁকে রয়েছে ওদের মাথার ওপর। বে-র দুই বাহুর মাঝখানে সরু ফাঁকটা বুজে এল।

মাইকে কথা বললেন গোল্ডম্যান। বিপদ টের পেয়ে সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ‘হোল্ড অন টাইট! হোল্ড অন টাইট! মেজর কলিশন কামিং!’

খপ্প করে রানার কনুই খামচে ধরল কাফম্যান, ব্যথায় উচ্চ করে উঠল রানা। ‘মি. রানা, বে-র ভেতর দিকে তাকান, কি ওটা?’

প্রথমে জিনিসটাকে চেনা গেল না। পানির তলা দিয়ে ছুটে আসছে, উঁচু পিঠ জেগে রয়েছে পানির ওপর। হাঙর নয়, তিমি নয়, তবে কি সাবমেরিন?

‘আভারওয়াটার স্পার!’ ফিসফিস করে বলল রানা।

দুশো ফিট উঁচু আইসবার্গের প্রসারিত পায়ের পাতা বলা যেতে পারে, পানির তলা দিয়ে ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে বে-তে। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে এগিয়ে আসছে। আকৃতিটা আন্দাজ করার

চেষ্টা করল রানা, ডায়ামিটারে পঞ্চাশ ফিটের কম হবে না।

পায়ের পাতার পিছু পিছু আসছে শরীরটা। ব্রিজের লোকেরা রেইল আঁকড়ে ধরল। নিচে, ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোও অবশিষ্ট রেইল ধরে তৈরি হলো আত্নরক্ষার জন্যে। রানার মাথা সামান্য একটু নড়ে উঠল, আকাশ থেকে কি যেন একটা পড়তে দেখল ও।

ছোটখাট একটা বাড়ি খসে পড়ল যেন। পড়ল নবাগত আইসবার্গের মাথার দিক থেকে। অথচ এই আইসবার্গের সাথে বাইশতলা এখনও ধাক্কা খায়নি। বে-র বাইরে, সরু ফাঁকটার কাছাকাছি পড়ল সেটা, মিনার আকৃতি নিয়ে আকাশের দিকে লাফ দিল পানি। ‘খোদা!’ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘ওটা গোস্ট বার্গ...’

তারমানে, গোটা পাহাড়টা, কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, ধাক্কা লাগার মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। ঢাকা পড়ে যাবে বে, কবর হয়ে যাবে কিউটের। কাঠের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে ধাক্কা লাগার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। প্রকৃতির খেলা, ওদের কোন ভূমিকা নেই। দুই আইসবার্গ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে, ওরা শুধু যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্যাপটেন এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল বাইশতলা, ওটার বিশালত্ব চাক্ষুষ করার সুযোগ মিলল। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই দুই আইসবার্গ স্পর্শ করল পরস্পরকে।

সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে মনে হলো কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। শক ওয়েভের ধাক্কায যে যেখানে ছিল, ছিটকে পড়ল সবাই মেঝেতে। প্রথম ঝাঁকিতে সাড়ে ছয় হাজার টন কিউট লাফ দিয়ে উঠল যেন। জাহাজের প্রতিটি কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল, বান বান

শব্দে নাচতে শুরু করল পেয়ালা, বাসন, চামচ থেকে শুরু করে শাবল, কোদাল, ইত্যাদি সব। বন বন করে ঘুরতে শুরু করল কম্পাসের কাঁটা। ডেক থেকে ছিটকে পানিতে পড়ল তিনজন ত্রু, সাথে সাথে মারা গেল তারা। তারপর, হঠাৎ করেই, সব শব্দ থেমে গেল, স্থির হয়ে গেল জাহাজ।

ভৌতিক নিস্তব্ধতা নামল।

সংঘর্ষের আগেই বন্ধ করা হয়েছিল এঞ্জিন। কেউ কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। বে থেকে বেরবার সরু পথের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ফাঁকটার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। বাইশতলার নিরেট পাঁচিল বন্ধ করে দিয়েছে সেটা। বে পরিণত হয়েছে খাঁড়িতে। যেন একটা বোতলের ভেতর আটকা পড়েছে ওরা, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। ছোট একটা লেকে রয়েছে কিউট, যে লেক থেকে বেরবার কোন পথ নেই। বিশাল বাহনের ভেতরে বন্দী ওরা, ভেসে চলেছে দিনে বিশ মাইল গতিতে।

সংঘর্ষ ঘটলেও, ধসে পড়েনি গোস্ট বার্গ।

রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন মানুষের গলা শুনে ভারি অবাক হয়েছে।

‘আর কোন উপায় নেই, ক্যাপটেন,’ বলল রানাই। ‘বার্গের সাথেই ভেসে যেতে হবে। কোন বিকল্প নেই।’

‘নেই,’ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। ‘শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া। অপেক্ষার শেষ হবে শালার আইসবার্গ মাথার ওপর ভেঙে পড়লে, তাই না?’

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘তাই।’

‘ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে!’ আবার দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল জুনায়েভ। সন্তুষ্ট, বিমূঢ় চেহারা, হাঁপাচ্ছে।

টু-শব্দ না করে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল বলটুয়েভ, হাইড্রোফোন সেকশনে নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জানবে।

কর্নেলকে ঢুকতে দেখে ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে মুখ তুলল অপারেটর।

‘জুনায়েভ বলল, তুমি নাকি আর কিছু শুনতে পাচ্ছ না? তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট নষ্ট?’

‘না। ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ইকো-ই আমরা পাচ্ছি না।’

‘কত দূরে?’

‘এক মাইল, কাছেও হতে পারে...’

‘দশ মিনিট আগেও তো তাই ছিল!’ জুনায়েভের দিকে কটমট করে তাকাল কর্নেল। ‘ব্যাপারটা কি? দশ মিনিট আগে এক মাইল দূরে ছিল কিউট। কয়েক সেকেন্ড আগে পর্যন্ত ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে। অথচ এখনও ওরা এক মাইল দূরে! কিভাবে সম্ভব? আমরা ভেসে আছি, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। মাঝখানের দূরত্ব আরও কমে আসার কথা!’

‘কিছু ঘটনা সত্যি...’

‘হতে পারে না, টেকনিক্যালি ইমপসিবল!’ মারমুখো হয়ে উঠল কর্নেল।

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছেও বিদঘুটে লাগছে...’

বুকে হাত বেঁধে অগ্নিদৃষ্টি হানল কর্নেল। ‘এমন নয় যে আমরা

যেমন কারেন্টের সাথে ভেসে চলেছি, ওরাও তেমনি ভেসে চলেছে। তা যদি হত, দূরত্ব একই রকম থাকত, কমত না বা বাড়ত না। কিন্তু ওরা শুধু স্রোতের টানে চলছে না, আমরা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি!’

‘জী, পরিষ্কার,’ আমতা আমতা করে বলল অপারেটর। ‘এক মিনিট আগেও...’

‘তাহলে ব্যাখ্যা করো!’ মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল অপারেটর।

‘বুঝতে পারছি না, কি ব্যাখ্যা করব...’

সমস্ত রাগ আর উত্তেজনা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল। অযোগ্য লোকদের কিভাবে শাস্তি করতে হয় জানে সে, কিন্তু কারও বিচার করার সময় এটা নয়। ‘ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা গরম কোরো না। তোমার যা কাজ করো তুমি, কানে প্লাগ ঢুকিয়ে বসে থাকো।’ জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। ‘চেক করার আরও উপায় আছে। এতই যখন কাছে ওরা, একটা হেলিকপ্টার পাঠালেই তো হয়।’ জুনায়েভ নির্দেশ পেয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, ‘পাইলটকে বলে দেবে কিউটকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তার ফেরার দরকার নেই।’

জোড়া লাগা দুই আইসবার্গের মাঝখানে, বিশাল বাহনের কোলে বসে রয়েছে কিউট। স্রোতের সাথে দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে ওরা। কতক্ষণ, কত ঘণ্টা ধরে ভেসে চলেছে, কেউ বলতে পারবে না। বরফের খাঁচায় বন্দী লোকগুলোর সময় জানার কোন উপায় নেই।

প্রথমে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এতই অবিশ্বাস্য, ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বাধ্য হয়ে নির্দেশ দিলেন, জাহাজে যত ঘড়ি আছে সব চেক করে দেখতে হবে। হুকুম তামিল হলো। দেখা গেল, অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা সত্যি। হাতঘড়ি, দেয়াল-ঘড়ি, টেবিল-ঘড়ি—সব বন্ধ হয়ে আছে। কারণটাও আন্দাজ করা গেল। দুই আইসবার্গ ধাক্কা খাওয়ার সময় যে শক ওয়েভ আর কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, এ তারই ফলশ্রুতি—সব ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে। জাহাজের কোথাও আর খুঁজতে বাকি রাখা হলো না, যদি একটা সচল ঘড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

কাজেই সময়ের ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে কাজ চালাতে হলো। লগ বুক লেখা হলো, ‘প্রায় উনিশশো ঘণ্টা...’ ‘সম্ভবত বাইশশো ঘণ্টা...’ এই রকম।

সময় জানতে না পারায় স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়তে লাগল। ওদিকে মাথার ওপর ঝুঁকে আছে গোস্ট বার্গের চূড়া, লক্ষ-কোটি টন বরফ নিয়ে। যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। যদি পড়ে, বাঁচার চিন্তা করা বাতুলতা। সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউট চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। লোকজনের কথা না বলাই ভাল।

তার ওপর, কারও কিছু করার নেই। করার নেই, করার সাহসও নেই। প্রতি মুহূর্তের স্বাভাবিক সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ডেকে কিছু বরফ এখনও রয়েছে, কিন্তু ফেলার সাহস হলো না—ভয়, কোদাল বা শাবলের আওয়াজ যদি আকাশ ছোঁয়া গোস্ট বার্গকে স্পর্শ করে, যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গোস্ট বার্গ! রানা আর নিয়াজ প্রতিবেশী আইসবার্গে উঠে এক চক্রর ঘুরে আসার পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল।

‘লক্ষণ যা দেখছি, গোস্ট বার্গ বলেই মনে হয়,’ আইসবার্গ থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিয়ে ক্যাপটেনকে বলেছিল রানা। ‘চুড়া থেকে বড় একটা টুকরো খসে পড়ল। তবু চেক করে দেখা দরকার...’

দেখার পর আর কোন সন্দেহ থাকল না, গোস্ট বার্গই বটে; এত বড় এর আগে দেখেনি রানা। দুশো ফিট উঁচু পাঁচিলের উল্টো পিঠটা, যে পিঠটা সাগরের দিকে মুখ করে রয়েছে, ঠিক যেন আরব্য রজনীর কোন দৃশ্য। ওখানে পৌছুবার জন্যে বে-র সরু ফাঁক গলে ঢুকে পড়া আন্ডারওয়াটার স্পার পেরোতে হলো ওদেরকে। পাঁচিলের গোড়ায় এসে সরু একটা কার্নিস পাওয়া গেল, সেটা ধরে সাবধানে উঠল ওরা। তারপর একটা বাঁক নিয়ে থমকে দাঁড়াল, চোখ তুলে যা দেখল তাতে আতঙ্কে কথা সরল না মুখে। অসংখ্য বিশাল আকারের গুহা আর ফাটল আইসবার্গের গায়ে, অথচ জাহাজ থেকে দেখে মনে হয়েছিল নিরেট বরফের পাহাড়। সারি সারি স্তম্ভ দেখল ওরা, কোনটা পঞ্চাশ ফিট উঁচু, কোনটা একশো বা তারও বেশি; স্তম্ভগুলোর ওপর বসানো রয়েছে বরফের ভারী ছাদ। আর নিচে, সী লেভেল থেকে অনেক উঁচুতে, যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে বিশাল একটা কুয়ো। পারে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া গেল না, অন্ধকার। তবে কান খাড়া করে হলল আওয়াজ শোনা গেল, বরফের গায়ে গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আছাড় খাচ্ছে। গোস্ট বার্গ, অন্তত আধ মাইল লম্বা, নিরেট তো নয়ই, প্রায় সম্পূর্ণটাই ফাঁপা। ঘামতে শুরু করা জেলিগনাইটের মত, যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।

‘ধাক্কা লাগার সময় ধসে পড়েনি কেন!’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘এটাই তো বৈশিষ্ট্য। প্রচণ্ড ধকল সহিতে পারে, আবার হঠাৎ সামান্য একটা শব্দেই হুড়মুড়...’

‘যথেষ্ট দেখেছি, এবার চলো ফেরা যাক...’

‘ইয়াল্লা, ওটা কি নিয়াজ?’

বিরাটকায় একটা স্তম্ভের মাথা থেকে কুয়াশা সরে গেছে, টাওয়ারের দুশো ফিট পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, আরও ওপর দিকটা কুয়াশায় ঢাকা। টাওয়ারটা চওড়া, ডায়ামিটারে একশো ফিটের কম না। গায়ে গরাদহীন জানালা, একটার ওপর আরেকটা, অনেকগুলো। জানালা না বলে গর্ত বলাই ভাল, টাওয়ারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি, টাওয়ারটা এখনও কিভাবে খাড়া রয়েছে সেটাই একটা বিস্ময়। ওপরের অংশ থেকে সরে গেল কুয়াশা, স্তম্ভিত হয়ে ওরা দেখল টাওয়ারটা বিশাল একটা ঝুল-বরফের প্রসারিত বাহুর ভার বহন করছে। প্রকাণ্ড বাহু আইসবার্গের মূল পাঁচিলের পিছন দিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রানা ঠিক বুঝতে পারল না, টাওয়ারটা কি শুধু বাহুর ভার বহন করছে, নাকি বাহু সহ গোটা পাঁচিলটার।

‘এভাবে বেশিক্ষণ টিকবে না,’ বিড়বিড় করে বলল ও। ‘চলো ফিরি।’

কি দেখেছে, মাত্র একজনকে বলল ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সবাই জেনে ফেলল ব্যাপারটা। এরপর থেকে উদ্বেজনা আর উদ্বেগ অসহ্য হয়ে উঠল। কারও কারও এমন অবস্থা দাঁড়াল, সন্দেহ হলো পাগল হয়ে যাবে। বান্ধহেডের সাথে

কারও যদি কনুই ঠুকে যায়, সঙ্গীরা তার দিকে এমনভাবে তাকায়, পারলে যেন খুন করে ফেলে। কারও খিদে পাচ্ছে না। চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। কিছু করার না থাকায় স্নায়ুর ওপর চাপ আরও বাড়তে লাগল। আইসবার্গ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে ঘুরছে স্রোতের টানে, অথচ কেউ কিছু অনুভব করছে না। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে থাকলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে ওরা।

‘বিস্ফোরকের ব্যাপারে আমরা এত আগ্রহী কেন?’ রানার কেবিনে বসে রয়েছে ওরা, নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠলে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘আইসবার্গ থেকে যদি বেরুতে পারি, আরেকটা বিপদ দেখা দেবে,’ বলল রানা। ‘তখন আত্মরক্ষার জন্যে বিস্ফোরক লাগতে পারে। কিভাবে, কোথায়, কখন, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। ক্যাপটেন গোল্ডম্যানের মত আশাবাদী নই আমি। ভেসে থাকা মাইন বা ওই ধরনের কিছুর কথা ভাবছি। কাফম্যানের সাথে আমার কথা হয়েছে।’

‘তোমার কি মনে হয়, এই জোড়া লাগা আইসবার্গ থেকে উদ্ধার পাব?’

‘যদি গোস্ট বার্গ ঘুরে আমাদের দক্ষিণে চলে যায়, তাহলে একটা আশা আছে,’ বলল রানা। ‘স্রোত ওটাকে টানবে, সেই টানে আবার সরে যেতেও পারে।’

বিনয় জিজ্ঞেস করল, ‘সত্যিই কি তুমি হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছ, রানা? গোস্ট বার্গে গিয়ে? গোল্ডম্যান তো বিশ্বাসই করছেন না।’

‘কারণ নিয়াজ শুনতে পায়নি আওয়াজটা। শুধু শুনিনি, আমার

মনে হয় এক পলকের জন্যে দেখেওছি ওটাকে, তারপরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়।’

‘তারমানে কর্নেল বলটু জানে আমরা কোথায়?’

‘সেটাই সম্ভব।’

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাতে কোন এক সময় গোস্ট বার্গ বিচ্ছিন্ন হলো। লগে লেখা হলো: ‘আন্দাজ বাইশাশো ঘণ্টায়।’ আইসবার্গের বিদায় পর্বটা দর্শনীয় কিছু হলো না। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল! শুনে ছাঁৎ করে উঠল প্রত্যেকের বুক। ব্রিজের পিছনের পোস্ট থেকে কাফম্যান একা ব্যাপারটা ঘটতে দেখল। বে-তে ঢুকে আটকা পড়েছিল আন্ডারওয়াটার স্পার, বিকট শব্দের সাথে ভেঙে গেল সেটা। গোস্ট বার্গ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বে-র সামনে থেকে পিছু হটে দূরে সরে গেল ধীরে ধীরে। আন্ডারওয়াটার স্পারের বাকি অংশটা বে-র পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলে পিছু নিল।

রানার সাথে ক্যাপটেন যখন ব্রিজে এলেন, পরিচিত দৃশ্যটা বদলে গেছে। জাহাজের পিছনে বে-র মুখ খুলে গেছে আবার। কুয়াশার ভেতর এখনও দেখা যাচ্ছে গোস্ট বার্গের কাঠামো, কিন্তু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। ক্যাপটেনের আচরণে এই প্রথম ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটল। যেচে পড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন তিনি।

কিন্তু ঘটনাখানেকের মধ্যেই কারও কোন পরামর্শ না নিয়ে নির্দেশ দিলেন, ‘এঞ্জিন স্টার্ট! সাগরে বেরিয়ে যাব আমরা!’

## দশ

কিউটের পিছনে পানিতে আলোড়ন তুলল প্রপেলার, সাদা ফেনার সাথে উথলে উঠল রাশ রাশ টুকরো বরফ। নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন, ধীরে ধীরে পিছু হটল জাহাজ। খানিকটা নেমে থেমে গেল আবার, এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো হলো। আরও জোরে ঘুরল প্রপেলার, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল ব্রিজ। উল্টোদিকে আবার গতি সঞ্চার হলো, ধীরে ধীরে বরফের ঢাল থেকে নেমে আসছে আইসব্রেকার।

সবশেষে পানিতে নামল বো, ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল পানি। বে-টা এতই ছোট, জাহাজ ঘোরাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পিছু হটে সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে হবে।

বে-র দুই বাহুর মাঝখানে পৌঁছে গেল কিউট, কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই ফাঁকটা গলে সাগরে পড়ল ওরা। ডেক কাঁপছে, রেইল ধরে বো-র দিকে এগোল রানা। মাথার ওপর আপাতত কোন কুয়াশা নেই। চাঁদের আলোয় ভাসমান বরফের টুকরো দেখা গেল পানিতে। ধীরে ধীরে জাহাজ ঘুরিয়ে নিলেন ক্যাপটেন। সামনে ঘন কুয়াশা রয়েছে, আধ মাইল দূরে। রানার পাশে বো-র কাছে এসে দাঁড়াল নিয়াজ। ‘এই জেদের কোন মানে হয়? এখনও এগোচ্ছি, বার্গের সাথে থাকলেও এগোতাম। কাফম্যানকেও বিরক্ত মনে হলো। আচ্ছা, এই আলোক সজ্জার কি দরকার ছিল বলতে পারো?’

ক্যাপটেনের নির্দেশে জাহাজের সব ক’টা আলো জ্বলে দেয়া হয়েছে। পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর বো-র দিকে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো ফেলা হয়েছে। ক্যাপটেনের ধারণা, এভাবে আলো জ্বলে এগোলে, তার সাথে যদি অবিরাম ফগ-হর্ন বাজতে থাকে, রুশ জাহাজগুলো ধাক্কা দেয়ার কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না।

‘কিউটে মেরিলিন চার্ট আর ইভেনকো রয়েছে, আর কোন অজুহাত দরকার আছে ওদের? যাই ঘটুক না কেন, রিপোর্ট করার উপায় নেই যখন?’

কিন্তু রানার কথা কানে তোলেননি গোল্ডম্যান। তাঁর যুক্তি, অন্ধকারে রুশ জাহাজগুলোকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে পরে কর্নেল বলটুয়েভ বলার সুযোগ পাবে, সংঘর্ষের জন্যে আমেরিকানরাই দায়ী, কুয়াশার জন্যে কিউটকে তারা দেখতে পায়নি।

চোখে নাইট-গ্লাস তুলে দূরে তাকাল রানা।

‘কিছু দেখছ?’ উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল নিয়াজ।

‘শুধু পানি। আর কুয়াশা।’

‘কিছু দেখছেন?’ ব্রিজ থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে রানার আরেক পাশে দাঁড়াল কাফম্যান। ‘আপনার যা চোখ, আবার মাস্তুলের ওপর উঠলে পারতেন।’

ঘাড় ফিরিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকাল রানা। আশি ফুট উঁচুতে, ক্রস-ট্রীর ওপর একজন বসে রয়েছে, ফার হুডের তলায় হেডসেট। ক্যাপটেনের নির্দেশে ওখানে উঠতে হয়েছে বেচারাকে। কিউটের সামনে কোন বাধা দেখলে সাবধান করবে। ‘না, ধন্যবাদ। আবার! তাছাড়া, কুয়াশার ভেতর দেখার আছেটা কি?’

‘স্টার্নের কাছে, স্টারবোর্ড সাইডে কারলি ফ্লোট আছে,’ নিচু গলায় বলল কাফম্যান। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের পাশেই। চাবিটা মি. মুখার্জিকে দিয়ে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ।’

‘সাহায্যের দরকার হলে, হিগিন আছে,’ গলা আরও খাদে নামিয়ে বলল ক্যাফম্যান। ‘সবাই মিলে লঞ্চটাকে নামাতে পারব।’

‘হিগিন?’

‘ফ্লোটের কাছে লুক-আউট পয়েন্টে ডিউটি দিচ্ছে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমাকে বলবেন, ঠিক কি করবেন বলে ভাবছেন আপনি, মি. রানা?’

‘ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব,’ পরিস্কার করে কিছু বলল না রানা।

‘ক্যাপটেন এখনও কিছু জানেন না, জানলে আমার চাকরি নট হয়ে যাবে,’ রানার কানে কানে বলল কাফম্যান।

‘আইসবার্গ অ্যালিতে মরার চেয়ে বেকার হয়ে বেঁচে থাকা ভাল নয়?’

‘কিউট আলাদা হয়ে যাচ্ছে,’ বলল কর্নেল। ‘পাইলটের তোলা ছবিতে যে আইসবার্গটির কোলে উঠে পড়েছিল, সেটা থেকে নেমে আসছে।’

রিগার ব্রিজে, রাডারস্কোপ-এর হুডের সামনে ঝুঁকে রয়েছে বলটুয়েভ, স্কোপের সবুজাভ আভায় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে তার মুখ। কামানো মাথাটাও সবুজ রঙে চকচক করছে।

‘কত দূরে?’ অস্থিরতা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

হুড থেকে মুখ তুলে ব্রিজের অপর প্রান্তে তাকাল বলটুয়েভ। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন, হাত দুটো পিছনে এক হয়ে আছে, সারা শরীর আড়ষ্ট। ‘এবার আপনি এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারেন, ক্যাপটেন,’ হাঁক ছাড়ল কর্নেল। ‘এখন থেকে রাডারের সাহায্যে নজর রাখব ওটার ওপর।’ এবার হুডের সামনে ঝুঁকে জুনায়েভের প্রশ্নের উত্তর দিল, ‘মাঝরাতের মধ্যে-আশা করি মাঝরাতের মধ্যেই সমস্ত বামেলা চুকে যাবে।’

আইসবার্গ অ্যালি ধরে দক্ষিণ দিকে চলেছে কিউট। ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কাটছে বো, হাফ পাওয়ারে চালু রয়েছে এঞ্জিন। জাহাজের প্রতিটি আলো জ্বলছে। আরও একটা সুবিধে করে দেয়া হয়েছে কর্নেল বলটুয়েভকে, কিউটের শক্তিশালী ফগহর্ন করণ সুরে বাজছে বিরতিহীন।

হর্নের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে শুনে চিন্তিত হলো রানা। তারমানে কুয়াশার ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও আইসবার্গ আছে।

নির্দয় ঠাণ্ডার মধ্যে বো-র কাছে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। মাঝে মধ্যে লুক-আউট পয়েন্টগুলোর কাছ থেকে ঘুরে আসছে তিনজন, শুধু রানা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। চোখে নাইট-গ্লাস, হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেল। পিছনে পায়ের আওয়াজ।

‘আপনার কফি, মি. রানা।’

পিছনে হিগিনকে নিয়ে আবার হাজির হলো কাফম্যান। ফ্লাস্ক থেকে অ্যালুমিনিয়ামের মগে তরল আগুনের মত কফি ঢালল



হিগিন। তাড়াতাড়ি চুমুক দিল রানা, এরইমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। হিগিনকে তার পোস্টে পাঠিয়ে দিল কাফম্যান। নিয়াজকে কোথাও দেখা গেল না। ‘ক্যাপটেনের সাথে কথা বলে এলাম,’ বলল কাফম্যান। ‘বললেন, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি।’

‘তবু ভাল যে সন্তুষ্ট একজনকে পাওয়া গেল।’

‘যাই বলুন, বিপদের কোন আভাস এখনও...’

‘সব বিপদই কি আগাম নোটিশ দিয়ে আসে?’ বাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল রানা। কফি শেষ করে কাপটা কাফম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল ও, নাইট-গ্লাস তুলল চোখে। লেন্সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করছে চোখ। সাগরের একধারে সরু একটা চ্যানেল দেখা গেল, চাঁদের আলোয় সম্পূর্ণ সমতল আর শান্ত, প্রায় এক মাইল লম্বা। দু’দিকে ভাসমান বরফের টুকরো গিজগিজ করছে। চ্যানেলের শেষ মাথাটা ঢাকা পড়ে আছে ঘন কুয়াশায়। পোর্ট সাইডে প্রকাণ্ড একটা আইসবার্গ, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। মাথার দিকে কুয়াশা নেই, টেবিলের মত সমতল ছাদ। স্টারবোর্ডের দিকে শুধু ভারী কুয়াশা, সাদাটে মেঘের মত আকাশ থেকে সাগর পর্যন্ত ঝুলে আছে, লম্বায় চ্যানেলটাকে ছাড়িয়ে গেছে।

রানা সেদিকে নাইট-গ্লাস ঘোরাতে কাফম্যান বলল, ‘ওদিকে কুয়াশা ছাড়া দেখার কিছু নেই।’

‘রেডিও-জ্যামিং কি আগের মতই স্ট্রং?’

‘বেশি।’

‘অর্থাৎ উৎসের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা।’

সামনেটা বোতলের ঘাড়ের মত সরু-চ্যানেলের একদিকে সমতল ছাদ নিয়ে দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ, আরেক দিকে গাঢ়

কুয়াশার নিশ্চিদ্র স্তর। কোর্স সামান্য একটু বদলে দুই বিপদের মাঝখানে থাকার চেষ্টা করল জাহাজ। বিনয়কে নিয়ে বো-র কাছে ফিরে এল নিয়াজ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল বিনয়, শরীর গরম রাখার চেষ্টা। দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিয়াজ। ধীরে ধীরে নাইট-গ্লাস ঘুরিয়ে আবার স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। ওদিকে সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছে কুয়াশা। বোতলের গলায় যখন ঢুকবে কিউট, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে ওরা।

‘কি ওটা?’ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘স্টারবোর্ডের দিকে, অনেকটা দক্ষিণে?’

সচল পাঁচিলের মত জিনিসটা, কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। নিয়াজ বলার আগেই ওটাকে দেখতে পেয়েছে রানা। পরিচিত শত্রু, আগের সেই গোস্ট বার্গটা।

বোতলের গলায় ঢুকে পড়েছে কিউট। পোর্ট বো-র দিকে এগিয়ে আসছে সমতল ছাদ নিয়ে আরেক দৈত্য। কুয়াশার ঘন স্তরের দিকে তাকাল রানা। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও। কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল রিগার বো, তেড়ে এল ওদের দিকে যুদ্ধ-জাহাজের মত।

‘আমেরিকান জাহাজটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে—আমাদের ডান দিকের কোর্স ধরে...’

‘কাজেই রেডি হোন,’ ট্রাভকিনকে নির্দেশ দিল কর্নেল বলটুয়েভ।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে রিগা। ঝুঁকে আবার রাডার স্কোপে চোখ রাখল ট্রাভকিন। কিউটের এগিয়ে আসা লক্ষ করছে সে। সময়ের নিখুঁত হিসেব দরকার হবে। ঠিক মুহূর্তটিতে কুয়াশা থেকে বেরুতে হবে জাহাজ নিয়ে, তা না হলে ব্যর্থ হবে সে। ‘কোর্স ঠিক রাখো,’ হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল।

মহুরবেগে এগোচ্ছে রিগা। সময়ের হিসেবে, কুয়াশা থেকে বেরুলেই সামনে পড়বে কিউট। রাডারস্কোপে ঝুঁকে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল ট্রাভকিনের, দরদর করে ঘামছে সে। পিছনে কর্নেল বলটুয়েভের উপস্থিতি আড়ষ্ট করে তুলছে তাকে।

‘আমি চাই কিউটের ঠিক মাঝখানে গুঁতো মারবে রিগা,’ ঢালাও হুকুম দিল কর্নেল।

রাডারস্কোপে ট্রাভকিন দেখল, কুয়াশা আর আইসবার্গের মাঝখানে, সরু বোতলের গলায় ঢুকছে কিউট। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল কর্নেল।

‘জাহাজ খোঁড়াচ্ছে কেন?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল সে। ‘আরেকটু জোরে ছোটাতে পারেন না?’

‘কুয়াশা থেকে আগেভাগে বেরুলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে,’ ভারী গলায় বলল ক্যাপটেন। ‘আপনি কি তাই চান?’

অন্ধকারে এগোচ্ছে রিগা, কোন আলো জ্বালা হয়নি। কুয়াশা চুইয়ে ক্ষীণ যে-টুকু চাঁদের আলো নামছে তাতেই সামনেটা খানিকদূর দেখতে পাচ্ছে বলটুয়েভ। এঞ্জিনের তেমন কোন আওয়াজ নেই, মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সাগর সম্পূর্ণ শান্ত।

‘স্পীড যা আছে তাই থাক,’ নির্দেশ দিল ট্রাভকিন।

‘এভাবে কতক্ষণ?’ জানতে চাইল কর্নেল।

‘যতক্ষণ দরকার।’

চেহারায়ে আক্রোশ ফুটে উঠলেও চুপ করে থাকল কর্নেল। নেভিগেশন সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই তার। অস্থিরতা বোধ করার কারণ, তার ইচ্ছে প্রথমবারই ধাক্কাটা লাগা চাই। ধাক্কা লাগলে কি ঘটবে, কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল সে। যোলো হাজার টন ভার নিয়ে কিউটের ওপর চড়াও হবে রিগা। রিগার বাঁ দিকে থাকবে কিউটের বিচ্ছিন্ন স্টার্ন, ডান দিকে তোবড়ানো বো। কোন্টা আগে ডুববে? কিউটের পিছনটা, না সামনেটা?

‘কর্নেল! ব্রিজের পিছনে চলে যান! শক্ত করে রেইল ধরে থাকুন!’

ক্যাপটেনের কথামত তাই করল কর্নেল। হেলমসম্যান, কর্নেলের নিজের লোক, আরও জোরে আঁকড়ে ধরল হুইল। ব্রিজের সামনে কুয়াশা, সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল বলটুয়েভ। কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে দেখলেই বুঝতে হবে সামনে কিউট আছে। রিগার একেবারে বো-র সামনে দেখা যাবে ওটাকে। ভাবল, বানচোত ট্রাভকিন স্পীড বাড়ায় না কেন?

রাডারস্কোপের সামনে থেকে সরে এল ট্রাভকিন, শক্ত হাতে টেলিগ্রাফের হাতল ধরল। হাফ স্পীডের নির্দেশ দিল সে। তারপরই আবার ছুটে গেল স্কোপের দিকে। ‘কোর্স ঠিক রাখো।’

জানালায় সামনে দিয়ে স্লান একটু আলো সরে গেল।

এঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় কুয়াশার ভেতর একটা আলোড়ন উঠল। ঘামের ধারা চোখে নেমে আসছিল, দ্রুত হাত ঝাপটা দিয়ে সেটা মুছল কর্নেল। কিউটের ফগহর্নের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এখন।

সরাসরি সামনের দিক থেকে আসছে।

রাডারস্কোপে চোখ রেখে নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। অকস্মাৎ সামনে থেকে উঠে গেল কুয়াশার পর্দা।

চাঁদের আলোয় ভেসে গেল ব্রিজ। নাক বরাবর সামনে চোখ ধাঁধানো আলো। কিউট।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রিগা, আকস্মিক গতি পেয়ে ছুটল। আইসব্রেকারের খোল দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দু'হাতে রাডারস্কোপ ধরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ট্রাভকিন, চোখ দুটো বিস্ফারিত। সময়ের হিসেবে তার কোন ভুল হয়নি।

স্পীড বাড়়াও! স্পীড বাড়়াও!—নিঃশব্দে আবেদন জানাচ্ছে ট্রাভকিন। ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল সে। আশা, কিউটের ক্যাপটেন তার আকুল আবেদনে সাড়া দেবে।—স্পীড বাড়়াও! সরে যাও সামনে থেকে! প্লীজ, প্লীজ!

স্পীড আগেই বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কুয়াশা থেকে রিগাকে বের করতে দেখেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রিগা সোজা ছুটে আসছে, সরাসরি আঘাত করবে কিউটের মাঝখানে। ব্রিজের পিছন থেকে দৃশ্যটা ভালভাবে দেখতে না পেলেও উল্লাসে উত্তেজনায় ছটফট করছে বলটুয়েভ।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মনে হলো, কিউট রক্ষা পেল না। আইসব্রেকারের মাস্তুল রিগার সামনে দেখা গেল, ব্রিজ ছাড়িয়ে গেছে। কোর্স না বদলে রিগার পথেই থাকল কিউট, গতি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।

‘ফুল স্পীড! ফুল স্পীড!’ ভয়েস পাইপে অনবরত চিৎকার করছেন গোল্ডম্যান।

কিউটের মাঝখানে নয়, পিছনে আঘাত করতে যাচ্ছে রিগা। কিউটকে এই স্পীডে পাবে, কর্নেল আশা করেনি। আইসব্রেকারের পিছনে উথলে ওঠা পানির দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল সে। চোখের পলকে রিগার বো-র সামনে থেকে স্যাঁৎ করে সরে গেল কিউটের স্টার্ন। এক ছুটে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল ট্রাভকিন। রেইল ধরে ঝুঁকে পড়ল সে।

ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার। ‘আপনি একটা অকর্মার ধাড়ি! এরপর আমি কমান্ডে থাকব।’ রাগে দিশেহারা, কি করবে বুঝতে পারছে না। পায়চারি শুরু করল সে, তারপর ছুটে এল ক্যাপটেনের দিকে—মারবে।

প্রকাণ্ড দেহটাকে দু'হাত দিয়ে ঠেকাল ট্রাভকিন, তারপর জোরাল একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এক পাশে। একহারা লোকটার গায়ের জোর দেখে তাজ্জব বনে গেল কর্নেল।

দাঁতে দাঁত চেপে গাল পাড়ল ট্রাভকিন, ‘আপনি একটা মাথামোটা আহাম্মক—দেখছেন না, আইসবার্গে ধাক্কা খাচ্ছি!’

ঝট করে সামনে তাকাল বলটুয়েভ। আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে এল সে। জানালা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে সমতল ছাদ নিয়ে একটা দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ।

ভরাডুবি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, বুঝতে পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল বলটুয়েভ।

কিউটের স্টার্নে ছিল রানা।

মনে হলো সংঘর্ষ ঠেকাবার উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে ধারণা হলো, রিগার বো কিউটের প্রপেলার গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। পরমুহূর্তে

দেখা গেল, প্রপেলারের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বো, মাত্র কয়েক গজের জন্যে মিস করল টার্গেট।

‘বার্গের সাথে ধাক্কা খাবে,’ পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘এসো, প্রার্থনা করি।’

স্টার্নে দাঁড়িয়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকল ওরা। শেষ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল রিগার ক্যাপটেন, রিসার্চ শিপের পিছনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি। ঘুরে যাচ্ছে জাহাজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখগতি রোধ করা সম্ভব হলো না। এই লাগল, এই লাগল ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন অলৌকিক ভাবে রিগার বো সম্পূর্ণ ঘুরে যাবার সময় পেল, সংঘর্ষ হলো না।

তারমানে বিপদ কাটল না। গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। নিয়াজ, বিনয়, আর হিগিনকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে সোজা ব্রিজে উঠে এল ও।

পিছনের জানালার কাছ থেকে ঘাড় ফেরালেন গোল্ডম্যান। ‘আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। রিগা আমাদের ডোবাবার চেষ্টা করল।’

‘আবার করবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় আপনি ওদের সাথে পারবেন না।’

‘প্রশ্নই ওঠে না।’ স্নান দেখাল ক্যাপটেনকে। ‘কিউটের টপ স্পীড মাত্র ষোলো নট।’

‘কাজেই যদি সম্ভব হয়, ওটাকে থামাতে হবে, ঠিক? কিউট, ক্রু, ইভেনকো রক্ষণ, আর ডকুমেন্টের কথা ভাবতে হবে আপনাকে।’

‘এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা কাফম্যান আপনাকে জানিয়েছে?’ হঠাৎ জানতে চাইলেন গোল্ডম্যান।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, কথা বলল না।

‘আপনার ধারণা, আমার জাহাজে কি ঘটছে না ঘটছে আমি জানি না, মি. রানা?’

‘রিগাকে থামাতে হবে, ক্যাপটেন,’ আবার বলল রানা।

‘যদি হয়, আমি হয়তো ভুল করে লগ বুকে ব্যাপারটা লিখব না।’ রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। তারপর মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, ‘স্টপ হার!’

কারলি ফ্লোট একটা ভেলা, কোন কারণে জাহাজ থেকে সবাইকে নেমে পড়তে হলে পানিতে ভাসানো হয়। একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, ডেটোনেশনের জন্যে তার জোড়া লাগিয়ে তোলা হলো ফ্লোটে। জায়গা মত ফিট করা হয়েছে টাইমার মেকানিজম, বিস্ফোরণের জন্যে দশ মিনিট মেয়াদ বেঁধে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে—তবে বন্ধ রাখা হয়েছে ঘড়ি, চালু করা হয়নি। ফ্লোটটাকে এখন বিস্ফোরণোন্মুখ মাইন বলা যেতে পারে।

পানিতে লঞ্চ নামাবার সময় জাহাজের গতি কমাতে হলো। সিদ্ধান্তটা স্নায়ু বিদীর্ণ করার জন্যে যথেষ্ট। কারণ, এখনও অনেকটা দূরে হলেও, আবার ধাওয়া করে ওদের ধরতে আসছে রিগা।

মাঝখানের দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে এমনিতেই কম ছিল, এখন আবার স্পীড কমাতে হলো কিউটকে।

শুধু যে পিছনে বিপদ তাই নয়, ব্রিজ থেকে সামনে তাকালেও

মনে ভয় ধরে যায়। স্টারবোর্ডের দিকে এখনও গাঢ় হয়ে রয়েছে কুয়াশার স্তর, আধ মাইল দূরের গোস্ট বার্গটাকে আবছা করে রেখেছে। পোর্ট সাইড আরও ভয়াবহ দৃশ্য উপহার দিল, সার সার আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পরিষ্কার পানি নিয়ে লম্বা হয়ে থাকা চ্যানেলটাকে সরু করে রেখেছে। আরও সামনে, নাক বরাবর, চ্যানেলের দুই পাশে, বিশাল দুই আইসবার্গ টাওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দলবদ্ধ আইসবার্গগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে গোল্ডম্যানকে।

‘ওভারটেক করতে কি রকম সময় নেবে রিগা?’ কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘দশ মিনিট—আন্দাজে বলছি।’

গম্ভীর গলায় নিয়াজ বলল, ‘আমার আন্দাজ পাঁচ মিনিট।’ স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ভুরু কঁচকাল সে। ‘ক্যাপটেন কোর্স বদল করছেন—লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বার্গগুলোর কাছে সরে যাচ্ছে জাহাজ।’

‘তাই যেতে বলেছি,’ বলল রানা। ‘কিউট আর গোস্ট বার্গের মাঝখানে যতটা সম্ভব চওড়া চ্যানেল থাকা দরকার।’

‘যাতে রিগা চওড়া অংশটা বেছে নিতে বাধ্য হয়? ক্যাপটেনের কি মাথা খারাপ হয়েছে...!’

‘তাহলে আমারও মাথা খারাপ হয়েছে। এসো, লঞ্চ নামা যাক।’

ডেভিট কেবলে ঝুলছে লঞ্চ। একজন ত্রুকে নিয়ে পাশেই অপেক্ষা করছে হিগিন। রানার পিছু পিছু একে একে লঞ্চ চড়ল বিনয় আর নিয়াজ।

‘মি. রানা, এখনও আপনি বলেননি ঠিক কি করার কথা ভাবছেন। রিগার বো-র তলায় ফাটাবেন ওগুলো? কিন্তু তা...’

‘তা সম্ভব নয়,’ কাফম্যানকে বলল রানা। ‘ফুল স্পীডে আসছে রিগা, বো-র তলায় জেলিগনাইট রেখে আসবে কে? ফর গডস সেক, দেরি না করে পানিতে নামান আমাদের! এভাবে সময় নষ্ট করলে মরতে হবে, মারতে হবে না।’

সময় কম। অথচ কাজগুলো জটিল, সময়সাপেক্ষ, ঝুঁকিপূর্ণ। উইঞ্চ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে পানির দিকে নিচু করা হলো লঞ্চ। সচল জাহাজ থেকে সাবধানে নামতে হবে পানিতে। কেবলের শেষ মাথায়, শূন্যে, জাহাজের পাশে, ঝুলতে লাগল লঞ্চ। নামছে, কিন্তু খুব ধীরে।

ওদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে রিগা। কুয়াশার ভেতর ঝাপসা, বিশাল একটা অশুভ আকৃতি। ফুল স্পীডে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ পেল ওরা। তাগাদার ওপর তাগাদা দিচ্ছে রানা, ‘তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!’

পানিতে নেমে দুলতে লাগল লঞ্চ, জাহাজের বো থেকে ঢেউ উঠছে।

এবার ফ্লোটটাকে নামাতে হবে। মুখ তুলে তাকাল ওরা, এরই মধ্যে নামতে শুরু করেছে ফ্লোট। সবাই জানে, নামাবার সময় ফ্লোট যদি জাহাজের গায়ে বাড়ি খায়, জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা কম-কম, তারমানে সম্ভাবনা আছে। এ-ধরনের দুর্ঘটনা একেবারে যে ঘটে না তাও নয়।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নেমে আসছে ফ্লোট। জাহাজের উঁচু কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ত্রুরা, একটু একটু করে রশি ছাড়ছে

তারা। হঠাৎ একজনের হাত থেকে ফসকে গেল রশি। কাত হয়ে পড়ল ফ্লোট।

‘ব্যাটা বলটুর লোক!’ প্রচণ্ড রাগে প্রলাপ বকল নিয়াজ। ‘আমাদের মারতে চায়।’

চরম বিপদের মধ্যেও মানুষ হাসতে পারে, প্রমাণ করল রানা।

কাত হয়ে গিয়ে দুলতে লাগল ফ্লোট, জাহাজের খোলে দড়াম দড়াম বাড়ি খেলো। যে-কোন মুহূর্তে বিপজ্জনক কার্গো ছিটকে পানিতে পড়তে পারে। লঞ্চে, ওদের মাথার ওপর পড়লেই বা কার কি করার আছে!

ধৈর্য হারিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। রিগা কোর্স বদলে চ্যানেলের চওড়া অংশে সরে যাচ্ছে। কিউটের স্টারবোর্ড সাইডে পজিশন নেবে ওটা। ‘খোদার দোহাই, তাড়াতাড়ি করো!’

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, চোখের পলকে। শূন্য থেকে খসে পড়ল ফ্লোট। সরাসরি ওদের মাথার ওপর নামছে।

মাথা থেকে তিন ফিট ওপরে ঝাঁকি খেয়ে থামল সেটা, এখনও কাত হয়ে আছে। এরপর নামার গতি আগের মত শ্লথ, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। ধীরে ধীরে সিধে হলো আবার।

নিরাপদেই নেমে এল ফ্লোট। ঘড়ি চালু করল বিনয়। গোস্ট বার্গ যখন ধাক্কা দেয়, ঘড়িটা বন্ধ ছিল, সেজন্যেই বোধহয় নষ্ট হয়নি ওটা। লঞ্চে সাথে আগেই বাঁধা হয়েছে ফ্লোটটাকে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, হুইল ধরে কাফম্যানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। উইঞ্চ কেবল খুলে নেয়া হলো। দ্রুত এগোল লঞ্চ, ক্রমশ দূরে সরে এল জাহাজের কাছ থেকে, হেলদুলে পিছু নিল ফ্লোট।

পিছন ফিরে রুশ রিসার্চ শিপের দিকে তাকাল নিয়াজ।

‘আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি!’

শান্ত সাগর, সগর্জনে ছুটল লঞ্চ, সোজা গোস্ট বার্গের দিকে যাচ্ছে। কিউটের পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে রিগার সামনের পথ লক্ষ্য করে। ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে কুয়াশা, ওদের টার্গেট গোস্ট বার্গের খাড়া পাঁচিল ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো। বিশাল একটা মহাদেশের মত তার বিস্তার।

বার্গের আরও কাছাকাছি পৌঁছে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল রানা। বার্গের গোড়ায়, ভিতের কাছে বড়সড় একটা গুহা রয়েছে। গুহার ভেতরটা অন্ধকার, চাঁদের আলো ঢুকছে না। আলো ঢুকছে না, কিন্তু তীব্রগতি শ্রোত তুমুল শব্দে ভেতরে ঢুকছে। রানা উপলব্ধি করল বার্গের ভেতর, পেটের মাঝখানে একটা লেক তৈরি হয়েছে। তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

‘আরও কাছাকাছি যাব আমরা-ফ্লোটটাকে ছেড়ে দেব আইসশেলফের কিনারায়।’

রানার চেয়ে আরও জোরে চিৎকার করল নিয়াজ, ‘অনেক দূরে চলে এসেছি, ফিরব কিভাবে? কিউটকে যদি ধরতে না পারি?’

‘সে ঝুঁকি নিতেই হবে,’ বলল রানা। ‘টানেলটা দেখছ? মুখে ছেড়ে দেব ফ্লোটটা। বার্গের ভেতর ঢুকে যেখানে খুশি ফাটুক।’

রানার প্ল্যানটা সাদামাঠা, কাজ হলেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। দু’দু’বার ধসে পড়া থেকে বেঁচে গেছে গোস্ট বার্গ। একবার দ্বিতীয় বার্গের সাথে জোড়া লাগার সময়, আরেকবার বিচ্ছিন্ন হবার সময়। তিন বারের বার হয়তো সত্যি ওটা ভেঙে পড়বে। জেলিগনাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৃতীয় ধাক্কাটা দিয়ে দেখতে চায় রানা। যদি ধসে, রিগার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে

চ্যানেল।

‘মাসুদ রানা, তোমার সলিল সমাধি ঠেকায় কে!’ উল্লসিত দানবের মত রিগার ব্রিজে লাফ-ঝাঁপ মারছে কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ব্যটাচ্ছেলের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কফিন হিসেবে সাড়ে ছ’হাজার টন লোহা-লক্কড় পাচ্ছে! জোড়াও মিলেছে ভাল-ইভেনকো রক্তভ সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু, মাসুদ রানা ইসরায়েলের! যাও, একসাথে ঠাণ্ডা করবে!’

রাডারস্কোপের কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে উন্মাদটার দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপটেন ট্রাভকিন।

‘মাঝখানে দূরত্ব কমে আসছে!’ আনন্দে ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। পরমুহূর্তে চোখ পাকিয়ে তাকাল ট্রাভকিনের দিকে। ‘সময় ঘনিষে এলে আমি নিজে হুইল ধরব!’ ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে মুখ চেপে ধরল সে। ঝাপসা কুয়াশার ভেতর কিউটের কাঠামো দেখা গেল। ‘তুমি টেলিগ্রাফের চার্জে থাকবে, স্পীড কন্ট্রোল করবে,’ জুনায়েভকে বলল সে।

‘চ্যানেলটা লক্ষ করছেন?’ জিঙ্কোস করল ট্রাভকিন। ‘একেবারে সরু। জাহাজ নড়াচড়ার জায়গা পাবে কি না সন্দেহ।’ প্রতি মুহূর্তে পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর স্টার্নের দিকে ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে ক্যাপটেন। স্টারবোর্ডের দিকে বিশাল একটা আইসবার্গ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে কুয়াশা থেকে, রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে সে। তবু তো ট্রাভকিন জানে না, ওটা একটা গোস্ট বার্গ, ভেতরটা ফাঁপা-যে-কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। হঠাৎ কাঁপা গলায় বলল সে, ‘একটা লক্ষ্য! কিউট থেকে

রওনা হলো! আমাদের সামনে দিয়ে চ্যানেল ক্রস করছে!’

‘করক! আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। স্পীড বাড়ান!’

‘কি বলছেন! সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে! বুঝতে পারছেন না, আইসবার্গটার খুব কাছে চলে যাচ্ছি আমরা!’

‘ফুল পাওয়ার!’ ব্রিজে যেন বজ্রপাত ঘটল। জুনায়েভের দিকে মারমুখে হয়ে এক পা এগোল বলটুয়েভ। ‘ফুল পাওয়ার!’

## এগারো

ওদের মাথার ওপর বরফ-প্রাচীর খাড়াভাবে উঠে গেছে। সহস্র বরফ টুকরোর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে লক্ষ্য। সামনেই আইসশেলফ, ওখানে গোস্ট বার্গের গোড়া আলিঙ্গন করে আছে সাগর। স্পীড কমিয়ে দিল রানা, ধীরে ধীরে থেমে গেল লক্ষ্য। ছোট বড় বরফ টুকরোর মাঝখানে দুলাতে লাগল ওরা। ওদের বিশ গজ দক্ষিণে বিশাল গুহাটা, তেরছাভাবে ঢুকে গেছে বার্গের অভ্যন্তরে। কুল কুল শব্দে পানি ঢুকছে ভেতরে। চাঁদের আলোয় চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। বিপরীতমুখী কোন স্রোত নেই। দম নিয়ে নির্দেশ দিল, চড়া গলায়, ‘খুলে দাও ফ্লোটা!’

ছুরি নিয়ে তৈরি ছিল নিয়াজ। এক হাতে রশিটা ধরে, অপর হাতে ঘঁচ ঘঁচ করে ছুরি চালাল। শক্ত ফাইবার, সহজে কাটতে চায় না। তার পিছনে রানা আর বিনয় দেরি দেখে হটফট করছে। রানার হিসেবে, বিস্ফোরণ ঘটতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। তবে

হাতে ঘড়ি না থাকায় নিশ্চিত হবার উপায় নেই। হয়তো সাতমিনিট বাকি, কিংবা তিন মিনিট।

শেষ পর্যন্ত রশিটা কাটতে পারল নিয়াজ, কিন্তু কয়েকটা চিকন রোঁয়া রয়ে গেল, লঞ্চের সাথে আটকে রাখল ভেলাটাকে। অশ্লীল একটা গালি বেরিয়ে এল নিয়াজের মুখ থেকে। ইতিমধ্যে হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে রশি। তার সাহায্যে এগিয়ে এল বিনয়, হাতে নিজের ছুরি। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল রানা, হুইল ছেড়ে যেতে পারছে না। গুহামুখের প্রকাণ্ড হাঁ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ।

কেঁপে উঠল রানা, ‘কি করছ তোমরা!’

অনেক কষ্টে রশিটা আবার ধরতে পারল নিয়াজ। রোঁয়াগুলোর ওপর ছুরি চালান বিনয়। বিদায় নিল ফ্লোট। হাতের এক বাপটায় থ্রটল খুলে দিল রানা, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল লঞ্চ, গোস্ট বার্গকে পিছনে রেখে দূরে সরে আসছে। চ্যানেল ধরে কোনোকোনি এগোল ওরা, সেই সাথে রিসার্চ শিপ রিগার আওয়াজ আরও জোরে বাজল কানে। কিউটের দিকে যাচ্ছে লঞ্চ, কিন্তু আইসব্রেকারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

স্টার্নে উবু হয়ে বসে পিছনে তাকিয়ে আছে বিনয়। ফ্লোটটা ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে দুলাচ্ছে। স্রোত ওটাকে গুহার ভেতর নয়, গুহার সামনে দিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গুহা-মুখের পাশে, বরফের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো ভেলা। মনে হলো ফিরে আসবে। কিন্তু না, ওখানেই থেমে থাকল। গাল-মন্দ করছে বিনয়, ঠোঁট নড়লেও কোন আওয়াজ নেই। তারপর, হঠাৎ করে, গুহার ভেতর থেকে কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মারল, চোখের পলকে সঁাৎ

করে ভেতরে সঁাধিয়ে গেল ফ্লোটটা।

হাঁফ ছাড়ল বিনয়।

লঞ্চ নিয়ে এগোতে গলদঘর্ম হচ্ছে রানা। বড় একটা বরফের চাঁই দেখে বন বন করে হুইল ঘোরাল, কাত হয়ে পড়ল দ্রুতগতি লঞ্চ, মনে হলো উল্টে যাবে, তারপর আবার সিঁথে হলো। ছোট বড় অসংখ্য বরফের টুকরো ভাসছে চ্যানেলে, মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটছে লঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত লঞ্চ চালানো মানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা। অথচ বাঁচার একমাত্র উপায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিস্ফোরকের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

ওদের ডান দিক থেকে এখনও মাথার ওপর ঝুঁকে রয়েছে গোস্ট বার্গ, সেটার বিস্তার ওদের সামনে দক্ষিণ বরাবর যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর।

হুইলের সাথে যেন কুস্তি লড়ছে রানা।

মনে হলো বহু দূরে একটা নিঃসঙ্গ আলো মিটমিট করছে। কিউটের পিছনে জ্বলছে ওটা। ওই একটাই, বাকি সব আলো কি মনে করে কে জানে নিভিয়ে দিয়েছেন গোল্ডম্যান। আইসব্রেকারের পিছনে হালকা খয়েরি ফেনা দেখা গেল, ওদের বাঁ দিকে। ঠাণ্ডা হুল-ফোটানো বাতাসে চোখ-মুখ নীল হয়ে গেল। বরফের টুকরোগুলোকে এড়াবার জন্যে এঁকেবেঁকে ছুটছে লঞ্চ। আর পিছু পিছু ধেয়ে আসছে ষোলো হাজার টন রশ রিসার্চ শিপ রিগা-গোস্ট বার্গের প্রায় গা ঘেঁষে।

এবার সত্যি ভয় পেল ওরা। কেউ ভাবতেও পারেনি এমন হুট করে এত কাছাকাছি চলে আসবে রিগা। রিসার্চ শিপের স্পীড লিমিট সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল ওরা।



‘গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!’ হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ।

দূরে, কিউটের সামনে, দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছে। রানার মনে হলো, গোল্ডম্যান অনেক দেরি করে ফেলেছেন। চ্যানেলের মুখে, দু’পাশে অটল দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল প্রকাণ্ড দুটো আইসবার্গ-হঠাৎ করে দুটোই বিপরীতমুখী দুই স্রোতের মধ্যে পড়ে যেন জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে। সচল হয়ে উঠে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে। কিউট যখন ওখানে পৌঁছবে, পথটা খোলা থাকবে না। নিয়াজ ভুল বলেনি, সত্যিই গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আঁতকে উঠে দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা। আকারে ছোটখাট একটা বাড়ি, ধাক্কা লাগার দরকার হবে না, ঘষা লাগলেই উল্টে যাবে লঞ্চ-এই সাইজের বরফ সামনে আরও দু’একটা দেখা গেল। ঘুর পথে এগোতে হলো ওদেরকে, ফলে আরও পিছিয়ে পড়ছে লঞ্চ। দু’একটা নয়, খানিক পরপর একটা করে, অনেকগুলো বড় বড় চাঁই সামনে। যে-কোন একটার সাথে ধাক্কা লাগা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তবু রানা বেপরোয়া, স্পীড না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে দিল। ওর এই দুঃসাহসের ফলও ফলল হাতেনাতে। কিউটের আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বল দেখল ওরা। তারমানে মাঝখানের দূরত্ব কমছে। স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। অবাক হয়ে গেল ও। গোস্ট বার্গের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে সামনে চলে এসেছে লঞ্চ।

‘পাওয়ার! আরও পাওয়ার!’ ফুঁসে উঠল কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ওভারটেক করো!’

কোন কথাই বলল না ট্রাভকিন। নিজের জাহাজে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। স্টারবোর্ড দিকের জানালা পথে বিশাল আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। এতক্ষণে ট্রাভকিন লক্ষ করল, আইসবার্গটার গোড়ায় একটা ফাঁক রয়েছে। তারমানে কি ফাঁকা ওটা? গোস্ট বার্গ?

চোখে ব্যাথা, পানি ঝরছে, ডুবে থাকা লম্বা বরফটা দেখতে পেল না রানা। লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফিটের কম নয়, লঞ্চের সামনে আড়াআড়িভাবে পড়ল। লঞ্চের বো ধাক্কা খেলো, লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, টুকরোটাকে টপকে যেতে শুরু করল লঞ্চ।

লঞ্চ উঁচু হতে শুরু করতেই একটা হার্টবিট মিস করল রানা। প্রপেলার ধাক্কা খাবে বরফের সাথে, দুমড়েমুচড়ে গিয়ে হয়তো লঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লঞ্চের বো উঠে গেল, তারপর নামতে শুরু করল। খোলের সাথে বরফের ঘষা অনুভব করল ওরা, তারপর কড়াৎ করে আওয়াজ হলো-মাঝখান থেকে ভেঙে গেল টুকরোটা। শূন্যে উঠে পড়ল প্রপেলার, উড়ে পেরিয়ে এল টুকরোটাকে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লঞ্চের পিছনটা। সেই সাথে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-পাঁচিলের ভেতর বিস্ফোরিত হলো ফ্লোটিং মাইন।

প্রথম দিকে একের পর এক ঘটনা যা ঘটল, সব গোস্ট বার্গের ভেতরে। যে টাওয়ারটা লক্ষ টন ঝুল-বরফের ভার বহন করছিল, প্রথমে ধসে পড়ল সেটা। তারপর সার সার স্তম্ভগুলো কাত হলো ধীরে ধীরে, বড় বড় টুকরোয় ভাগ ভাগ হয়ে খসল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে পড়তে লাগল বার্গের ভেতর লেকে। তারপর কাত হয়ে থাকা

স্তুম্ভগুলো আছাড় খেতে শুরু করল। একেকটার ওজন হবে হাজার দু'হাজার টন।

স্তুম্ভগুলোর মাথায় ছিল অসংখ্য চওড়া সেতু, তিনশো ফিট ওপর থেকে নেমে এল সেগুলো। লেকের কিনারায় বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ তুলে পড়তে লাগল একের পর এক। লেকের ভেতরটায় সচল হিমবাহের মহা আলোড়ন উঠল। টাওয়ার গেল, বিশাল ঝুল বরফ গেল, গোস্ট বার্গের পাঁচিলটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছিল অবলম্বনগুলো, সেগুলোও গেল। থাকল শুধু দীর্ঘ পাঁচিল। কিন্তু এবার অবলম্বনহীন পাঁচিলের একটা অংশও কাত হতে শুরু করল। সেই সাথে প্রকৃতির এক ভয়ঙ্করতম দৃশ্য উন্মোচিত হলো ধীরে ধীরে।

পাঁচিল কাত হলো ভেতর দিকে, রিগার উল্টোদিকে। দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে স্রেফ পাথর হয়ে গেল রিগার লোকজন। উঁচু পাঁচিল, খানিক আগে যেটা ওদের মাথার ওপর আকাশ ছুঁয়ে ছিল, কাত হয়ে ধসে পড়ল পিছন দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না বলটুয়েভ। দ্রোভকিনের দিকে তাকাল সে, ক্যাপটেনের চোখ কোটার ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

‘গোস্ট বার্গ...!’ পতনের একনাগাড় গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল দ্রোভকিন। ভয়েস-পাইপের দিকে ছুটে গেল সে, চিৎকার করে বলল, ‘ভয়ের কিছু নেই...ভয়ের কিছু নেই...’

দ্রোভকিন ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারত রানা। রাশিয়ানরা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য চাক্ষুষ করছে, যা ঘটবে তার তুলনায় এ কিছুই না। মাত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে দানব প্রকৃতি।

‘শালার গোস্ট বার্গ পিছন দিকে পড়ল!’ আক্ষেপের সাথে চিৎকার করে উঠল নিয়াজ। ‘কানা ভূতটা...’

‘চুপ থাকো!’ ধমকে উঠল রানা। ‘গাল দিও না বেচারাকে!’

বার্গের সামনে পানিতে আলোড়ন উঠল। ফুলে উঠল পানি, বড় বড় ঢেউ তৈরি হলো। কিন্তু এটা রানার উদ্বেগের কারণ নয়। তীব্র স্রোতের সাথে উঁচু পাহাড়ের মত ঢেউ আসবে-আসবেই, জানে ও। সবাই তাকিয়ে আছে পানির ওপরে, বার্গের দিকে। কিন্তু রানা ভাবছে পানির নিচের কথা।

বাঁচতে হলে দূরে পালাতে হবে। কিউটে না উঠতে পারলে নির্ঘাত মরণ। পিছনে কি ঘটছে ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা, সমস্ত মনোযোগ দিল লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ওপর। লঞ্চ থাকলে ডুবে মরবে সবাই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

রিগা তার কোর্স ধরে আগের মতই ছুটছে, ধসে পড়া গোস্ট বার্গটাকে পাশ কাটিয়ে আসছে। পাঁচিলের একটা মাথা, পিছন দিকে যেটা আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে এখনও, এবার সেটা ধসে পড়ল। বিশেষ কোন দিকে কাত হলো না, সম্ভবত ফাঁপা বলেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ফুটবল মাঠ আকৃতির বার্গের মেঝেতে।

লঞ্চ টন ধসে পড়া বরফের চাপে গোস্ট বার্গের আরেক প্রান্ত, আধ মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে, গম্বুজের আকৃতি নিয়ে ফুলে উঠতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে পাঁচিলের যে অংশটা এখনও খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা মস্ত একটা পাহাড়ের মত দেখতে, কিন্তু পানির তলা থেকে ধীরে ধীরে যেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার তুলনায় ওটা কিছুই না।

বিশাল এলাকা জুড়ে উথলে উঠল সাগর। সারফেস থেকে উঁচু

হয়ে উঠল পানি, যেন ভোজবাজির মত সী-লেভেল দ্রুতবেগে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল ডুবে থাকা নিরেট বরফ-পাঁচিল, সাগরের তলা থেকে যেন জেগে উঠছে একটা মহাদেশ। পাঁচিলের মাথা আর গা থেকে বিপুল জলরাশি জলপ্রপাতের মত নামছে। নায়াত্রাও বোধহয় হার মানবে এর কাছে।

পাঁচিলের সাথে মাথাচাড়া দিল অনেকগুলো টাওয়ার, কোন্টা কোন্টার চেয়ে আগে আকাশ ছুঁতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। একটা টাওয়ার রিগার ব্রিজ, তারপর মাস্তুল ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠে গেল, চওড়া পাঁচিলটা অনুসরণ করল সেটাকে, অন্যান্য টাওয়ারগুলোও পিছিয়ে থাকল না। রিগার ব্রিজ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল কর্নেল বলটুয়েভ আর ট্রাভকিন, পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়।

অসুস্থ বোধ করল কর্নেল। সেই সাথে অসময়োচিত একটা অস্বস্তি। অস্বস্তির কারণটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না সে। ট্রাউজার ভিজে গেছে, কিন্তু টের যে পাবে, সে-অনুভূতি তার নেই।

জলপ্রপাতের চওড়া একটা বিরতিহীন ধারা প্রচণ্ড গর্জনের সাথে রিগার ওপর পড়তে লাগল। শুধু যে পানি তা নয়, পানির সাথে বরফের চাঁইও রয়েছে। একেকটা একশো থেকে হাজার টন ওজনের। গুঁড়িয়ে গেল রেইল। তুবড়ে গেল খোল। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বরফ-পাঁচিল প্ল্যাটফর্মের সাথে ঘুরতে শুরু করল। দশ মিলিয়ন টন, কিংবা তারও বেশি বরফ, বিশাল এলাকা জুড়ে আলোড়িত হতে শুরু করেছে। টাওয়ার, পানি থেকে উঠে আসা পাঁচিল এখনও থামেনি, উঠে যাচ্ছে আরও ওপর দিকে। সেই

সাথে প্ল্যাটফর্মের সাথে একশো আশি ডিগ্রী কোণ রচনা করে ঘুরছে।

‘ভগবান!’ দু’হাতে মুখ ঢাকল বিনয়। ‘এ আমি কি দেখছি! পাতাল থেকে আরেকটা দুনিয়া উঠে আসছে!’

রানা মাত্র একবার, পলকের জন্যে, পিছন ফিরে তাকাল। ওর একমাত্র প্রার্থনা, খোদা, সময় মত যেন কিউটে উঠতে পারি। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে শ্রোতের মাথায় চড়ে ধেয়ে আসতে শুরু করবে ঢেউগুলো। ওদের পিছনে গোস্ট বার্গ উল্টে গেল।

বলা যায় গোটা আকাশটাই যেন ভেঙে পড়ল রিগার মাথায়। রিগার ব্রিজ থেকে ওরা দেখল ওদের মাথার ওপর বিশাল একটা ছায়া নেমে আসছে—ঘুরন্ত একটা ছায়া। নিজের অজান্তেই পারকার পকেট থেকে, শেষ মুহূর্তে, দাবা বোর্ডের খুদে সংস্করণটা বের করে দু’হাতে ধরে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ। কোন্ খেলায় কবে হেরেছিল, চালে কোথায় ভুল করেছিল সেটা বোধহয় জানার ইচ্ছে হয়ে থাকবে। প্রথম বড় আঘাতটা এল। পাঁচিলের অর্ধেকটা আছাড় খেলো রিগার ওপর, ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ তিন চার লক্ষ টন বরফে চাপা পড়ে গেল। রিগার কি ভাঙল বোঝা গেল না, বোঝার দরকারও ফুরাল। রিগা ছিল, ব্যস, অতীত হয়ে গেছে।

‘জাম্প!’ হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

কিউটের স্টার্ন ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, জাহাজের মাঝখানে থেমেছে। খোলের সাথে ঘন ঘন বাড়ি খেলো লঞ্চ। আগেই ওদেরকে আসতে দেখেছেন গোল্ডম্যান, জাহাজের স্পীড কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওপরের রেইল থেকে মই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ‘জাম্প!’ আবার গর্জে উঠল রানা।

একটা মই ধরে ঝুলে পড়ল নিয়াজ, বিনয়ও আরেকটা মই লক্ষ্য করে লাফ দিল। হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, সচল খোলের পাশে লম্বটাকে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কিউটের পিছনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সাগর। ফুলে ওঠা বিপুল জলরাশি ধেয়ে আসছে বিপুল বিক্রমে।

ওপরের রেইল থেকে নতুন আরেকটা রশির মই ছুঁড়ে দিল কাফম্যান। রানার বুক বাড়ি খেলো সেটা। মইটা ধরে হুইল ছেড়ে দিল ও। মুখ তুলে দেখল, রেইল টপকে জাহাজে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। রানার পায়ের নিচে থেকে সরে গেল লম্ব। মই আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল ও। রশিতে পা বাধল। মাথার ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল কাফম্যান, 'কুইক, মি. রানা! কুইক, কুইক, কুইক!'

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, চাপা একটা গর্জন শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। কিউটের স্টার্ন লক্ষ্য করে ছুটে আসছে পাহাড় সমান ঢেউ। ঢেউয়ের সাথে পিঁপে আকৃতির বড় বড় বরফের টুকরো। প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় ভারী টুকরোগুলো নাচছে। ঠিক এই ভয়ই করেছিল রানা। বরফের একটা টুকরো যদি ধাক্কা দেয়, খোলের গায়ে রক্ত মাংস লেপ্টে যাবে।

রেইলের ওপর ঝুঁকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল নিয়াজ, বিনয়, আর কাফম্যান। পাগল হয়ে গেল নিয়াজ রানাকে উদ্ধারের জন্যে। আবার মই বেয়ে নামতে চায় সে। তাকে বাধা দেবে কি, বিনয়ও ফুঁপিয়ে উঠে অনুসরণ করল তাকে। কাফম্যানের একার পক্ষে ওদেরকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না, অন্যান্য তুরা সাহায্য

করল তাকে।

খোলের গায়ে ঝুলছে রানা। স্রোতের সাথে তীরবেগে ছুটে এল ঢেউ। শেষ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল কাফম্যানের গলা চিরে। আর কোন আশা নেই রানার। ওর জন্যে কারও কিছু করারও নেই। খোলের গায়ে মইয়ের শেষ মাথায় ঝুলে থাকল রানা। যমদূত এসে পড়েছে।

কিন্তু তবু সে মাসুদ রানা। আশা নেই জানে, জানে যতটুকুই ওঠার সুযোগ পাক ও, ঢেউ ওর নাগাল পেয়ে যাবে। কিন্তু হাল ছাড়ল না। এবং আশ্চর্য, ঢেউ এসে পড়ার আগেই অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এল রানা। এতক্ষণে আবার একবার কিউটের পিছন দিকে তাকাল ও।

মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে সবুজ একটা পাঁচিল ছুটে আসছে, এরই মধ্যে ওর মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে সেটা। প্রথম ঢেউয়ের চূড়ায় নিরেট বরফের চাঁইটা দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। একবার ভাবল, কি পাপ করেছে ও যে এই মৃত্যু ছিল কপালে! খোলের গায়ে ছাতু হয়ে যাবে শরীরটা।

ঢেউটা আঘাত করল কিউটের পিছনে। প্রায় এক ঝটকায় উঁচু করে তুলল স্টার্ন, সেই সাথে কিউটের সামনের অংশ, বো, ডুব দিল পানির তলায়। দস্তানা পরা হাত দিয়ে রশির মই কজিতে পৌঁচিয়ে নিল রানা, অন্তত লাশটা যেন ভেসে না যায়। কনুই ভাঁজ করে মাথার দু'পাশে তুলল-ক্ষীণ আশা মাথাটাকে বাঁচাতে পারলে বলা যায় না, হয়তো...

লিফটের মত ওপরে উঠে যাচ্ছে স্টার্ন।

ঢেউয়ের ধাক্কা খেলো রানা, ধারাল দাঁতের মত সারা গায়ে

কামড় বসাল ঠাণ্ডা পানি। কাঁধের ওপর অসহ্য চাপ অনুভব করল ও। মনে হলো মই থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে ওকে। কানের পাশে একটানা শৌ-শৌ গর্জন। ওর পাশে, খোলে বোমা ফাটল যেন, বরফের একটা মস্ত চাঁই ভেঙে চুরমার হলো। আচমকা রানা উপলব্ধি করল, গুঁড়ো বরফের স্তূপের ভেতর ঢাকা পড়ে গেছে গোটা শরীর। প্রচণ্ড বেগে খোলের গায়ে আছাড় খেয়ে চাঁইটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলের গায়ে চুম্বকের মত আটকে গেছে গুঁড়োগুলো, তারই ভেতর জ্যাস্ত কবর হয়ে গেছে ওর।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কিউট, ডেউয়ের মাথায় শূন্যে উঠে পড়েছে স্টার্ন, কিন্তু রানা জাহাজের খোলের গায়ে একই জায়গায় রয়েছে। জ্যাস্ত কবর হওয়াতেই বরং কিছুটা সময় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল ও। প্রবল স্রোত মই থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত ওকে, তা সম্ভব হলো না বরফের খোলসের ভেতর থাকায়।

এরপর বো উঠতে শুরু করল পানি থেকে। ধীরে ধীরে সিধে হলো কিউট। দ্বিতীয় ডেউটা আসছে। কিন্তু তার আগেই রেইলের কাছ থেকে ওরা সবাই মই ধরে টানাটানি শুরু করেছে। বরফের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এল রানা। ঠিক তখনই আবার উঁচু হতে শুরু করল স্টার্ন, আবার পানিতে ডুব দিল বো।

ত্রিশ স্রোত খোলের গায়ে চেপে রাখল রানাকে। ওপর থেকে ওরা বুঝতে পারল না রানা বেঁচে আছে কি না। মই টানছে না কেউ, রেইল ধরে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত সবাই।

রানা বেঁচে আছে, কিন্তু হুঁশ-জ্ঞান ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

মনে হলো, বাস্তবে এ-সব কিছুই ঘটছে না, গোটা ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন। তারপর নিজেকে তিরস্কার করল ও, ব্যাটা উজবুক! টের পাও না মই থেকে ছুটে গেছে হাত, ভেসে যাচ্ছ...

মাথার দু'পাশ থেকে ভাঁজ করা কনুই দুটো নিজের অজান্তেই খসে পড়ল। খোলের সাথে ঠক-ঠক, ঠকাঠক বাড়ি খেলো খুলি। তারপর আবার পানি থেকে উঠল বো। চোখের সামনে হঠাৎ আলোর বলকানি, তারপর অন্ধকার দেখল রানা। আলোর মধ্যে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একবার, নিখুঁতভাবে চোখ টিপে দিল একটা। তাকে চিনতে পেরে একটুও অবাক হলো না রানা।

সোহানা।

বহু দূর থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ বাংলায় চিৎকার করে বলল, 'ধরে থাকো, রানা, ধরে থাকো! আমরা তোমাকে টেনে তুলছি!' পরমুহূর্তে, নাকি মিনিট খানেক পর, বলতে পারবে না রানা, শক্ত কিসের সাথে যেন বাড়ি খেলো ও। অস্টোপাস? ওকে জড়িয়ে ধরছে কি ওগুলো?

হাত। মানুষের হাত।

চোখ মেলল রানা। চাঁদের আলো নিয়ে রাতের আকাশ-এ-ও কি স্বপ্ন? তারপর ডগা ভাঙা মাস্তুলটা দেখতে পেল। আগুপিছু দুলছে। কি যেন একটা খসে পড়ল ক্রস-ট্রী থেকে। মনে হলো ওর মুখের ওপর আছাড় খাবে। কিন্তু পড়ল ডেকের ওপর, ওর পাশে। না, কল্পনা নয়, ক্রস-ট্রী থেকে একজন লোকই পড়েছে। খুলি ফেটে গেছে লোকটার। মারা গেছে বোচারা।

কার মরার কথা কে মরছে!

সারা শরীর রক্তে জবজব করছে। ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো ওকে। আবার চোখ মেলে রানা দেখল, নিয়াজ আর বিনয়ের চোখে পানি। ‘দূর বোকা! এমন ছেলেমানুষি করো তোমরা...’ জোর করে হাসতে গেল রানা, সেই সাথে জ্ঞান হারাল।

## বারো

ফুল স্পীডে ছুটছে কিউট। অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত বেগে।

ক্রস কারেন্টের মধ্যে পড়ে সব ক’টা আইসবার্গ সচল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে এগিয়ে এসে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হবে। প্রায় সবগুলো এগিয়ে আসছে কিউটের দিকে। তবে ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছেন সামনের দুই দৈত্যের দিকে। পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে সে-দুটো, বন্ধ করে দিচ্ছে চ্যানেলের মুখ। জাহাজের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইডে একের পর এক নতুন নতুন আইসবার্গ বেরিয়ে আসছে কুয়াশা ছিঁড়ে, কিন্তু সেদিকে তাকাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা কিছু হওয়ার হয়ে যাবে। হয় কিউট চ্যানেল থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে, না হয় দুই আইসবার্গের মাঝখানে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবে।

‘ফুল পাওয়ার!’ বারবার একই নির্দেশ দিচ্ছেন ক্যাপটেন।

ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। পোর্ট আর স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছানাঝা হলো তার চোখ।

সম্মোহিতের মত সামনে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান, কাফম্যানের উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে মনে হলো না। হঠাৎ পকেটে হাত ভরে রুমাল বের করলেন তিনি, কপালের ঘাম মুছে বললেন, ‘সাংঘাতিক গরম!’ পোর্টের দিকে তাকালেন না, তাকালে দেখতে পেতেন কেউ যদি একটা বোতল ছুঁড়ে মারে, আইসবার্গের গায়ে ভাঙবে সেটা।

সামনের ডেকে চাঁদের আলো নেই। জোড়া আইসবার্গের ছায়া পড়েছে। চোখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে আছে কাফম্যান আর হেলমসম্যান। গোল্ডম্যান জানেন, পোর্ট বা স্টারবোর্ডের দিকে তাকালে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন তিনি। বিপদ ভুলে থাকার জন্য হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘নাম্বার ওয়ানটার খবর কি?’

কিছুই বুঝতে না পেরে হেলমসম্যান আর কাফম্যান দৃষ্টি বিনিময় করল। ক্যাপটেন কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

‘কার কথা বলছেন, স্যার?’ বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল কাফম্যান।

‘নাম্বার ওয়ান। গাঁয়ার দি গ্রেট। চতুর নেকড়েটা, আর্কটিক যাকে অচ্যুত মনে করে হেঁয় না। হাতের তালুতে আইসবার্গ নিয়ে খেলে। এখনও বুঝতে পারছ না কার কথা জিজ্ঞেস করছি?’ কথা বলতে বলতেই আবার সামনের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

‘মি. কাফম্যান,’ হঠাৎ ভারী গলায় বললেন ক্যাপটেন, ‘পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকাও!’ ক্যাপটেনের

সম্বোধনই কাফম্যানকে জানিয়ে দিল, অ্যাকটিং মেট থেকে মেট-এ পরিণত হয়েছে সে।

‘পেরিয়ে এসেছি!’ উল্লাসে কাফম্যানের গলা কেঁপে গেল।  
‘গেট থেকে বেরিয়ে এসেছি!’

‘মেইন্টেইন ইওর প্রেজেন্ট কোর্স।’

সামনে, বহুদূর আকাশে, স্নান একটা আলো দেখা গেল। আর্কটিকে ফিরে আসছে সূর্য। ভারী কুয়াশা থাকায় এই আলোর আভা দিনের পর দিন অদৃশ্য ছিল। পিছনের জানালা দিয়ে স্টার্নের দিকে তাকাল কাফম্যান। দুই আইসবার্গের মাঝখানে চ্যানেলের মুখ এত সরু, ছোট একটা লঞ্চও এখন গলবে না।

‘ক্লিয়ার ওয়াটার অ্যাহেড, মি. কাফম্যান,’ ক্যাপটেনের ভারী গলা ব্রিজের ভেতর গম গম করে উঠল। ‘আমরা বাড়ি ফিরছি।’

‘ইয়েস, স্যার!’ বলে স্যালুট ঠুকল মেট কাফম্যান।

‘কিন্তু তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, মি. কাফম্যান?’

‘ইয়েস, স্যার। মি. রানা জ্ঞান হারিয়েছেন, তবে ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে, দু’দিনের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারবেন তিনি। জখমগুলো সারতে অবশ্য আরও ক’টা দিন সময় নেবে...’

সাতই মার্চ, বুধবার, কুইবেকে নোঙর ফেলল কিউট। গ্যাংওয়েতে রানাকে বিদায় জানাল নিয়াজ আর বিনয়। জাহাজে করে আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ সেন্টারে ফিরে যাবে ওরা, নিজেদের কর্মস্থলে। পালা করে দু’জনের সাথে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। দু’জনই ওরা হাসছে।

জাহাজ থেকে প্রথমে নামল ইভেনকো রুস্তভ। রানার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় তার মুখে বিজয়ীর হাসি দেখা গেল। ভাবটা যেন, কেমন ঠক্ দিলাম! দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

গোল্ডম্যান, কাফম্যান, আর হিগিনের কাছ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে রানা। জেটি ধরে এগোল ও। জেটির শেষ মাথায় দুটো গাড়ি দেখল। গাড়ির পাশে জেনারেল ফচ, আর সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর উইলিয়াম অবসনকে দেখা গেল। ওদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে ইভেনকো রুস্তভ।

প্রথমে এগিয়ে এলেন জেনারেল ফচ। রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। কর্নেল উইলিয়াম অবসন আলিঙ্গন করল রানাকে। মাথা আর কাঁধে ব্যান্ডেজ, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা।

‘আপনার জন্যে হিলটনের একটা সুইট রিজার্ভ করা হয়েছে, মি. রানা,’ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন জেনারেল ফচ। ‘এয়ারপোর্টে একটা প্লেন রাখা হয়েছে, আপনার যখন খুশি...’ কুইবেকে আসার পথে আমেরিকান একটা জাহাজের সাথে মাঝ সমুদ্রে দেখা হয়েছিল কিউটের, ওয়ায়েরলেসে সব খবরই পেয়েছেন তিনি।

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘সরাসরি এয়ারপোর্টেই যাব আমি।’

‘মেরিলিন চার্ট...’

‘আমার কাছে, মি. ফচ,’ তাড়াতাড়ি বলল ইভেনকো রুস্তভ। পারকার পকেট থেকে টিউবটা বের করল সে। জেনারেল ফচ আর কর্নেল অবসনের সাথে তার পরিচয়, ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে। হঠাৎ রানার দিকে ফিরল রুস্তভ। ‘আগেই জানিয়েছি, আপনি আমেরিকান নন বলে আপনার ওপর ততটা বিশ্বাস আমি রাখতে পারিনি, মিস্টার রানা।’ টিউবটা বাঁকাতে শুরু করল সে। তালুর

ওপর এক টুকরো কোর পড়ল। আবার ঝাঁকাল রুস্তভ। এবার পড়ল মাইক্রোফিল্ম। ‘আপনি জানেন, এটাই আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। আপনাকে তাই আমি জানিয়েছিলাম।’ হাসতে লাগল সে। ‘কিন্তু এটার কথা আপনাকে আমি জানাইনি,’ বলে টিউবটা আবার ঝাঁকাতে শুরু করল। এবার আরও এক টুকরো কোর বেরল টিউব থেকে। তবু টিউবটা ঝাঁকাচ্ছে রুস্তভ। সবশেষে আরেকটা মাইক্রোফিল্মের মোড়ক বেরল ভেতর থেকে। ‘মি. রানা, এটাই হলো আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। প্রথমটা আপনি দেখেছেন, কিন্তু সেটা নকল—কাজেই আপনি দেখে থাকলেও কিছু আসে যায় না।’ যেন মস্ত এক রসিকতা করেছে, একা একাই হো হো করে হাসতে লাগল রুস্তভ।

রানার ইচ্ছে হলো বলে, বোকচন্দর, জাহাজে থাকতে টিউব টিউব করে জান দিচ্ছিলে বলে আমাদের সন্দেহ হয়, টিউবের ভেতর আরও একটা মাইক্রোফিল্ম আছে, এবং সেটাই আসল মেরিলিন চার্ট। তাই কৌতূহলী হয়ে টিউবটা আমরাও ঝাঁকাতে শুরু করি। বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় মাইক্রোফিল্ম। যদি জানতে, সেটা এখন আমার বগলের তলায় টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে! প্রথম মাইক্রোফিল্মের দুটো ফটোকপি তৈরি করি আমরা, সে-দুটো টিউবে ভরে রাখি, তারপর টিউবটা ফিরিয়ে দেয়া হয় তোমাকে। তোমার হাতে যে দুটো মাইক্রোফিল্ম শোভা পাচ্ছে, ব্যাটা হাড়ে-বজ্জাত, নকল চার্টের কার্বন কপি গুণ্ডলো। কিছুদিন যাক, দুটোই যে নকল, টের পাবে বাছাধন। আমেরিকানরা তখন তোমার পাছায়...। কিন্তু কিছুই তাকে বলল না রানা। চেহারা নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে জেনারেল ফচকে বলল, ‘এয়ারপোর্ট

পর্যন্ত আমাকে একটা লিফট দেবেন, প্লীজ?’

‘ও, শিওর, গ্যাডলি!’ জেনারেল ফচ নয়, সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল অবসন রানার হাত ধরে একটা গাড়ির দিকে এগোল। গাড়িতে ওঠার আগে, কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। অবিশ্বাস্য হলোও সত্যি, ইভেনকো রুস্তভকে ভেঙচাল ও।

এয়ারপোর্টে যাবার পথে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মটা রাশিয়ানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজটা ঢাকায় পৌঁছেও সারা যায়। সোভিয়েত দূতাবাসে যেতে হবে ওকে।

খুক করে কেশে কর্নেল অবসন বললেন, ‘কি ভাবছেন, মি. রানা?’

রানা হাসল। কিছু বলল না।

‘আপনি শুনে খুশি হবেন, মি. রানা,’ আবার বলল কর্নেল অবসন, ‘আমাদের প্রেসিডেন্ট এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত সব জেনেছেন। তিনি যে খুশি হয়েছেন, ধন্যবাদ দিয়েছেন, এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সেটা আপনাকে জানাবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।’

‘কেউ বলতে পারবে না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেননি,’ মৃদু হেসে বলল রানা।

‘ধন্যবাদ, মি. রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ।’ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল কর্নেল অবসন, ‘ভবিষ্যতে যদি কোন দরকার হয়, আশা করি আবার আমরা আপনার সাহায্য পাব...?’

‘ভবিষ্যৎই সে-কথা বলতে পারে...’



‘না, প্লীজ, এড়িয়ে যাবেন না,’ আবেদনের সুরে বলল অবসন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। ‘আপনাকে যেন সিরিয়াস মনে হচ্ছে?’

‘সিরিয়াস? হ্যাঁ, অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে কি, জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে আমার হাতে। কিন্তু যোগ্য লোকের অভাবে...’

‘সি.আই.এ-তে যোগ্য লোকের অভাব?’ হেসে উঠল রানা।

কর্নেল গম্ভীর। ‘বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হাতে মাঝে মাঝে এমন টপ সিক্রেট কাজ থাকে, নিজেদের কোন এজেন্টকে বিশ্বাস করে সে-কাজ দেয়া চলে না। সেই রকম একটা কাজের কথা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই আমি...’

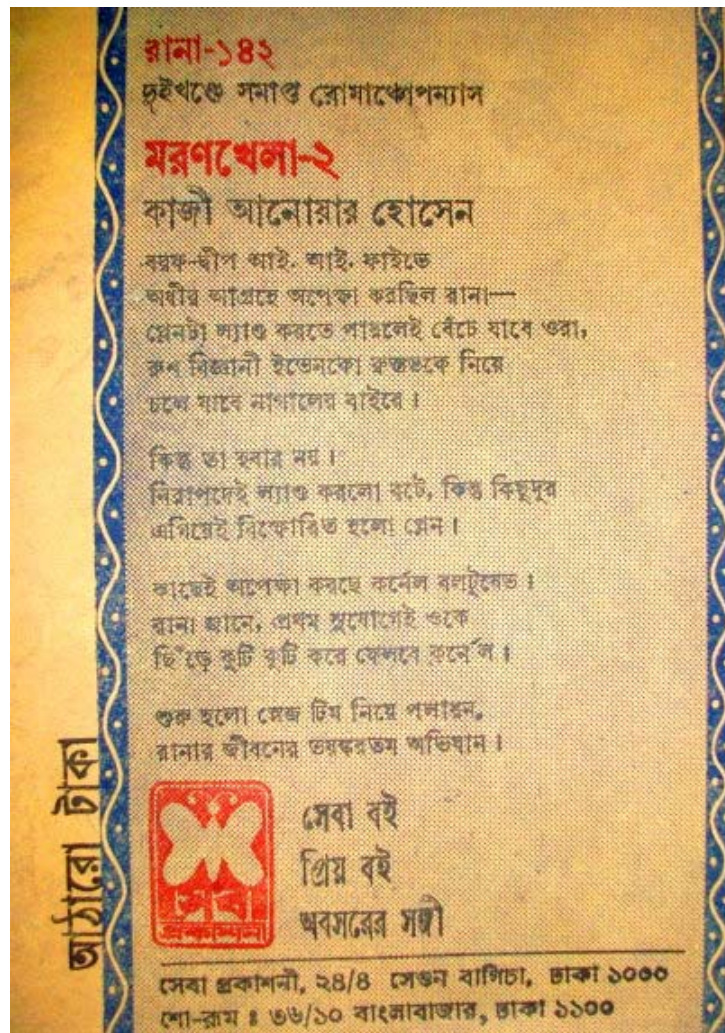
হাতজোড় করল রানা। ‘এখন? মাফ করুন!’

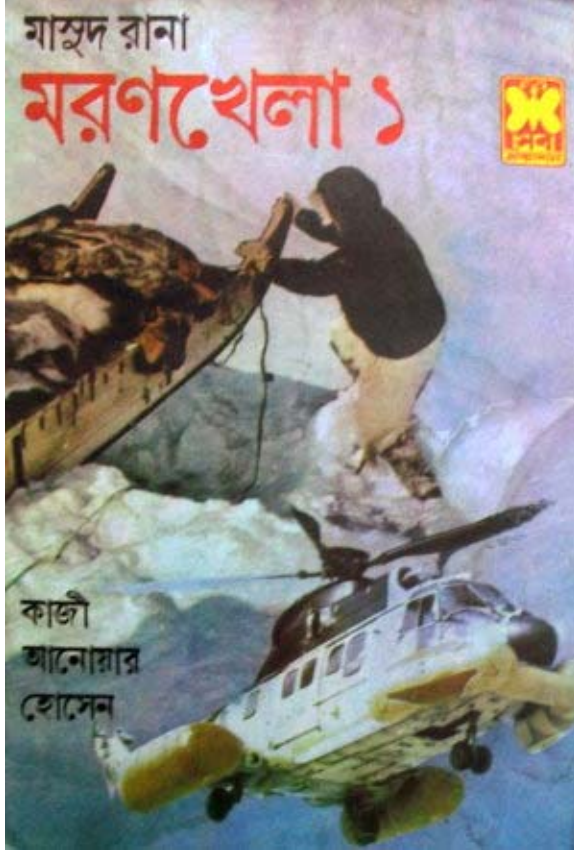
হেসে ফেলল কর্নেল। ‘ঠিক আছে, পরে একসময়। আমিই যোগাযোগ করব। তার আগে একটু বলে রাখি, কাজটা করে দেয়ার অনুরোধ শুধু আমার তরফ থেকে নয়, প্রেসিডেন্টের তরফ থেকেও পাবেন আপনি। আশা করি প্রত্যাখ্যান করবেন না।’

‘দেখা যাবে।’

এরপর রানাকে আর বিরক্ত করল না অবসন।

\*\*\*





## এক

আঠারোই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার।

বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা চিরে দিল কালো আকাশটাকে, কড়াং করে একটা বাজ পড়ল কোথাও। ঘনঘোর দুর্ঘোণের রাত, ঝড়ো হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে বন-বাদাড়ের ঝাঁকড়া মাথা, একটানা তুমুল বর্ষণে থই থই করছে জলাভূমি আর ধু-ধু প্রান্তর। ওদেশে ফেব্রুয়ারি মানেই তো এই-প্রবল ঝড়, ঘন ঘন বজ্রপাত, আর তুমুল বৃষ্টি।

কুউউ, ঝিকঝিক ঝিকঝিক। ঝড়-বৃষ্টি মানামানি নেই, বত্রিশটা বগি নিয়ে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল গতিতে ছুটে চলেছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। বাঁধনহীন চাকায় গতির উল্লাস, সমস্ত যান্ত্রিক শব্দ এক হয়ে বারবার যেন একই সুরে গাইছে, যাকে পাই তাকে খাই, যাকে পাই তাকে খাই। দুশো মাইলের মধ্যে কোথাও কোন বিরতি নেই। বন্ধ জানালার বাইরে হিম শীতল প্রকৃতি ফুঁসছে, সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম থাকায় ট্রেনের ভেতরটা গরম। রাত প্রায় বারোটা, স্লিপিং কারের ভেতর কমল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে বাংলাদেশী এক যুবক।

প্রশস্ত স্লিপিং কারটাকে দু'ভাগ করেছে সন্ন্যাসী একটা করিডর।

করিডরের দু'পাশে ভারী পর্দা ঘেরা দুটো কেবিন। নরম বিছানায় শুয়ে দোল খাচ্ছে ঘুমন্ত আরোহী, সাউন্ড-প্রফ দরজা জানালা দিয়ে বাড় বা ডিজেল ইঞ্জিনের কোন আওয়াজই ভেতরে ঢুকছে না। কান পাতলে শুধু পাশের কেবিন থেকে ভেসে আসা প্রৌঢ় এঞ্জিনিয়ারের নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যাবে।

বিশ মাইল সামনে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন সশস্ত্র লোক। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন, বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই। চারজনই ওরা দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ, দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। প্রত্যেকের পরনে কালো সুট, সুটের ওপর ওভারকোট, ওভারকোটের ওপর রেনকোট, মাথায় চওড়া কার্নিসঅলা হ্যাট। প্রত্যেকে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে, দু'জন এরই মধ্যে হোলস্টার থেকে বের করে ওভারকোটের পকেটে রেখেছে রিভলভার। ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

সবচেয়ে লম্বা লোকটা ওদের দলপতি, ছয় ফিট দু'ইঞ্চি। কজি থেকে ওভারকোটের হাতা সরিয়ে হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বুলাল সে। বিশ মাইল দূরে রয়েছে ট্রেন, ট্রেনের সামনে ইতিমধ্যে বদলে গেছে সিগন্যাল। হতভম্ব ড্রাইভার বাধ্য হয়ে ব্রেক চাপ দিতে শুরু করেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে কোথাও থামার কথা না থাকলেও সিগন্যালকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য নেই তার।

'ট্রেনে ব্যাটা থাকলে হয়,' দলপতির পাশ থেকে সংশয় প্রকাশ করল একজন, দু'হাতের ভেতর আড়াল করা দোমড়ানো সিগারেটে কষে একটা টান দিল সে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে।

কটমট করে লোকটার চোখের দিকে তাকাল দলপতি,

চেহারায় তীব্র ভরৎসনা। 'আছে,' শান্ত গলায় আশ্বস্ত করল সে। 'হেডকোয়ার্টারের ইনফরমেশন ভুল হতে পারে না।'

'থাকলেও,' বলে খানিক ইতস্তত করল ধূমপায়ী, 'ওর সম্পর্কে যা শুনলাম, ট্রেন থেকে নামানো সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

'এটা দেখে বাপ্ বাপ্ করে নেমে আসবে।' ওভারকোটের পকেট থেকে পয়েন্ট ফরটিফাইভ কোল্ট রিভলভারটা বের করে দেখাল দলপতি। সিলিভার চেক করে আবার সেটা পকেটে রেখে দিল সে। 'মনে আছে তো, আমাদের নাটকের এক-আধজন দর্শক থাকতে হবে। আর অভিনয়ে কোন খুঁত থাকা চলবে না।'

'মাসুদ রানা...মাইরি বলছি, নামটার মধ্যে কেমন যেন ইম্পাত ইম্পাত, নিরেট একটা ভাব আছে...'

'ভয়ের কিছু নেই। সে একা, আমরা চারজন...'

'কিন্তু খেপে গেলে সে নাকি একাই একশো...'

'আরে রাখো, অমন বীরপুরুষ কত দেখলাম!' তাচ্ছিল্যের সাথে মন্তব্য করল একজন।

আরেকজন ঝাঁঝের সাথে বলল, 'আহত করা যাবে না, এ আবার কি কথা! ও যদি ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, কি অবস্থা হবে ভাবতে পারো? এক একজনকে ধরে আছাড় মারবে, অথচ আমরা তার গায়ে আঁচড়টাও কাটতে পারব না!'

'নির্দেশ নির্দেশই,' দলপতির গম্ভীর তিরস্কার শোনা গেল। 'সব কথা জানো না, কাজেই চুপ করে থাকো। আর, আহত করা যাবে না মানে আমি বলতে চেয়েছি, লোকটাকে অচল করা যাবে না। বিশেষ করে পা, চোখ, আর হাত যেন অক্ষত থাকে। কেউ গুলি করবে না, কারণ কোথায় লাগতে কোথায় লাগে তার ঠিক

নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওর নাক বা দাঁত ভাঙা যাবে না। অফিসে ওর ওপর টরচার চালানো হবে বলে শুনে এসেছি। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, লোকটা যেন অচল হয়ে না পড়ে।’

সতেরো মাইল দূরে রয়েছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে ঝড়ো রাতের দিকে তাকিয়ে আছে ড্রাইভার। এইমাত্র পেরিয়ে আসা সিগন্যালের নির্দেশ ছিল, গতি কমাতে হবে। অথচ দু’ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনের কোথাও থামার কথা নয়। কি ঘটছে কী?

স্পীড ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে ড্রাইভার। ইস্পাত-মোড়া ছাদে ঝাঁক ঝাঁক বৃষ্টি পড়ছে, কাঁচমোড়া দরজা আর জানালার বাইরে দাপাদাপি করছে বাতাস। পরবর্তী সিগন্যালকে পাশ কাটিয়ে এল ট্রেন। টকটকে লাল সঙ্কেত-মানে, সামনে বিপদ। ট্রেন থামাবার চূড়ান্ত নির্দেশ। এর মানেটা কি? ব্রেকের ওপর চাপ আরও বাড়াল ড্রাইভার। সেডার ফলসের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্রেন। সামনে পরিত্যক্ত স্টেশন। অনির্ধারিত বিরতি।

দু’মিনিট পর একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। কড়কড় কড়াং করে কাছে পিঠে কোথাও একটা বাজ পড়ল। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল মাসুদ রানা, ট্রেনের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, সারা শরীর শিউরে উঠল গোপন পুলকে। স্বপ্ন দেখছে রানা, মধুর সুখে ওর শরীর-মন ভরপুর।

করিডরের দু’পাশের পর্দা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলা হলো। ভেজা রেনকোট পরা তিনজন লোক রানার বিছানার সামনে দাঁড়াল। কেবিনের মেঝেতে পানি জমছে। দলপতির হাতে

পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো, রানার চেহারার সাথে ফটোটা মেলাল সে। ‘হ্যাঁ, এই লোকই, ডিক,’ শান্ত গলায় বলল সে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলাল রানা। কোল্ট ফরটিফাইভের কালো মাজল্ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ‘সরাও ওটা,’ বিড়বিড় করে বলল ও। ‘গুলি বেরিয়ে যেতে পারে, তোমার হাত ভিজে।’

এক নিমেষে বিপদ আঁচ করে নিয়েছে রানা। ট্রেন চলছে না, তিন আগন্তুকের গায়ে ভিজে রেনকোট, শ্রৌঢ় আরোহীর বিস্ফারিত চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক। দলপতির দু’পাশে দাঁড়ানো লোক দু’জন রিভলভার বের করেনি, তবে রেনকোটের বোতাম খুলে ওভারকোটের পকেটে হাত ভরে রেখেছে। ওদের একজন রানার দিকে একটু পাশ ফিরে আছে, লক্ষ রাখছে অপর আরোহীর দিকে।

‘কাপড় পরো,’ কঠিন সুরে নির্দেশ দিল দলপতি। ‘ট্রেন থেকে নামতে হবে তোমাকে।’

‘মামার বাড়ির আবদার?’ উদ্বেগ গোপন করে ফাঁস করে উঠল রানা। ‘কে তুমি?’ রানা এজেন্সির শাখা অফিসগুলোয় সারপ্রাইজ ভিজিট দিচ্ছে ও, বিরতিহীন এক হুগা চরকির মত আমেরিকার এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লাস্ত। সম্ভাবনাগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করল। অতর্কিতে ঝটকা মেরে দলপতির হাত থেকে রিভলভারটা ফেলে দিতে পারে। একই সাথে তার ডান পাশে দাঁড়ানো লোকটার তলপেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারতে পারে। তৃতীয় লোকটা ওভারকোট থেকে রিভলভার বের করার আগেই...না, ঝাঁকি নেয়া উচিত হবে না। গুলি শুরু হলে

বেচারি এঞ্জিনিয়ার মারা যেতে পারে।

‘রেক্স, এফ.বি.আই.,’ ঘেউ ঘেউ করে উঠল দলপতি।  
‘তাড়াতাড়ি করো-ট্রেন তোমার জন্যে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে...’

‘নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে তোমাদের,’ গম্ভীর গলায় বলল রানা। ‘আমি একজন বাংলাদেশী...,’ হকের সাথে ঝুলন্ত জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল ও।

‘ওয়াচ ইট!’ গর্জে উঠল রেক্স। চোখের পলকে তার দুই সঙ্গীর হাতে রিভলভার বেরিয়ে এল।

‘আমি নিরস্ত্র,’ ব্যঙ্গ মেশানো মুচকি একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। ওদের হুমকি গ্রাহ্য না করে হক থেকে জ্যাকেটটা নামাল ও। ‘পাসপোর্ট বের করছি।’ তিনটে রিভলভারের মাজল ওর দিকে তাক করা, দেখেও না দেখার ভান করল ও। ভেতরের পকেট থেকে দু’আঙুলে ধরে সাবধানে পাসপোর্টটা বের করে দলপতির দিকে বাড়িয়ে দিল।

এক হাত ব্যবহার করেই পাসপোর্টটা খুলল রেক্স, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, ‘জাল পাসপোর্ট, ডিক-তাও একেবারে কাঁচা হাতের কাজ।’ রানার দিকে ফিরল সে, পাসপোর্টটা নিজের পকেটে ভরল। ‘বুঝতেই পারছ, তুমি ধরা পড়ে গেছ। এখন আর কোন কৌশলই কাজে আসবে না। লক্ষ্মী ছেলের মত যাবে, নাকি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে?’

‘ওটা যদি জাল পাসপোর্ট হয়, তাহলে তোমরাই বলো, আমি কে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। এদের সাথে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মুক্তি পেতে হলে ট্রেন থেকে নামতে হবে ওকে। মোক্ষম একটা সুযোগ দরকার, নিরীহ একজন

আরোহীর উপস্থিতিতে তা পাওয়া যাবে না।

জবাব না দিয়ে হাতঘড়ি দেখল রেক্স, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

‘আমি জন ফাইবার,’ করিডরের ওদিক থেকে বলল প্রৌঢ় এঞ্জিনিয়ার। ‘এই ভদ্রলোকের সাথে আমার কথা হয়েছে। বললেন, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির উনি ডিরেক্টর...’

‘ভদ্রলোক, হুঁহু!’ ঘড়ি থেকে চোখ তুলে এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল রেক্স। ‘রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি ওকে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে গরুখোঁজা করছে।’ রানার দিকে ফিরল সে। ‘আল মাসুদ, হাত দুটো এক করে বিছানার ওপর রাখো!’

গায়ের কমল সরিয়ে বিছানা থেকে নামল রানা। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল রেক্স। দেখা গেল টাই, জ্যাকেট আর জুতো ছাড়া কাপড়চোপড় পরেই শুয়েছিল রানা।

‘আমরা নেমে গেলেই ট্রেন ছাড়বে,’ রানার টাই আর জুতো পরা শেষ হতে এঞ্জিনিয়ারকে বলল রেক্স। ‘তখন আপনি নিশ্চিত মনে ঘুমাতে পারবেন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন যে বদমাশটার সাথে এতক্ষণ থেকেও প্রাণটা খোয়াননি।’

জ্যাকেট পরতে পরতে নির্লিপ্ত চোখে দলপতির দিকে তাকাল রানা, প্রতিবাদ করল না।

‘ওটা তোমার ব্যাগ?’ জিজ্ঞেস করল রেক্স, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ডান পাশের সহকারীকে ইশারা করল সে। সহকারী টেবিল থেকে রানার ব্যাগটা তুলে নিল। ‘এবার হাত দুটো এক করে...’ রেক্সের বাঁ পাশের লোকটার হাতে একটা হ্যান্ডকাফ দেখা গেল...।

‘না,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। ‘হয় আমি এভাবেই যাব, না হয় আমাকে গুলি করতে হবে—কি করবে ঠিক করো।’

করিডর ধরে এগোল ওরা। রানার সামনে ব্যাগ হাতে ডিক, পিছনে রিভলভার হাতে রেক্স আর তার অপর সহকারী। দু’পাশের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল আরোহীরা, ছোট মিছিলটা দেখে বিস্মিত হলো। খালি পায়ে ওদের পিছু পিছু এল এঞ্জিনিয়ার জন ফাইবার। তাকে বলতে শোনা গেল, ‘ওর সম্পর্কে কিছুই তো বললেন না! আমি হয়তো সাহায্য করতে পারতাম...’

উঁচু গলায় জবাব দিল রেক্স, সবাই যাতে শুনতে পায়, ‘কুখ্যাত খুনী। ফলসাম জেল থেকে পালিয়েছে।’

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা, ঝুলে পড়েছে কাঁধ দুটো। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, যেন আড়ষ্ট ভাবটা এখনও কাটেনি। ওর দিকে চেয়ে পিছন থেকে মুচকি হাসল রেক্স। ভাবল, লোকের অভ্যেসই এই, তিলকে তাল করা! এই লোক নাকি একাই একশো! হতে পারে—উলুবনে শেয়াল রাজা!

ট্রেনের বাইরে এ যেন আরেক জগৎ। সিঁড়ি বেয়ে রানা প্ল্যাটফর্মে নামতেই শীত, বৃষ্টি, আর বাতাস একযোগে হামলা চালাল। সেডার ফলস বনভূমির কিনারায় পরিত্যক্ত স্টেশন, বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় নির্জন একতলা ভবনটাকে ভূতের আস্তানা বলে মনে হলো।

এঞ্জিন রুম ছেড়ে ড্রাইভার নামেনি, তবে কয়েক ফিট দূরে গার্ড আর ড্রাইভারের সহকারীকে দেখা গেল, এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দাঁড়িয়ে ভিজছে। শেডের নিচে পৌঁছুতেই ভিজে গোসল হয়ে গেল রানা। হঠাৎ ওদের সবার গায়ে চোখ

ধাঁধানো এক ঝলক আলো পড়ল।

‘হল্ট!’ পিছন থেকে নির্দেশ দিল রেক্স। ‘ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব আমরা। টিমোথি, ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা খুলে নিয়ে এসো!’

এঞ্জিন রুমের দিকে ছুটে গেল টিমোথি, আলোটা ওদিক থেকেই এসেছে। ড্রাইভারের সহকারী আর গার্ডের সাথে চাপা স্বরে কথা বলল সে। কিছু একটা হাত-বদল হলো। টিমোথি ফিরে আসতে শুরু করল, লোক দু’জন উঠে পড়ল ট্রেনে।

এক মুহূর্ত পর সচল হলো ট্রেন।

সুযোগের অপেক্ষায় আছে রানা, রেক্স সেটা ভাল করেই জানে। রানার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে সে, হাতের রিভলভার বুক বরাবর তাক করা। রানার পিছনে রয়েছে ডিক।

টিমোথি ফিরে আসতে চারজনের দলটা প্ল্যাটফর্মের আরেক দিকে চলে এল। ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা। ওকে কাঁপতে দেখে সকৌতুকে হাসল রেক্স। ট্রেনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে সে বলল, ‘দুঃখিত, একটু কষ্ট দিলাম। আমাদের অফিসে তোমার জন্যে গরম কফি আর যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা আছে, গেলেই দেখতে পাবে!’ ডিকের সাথে তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় রানার নজর এড়াল না।

স্টেশন থেকে নেমে বিশ গজের মত এগোল ওরা, বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড গাড়িটা। হেডলাইট জ্বলছে। ড্রাইভারকে নিয়ে সংখ্যায় প্রতিপক্ষ হলো চারজন।

সামনের দরজা খুলল ডিক, মাথা নিচু করে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসতে যাচ্ছে টিমোথি। পিছনের সীটের দরজা খুলে রানাকে



পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল রেক্স। কোন রকম কৌশল না করে গাড়ির ভেতরে ঢুকল রানা। সামনের সীটে মাত্র বসেছে টিমোথি, ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিক। রানা গোবেচার ভঙ্গিতে বসে আছে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাল ড্রাইভার। পিছন থেকে তার মাথার চুল খামচে ধরল রানা।

বাঁ কাঁধ, বাঁ হাত, আর মাথা দিয়ে সবগে দরজার গায়ে পড়ল রানা, ডান হাতে ধরে আছে ড্রাইভারের চুল। ঠিক যেন বিনা শব্দে একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো গাড়ির ভেতর। সীটের পিঠ উপরে এল ড্রাইভার, পিছনের সীটের দরজার কাছে মেঝেতে মাথা পড়ল, পা দুটো সামনের সীটের পিঠে আটকে গেছে। দরজার গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে রানা, দরজার ধাক্কা রাস্তার পাশে চিং হয়ে পড়েছে রেক্স। বাঁকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল সে, নাকটা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তার বুকের ওপর পড়ল রানা, এক ঝটকায় কেড়ে নিল হাতের রিভলভার।

কোল্ট অটোমেটিকটা রেক্সের খঁতলানো, রক্তাক্ত নাকের ফুটোয় চেপে ধরল রানা। গোটা ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘটে গেলেও হাতের ব্যাগ ফেলে দিয়ে এরই মধ্যে রানার দিকে রিভলভার ধরেছে ডিক।

‘গুলি করো,’ আহ্বান জানাল রানা। ‘তবে রেক্সের আশা ছেড়ে দিয়ে!’ হেডলাইটের আলো ওদের কারও গায়েই সরাসরি পড়ছে না, তবে আলোর আভায়ে প্রত্যেককেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

গাড়ির ভেতর গোঙাচ্ছে ড্রাইভার। দরজার ফ্রেমের সাথে মাথা ঠুকে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে সে, সামনের জোড়া সীটের মাঝখানে পা

আটকে যাওয়ায় প্রায় বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। হাঁ করে জানালা দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে টিমোথি, তার হাতে ধরা রিভলভারের ব্যারেল জানালার ফ্রেমে ঠেকে রয়েছে।

বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে ভিজে চুল সরাল রানা, হাতটা কপালে রেখে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করল। ‘দুটোই ছুঁড়ে দাও এদিকে,’ ঝড়ের শৌ শৌ আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা।

বৃষ্টির পানিতে প্রতি মুহূর্তে ধুয়ে যাচ্ছে রক্ত, ফ্যাকাসে দেখাল দলপতি রেক্সকে। ডিক আর টিমোথি ইতস্তত করছে দেখে খঁকিয়ে উঠল সে, ‘যা বলছে করো!’

রেক্সের বুকের ওপর বসে তার হাত দুটো জুতোর নিচে চেপে রেখেছে রানা। রেক্সের মাথার কাছে প্রায় এক সাথে পড়ল রিভলভার দুটো, তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা। ‘এবার ড্রাইভারের রিভলভার। তারপর গাড়ি থেকে বের করো ওকে।’

‘ড্রাইভার নিরস্ত্র...’ শুরু করল ডিক।

‘আমি বলছি, কোন চালাকি নয়, ডিক!’ রানার নিচে থেকে হুঙ্কার ছাড়ল রেক্স।

ড্রাইভারের রিভলভার তার পকেটেই ছিল, সেটা বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল টিমোথি। গুলিগুলো বের করে নিয়ে দূর ঝোপের দিকে রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল রানা। মাথায় হাত দিয়ে, টলতে টলতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার।

‘প্রত্যেককে আলাদা ভাবে আদেশ করতে হবে নাকি?’

রানার ঝাঁঝ লক্ষ করে ভিজে বিড়ালের মত টিমোথিও বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। ওদের তিনজনকে গাড়ির পাশে, পাঁচ হাত দূরে

এক লাইনে দাঁড় করাল রানা। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে রেক্সের বুক থেকে উঠল ও। পিছিয়ে এসে গাড়ির পিছনের দরজাটা বন্ধ করল। ওদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

‘রানা, শোনো...’ আবেদনের সুরে বলল রেক্স, উঠে বসেছে সে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছেছে।

‘রানা? আল মাসুদ নই তাহলে?’ জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কোল্ট অটোমেটিকের ব্যারেল জানালার ফ্রেমে ঠেকে আছে। ‘বুঝতেই পারছ, ইচ্ছে করলে সারারাত এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে আমি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি। তা যদি না চাও, ঝটপট জবাব দেবে।’

‘রানা, শোনো, প্লীজ,’ হড়বড় করে বলল রেক্স। ‘আমরা সি. আই. এ-র লোক, পরিচয়-পত্র আছে...।’ কাছেপিঠে কোথাও একটা গাছ ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ হলো, শেষ দিকের কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

‘লেজে পা পড়তেই জাত বদলে ফেললে? বাপের নাম ভুলে যাওনি তো?’ একটা হাত লম্বা করে দিল রানা। ‘কই, দেখি।’

ওভারকোটের বোতাম খুলে শার্টের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল রেক্স। তার চারপাশে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, কাদায় হাত আর হাঁটু রেখে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল সে।

রানার লম্বা করা হাতে কার্ডটা দিয়ে পিছিয়ে গেল রেক্স। গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলে কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে হাসল রানা। ‘জাল-তাও একেবারে কাঁচা হাতের কাজ।’

‘স্বীকার করি, তোমার খেপে যাওয়ার কারণ আছে,’ নরম

সুরে, বিনয়ের অবতার সাজল রেক্স। ‘কিন্তু সব কথা শুনলে তুমিও বুঝবে, এই অভিনয়টুকুর দরকার ছিল। একটা কাজে তোমাকে আমাদের দরকার, কিন্তু কাউকে সেটা জানতে দেয়া চলবে না, সে জন্যেই ট্রেনে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। তাছাড়া, এটা একটা ইমার্জেন্সী...’

অতি বিনয় চোরের লক্ষণ হলেও, রানার মনে হলো রেক্স সবটুকু মিথ্যে বলছে না। যদিও ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সহজ কোন উপায় নেই। পরিচয়-পত্র জাল হওয়া খুবই সম্ভব। ‘তোমাদের অপারেশনাল চীফের নাম বলো।’

প্রতিবাদ জানাল রেক্স, ‘এটা একটা সিক্রেট।’

‘আমার পরিচয়টাও তাই,’ বলল রানা।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অপারেশনাল চীফের নাম বলল রেক্স। এরপর রানা একের পর এক অনেকগুলো প্রশ্ন করল। রেক্সের উত্তর শুনে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ও, এরা সম্ভবত সি.আই.এ-রই লোক, কিংবা সি.আই.এ-র ভেতর এদের ইনফরমার আছে। ‘এবার আমার সম্পর্কে কি জানো বলো,’ জিজ্ঞেস করল রানা।

গড়গড় করে বলে গেল রেক্স, ‘তুমি মেজর মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তোমার একটা কাভার। এজেন্সির শাখা অফিসগুলো ভিজিট করার জন্যে আমেরিকায় এসেছ তুমি। তোমার বসের নাম মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। বলা যায় প্রায় অলৌকিকভাবে আজও তোমরা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছ-না কম্যুনিষ্ট ব্লকে ভিড়ছ, না পুঁজিবাদী দুনিয়ায়।



তোমাদের একটা নীতি আছে, সেই নীতির মূল কথা হলো সুপারপাওয়ারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা। তাই মাঝে মাঝে তোমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরক্তি উৎপাদন করো, আবার কখনও সোভিয়েত রাশিয়ার। কিন্তু মজার কথা হলো, প্রায়ই দেখা যায়, তোমাদের সাহায্য ছাড়া কে.জি.বি. বা সি.আই.এ-র চলে না। তাই সবাই পারতপক্ষে তোমাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়।

‘দুর্গমিত, অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। এবার তোমার সম্পর্কে বলি। তুমি মেজর মাসুদ রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের...’

‘তেল মাথাবার ভাল ট্রেনিং পেয়েছ,’ রেক্সকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। ‘এবার বলো, আমাকে তোমাদের কি দরকার।’

‘সব কথা কি আমাদের বলা হয়?’ রেক্সকে প্রায় অসহায় দেখাল। ‘ওয়াশিংটনে গেলেই তুমি জানতে পারবে...’

‘ওয়াশিংটন?’ রানার ভুরু কুঁচকে উঠল। ‘তোমরা কি ওয়াশিংটন থেকে আসছ?’

‘কুক্ষণই বলতে হবে, যাত্রার শুরুতেই বিপত্তি দেখা দেয়,’ বলল রেক্স। ‘গোটা আমেরিকার ওপর দিয়ে ইলিকট্রিকাল স্টর্ম বয়ে যাচ্ছে। কোন প্লেন ফ্লাই করছে না। অথচ তোমার ট্রেনকে থামাতে হলে প্লেনে করে আসতে হবে আমাদের। নিজেদের প্লেন আর পাইলট ছিল বলে আসতে পারলাম। বুঝতে পারছ তো, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কি রকম ঝুঁকি নিয়েছি আমরা?’

‘কিন্তু সবই বৃথা,’ বলল রানা। ‘তোমাদের সাথে আমি যাচ্ছি না। কারণ, এক, তোমাদের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করছি না,

দুই, আমার কোন দায় পড়েনি যে সি.আই.এ-কে সাহায্য করব। মাইল ত্রিশেক হাঁটলেই লোকালয়ে পৌঁছে যাবে তোমরা। গুডবাই।’

‘এক মিনিট,’ দ্রুত বলল রেক্স, অস্থির দেখাল তাকে। ওভারকোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। ‘এই চিঠিটা পড়ে দেখো, প্লীজ।’ কয়েক পা এগিয়ে খামটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

‘কার চিঠি?’

‘অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের।’

জর্জ হ্যামিলটন গোপন একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির চীফ, প্রেসিডেন্ট ছাড়া অল্প দু’একজন এই এজেন্সি সম্পর্কে জানে। রাহাত খানের বন্ধু তিনি, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সম্ভব হলে রানার কোন অনুরোধ তিনি ফেলেন না, রানাও আপদে-বিপদে তাঁকে সাহায্য করে। খামটা খুলে চিঠিটা বের করল ও। ছোট্ট চিঠি, টাইপ করা, নিচের সইটা প্রথমে ভাল করে দেখল ও।

অ্যাডমিরাল লিখেছেন, ‘রানা, সি.আই.এ-র অপারেশনাল চীফের সাথে ওয়াশিংটনে দেখা করো। সম্ভব হলে ওদের কাজটা করে দিয়ো। শুভেচ্ছা, জর্জ হ্যামিলটন।’

‘এতক্ষণ এটা দেখাওনি কেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সইটা তুমি জাল বলবে, তাই,’ সাথে সাথে জবাব দিল রেক্স।

‘তুমি বলতে চাইছ জাল নয়?’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রেক্স, বাতাসের ধাক্কায় অনবরত টলছে সে। ‘এরপরও যদি তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস না করো, কিছু করার নেই। ছেড়ে দাও আমাদের, ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে

বলি, আমরা ফেল করেছি।’

দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। অ্যাডমিরালের সইটা চিনতে পেরেছে ও, জাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে চিঠির ভাষা। অ্যাডমিরাল ওকে আদেশ করতে অভ্যস্ত নন, সম্পর্কটা সে রকম নয়, অথচ প্রথম বাক্যটা আদেশের সুরেই লিখেছেন তিনি। যেন ওয়াশিংটনে সি.আই.এ-র অপারেশনাল চীফের সাথে রানার দেখা করাটা একান্ত জরুরী, ওখানে যেন কি একটা খবর অপেক্ষা করছে রানার জন্যে। পরের বাক্যটা অবশ্য অনুরোধের সুরে লেখা, কিন্তু বাহুল্যবর্জিত চণ্ডে। প্রতি দু’লাইনের মাঝখানে প্রায় সময়ই কিছু অলিখিত বার্তা থাকে, সেটা পড়তে পারছে না বলেই অস্বস্তি বোধ করল রানা। ওর মন বলছে, ওয়াশিংটনে যাওয়া দরকার। অথচ সি.আই.এ-র আচরণে ও বিরক্ত।

‘ঠিক আছে, যাব আমি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু আমার সাথে মাত্র একজন আসতে পারবে তোমরা-তুমি, রেক্স।’

‘প্লীজ, রানা, এটা অমানবিক....’ প্রায় হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রেক্স। ‘এই দুর্যোগের মধ্যে...’

‘ঘুমন্ত মানুষকে ট্রেন থেকে নামানো অমানবিক নয়?’ কঠোর দেখাল রানাকে। ‘ইয়েস, অর নো?’

‘আচ্ছা শালা, অফিসে পৌঁছে নিই!’ মনে মনে বলল রেক্স। সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে, নিচু স্বরে কথা বলল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে গাড়ির দিকে এগোল।

‘এয়ারপোর্ট এখান থেকে কত দূর?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘তুমি ড্রাইভ করবে।’

## দুই

উনিশে ফেব্রুয়ারি, শনিবার, রাত তিনটে। ওয়াশিংটন, সি.আই.এ-র অপারেশনাল হেড অফিস।

নিজের অফিসে পায়চারি করছেন জেনারেল স্যামুয়েল ফচ। ঠাণ্ডাকে তাঁর বড় ভয়, বোধহয় সেজন্যেই আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ বানানো হয়েছে তাঁকে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা দায়, ভুর ভুর করে কাঁচা রসুনের গন্ধ বেরোয় মুখ থেকে। মাঝারি আকৃতির শক্ত-সমর্থ মানুষ, শিশুর সারল্য মাথা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বুদ্ধির পঁচ কষতে এই লোকের জুড়ি মেলা ভার। হিটিং সিস্টেম চালু থাকায় অফিসের ভেতর তাপমাত্রা তিরিশি ডিগ্রী ছাড়িয়ে গেছে, ওপরের দুটো বোতাম খোলা শুধু একটা শার্ট গায়ে ঘামছেন তিনি।

‘আপনার মাসুদ রানা এইমাত্র এয়ারপোর্টে নামল,’ জেনারেল ফচের সহকারী টমাস উড ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল। ‘গাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে ওকে।’

জেনারেল ফচ থামলেন না, বরং আরও দ্রুত হলো পায়চারি, জোড়া ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে আছে।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল টমাস উড। ‘এত থাকতে এই বাংলাদেশী মেজরকে কেন যে দরকার হলো আমাদের, আমি বুঝতে অক্ষম!’ নরম কিন্তু অভিযোগের সুরে বলল সে। ‘সহজ একটা অপারেশন, আমাদের ছেলেরাই করতে পারে। ইভেনকো

রুস্তভ কখন আই.আই. ফাইভে আসছে জানার সাথে সাথে আমরা একটা প্লেন পাঠাব, প্লেনটা তাকে নিয়ে ফিরে আসবে...’

‘সহজ নয়,’ টমাসকে থামিয়ে দিয়ে বললেন জেনারেল ফচ। ‘হাতির তিমি গেলার মত কঠিন। তাছাড়া, গোড়াতেই ভুল করছ তুমি। ইভেনকো রুস্তভ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, শুধু যদি মাসুদ রানাকে পাঠানো হয় তবেই সে আসবে।’

মুখ বেজার করে টমাস বলল, ‘রাশিয়ানদের এই মাসুদ রানা প্রীতি, অসহ্য!’

‘রুশ প্রশাসন বা কম্যুনিষ্ট পার্টির হর্তাকর্তারা রানাকে কি চোখে দেখে, আমাদের জিজ্ঞেস করো না,’ মুচকি হেসে বললেন জেনারেল। ‘তবে রাশিয়া থেকে মিং-একত্রিশ ছিনিয়ে আনার পর থেকে কিছু রুশ নাগরিক সত্যি ওর ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ইভেনকো রুস্তভ একজন। ছিনিয়ে এনে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে মিংটা, অর্থাৎ নিজের বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেছে রানা। অভিজ্ঞতাটা আমাদের জন্যে তিক্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু রাশিয়ানদের মধ্যে ব্যাপারটা যারা জানে তারা তো ওর ভক্ত হবেই।’

‘ইভেনকো যাই বলুক, রানাকে সে তো আর চেনে না,’ বলল টমাস। ‘আমাদের একজন এজেন্টকে রানা বলে চালাতে অসুবিধে কি?’

‘রাশিয়া থেকে এর আগে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের চেয়ে ইভেনকো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, স্বীকার করো?’

নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টমাস। ‘করি।’

‘কাজেই আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না,’ বললেন

জেনারেল ফচ। ‘সোভিয়েত এন.পি.সেভেনটিন\* থেকে রওনা হবে সে, আমাদের সবেচেয়ে কাছের রিসার্চ বেস আই.আই. ফাইভে পৌঁছতে হবে। আই.আই. ফাইভ এই মুহূর্তে সোভিয়েত আইল্যান্ড থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। ওখানে তিনজন প্রফেসর রয়েছে আমাদের, দ্বীপটা ভেঙে যাবে তাই ফেরত আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। বুঝতে কোথাও অসুবিধে হচ্ছে, টমাস?’

‘না, স্যার...’

‘ইভেনকো পালিয়ে আসছে, তিন প্রফেসরের কেউই তা জানে না। আমরা বলিনি, কারণ ওদের কারও টপ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নেই।’

‘আমাদের হয়তো উচিত রেডিয়োতে ওদেরকে আভাস দেয়া যে...’

‘মারো মধ্যে ভাবি, তোমার সার্টিফিকেটগুলো জাল কিনা!’ জেনারেল ফচের এটা প্রিয় একটা মন্তব্য, সুযোগ পেলেই ঝেড়ে দেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে টমাস উড এত বেশি অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন অর্জন করেছে, সবগুলোর কথা তার মনেও থাকে না। রুশ সহ ছয়টা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে টমাস। ক্রিপটোগ্রাফ এবং রেডিও-কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ সে, আমেরিকার ছয়জন সেরা ইন্টারোগেটরের মধ্যে একজন। শুধু একটা ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই, জীবনে কখনও মেরু-প্রদেশে যায়নি। বরফের রাজ্য সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

---

\* আর্কটিকে সমস্ত ভাসমান সোভিয়েত বেসকে এন. পি. (নর্থ পোল) বলা হয়, প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় এন. পি.-র শেষে একটা করে সংখ্যা জুড়ে দিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় বেস বা বেসগুলো হয়তো নর্থ পোল থেকে একশো মাইল দূরে রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে ভেসে যাচ্ছে আরও দূরে।

‘সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নেই, আভাসই বা দিই কিভাবে? প্লেন ভর্তি একদল লোক পাঠিয়ে দেব, সে উপায়ও নেই, রাশিয়ানরা তাতে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। ওরা যদি ওদের বেস সীল করে দেয়, তখন? ইভেনকো আর বেরতে পারবে? কাজেই আই.আই. ফাইভের পরিবেশ শান্ত আর স্বাভাবিক রাখতে হবে।’

‘মোট কথা ইভেনকো শর্ত দিয়েছে, কাজেই কাজটা রানাকে দিয়ে না করিয়ে আমাদের উপায় নেই, এই তো?’

টমাসের চোখে চোখ রেখে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন জেনারেল ফচ। ‘আরও কারণ আছে।’

‘কি কারণ?’

‘কুয়াশা।’

‘কুয়াশা?’

‘ধরো আই. আই. ফাইভ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল? ইভেনকোকে আনার জন্যে আমাদের লোক তাহলে এখানে পৌঁছবে কিভাবে? নিরেট পোলার প্যাকে জাহাজ চলবে না। কুয়াশার ভেতর প্লেন চালানো সম্ভব নয়। কাজেই পায়ে হেঁটে বা স্নেজে চড়ে যেতে হবে। রানাকে দিয়ে কাজটা করাবার পিছনে এটাও একটা কারণ।’

‘কেন, রানা কি?’

‘বরফের রাজ্যে রানাকে গ্যারান্টিড ইস্যুরেন্স বলতে পারো,’ ভারী গলায় বললেন জেনারেল ফচ। ‘সব মানুষই যে-কোন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার রকম ফের আছে। আর্কটিকে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ তাদের স্বাভাবিক গুণগুলো হারিয়ে ফেলে। আমার কথাই ধরো, ঠাণ্ডাকে

আমার বড় ভয়, আর্কটিকে গেলে জড় পদার্থ বনে যাব, ব্রেন কাজ করবে না। কিন্তু রানার বৈশিষ্ট্য হলো, আবহাওয়া আর পরিবেশ যত বিরূপ হবে ওর স্বাভাবিক গুণগুলো ততই বেশি করে ফুটবে।’

মুখ হাঁড়ি করে টমাস বলল, ‘আপনি এমন করে বলছেন যেন ও একটা সুপারম্যান...’

‘অথচ তুমি জানো, কারও প্রশংসা করা আমার স্বভাব নয়।’ পিরিচ থেকে খোসা ছাড়ানো এক কোষ রসুন তুলে মুখে পুরলেন জেনারেল ফচ। ‘নির্জলা বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করছি, কিছু বাড়িয়ে বলছি না। এর আগে একাধিক বার আর্কটিকে গেছে রানা, প্রমাণ করেছে...’

বসের কথা কেড়ে নিয়ে টমাস বলল, ‘প্রমাণ করেছে যে সে সি. আই.এ-র সাথে বেঈমানী করতে ওস্তাদ।’ তার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। ‘যাই বলুন, স্যার, জেনেশুনে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা। এর আগেও ঠিক এ-ধরনের কাজের দায়িত্ব রানাকে দেয়া হয়েছিল, সেবার রাশিয়ান বিজ্ঞানীকে আমাদের হাতে তুলে না দিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। এবারও যে সে...’

জেনারেল ফচ মুচকি হাসলেন। ‘বেঈমানী করার সুযোগ এবার আমরা রানাকে দিচ্ছি না, টমাস। ওর যারা প্রিয় লোকজন, তাদের কয়েকজনকে আমরা জিম্মি রাখছি। এদিকে এসো, কাজটার জন্যে শুধু এক রানাকেই কেন উপযুক্ত বলে মনে করছি, ব্যাখ্যা করে বলি।’ চেয়ার ছেড়ে আর্কটিক ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। থমথমে চেহারা নিয়ে তাঁর পাশে চলে এল টমাস।

ম্যাপের মাথার দিকে রাশিয়ান উপকূল, ডান দিকে মারমানস্ক

আর লেনিনগ্রাদ। মাঝখানে স্পিটবার্জেন আর গ্রীনল্যান্ড সহ নর্থ পোল, নিচে কানাডিয়ান আর আলাস্কা উপকূল। মার্কীর চিহ্নিত করছে আই. আই. ফাইভের বর্তমান পজিশন, ম্যাপের খুবই নিচের দিকে সেটা, আইসবার্গ অ্যালি-র ঠিক ওপরে গাঁথা, গ্রীনল্যান্ড আর স্পিটবার্জেনের মাঝখানে জাহাজের চিমনি আকৃতির ভাসমান বিশাল বরফ খণ্ড।

‘আই. আই. ফাইভ\* এখন গ্রীনল্যান্ড উপকূলের একশো বিশ মাইল দূর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে,’ জেনারেল ফচ মৃদু গলায় বললেন। ‘আরও পঁচিশ মাইল পূবে রয়েছে রাশিয়ান বেস, এন.পি.সেভেনটিন, ওখান থেকে যাত্রা শুরু করবে ইভেনকো রপ্তান। দুটো বেসই বিশাল দুই বরফের টুকরোর ওপর রয়েছে, টুকরো দুটো পোলার প্যাকের সাথে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে আইসবার্গ অ্যালির দিকে। শেষবার নর্থ পোল থেকে ফিরে আসার পর রানা আর্কটিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যে রিপোর্ট করেছিল তাতে লিখেছে, দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা ওটা। ওর সাথে আমি একমত।’

‘আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন...’

‘গোটা এলাকাটা রানা চেনে, গেছে, এবং বেঁচেবর্তে ফিরে এসেছে,’ ধমকের সুরে বললেন জেনারেল ফচ। ‘কি বলতে চাইছি

---

\* বিশাল আকৃতির বরফ-দ্বীপগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্যে আইস আইল্যান্ড ওয়ান, টু, থ্রী, এইভাবে উল্লেখ করে আমেরিকানরা। আই. আই. ওয়ান (আইস আইল্যান্ড ওয়ান), সবচেয়ে পুরানো বরফ-দ্বীপ, উনিশশো ছেচল্লিশ সালের চোদ্দই আগস্ট কানাডিয়ান আর্কটিক উপকূলের কাছাকাছি প্রথমবার একটা সুপারফোর্ট্রেসের রাডার অপারেটরের চোখে ধরা পড়ে।

এখনও বুঝতে পারছ না?’

‘হুঁ,’ বলে উদাস চোখে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকল টমাস।

জেনারেল ফচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘থিউল-এ আমাদের সিকিউরিটি লিক সম্পর্কে কিছু শুনেছ?’

ঝট করে বসের দিকে ফিরল টমাস। ‘না! কি ব্যাপার?’

‘এফ.বি.আই-র মরিসন দু’ঘণ্টা আগে সাবধান করে দিয়েছে আমাকে।’ রসুনের কোষে কামড় দিয়ে মুখ বাঁকালেন জেনারেল ফচ। ‘জানা গেছে, টপ একজন সোভিয়েত স্পেশ্যাল সিকিউরিটি এজেন্ট দু’বছর ধরে ওখান থেকে লেনিনগ্রাদে ইনফরমেশন পাচার করছে। এফ. বি. আই. তার কোড নেম জানতে পেরেছে—কাঁকড়া। ওরা নাকি তার আসল পরিচয় খুব তাড়াতাড়ি জেনে ফেলতে পারবে।’

টমাসের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ‘এর ফলে গোটা অপারেশনটাই কেঁচে যেতে পারে।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ বললেন জেনারেল। ‘রানাকে সাবধান করে দেব, ও যেন শুধু ওখানকার সিকিউরিটি চীফ মাইকেল জনসনের সাথে ডিল করে।’ হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। ‘যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রানা। প্রজেক্টর অপারেটরকে ফোন করো, সে যেন ফিল্ম নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। মিলারকেও বলো, সে তার সরঞ্জাম রেডি করুক। আমাদের হাতে সময় খুব কম।’

সামান্য একটু বিস্মিত দেখাল টমাসকে। ‘আপনি বলতে চাইছেন ফিল্ম দেখার পরও রানা গোয়ার্তুমি করবে? টরচার না করলে রাজি হবে না?’

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন জেনারেল ফচ, ‘হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই

বলতে চাইছি।’

টাঁদের হিম আলোয় চকচক করছে বরফের রাজ্য। আকাশে ছড়ানো ঝলমলে গ্রেট বিয়ার নক্ষত্রপুঞ্জ ঝুলে রয়েছে পোলার প্যাকের ওপর। বাঘের মত ভয় ধরানো শীত, দীর্ঘ রজনী, আই.আই. ফাইভ অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

গ্রীনল্যান্ড উপকূল থেকে একশো বিশ মাইল পুবে, সোভিয়েত আইস আইল্যান্ড এন.পি.সেভেনটিন থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল পশ্চিমে, বিশাল বরফ-রাজ্য পোলার প্যাক অবরুদ্ধ করে রেখেছে আই. আই. ফাইভকে। অযুত কোটি টন বরফ থেমে নেই, প্রতি মুহূর্তে ভেসে চলেছে। বিস্তীর্ণ বরফ রাজ্যে আই. আই. ফাইভ একটা বরফ দ্বীপ। অনবরত ঘষা, চাপ, আর ধাক্কা দিয়ে দ্বীপটাকে ভাঙার চেষ্টা করছে পোলার প্যাক।

দ্বীপটাকে ভাঙার এই চেষ্টা ত্রিশ বছর ধরে চলছে, সেই উনিশশো বেরাল্লিশ সাল থেকে, যেদিন কানাডিয়ান আইস শেলফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নর্থ পোলকে ঘিরে চক্রর দেয়া শুরু করল আই.আই. ফাইভ। কিন্তু চিমনির আকৃতি নিয়ে বিশ ফুট উঁচু বরফ-দ্বীপের তেমন কোন ক্ষতিই করতে পারেনি পোলার প্যাক, কারণ পোলার প্যাক লোনা পানির বরফ-সাগরের পানি থেকে তৈরি। বিশাল বরফ রাজ্য পোলার প্যাকের চেয়ে এই নিরেট দ্বীপ অনেক বেশি শক্ত, যদিও ডায়ামিটার মাত্র এক মাইল।

আই.আই. ফাইভ মিষ্টি পানির তৈরি বরফ। তুলনায় লোনা পানির তৈরি বরফ অনেক নরম আর ভঙ্গুর হয়। তাছাড়া, আই.আই. ফাইভের বংশ-পরিচয়টাও তো দেখতে হবে। শত শত

বছর ধরে সরু গিরিখাদ থেকে নেমে আসা মস্তুরগতি হিমবাহগুলো কানাডিয়ান উপকূলের কিনারায় জমাট সাগরে পড়েছে, তৈরি হয়েছে আইস শেলফ। স্তরের ওপর স্তর পড়ে দুশো ফিট গভীর হয়েছে শেলফ। আই.আই. ফাইভ এই শেলফেরই একটা টুকরো মাত্র—এক মাইল চওড়া একটা টুকরো, নিজেকে ছাড়িয়ে আলাদা করে নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাসমান পোলার প্যাকের সাথে।

পোলকে ঘিরে দশ বছর মেয়াদী চতুর্থ টহল শুরু করেছে আই. আই. ফাইভ, আবার একবার ঘুরে চলে এল কানাডিয়ান আর্কটিক কোস্টে, আর ঠিক তখনই গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট পেয়ে বসল ওটাকে। বরফের প্রকাণ্ড টুকরোটাকে অনেক দক্ষিণে টেনে আনা হলো, এত দক্ষিণে এর আগে কখনও আসেনি। গ্রীনল্যান্ড আর স্পিটবার্জেনের মাঝখানে, হাজার মাইল বিস্তীর্ণ আই-ফিল্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওটা, এরপর আর ফেরার পথ থাকল না। পশ্চিমের বদলে পূর্ব দিকে এগোল আই.আই. ফাইভ, আইসবার্গ অ্যালির দিকে।

বহুদূর ওয়াশিংটনে জেনারেল ফচ তখনও রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন, হাতে সেক্সট্যান্ট নিয়ে হেডকোয়ার্টারের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আই. আই. ফাইভের স্টেশন লীডার ড. লিমুয়েল কর্ডন, মাপজোক করে তারাগুলোর অবস্থান আরেকবার জেনে নেবেন। পঞ্চাশ বছর বয়স কর্ডনের, শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় এই মুহূর্তে তাঁকে অস্থির দেখাল। পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ হতে তাঁর অস্থিরতা বাড়ল বৈ

কমল না।

বত্রিশ বছর বয়স, জেমস কাজম্যান স্টেশনের অয়্যারলেস অপারেটর। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ড. কর্ডনের পাশে এসে দাঁড়াল সে। ‘ব্যস্ততার কোন আভাস পাচ্ছ নাকি, ডক্টর?’

‘প্রচুর,’ জোর করে কৌতুক করলেন ড. কর্ডন। ‘গান গাইতে গাইতে বাস ভর্তি একদল লোক গেল, পিকনিক পার্টি।’

‘ঈশ্বর,’ আকাশে চোখ তুলল জেমস কাজম্যান। ‘যদি সত্যি হত! জানতে চাইছিলাম, রাশিয়ানদের কোন তৎপরতা...’

‘না।’

বরফ-দ্বীপ আই. আই. ফাইভের মাঝখানে বারোটা সমতল ছাদঅলা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এই বারোটা ঘর নিয়েই ওদের রিসার্চ বেস। উঁচু-নিচু বরফ মোড়া সরু একটা রাস্তার দু’পাশে দুই সারিতে ছ’টা করে বারোটা ঘর। রাস্তার শেষ মাথায় আরও একটা ঘর রয়েছে, সেটার ছাদ ফুঁড়ে চাঁদের দিকে কয়েকশো ফিট উঠে গেছে অয়্যারলেস মাস্ট। ওদের চারদিকে রয়েছে ভয়াবহ শত্রু-পোলার প্যাক। যেন বিশাল কোন আহত পশু তীব্র ব্যথায় গোঙাচ্ছে। এই গোঙানির শব্দ ওদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, পোলার প্যাক জ্যাস্ত, প্রতি মুহূর্তে দ্বীপের উঁচু পাঁচিলটাকে পিষে গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। নতুন একটা আওয়াজ পেল ওরা, কড়াৎ করে বাজ পড়ল যেন।

‘ওটা কি?’ ফিসফিস করে জানতে চাইল কাজম্যান।

‘ভেঙে আলাদা হলো বরফের একটা টুকরো,’ ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন ড. কর্ডন। ‘ভেতরে গিয়ে রডেনবার্গের সাথে থাকো, জেমস। কাজটা আমি শেষ করতে চাই।’

‘পাগলা কুত্তা হয়ে আছে রডেনবার্গ। ভয় হয়, ডক্টর, ও না আত্মহত্যা করে!’

‘সেজন্যেই তো ওর সাথে থাকতে বলছি তোমাকে,’ বললেন ড. কর্ডন। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও, তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে থাকল। ওদের তিনজনের মধ্যে রডেনবার্গ সবচেয়ে ছোট, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েস। বরফের এই নির্জন জগৎ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তাকে, যে-কোন মুহূর্তে নার্সাস ব্রেকডাউন ঘটতে পারে। এই দ্বীপে ওদের দিন যতই ফুরিয়ে আসছে ততই বাড়ছে তার রোগের উপসর্গ। আর বারো দিন পর ওদেরকে নিতে আসবে প্লেন, এই অভিশপ্ত দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে ওরা, যেন সেজন্যেই এখন প্রতিটি ঘণ্টাকে, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে এক একটা বছর।

ওদের এই সার্চ বেসকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে মসৃণ তুষার মোড়া মালভূমি, দ্বীপ-পাঁচিলের উঁচু কিনারা পর্যন্ত তার বিস্তার-বাকি একদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোট একটা পাথুরে পাহাড়, মালভূমি থেকে চল্লিশ ফিট উঁচু তার চূড়া। এখানে, সবচেয়ে কাছের উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে, এই পাহাড়ের গায়ে গিজ গিজ করছে বিশাল আকৃতির বরফ মোড়া বোল্ডার, সত্যিকার নিরেট পাথর, কোন কোনটা আকারে ছোটখাট বাড়ির মত। বহু যুগ আগে হিমবাহের সাথে কানাডিয়ান আইস শেলফে নেমে এসেছিল ওগুলো, এবং এক সময় যখন বরফের একটা টুকরো দ্বীপের আকৃতি নিয়ে শেলফ থেকে আলাদা হয়ে যায়, টুকরোর সাথে বেরিয়ে আসে ওই পাথুরে পাহাড়।

একটা ঘরের দিকে এগোল কাজম্যান, দরজা খুলে বেরিয়ে

এল রডেনবার্গ। আওয়াজ পেয়ে ড. কর্ডনের মুখভাব থমথমে হয়ে উঠল। কাজম্যান ঘরে না ঢুকে রডেনবার্গের সাথে ফিরে এল ড. কর্ডন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেখানে।

রডেনবার্গ যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরফের রাজ্যে এ এক ধরনের নির্বাসন, গরম ঘরের ভেতরও একা কেউ থাকতে চায় না। কিন্তু পোলার প্যাক যেমন প্রতি মুহূর্তে দ্বীপের পাঁচিলে কামড় বসাচ্ছে, ওরা তিনজন একসাথে হলেও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেমনি পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে।

‘দরজাটা বন্ধ করেছ, গুন্টার?’ একটা ইন্সট্রুমেন্টে চোখ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন ড. কর্ডন। তাঁর পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো।

‘রাশিয়ানরা চলে গেছে!’ হাউমাউ করে উঠল রডেনবার্গ, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। ‘ঘটে বুদ্ধি রাখে ওরা, সময় থাকতে নিজেদের বেস ছেড়ে কেটে পড়েছে। অয়্যারলেন্স করে আমরা কেন আমাদের প্লেনটাকে ডাকছি না? সবই তো প্যাক করা হয়ে গেছে...’

‘খামো, গুন্টার,’ সেক্সট্যান্ট নামিয়ে দ্রুত আধপাক ঘুরলেন ড. কর্ডন। ‘সব প্যাক করা হয়নি। তাছাড়া, এখনও সব এক্সপেরিমেন্ট শেষ করিনি তুমি...’

‘লাথি মারি এক্সপেরিমেন্টে!’ ফুঁসে উঠল রডেনবার্গ। ‘এই জায়গায় আর একটা দিন থাকতে হলে আমি মারা যাব...’

‘আই.আই. ফাইভে আজ এগারো মাস রয়েছ তুমি,’ বাধা দিয়ে বললেন ড. কর্ডন। ‘এটা তো সেই একই জায়গা।’

‘এসব ছেলে-ভুলানো কথা শুনতে চাই না,’ রাগের সাথে বলল রডেনবার্গ। ‘আইসবার্গ অ্যালির কিনারায় চলে এসেছি আমরা, একই জায়গা হলো কি করে?’

‘ভেতরে গিয়ে খানিকটা কফি বানাও,’ ধমকের সুরে বললেন ড. কর্ডন। ‘সময়টা আমরাও উপভোগ করছি না, কিন্তু তাই বলে অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই।’ নরম তুষারের ওপর থপ থপ পা ফেলে ঘরে ঢুকল রডেনবার্গ, দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো আবার। ‘ওর সাথে থাকো, জেমস,’ নরম সুরে বললেন তিনি। ‘একা কি না কি করে বসে। ও শান্ত হলে আবার তুমি একবার থিউল-এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। আমাদের নতুন পজিশন ওদেরকে জানানো দরকার।’

‘চেষ্টা করতে আপত্তি নেই,’ সন্দিহান দেখাল কাজম্যানকে। ‘অত্যন্ত বাজে ধরনের স্ট্যাটিক বিল্ড করছে। আমার ধারণা, বাইরের দুনিয়ার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হতে পারে আবহাওয়ার বিরাট কোন পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।’

কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছেন ড. কর্ডন, নিজের অজান্তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তাঁর। রেডিও যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটছে, বা একেবারেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, এ-ধরনের কথা শোনার পর কারও পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব নয়। কাজ শেষ করে যত্নপাতি গুছিয়ে নিলেন তিনি, ঘরে ঢোকান আগে পরিচিত জমাট সাগর আর প্রাণহীন নির্জন শীতল বিস্তৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। কোথেকে একটা ভয় এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। কপালে কি দেশে ফেরা আছে? নাকি এই বরফ-দ্বীপেই লেখা আছে শীতল মৃত্যু?



সি.আই.এ-র অপারেশনাল হেড অফিসে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো রানাকে। জেনারেল ফচকে কোথাও দেখা গেল না, তাঁর সহকারী টমাস উড পথ দেখিয়ে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল ওকে। অপারেটর আগে থেকেই তৈরি ছিল, ওরা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল সে। ইতিমধ্যে একটা চেয়ারে বসেছে রানা, ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে টমাস উড। প্রজেক্টর চালু হলো, সামনের সাদা স্ক্রীনে ফুটে উঠল রঙিন ছবি।

গ্রীনল্যান্ড। আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির দিকে স্থির হয়ে আছে ক্যামেরা। ল্যাবরেটরি ভবনের গেটের সামনে মার্কিন নেভীর ছাপ মারা একটা জীপ দেখা যাচ্ছে। ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার আর একজন নৌ-সেনা জীপের পাশে দাঁড়িয়ে, ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ওরা। মনে হলো, কেউ বেরিয়ে আসবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে।

অশুভ কিছু আশঙ্কা করল রানা। আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বাংলাদেশী দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী কাজ করে, নিয়াজ মাহমুদ আর বিনয় মুখার্জি। কেউ তদবির করেনি, মার্কিন সরকার উপযাচক হয়ে তিন বছরের স্কলারশিপে এই ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছে ওদেরকে। ওরা যে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির পার্টটাইম অপারেটর, কাকপক্ষীরও তা জানার কথা নয়। রুশ বা মার্কিন আর্কটিক রিসার্চ বেসগুলো আসলে এক একটা স্পাইয়ের আখড়া, চোখ-কান খোলা রাখলে গবেষকরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারে। নিয়াজ আর বিনয়

দু'জনেই হঠাৎ পাওয়া কোন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে গোপনে পাঠিয়ে দেয় রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে।

নিয়াজ মাহমুদ দক্ষ নেভিগেটর, মেরিন বায়োলজিতে মাস্টার ডিগ্রী আছে তার, প্রথম শ্রেণীর মার্কসম্যান। সুদর্শন, প্রাণচ্ছল, কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ প্রেমে বিফল হওয়ার পর জীবনে কখনও বিয়ে করবে না বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।

বিনয় মুখার্জি পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা, প্রতিভাবান জিয়োলজিস্ট, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, ডেপথ-সাইন্ডিং বিষয়ে ভাল কারিগরি জ্ঞান রাখে। নিয়াজ তার একমাত্র বন্ধু, এবং ওরা তিনজন সমবয়সী হলেও রানা বলতে দু'জনেই অজ্ঞান। রানার সাথে ওদের সম্পর্ক ঠিক গুরু-শিস্যের নয়, আবার বন্ধুত্বেরও নয়। রানাকে ওরা নাম ধরেই ডাকে, তুমি বলে সম্বোধন করে, কিন্তু ব্যবহারে লুকিয়ে থাকে শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাব, সেটা অনেক সময়ই কারও চোখে পড়ে না। বছর চারেক আগে মাত্র একবার রানার সাথে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করেছে ওরা। তবে গ্রীনল্যান্ডে ওদের সাথে দু'একবার দেখা হয়েছে রানার।

ল্যাবরেটরির খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে এল নিয়াজ আর বিনয়, ওদের সামনে পিছনে একজন করে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র নৌ-সেনা। জুম করে এগোল ক্যামেরা, স্ক্রীনে বড় আকারে ফুটল ওদের দু'জনের চেহারা। কৌতুকপ্রিয় নিয়াজের মুখে হাসি নেই, বিনয়ের চোখ দুটো বিষণ্ণ। রানা বুঝল, ওর আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। সম্ভবত কোন গোপন তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ওরা।

অফিসারের সামনে দাঁড়াল ওরা। অফিসার পকেট থেকে

একটা কাগজ বের করে পড়ল, ‘গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আপনাদের গ্রেফতার করা হলো।’ একজন নৌ-সেনার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে, লোকটা এগিয়ে এসে নিয়াজ আর বিনয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। জীপে তোলা হলো ওদের, দ্রুত একটা ইউটার্ন নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি।

আলো জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় না থেকে চেয়ার ছাড়তে গেল রানা, পিছন থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল টমাস উড। ‘আরও আছে, মি. মাসুদ রানা।’

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল রানার মনে, কিন্তু শক্ত কাঠ হয়ে চুপচাপ বসে থাকল ও। ওদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ওকে ডেকে আনিয়ে দেখাবার পিছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। তার চেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো, আর কি দেখতে হবে ওকে?

আবার সচল ছবি ফুটল স্ক্রীনে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো রাজ্যের দৃশ্য ফুটে উঠল। একটা গাড়ির ওপর রয়েছে ক্যামেরা, গাড়ি ছুটে চলেছে বড় একটা রাস্তা ধরে। বুকটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল রানার। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। পিছনে দাঁড়িয়ে মুচকি একটু হাসল টমাস উড। আবছা অন্ধকারেও রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছে সে।

সোহানার কথা ভেবে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠল রানা। পর পর দুটো অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সোহানা, কলোরাডোর সিটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। বিশ্রাম আর উপযুক্ত চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সেরে উঠছে সে। দিন সাতেক আগে তাকে দেখেও এসেছে রানা।

সি.আই.এ. তবে কি সোহানাকেও...?

চোয়াল দুটো শক্ত, উঁচু হয়ে উঠল রানার।

যা আশঙ্কা করেছিল, সিটি ক্লিনিকের সামনে থামল ক্যামেরা। ক্লিনিকের গেটে কোন গাড়ি দেখা গেল না, তবে পনেরো বিশ গজ পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র পুলিশ। খোলা গেট দিয়ে ক্লিনিকের ভেতর ঢুকল ক্যামেরা। একটা কেবিনের দরজা দেখা গেল, দরজার বাইরে একজন পুলিশ। পরমুহূর্তে কেবিনের ভেতরে দৃশ্য ফুটে উঠল। বিছানায় শুয়ে একটা ভোগ ম্যাগাজিন পড়ছে সোহানা। স্লান চেহারা, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা একটা মহিলা পুলিশ। সোহানার দিকে তাক করা নয় বটে, কিন্তু তার কোলের ওপর হাতে ধরা একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

সম্ভবত ডাক্তারদের অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি সোহানাকে। আপাতত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলেই হাজতে নিয়ে ভরা হবে।

ওকে নিশ্চয়ই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে...দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

খুট শব্দের সাথে যখন আলো জ্বলল, টমাস উড দেখল উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের বোতাম লাগাচ্ছে রানা। মেঝের দিকে উঠে তাকাল সে, পানির স্রোত দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। ‘মি. রানা, আপনি, মানে...’

‘ভয় পেলে এরকম হয় আমার,’ বলে টমাসের মুখের ওপর হাসল রানা। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো। ‘তোমার বসের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।’

কালচে তিলে ভরা টমাসের লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠল

রাগে। রানার এ এক ধরনের পাঁটা আক্রমণ, বুঝতে পেরেছে। শুধু রাগ নয়, স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সে—কোন লোক এত দ্রুত রিয়ালিটি করতে পারে তার ধারণা ছিল না।

টমাস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার দিকে এক পা এগোল রানা। ‘আমার কথা শুনতে পাওনি?’

প্রায় লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল টমাস, শোল্ডার হোলস্টার থেকে চোখের পলকে বেরিয়ে এল একটা ইস্পাত-নীল রিভলভার। ‘সাবধান!’

হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপারেটর।

‘হাত দুটো সামনে রেখে চেয়ারে বসুন, মি. রানা,’ বলল টমাস, তার রিভলভারের কালো মাজল্ রানার বুকের দিকে তাক করা। ‘আমার বস্, জেনারেল ফচ, আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ, জরুরী কাজে বাইরে আছেন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমার ওপর দেয়া হয়েছে।’

বসল না রানা, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে টান টান হয়ে দাঁড়াল। ‘বিপদে পড়েছ, আমার সাহায্য দরকার—আগেই বুঝেছি।’

দরজার দিকে সরে গেল টমাস, সুইচবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে গুরু করল, ‘প্রথম শ্রেণীর একজন রুশ ওশেনোগ্রাফার, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় পালিয়ে আসতে চেয়েছেন। আর্কটিকে, একটা সোভিয়েত বেসে রয়েছেন তিনি, শর্ত দিয়েছেন শুধু মাসুদ রানাকে পাঠালে তবেই তিনি আসবেন...’

‘ওদের তোমরা...’

‘ওদের আমরা ইস্পুরেস হিসেবে আটকে রাখব,’ বলল টমাস। ‘এর আগেও একজন রুশ বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসার দায়িত্ব

আপনাকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাকে আপনি সোভিয়েত এলাকা থেকে নিয়ে এলেও, আমাদের হাতে তুলে না দিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেন। সেজন্যেই এবার আমরা সাবধান হয়ে গেছি। ইভেনকো রুস্তভকে আপনি নিরাপদে আমাদের হাতে তুলে দিলেই ওরা তিনজন ছাড়া পেয়ে যাবে, অর্থাৎ ওদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।’

‘আমি যদি কাজটা না করি?’

কাঁধ বাঁকাল টমাস। ‘সেক্ষেত্রে আইন তার নিজস্ব পথে এগোবে। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রমাণ হলে দুটোর যে-কোন একটা শাস্তি ওদের কপালে ঝুলছে—হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নাহয় মৃত্যুদণ্ড। আমি দুঃখিত, মি. রানা—কাজটা করা ছাড়া আপনার সামনে আর কোন বিকল্প আছে বলে তো আমার মনে হয় না...’

‘আছে,’ বলে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে টমাসের দিকে এগোল রানা। ‘কাঁধ থেকে তোমার মুণ্ডটা আগে ছিঁড়ে নামাই...’

টমাসের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপে দিল সে। সবেগে বিস্ফোরিত হলো দরজা, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল উদ্যত রিভলভার হাতে তিনজন সি.আই.এ. এজেন্ট।

ভেতরে ঢুকে দ্রুত পজিশন নিল ওরা। দু’জন দাঁড়াল টমাসের দু’পাশে, আরেকজন চলে গেল রানার পিছনে। রানার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ একটু হাসল টমাস। ‘কোথায় রয়েছেন ভুলে গেলে চলবে কেন! এখানে শুধু আমরাই জোর খাটাতে পারি, বাকি সবাইকে নত হতে হয়। আপনি রাজি হয়ে যান, দেখবেন, আমরা সবাই আপনার বন্ধু হয়ে গেছি।’

পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল রানা। ‘তোমার বাপদের খবর দাও; বলো, আমি রাজি নই।’ ভাবল, কি মনে করে ওরা, ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে নতি স্বীকার করব?

‘প্লীজ, মি. রানা, আরেকবার ভেবে দেখুন,’ বলল টমাস। ‘নিয়াজ আর বিনয়ের এই বিপদের জন্যে আপনিও কোন অংশে কম দায়ী নন। আপনার নির্দেশেই ওরা গোপন তথ্য সংগ্রহ করছিল। তারপর ধরুন মিস সোহানার কথা। আপনার ওপর তার দুর্বলতার কথা কে না জানে। নিশ্চয়ই আপনি চান না এদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাক?’

‘ওদের কিভাবে মুক্ত করতে হবে আমার জানা আছে,’ বলল রানা। জানে, ও যদি রানা এজেন্সির অপারেটরদের নির্দেশ দেয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ-সাতজন সি.আই.এ. এজেন্টকে পাল্টা আটক করতে পারবে তারা। ‘বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবটা তোমরাই আগে দেবে।’

‘সি.আই.এ. এজেন্টদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ আটক করতে পারবে না। তাছাড়া, নিজের লোককে আপনি নির্দেশ দেবেন কিভাবে? আপনাকে আমরা ছাড়লে তো!’

রানা জানে, এরই মধ্যে রানা এজেন্সি এবং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নিয়াজ, বিনয়, আর সোহানার ত্রৈফতার হওয়ার খবর পেয়ে গেছে। বিশেষ করে এজেন্সির অপারেটররা রানার নির্দেশ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে রানা যোগাযোগ না করলে কি ঘটেছে বুঝে নেবে ওরা, তার পরই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে কাজে হাত দেবে। ওরা যদি সি.আই.এ. এজেন্টদের নাগাল না পায়, একমাত্র উপায়

হিসেবে সোহানা, নিয়াজ, আর বিনয়কে ছিনিয়ে আনার চেষ্টায় কমান্ডো হামলা চালাবে, এবং মারা পড়বে অকাতরে।

‘হ্যাঁ,’ মুচকি হেসে আবার বলল টমাস, ‘আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। দু’পক্ষেরই। আপনি কি সেটা চান?’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, ‘আমি বন্দি, কাজেই যাই ঘটুক না কেন আমাকে দায়ী করা যাবে না।’

‘কিন্তু আপনাকে রাজি করাতে না পারলে আমাকে দায়ী করা হবে,’ গম্ভীর সুরে বলল টমাস। ‘কারণটা কি, কেন আপনি গৌঁ ধরছেন?’

‘নীতির প্রশ্ন,’ বলল রানা। ‘নিরপেক্ষ থাকতে চাই আমরা। কখনও যদি রাশিয়ার বা আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু করি, শুধু ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই তা করব। তাছাড়া, আত্মসম্মানবোধ আমাদের একটু বেশি, চাপের মুখে মাথা নোয়াই না।’

রানার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল টমাস। ‘ঘি যখন উঠলই না, আঙুল আমাকে বাঁকা করতেই হয়!’ তার ইঙ্গিতে তিনজন তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল রানাকে। ‘আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নিয়ে যাও ওকে। টরচারের ফুল কোর্স শেষ করে তারপর রিপোর্ট করবে আমার কাছে।’

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। সি.আই.এ.-র নির্যাতন কি জিনিস জানা আছে ওর, নাৎসীর থাকলে তারাও লজ্জা পেত। ফুল কোর্স মানে বারো ঘণ্টা মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার, বেশিরভাগ

লোক ছ'ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। বারো ঘণ্টার নির্যাতন সহ্য করে কেউ যদি বেঁচে থাকে, পঙ্গু এবং উন্মাদ অবস্থায় বাকি জীবন কাটে তার।

করিডরে আরও দু'জন সশস্ত্র এজেন্ট ওদের সাথে যোগ দিল। সিঁড়ি বেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নামার সময় রানার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে গেল। জানে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'একজনকে আহত করা সম্ভব, এক-আধজনকে হয়তো মেরেও ফেলা যায়, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন হয়তো কিছুই জানেন না, তাঁর সহি সম্ভবত নকল করেছে ওরা। বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করা। ভদ্রলোকের সাথে রানার পরিচয় আছে, সি.আই.এ-র এই ভূমিকা সম্পর্কে জানলে নিশ্চয়ই খেপে উঠবেন।

এত কথা ভাবল রানা, কিন্তু একবারও ওদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথা বিবেচনা করল না। ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করছে ও, নর্থ পোলে ওকে পাঠানো যদি খুব জরুরী হয় তাহলে নির্যাতনের একটা সীমা থাকবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করবে ওরা, সে রাজি হবে যেতে।

লোহার একটা বেডে শোয়ানো হলো রানাকে, কয়েক জোড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে এমনভাবে বাঁধা হলো হাত-পা, এক চুল নড়ার উপায় থাকল না। সেল থেকে বিদায় নিল টমাস, যাবার সময় সম্পূর্ণ হতাশ করে দিয়ে গেল রানাকে। 'আপনি আমাদের কোন কাজে আসবেন না এটা ধরে নিয়েই টরচার চালানো হবে, মি. রানা,' নির্দয় সুরে বলল সে। 'আপনার নাম-পরিচয় নিয়ে অন্য লোক

যাবে নর্থ পোলে।'

টেপ দিয়ে রানার চোখের পাপড়িসহ পাতা জোড়া ভুরুস সাথে আটকে দেয়া হলো, ফলে চেষ্টা করলেও চোখ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তার টেনে নামানো হলো ওর চোখের সামনে, শেষ প্রান্তে ঝুলছে দুশো পাওয়ারের নগ্ন একটা বালব। সিলিং থেকে ঝুলছে একটা সরু পাইপ, পাইপের মুখ থেকে হিম শীতল ঠাণ্ডা পানির ফোঁটা পড়তে শুরু করল রানার কপালের ঠিক মাঝখানে। বালবটা আগেই জ্বলে দেয়া হয়েছে।

তিন মিনিট সহ্য করল রানা, তারপর গোটা ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গেল। পানির ফোঁটাগুলো ঠাণ্ডা বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কপালে। প্রতি দু'সেকেন্ডে একটা করে শীতল ফোঁটা। সময়ের সাথে তাল দিয়ে একই ছন্দে জ্বলতে আর নিভতে লাগল বালবটা। রানার পায়ের কাছে বসে আছে এক লোক, দু'পায়ের তলায় পাখির পালক দিয়ে নিবিষ্ট মনে আলতো সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে সে।

দু'সেকেন্ড পর পর আলোর বিস্ফোরণ, কিন্তু আলোর ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। লোকে অন্ধ হয়ে গেলে অন্ধকার দেখে, রানা অন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু আলো দেখছে। কারও গায়ে বোমা ফাটলে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, রানার গায়ে বোমাও পড়ছে না, শরীরও ছিন্নভিন্ন হচ্ছে না, কিন্তু অনুভূতিটা হচ্ছে হুবহু সেই রকম-দু'সেকেন্ড পরপর একবার করে।

দেখতে না পেলেও রানা টের পেল, ক্ষুরধার কিছু দিয়ে ওর গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হলো। নির্যাতনের পর্যায়গুলো জানা আছে ওর। ওর বুকের বাঁটায় এবার ইলেকট্রিক কাঁকড়া বসানো

হবে। কোমর থেকে ট্রাউজারও নামিয়ে ফেলা হলো। এরপর আন্ডারঅয়্যার। পেনিসের ডগায়ও থাকবে একটা কাঁকড়া।

আধ ঘণ্টার বেশি ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় না, লোকটাকে যদি তাড়াতাড়ি মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। শক দেয়া শুরু হলে রানার সারা শরীর প্রায় অসাড়া হয়ে যাবে, কাজেই পায়ে সুড়সুড়ি দেয়ার আর কোন মানে হয় না। পানির ফোঁটা আর আলোর বিস্ফোরণ চলতেই থাকবে, তবে সেজন্যে আলাদা কোন লোকের দরকার নেই। সেলে এখন শুধু একজন লোকই রয়েছে, জন মিলার।

মানুষকে কষ্ট দিয়ে যারা পৈশাচিক আনন্দ পায়, মিলার তাদের একজন। তাকে এই মুহূর্তে রানা দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে গোপন অনেক কথা জানা আছে ওর। এই লোক আজরাইলের চেয়েও ভয়ঙ্কর, নির্দয় অত্যাচার চালিয়ে ধীরে ধীরে জান কবচ করে।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে ঝাড়া পাঁচ মিনিট সময় লাগবে রানার। একাধারে বিস্মিত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও। কপালে শীতল বোমা ফাটছে না, চোখে বিস্ফারিত হচ্ছে না সাদা আলো। ব্যাপারটা কি? কি ঘটতে যাচ্ছে? বুঝতে দু'মিনিট সময় লাগল, চোখের পাতা থেকে খুলে নেয়া হয়েছে টেপ। চোখ বন্ধ করতে পারছে ও। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল হিসহিসে একটা কর্ণস্বর, 'আরও তিন মিনিট পর চোখ খুলবেন, মি. রানা।'

সারা শরীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মাথা আর চোখে প্রচণ্ড ব্যথা, সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। তিন মিনিট পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। প্রথম কিছুই দেখল না, সব ঝাপসা,

তারপর একটু একটু করে কেটে গেল অস্পষ্ট কুয়াশা ভাব।

সিলিঙে একটা টিউবলাইট জ্বলছে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে।

‘আমি জন মিলার,’ বলল লোকটা, চেহারা চাপা উত্তেজনা। ‘আপনি আমার সম্পর্কে জানেন, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?’ মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও।

‘রাজি হয়ে যান,’ নিচু গলায় দ্রুত বলল জন মিলার। ‘করে দিন কাজটা। আমরাও চাইছি ইভেনকো রস্তুভ এখানে চলে আসুন। আপনি শুধু তাঁকে এখানে পৌঁছে দিন—প্লিজ, মি. রানা।’

তারপর আবার যাকে তাই অবস্থা। রানা কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করার আগেই জ্যাস্ত হয়ে উঠল ইলেকট্রিক কাঁকড়া, সেই সাথে বিস্ফোরিত হলো পানির ফোঁটা আর চোখ ধাঁধানো আলো।

জ্ঞান হারাবার আগে ভাবনা চিন্তার জন্যে অল্পই সময় পেল রানা। অনেক দিন থেকেই জানে ও, জন মিলার সোভিয়েত স্পাই, সি. আই. এ-র ভেতর ঠাঁই করে নিয়েছে। সি.আই. এ-র ওপর একটা মোক্ষম প্রতিশোধ নেয়ার চমৎকার সুযোগ দেখতে পেল ও। কে.জি.বি.-ও চাইছে ইভেনকো রস্তুভ আমেরিকায় চলে আসুক, তারমানে রহস্যের ভেতর রহস্য আছে। রস্তুভের কাছে হয়তো অমূল্য কোন ডকুমেন্ট আছে, সেগুলো পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে আছে সি.আই.এ.। আর কে. জি. বি. হয়তো ভাবছে ভুয়া কাগজ-পত্র দিয়ে পাঠাবে রস্তুভকে। এক সময় ব্যাপারটা হয়তো চাপা থাকবে না, ফাঁস হয়ে যাবে, কিন্তু ততদিনে আমেরিকায় বসে মার্কিনীদের অমূল্য কিছু ডকুমেন্টে চোখ বুলাবার সুযোগ পেয়ে

যাবে রক্তভ। ভুয়া কাগজ-পত্র গছিয়ে দিয়ে, শত্রুপক্ষের গোপন কাগজ-পত্র হাত করে, আবার ফিরে যাবে রক্তভ। মস্ত একটা ঠক খেয়ে আঙুল চোষা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না সি. আই.এ-র। কিংবা এমনও হতে পারে রক্তভ হয়তো কে.জি.বি.-র ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার পালিয়ে আসার ইচ্ছে সম্পর্কে কে.জি.বি. জানে, এ-সম্পর্কেও হয়তো তার কোন ধারণা নেই।

এত ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে। নর্থ পোল থেকে ইভেনকো রক্তভকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারলে কে.জি.বি.-র একটা উপকার করা হবে, রানার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট।

জ্ঞান ফেরার পর ফিসফাস গলার আওয়াজ পেল রানা। অত্যন্ত মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘আপনি শান্ত থাকুন, মি. রানা। আপনার এই অবস্থার জন্যে যে লোক দায়ী তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা সবাই অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। প্লীজ, দশ মিনিট পর চোখ খুলবেন।’

এখনও রানা নগ্ন, তবে চাদরে গা ঢাকা রয়েছে। একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হলো ওকে, শরীরের সব ব্যথা দূর হয়ে গেল। দশ মিনিট পর চোখ মেলে দেখল, ছোট্ট একটা কেবিনে নরম, সাদা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। দু’জন ডাক্তার আর একজন নার্সকে দেখা গেল, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সি.আই.এ-র পদস্থ একজন কর্মকর্তা। লোকটাকে চিনতে পারল রানা, ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

‘খবর পাওয়া মাত্র ল্যাংলি থেকে ছুটে এসেছি আমি, মি. রানা,’ ডাক্তার আর নার্সকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ডি. ডি।

তার পিছন থেকে উঁকি দিলেন আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ জেনারেল ফচ। ‘আপনার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইছি। টমাস একটা গর্দভ, এর জন্যে তাকে শাস্তিও পেতে হবে। জেনারেল ফচ অফিসে ছিলেন না, থাকলে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না...’

বিছানার ওপর উঠে বসতে গেল রানা, তরুণী নার্স দ্রুত এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। ‘ধীরে, স্যার, ধীরে।’ রানাকে বসিয়ে ওর পিছনে কয়েকটা বালিশ ঠেসে দিল সে। তার কোমল, উন্নত স্তন চাপ দিল রানার কপালে। ‘এক চুমুকে এটুকু খেয়ে নিন, স্যার,’ বলে রানার মুখে আধ গ্লাস ব্র্যান্ডি ধরল সে।

গ্লাসটা শেষ করে ডি. ডি. কর্নেল অবসনের দিকে তাকাল রানা। ‘এখন তাহলে আমি এখান থেকে যেতে পারি?’

হাত দুটো প্রসারিত করে কর্নেল বলল, ‘কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। কিন্তু তার আগে আপনার যত্ন নেয়ার অনুমতিটুকু দয়া করে দিন আমাদের, প্লীজ।’ বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এবং তার পিছু পিছু কামরা থেকে নার্স বাদে আর সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

‘বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে,’ চোখ মটকে বলল রানা। ‘নরক থেকে সরাসরি একেবারে স্বর্গে? এ-ও এক ধরনের ট্রিটমেন্ট, তাই না?’

গোলাপী ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে নার্স বলল, ‘চুপ! কথা বলা নিষেধ।’ একটানে রানার গা থেকে চাদরটা তুলে নিল সে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সকৌতুকে দেখল। দুষ্টিমিভরা হাসি দেখা গেল তার সারা মুখে। ‘মাই গড!’ কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের কারণটা বলল না। রানার শরীরের তিন জায়গায় খুদে আকৃতির ক্ষত দেখা গেল,

বুকের দুটো বোঁটায় আর পেনিসের মাথায়। ক্ষতগুলো আঙুলের আলতো স্পর্শে পরখ করল সে। মৃদু হেসে বলল, ‘চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তাহলেই মেরামত হয়ে যাবে চামড়া।’ গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে পিছন ফিরল সে। ‘কাঁধ ধরে ঝুলে পড়ুন, বাথরুমে নিয়ে যাই।’

হেঁটেই বাথরুমে ঢুকল রানা। গরম পানি দিয়ে ওকে গোসল করিয়ে দিল নার্স। হ্যাঙ্গারে নতুন এক প্রস্থ কাপড়চোপড় ঝুলছে, এক এক করে রানাকে পরানো হলো। কেবিনে ফিরে মেয়েটার জেদে এক বাটি গরম মুরগির সুপও খেতে হলো ওকে। ওর মাথা আঁচড়ে দিল মেয়েটা, তারপর রানার দুই গালে আর ঠোঁটের ওপর হালকা চুমো খেয়ে গুডলাক বলল, কোমর দুলিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। প্রায় সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল কর্নেল অবসন আর জেনারেল ফচ।

‘এটা একটা মানবিক প্রশ্ন, মি. রানা,’ কোন ভূমিকা না করেই নতুন করে প্রস্তাবটা পাড়ল কর্নেল অবসন। ‘কাজটা আপনি করবেন কি করবেন না, সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার, কেউ আপনাকে জোর করছে না। তবে, একজন মক্কেল হিসেবে রানা এজেন্সির সার্ভিস আশা করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে, ঠিক কিনা? কাজটা কি আপনি জানেন, কিন্তু এর পুরস্কার কি তা জানেন না। ওয়ান বিলিয়ন ডলার, মি. রানা।’

‘কত বললেন?’ রানার মনে হলো ভুল শুনেছে।

‘এক হাজার মিলিয়ন ডলার, মি. রানা,’ সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর সবিনয়ে হাসল। ‘সমস্ত খরচ আমাদের। সত্যি কথা

বলতে কি, ইভেনকো রুস্তভ সাথে করে যা নিয়ে আসবে তার দামের তুলনায় এক বিলিয়ন ডলার হাতের ময়লা মাত্র। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, মি. রানা, প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয়ার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখুন...’

এমন ভাব করল রানা যেন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ঝাড়া এক মিনিট পর মুখ তুলে বলল, ‘আমার তিন সহকর্মীকে মুক্তি না দিলে এমনকি আমি আলোচনা করতেও রাজি নই।’

ফোনের রিসিভার তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কর্নেল অবসন, সেই সাথে রানার সামনে একটা নোটবুক খুলে ধরল। ‘সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতি, মি. রানা। নাম্বার দেখে ফোন করুন। ওদের আমরা এরই মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি। এমনকি ওদের ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগও তুলে নেয়া হয়েছে।’

নোটবুকে গ্রীনল্যান্ড, আর কলোরাডোর নাম্বার দেখল রানা। প্রথমে কলোরাডোর নাম্বারে ডায়াল করল ও। সান্কেতিক ভাষায় দু’মিনিট কথা হলো সোহানার সাথে। নিয়াজ আর বিনয়ের সাথেও আলোচনা হলো। অবসন মিথ্যে বলেনি।

‘এবার আমি আমার বসের সাথে কথা বলতে চাই,’ বলল রানা। ‘আপনাদের বাইরে যেতে হবে।’

বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকার নাম্বারে ডায়াল করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে মিনিট দশেক কথা বলল রানা। বস্ ওকে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে জানালেন, সি. আই. এ. যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা আছে তাঁর হাতে।

কেবিনের দরজা খুলে ওদেরকে ডাকল রানা। ‘ব্যাপারটা



এবার শোনা যেতে পারে।’

‘মোটামুটি ছবিটা পেলাম,’ বলল রানা। ‘এবার বলুন, এই রুশ ভদ্রলোক, ইভেনকো রুস্তভ, এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?’

আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ জেনারেল ফচের অফিসে বসে কথা বলছে ওরা।

‘তিনি গুরুত্বপূর্ণ, এটুকুই শুধু আপনাকে বলা যায়,’ বললেন জেনারেল ফচ। ‘তঁার সম্পর্কে বাকি সব তথ্য টপ সিক্রেট।’

ঠাঙা চোখে জেনারেলের দিকে তাকাল রানা, তারপর সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে ফিরল। কর্নেল তাড়াতাড়ি শুরু করল, ‘ইভেনকো রুস্তভ সোভিয়েত রাশিয়ার এক নম্বর ওশেনোগ্রাফার। ওদের গোটা জুলিয়েট আর রোমিও সিস্টেম আর্কটিক সী-বেডে বিছানোর কাজটা তিনি নিজে সুপারভাইজ করেছেন। সাথে করে মেরিলিন চার্ট নিয়ে আসছেন তিনি, ওই সিস্টেমের কমপ্লিট ব্লু-প্রিন্ট ওটা। আর্কটিক বরফের তলা দিয়ে আমাদের তীর পর্যন্ত আসতে পারে ওদের সাবমেরিনগুলো, কারণ ওই সিস্টেম গাইড হিসেবে কাজ করে। ব্লু-প্রিন্টের গুরুত্ব কতখানি এবার নিশ্চয়ই বুঝেছেন, মি. রানা?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। মনে মনে ভাবল, আসল জিনিস তোমাদের কপালে নেই, ওই সিস্টেমের নকল ব্লু-প্রিন্ট পাবে তোমরা।

‘চার্টগুলো আমাদের হাতে এলে ওদের গোটা অফেনসিভ সিস্টেম ভেঙে চুরমার করে দেব আমরা, পাক্কা দশ বছর পিছিয়ে যাবে ওরা,’ বলে চলল কর্নেল অবসন। ‘মে মাসে প্রেসিডেন্টের

মস্কোয় যাবার কথা রয়েছে, তখন যদি তাঁর পকেটে মেরিলিন চার্ট থাকে, জোর গলায় কথা বলতে পারবেন তিনি। কাজেই একজন যোগ্য লোককে গ্রীনল্যান্ডে পাঠাতে চাইছি আমরা। আপনি, মি. রানা...’

‘তাড়াছড়ো করে ফেলেছেন,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘কোথাও যাব বলে এখনও আমি রাজি হইনি।’ চেয়ার ছেড়ে ম্যাপের সামনে দাঁড়াল ও। ম্যাপের নিচের দিকে একটা তারকা-চিহ্নের ওপর আঙুল রাখল। ‘এটা কি কিউট-আইসব্রেকার?’

‘হ্যাঁ। আর্কটিকে এক বছর কাটিয়ে মিলওয়াউকিতে ফিরে আসছে।’

‘আমি হয়তো চাইতে পারি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ওটাকে আইসফিল্ডে ফিরে যেতে বলা হোক...’

রানাকে বাধা দিল জেনারেল ফচ, ‘প্ল্যানটা আমরা করছি, মি. রানা, আপনি নন...’

‘তাহলে আপনারাই যান না কেন ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। কর্নেলের দিকে ফিরল ও। ‘গোটা ব্যাপারটা এমনিতেই জট পাকিয়ে আছে। থিউল-এর সিকিউরিটি লিক সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। ভাল কথা, আমি যদি কাজটা করি, আমার দু’জন সহকারী লাগবে।’

‘বেশ তো, লোকের কোন অভাব নেই আমাদের...’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ওরা আমার লোক হতে হবে,’ বলল ও। ‘নিয়াজ আর বিনয়ের কথা ভাবছি আমি।’

‘কিস্তি তা কি করে সম্ভব!’ ঘোর আপত্তি জানালেন জেনারেল ফচ। ‘সি.আই.এ-র অ্যাসাইনমেন্ট অথচ আমাদের কোন লোক

থাকবে না...’

‘এখন আর এটা সি.আই.এ-র অ্যাসাইনমেন্ট নয়, জেনারেল,’ বলল রানা। ‘আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি, কেসটা আপনারা রানা এজেন্সিকে দিচ্ছেন, তাই না?’

জেনারেল আমতা আমতা করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মুখ খুলল কর্নেল অবসন, ‘ঠিক তাই, মি. রানা।’

‘আমি তাহলে থিউল-এ যাব আগে, নিয়াজ আর বিনয়কে তুলে নেয়ার জন্যে,’ বলল রানা। ‘ওখান থেকে কার্টিস ফিল্ডে।’ আই.আই. ফাইভের সবচেয়ে কাছের এয়ারফিল্ডের ওপর আঙুল রাখল ও।

অসম্ভব হলেও, নিজেকে দ্রুত সামলে নিলেন জেনারেল ফচ। বললেন, ‘এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসন বলছে, কাঁকড়ার আসল পরিচয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বের করে ফেলতে পারবে সে। আমরা যদি আগেভাগে কোন নির্দেশ পাঠাতে চাই, জনসনকে রেডিও মেসেজ পাঠাতে পারব-সে ওখানকার সিকিউরিটি চীফ।’

‘আমি যদি ভাল মনে করি, তবেই,’ বলল রানা। জেনারেলের কাছ থেকে আবহাওয়ার রিপোর্টটা চেয়ে নিয়ে চোখ বুলাল ও। ‘কুয়াশা নেই। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তারমানে, কার্টিস ফিল্ড থেকে আমরা তিনজন কুয়াশার কিনারা পর্যন্ত প্লেনে করে যাব, ওখান থেকে আই.আই. ফাইভে যেতে হবে স্লেজে চড়ে-আদৌ যদি খুঁজে পাই ওটাকে। এরপর ইভেনকো রাস্তাভকে সাথে নেব, ধরেই নিচ্ছি ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে পঁচিশ মাইল হেঁটে আই.আই.ফাইভে পৌঁছুতে পারবে সে। এরপর বরফের ওপর দিয়ে একশো বিশ মাইল স্লেজে চড়ে আসতে হবে

আমাদের, ধাওয়া করবে রুশ সিকিউরিটি...’

‘কুয়াশার ভেতর থেকে আপনারা বেরিয়ে এলে আর কোন চিন্তা নেই, প্লেনে করে...’

‘প্লেন যদি আমাদের খুঁজে পায়,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘কিন্তু পাবে না। চারজন লোক, আর এক জোড়া স্লেজ টীমকে বছরের এ-সময়টায় খুঁজে পাওয়া কি রকম কঠিন, আপনার কোন ধারণা আছে, জেনারেল? আমার তো মনে হয় না আর্কটিকে আপনি কখনও গেছেন।’

মুখ বেজার করে জেনারেল বললেন, ‘কেন, প্লেনে করে মানুষকে উদ্ধার করা হয় না?’

‘হ্যাঁ, হয়,’ ভারী গলায় বলল রানা। ‘কিন্তু তা স্রেফ কপালগুণে। একটা প্লেন, নিখোঁজ দলটাকে খুঁজছে না, হঠাৎ তাদের দেখতে পেল-এভাবে।’ এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল রানা, ‘আরেকটা জিনিস আমার ভাল ঠেকছে না। রাস্তাভ কখন আসছেন আমরা জানি না।’ কর্নেলের দিকে তাকাল ও। ‘কিউটকে আর্জেন্ট সিগন্যাল পাঠান, আবার উত্তর দিকে অর্থাৎ আইসফিল্ডের দিকে ফিরে যেতে হবে ওটাকে।’ ওয়াল-ম্যাপের এক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে একটা তারকা-চিহ্ন আঁকল ও। ‘এটা একটা রাঁদিভো পয়েন্ট হতে পারে।’

জেনারেল ফচ চোখ কপালে তুললেন, ‘কিন্তু ওটা তো আইসফিল্ডের অনেক গভীরে!’

‘তারমানেই বরফ ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে কিউটকে,’ বলল রানা। ‘দু’ঘণ্টার মধ্যে একটা প্লেন চাই, গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে যাবে আমাকে। নন-স্টপ ফ্লাইট হতে হবে।’

‘আপনার জন্যে একটা বোয়িং অপেক্ষা করছে।’

‘এবার বলুন, রুস্তভ কখন আসছেন সেটা আপনারা জানছেন কিভাবে,’ নিজের চেয়ারে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

নড়েচড়ে বসে শান্তভাবে শুরু করলেন জেনারেল ফচ, ‘লেনিনগ্রাদ থেকে এক লোক হেলসিঙ্কিতে ফিরে আসবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। লেনিনগ্রাদে ইভেনকোর এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করবে সে, সেই আত্মীয় তাকে জানাবে এন.পি.সেভেনটিন থেকে কোন্ তারিখে রওনা হবেন ইভেনকো। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে-কোন একটা দিন, এটুকু আমরা জানি। আমাদের লোক লেনিনগ্রাদ থেকে বেরিয়ে এলেই নির্দিষ্ট তারিখটা জানতে পারব।’

‘এমন যদি হয়, লেনিনগ্রাদ থেকে সে বেরুতে পারল না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘কেন বেরুতে পারবে না!’ রানার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন জেনারেল। ‘এর আগে কখনও রাশিয়ায় যায়নি সে, সেজন্যেই তাকে পাঠানো হয়েছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক। হেলসিঙ্কিতে পৌঁছে সোজা আমাদের দূতাবাসে রিপোর্ট করবে সে। দূতাবাস থেকে সিগন্যাল পাব আমরা।’

কোন মন্তব্য না করে আপনমনে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

## তিন

আঠারোই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিকেল তিনটে পাঁচে লেনিনগ্রাদের

নেভ্‌স্কি প্রসপেক্টে একজন লোক মারা গেল।

লেনিনগ্রাদে বিকেল তিনটে মানে ওয়াশিংটনে সবেমাত্র সকাল সাতটা। ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসে এখনও চড়েনি রানা, এখন থেকে সতেরো ঘণ্টা পর সি.আই.এ-র দলটা ট্রেন থেকে নামতে বাধ্য করবে ওকে।

আমেরিকান ট্যুরিস্ট, আলবার্ট ডকিনস, তুষার ঢাকা তিনটে ধাপ টপকে হোটেল লেনিনগ্রাদ থেকে রাস্তায় নেমে এল। দীর্ঘদেহী, চল্লিশ বছর বয়স; পাসপোর্টে তাকে একজন লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাস্তায় নেমে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিল ডকিনস। তুষার মাথায় করে নেভ্‌স্কি প্রসপেক্টের দিকে হন হন করে এগোল সে।

আরও জোরেশোরে তুষারপাতের হুমকি দিয়ে ফুলে আছে আকাশ। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। আর আধঘণ্টার মধ্যে নেমে আসবে অন্ধকার। এরই মধ্যে স্ট্রীটল্যাম্পগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। নেভ্‌স্কি প্রসপেক্টে পৌঁছে গেল ডকিনস, চওড়া এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে সতর্কতার সাথে দু’দিকে তাকাল সে। ভাব দেখে মনে হবে, সাবধানী লোক, রাস্তা পার হতে ভয় পাচ্ছে। আসলে এভিনিউয়ের একধারে পার্ক করা তিনটে গাড়ি তার মনে খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে।

কিন্তু না, মাদাম নাতাশা তো দূরের কথা, গাড়িগুলোয় কোন লোকই নেই।

হেলসিঙ্কি থেকে পাঁচ দিন হলো লেনিনগ্রাদে এসেছে ডকিনস, সেই থেকে মাদাম নাতাশা তার গাইড হিসেবে কাজ করছে। হার্মিটেজে যতবার গেছে সে, প্রতিবার সাথে থেকেছে মাদাম

নাতাশা। গাড়িগুলোয়, রাস্তায়, দোকানগুলোর সামনে, কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে ডকিনস ভাবল, তারমানে ওর গল্প বিশ্বাস করেছে মেয়েটা। কাল রাতেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে ও, আজ আর হার্মিটেজে যাবে না।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল ডকিনস, তারপর একটা ট্রলি-বাসকে ছুটে আসতে দেখে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পেরোল। তাকে দেখে সহজেই লোকে রাশিয়ান বলে ভুল করতে পারে। ফার কোট, ফার হ্যাট, আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট পরেছে সে।

হাতঘড়ি দেখল ডকিনস, তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তুমুল ঝগড়ায় মেতে আছে একজোড়া কিশোর-কিশোরী, মেয়েটা ঠাস করে একটা চড় কষাল ছেলেটার গালে। মনে মনে হাসল ডকিনস, টিন-এজারদের নিয়ে কোথায় না সমস্যা নেই।

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এল ডকিনস, দূরে দেখা গেল ওর গন্তব্য, সারি সারি গাছপালায় ঘেরা পার্ক। দস্তানা পরা হাত দুটো ফার কোটের পকেটে ভরে হন হন করে হাঁটছে সে, কালও এই রাস্তা ধরে হার্মিটেজ মিউজিয়ামে গেছে। আর্ট ক্যাটালগটা বগলে করে নিয়ে এসেছে ডকিনস, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় যাওয়া হয়েছিল, উত্তর দিতে অসুবিধে হবে না।

পার্কের ভেতর, রাস্তার কাছাকাছি লেনিনের স্ট্যাচু দেখা গেল। পার্কে ঢুকে সোজা রাস্তাটা ধরে এগোল ডকিনস, রাস্তার শেষ মাথায় উদয় হলো একজন লোক।

এই কি সেই নাবিক? এর সাথেই তার দেখা হওয়ার কথা?

ইউরি রুস্তভকে আগে কখনও দেখেনি ডকিনস। বিজ্ঞানী, ওশেনোগ্রাফার ইভেনকো রুস্তভের ভাই ইউরি রুস্তভ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ডকিনস, লোকটা কাছে চলে আসার আগেই তিনটে চিহ্ন দেখতে পেতে হবে তাকে।

একটা এয়ারব্যাগ থাকবে, কিন্তু কাঁধের বদলে বগলে। আছে। গলায় জড়ানো থাকবে লাল একটা স্কার্ফ। আছে। কিন্তু আলো দ্রুত কমে আসছে বলে আরেকটা চিহ্ন চোখে পড়ছে না। কোটের অন্যান্য বোতাম গাঢ় রঙের হবে, কিন্তু ওপরের বোতামটা হবে সাদা।

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল ডকিনসের। সর্বনাশ! নাবিক লোকটার পিছনে একজন পুলিশ উদয় হয়েছে...নাকি সৈনিক? বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করলেও যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে থাকল সে। এ কি শ্রেফ মন্দভাগ্য, এই সময় এই রাস্তায় পুলিশ লোকটার উপস্থিতি নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা? না ইউরি রুস্তভের পিছু নিয়েছে? মনে হয় না। এমন প্রকাশ্যে কেউ কাউকে অনুসরণ করে না।

তবু ডকিনসের ভয় যায় না। ধরা পড়লে কপালে খারাবি আছে তার, গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে পাঁচ-সাত বছরের জেল হয়ে যাবে। তারচেয়ে বড় কথা, ইভেনকো রুস্তভ কবে রওনা হবে এন.পি. সেভেনটিন থেকে সেই খবরটা জেনারেল ফচের কাছে পৌঁছুবে না।

প্রতি মুহূর্তে দ্রুত কমে আসছে আলো। কাছাকাছি চলে আসছে নাবিক, তার পিছনে পুলিশ লোকটার পরনে গাঢ় নীল গ্রেট কোট, দু'জনের মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মত ব্যবধান। এ-ও কি

কাকতালীয় ঘটনা যে ইউরি রুস্তভের সাথে একই গতিতে হেঁটে আসছে পুলিশ লোকটা? মাঝখানের ব্যবধান কমছেও না, বাড়ছেও না!

ও কি সত্যি ইউরি রুস্তভ?

সাদা বোতামটা এখনও দেখতে পাচ্ছে না ডকিনস। ত্রিশ-বত্রিশ, লোকটার বয়স আন্দাজ করল সে। সোজা তাকিয়ে আছে, তার দিকে নয়, তার পাশ ঘেঁষে সোজা রাস্তা বরাবর। চেহারা লক্ষ করে মনে মনে আঁতকে উঠল ডকিনস। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে হয় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে, নাহয় জ্ঞান হারাবে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় এই লোকই ইউরি...?

এ-ধরনের ঝুঁকি নিয়ে অভ্যস্ত নয় লোকটা।

একেবারে সামনে চলে এল নাবিক, ডকিনস তার সাদা বোতাম দেখতে পেল। তুমারে পা বাধিয়ে নিখুঁত একটা আছাড় খেলো সে, উপস্থিত বুদ্ধিতে এরচেয়ে ভাল কোন উপায় তার মাথায় আসেনি। পুলিশ লোকটা এখনও পঞ্চগশ গজ পিছনে। আর্ট ক্যাটালগটা বগল থেকে পড়ে খুলে গেছে, সাদা তুমারে রঙিন ছবিগুলো রক্তের দাগের মত দেখাল। এই ক্যাটালগ দেখেই ডকিনসের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবে ইউরি রুস্তভ। ডকিনস উঠে বসার চেষ্টা করছে, সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল ইউরি।

‘বিশ তারিখে রওনা হবেন তিনি,’ ডকিনসকে ধরে তুলতে শুরু করল ইউরি। ‘বিশ তারিখে, বিশে ফেব্রুয়ারি...এন.পি.সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে আই.আই. ফাইভে পৌঁছুবেন...বিশ, বিশ...’

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে তুমার ঝাড়তে শুরু করল

ডকিনস। ইউরি রুস্তভ তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে এগোল আবার। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না সে।

ডকিনসের সামনে থামল পুলিশ লোকটা। রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, ‘হাঁটতে পারবেন বলে মনে করেন? অনেক দূর যেতে হবে?’

রুশ ভাষা জানে ডকিনস, কিন্তু ইউরি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। ইংরেজীতে বলল সে, ‘কিছু না, গোড়ালিতে একটু মোচড় খেয়েছি, ধন্যবাদ।’ কিছুই না বুঝে ওর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল পুলিশ, মুখে সামান্য ব্যথার ভাব নিয়ে একটু হাসল ডকিনস। ‘লেনিনগ্রাদ হোটেল থেকে আসছি আমি, মিউজিয়ামে যাচ্ছিলাম...তা বোধহয় আর সম্ভব নয়।’

ক্যাটালগটা তুমার থেকে তুলে ডকিনসের হাতে ধরিয়ে দিল পুলিশ। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা ধরল ডকিনস। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে। ভান নয়, সত্যিই ব্যথা পেয়েছে।

এ এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে, ভাবল সে। পরশু লেনিনগ্রাদ ছাড়ার কথা তার, রোববার সকালের ফ্লাইটে। কিন্তু এখন জানা গেল ওই একই দিনে এন.পি.সেভেনটিন থেকে আই.আই. ফাইভের উদ্দেশ্যে রওনা হবে ইভেনকো রুস্তভ। তারমানে পরশু নয়, আরও আগে হেলসিঙ্কিতে পৌঁছুতে হবে তাকে। অথচ রুশ কর্তৃপক্ষ জানে, বিশিষ্ট আর্ট ক্রিটিক এবং লেখক আলবার্ট ডকিনস বিশ তারিখের আগে মিউজিয়াম দেখা শেষ করতে পারবেন না। পায়ের ব্যথাটায় কোন ভেজাল নেই, তাড়াহুড়ো করে রাশিয়া ছাড়ার কারণ হিসেবে দেখানো চলবে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেভস্কি প্রসপেক্টে ফিরে এল ডকিনস, দেখল লাল-চুলো কিশোরীর মান ভাঙাবার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছে জ্যাকেট পরা কিশোর। সারা গালে আলতো চুমোর স্পর্শ নিয়েও কিশোরী ঠোঁট ফুলিয়ে আছে। ইতিমধ্যে তুষারপাত আরও বেড়েছে, সেই সাথে কুয়াশা আর সন্ধ্যা দ্রুত ঢেকে ফেলছে চারদিক। রাস্তা ফাঁকা, কোন গাড়ি আসছে না। পুলিশ লোকটা এখনও পিছু পিছু আসছে কিনা দেখার জন্যে একবারও ঘাড় ফেরায়নি ডকিনস। ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল সে।

জ্যাকেট পরা কিশোর শেষ পর্যন্ত জিতল। কিশোরীর হাতে আরও একটা কিল খেলো সে, কিন্তু মিষ্টি আদরের কিল। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে উঠল সে। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। বোমার মত বিস্ফোরিত হলো এগজস্ট। বাঁকি খেয়ে লাফ দিয়ে সামনে ছুটল গাড়ি। এতক্ষণে মনে পড়ায় হেডলাইটের সুইচ অন করল সে।

খুঁড়িয়ে হাঁটাটা ডকিনসের যদি ভান হত, লাফ দিয়ে অনায়াসে সরে আসতে পারত সে। গাড়িটা তার গায়ের ওপর এসে পড়ছে, এই সময় চোখ ঝাঁপানো আলো জ্বলে উঠল। একেবারে অন্ধ হয়ে গেল ডকিনস। কিশোর দেখল, গোটা উইন্ডস্ক্রীন জুড়ে রয়েছে ফার কোট পরা লোকটা। দ্রুত হইল ঘোরাল সে, গাড়ির নাকে লোকটাকে আটকে নিয়ে ফুটপাথের সাথে ধাক্কা খেলো। রাস্তা থেকে ফুটপাথ আড়াই ফিট উঁচু, ডকিনসের মাথা আর বুক পড়ল ফুটপাথের ওপর, শরীরের বাকি অংশ থাকল রাস্তায়। মট মট করে পাঁজর ভাঙার আওয়াজ হলো। গাড়ির সামনের দুটো চাকা ডকিনসকে চাপা দিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথের ওপর। বুক থেকে

চাকা নামার আগেই মারা গেছে ডকিনস।

রাস্তার ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। একশো গজ দূরে রাস্তা পার হবার জন্যে থেমেছে ইউরি রুস্তভ, দৃশ্যটা দেখে মাথা ঘুরে গেল তার।

বন্দরে অপেক্ষা করছে ট্রলার বার্জেন, তিন ঘণ্টা পর নোঙর তুলবে। টলতে টলতে রাস্তা পেরোল ইউরি, চোখে অন্ধকার দেখছে। গোটা ব্যাপারটাই ভুল হয়ে গেছে, আমেরিকান লোকটা মারা যাওয়ায় ওয়াশিংটনে মেসেজটা পৌঁছবার আর কোন উপায় থাকল না। তার ভাইকে সাবধান করে দেয়াও এখন আর সম্ভব নয়।

ইভেনকো রুস্তভ রোববারে এন.পি. সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে যাবে, অথচ আমেরিকানরা সে-ব্যাপারে জানবে না কিছুই।

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বন্দরের দিকে হাঁটছে ইউরি। মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

শনিবার সকাল আটটা, এস.এস.এস. হেডকোয়ার্টার।

‘আমেরিকান লোকটা, কি যেন নাম...ডকিনস, নেভস্কি প্রসপেক্টে মারা গেছে কাল,’ বলল আর্কটিক মিলিটারি জোনের স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিস চীফ কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ‘কি যেন ঠিক মিলছে না। উদ্ভট কিছু একটা আছে, অথচ আঙুল তুলে দেখাতে পারছি না।’

গৌরবর্ণ বিশাল দৈত্য সে। চকচকে কামানো মাথাটা সব সময় গরম হয়ে থাকে। গোটা রাশিয়ায় তার মত কাজপাগল লোক দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। যখন সে শান্তভাবে কথা বলে মনে

হয় সিংহ গজরাচ্ছে। কংক্রিটের মেঝেতে পা ঠুকলে বুঝতে হবে মাত্র রেগে উঠতে শুরু করেছে সে, তখন চেয়ার-টেবিল কেঁপে উঠলেও ঘরে যারা উপস্থিত থাকে তাদের এক চুল নড়ার শক্তি থাকে না। নিজের যেমন প্রাণশক্তির সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি অধীনস্থ লোকদের চরকির মত ব্যস্ত রাখতেও তার জুড়ি মেলা ভার।

‘কমপ্লিট একটা রিপোর্ট চাই আমি, জুনায়েভ,’ আবার বলল কর্নেল। ‘গাইড নাতাশাকে আনো। পুলিশ লোকটা দেখেছে, তাকেও। প্রত্যক্ষদর্শী আর যারা আছে তাদের সবাইকে বিকেল তিনটের মধ্যে এই অফিসে এক লাইনে দাঁড় করাও। আমি নিজে ওদের জেরা করব।’

ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে নিকিতা জুনায়েভ বলল, ‘কর্নেল কমরেড।’

‘এয়ারপোর্টে খোঁজ নাও। একে-তাকে জিজ্ঞেস করলে অনেক তথ্য পেয়ে যাবে। একা এসেছিল কিনা জানতে চাই আমি। বিকেলের আগে।’

‘কর্নেল কমরেড।’

‘পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাও, জুনায়েভ। ডকিনসের ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিস-পত্র সাথে করে নিয়ে এসো। ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিনগ্রাদে আমেরিকান ট্যুরিস্ট! অসম্ভব! এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে।’

এতক্ষণ কর্নেল একবারও মুখ তুলে তাকায়নি। সহকারী জুনায়েভকে নির্দেশ দিচ্ছে মুখে, মনে মনে ভাবছে মেয়েটার এবার বিয়ে না দিলেই নয়, আর চোখ বুলাচ্ছে খোলা একটা ফাইলে।

নিকিতা জুনায়েভের বয়স পঁয়ত্রিশ, কর্নেলের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। এস.এস.এস. চীফের সহকারী হবার সমস্ত যোগ্যতা তার আছে, আর আছে কর্তার অহেতুক আশ্বালন এবং বাম বাম বৃষ্টির মত নির্দেশগুলোকে শান্তভাবে গ্রহণ করার দুর্লভ গুণ। এই গুণটার জন্যেই আজও কর্নেলের সহকারী হিসেবে টিকে আছে সে। এর আগের লোকটা আত্মহত্যা করেছিল।

‘কর্নেল কমরেড,’ শান্ত গলায় বলল জুনায়েভ, ‘লোকটার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই যে...’

‘কি! এখনও তুমি যাওনি!’

জুনায়েভ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল বলটুয়েভ, কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে উঠল চেয়ারটা। জানালার সামনে এসে বাইরে তাকাল সে। সকাল আটটায়ও বাইরে অন্ধকার। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, তুষার মাথায় করে কাজে যাচ্ছে লোকজন।

পকেট থেকে খুদে একটা দাবার ছক বের করে আবার ডেস্কে বসল কর্নেল। ঘরের ভেতর হিসহিস শব্দে একটা স্টোভ জ্বলছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে টেলিপ্রিন্টারের আওয়াজ। গভীর মনোযোগের সাথে দাবার একটা জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল সে। সাদা আর কালো ঘুঁটির অবস্থান দেখে যে-কারও মনে হবে, পরিণতি ড্র হতে বাধ্য। অথচ কাসপারভ এই খেলায় জিতেছে।

সমস্যাটা নিয়ে তিন দিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছে কর্নেল। আজ মাত্র আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সমাধান বেরিয়ে এল। আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গেল তার, বারবার মনে হতে লাগল ডকিনসকে সন্দেহ

করে ভুল করছে না সে।

লেনিনগ্রাদে ইহুদিদের নিয়ে বিরাট সমস্যা রয়েছে। প্রতি বছর বেশ কিছু ইহুদি পালিয়ে চলে যাচ্ছে ইসরায়েলে। কোন সন্দেহ নেই ইহুদিদের আভারখাউন্ড একটা সেল অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। কর্নেল বলটুয়েভের বিশ্বাস, এই আভারখাউন্ড সেল টাকা পাচ্ছে বিদেশ থেকে। ডকিনসের ব্যাপারটা জানার সাথে সাথে তার মনে হয়, ইহুদিদের জন্যে লোকটা টাকা নিয়ে আসেনি তো? সে জন্যেই, লোকটা মারা গেলেও, তার লাশ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে সে।

শনিবার সকাল আটটায়ও কর্নেল বলটুয়েভ জানে না যে সময়ের সাথে ভয়ানক এক দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে তাকে—রোববারে এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রস্তুভ যাত্রা শুরু করার আগে ডকিনস রহস্য ভেদ করতে হবে তার।

ওয়াশিংটনে এখনও মাঝরাত, শুক্রবার। রানা এখনও ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে ঘুমাচ্ছে। সোভিয়েত ঘাঁটি এন.পি.সেভেনটিনে এখন ভোর চারটে, কিয়েভ থেকে সবোমাত্র এখানে পৌঁচেছে ইভেনকো রস্তুভ।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো গুনতে গুনতে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে ইভেনকো রস্তুভ।

বরফ-দ্বীপ এন.পি.সেভেনটিনের মাঝখানে সরু একটা এয়ারস্ট্রিপ, আরেকবার পরিষ্কার করে প্লেন নামার উপযোগী রাখা হয়েছে। ভোর চারটে, চাঁদের আলো গায়ে মেখে এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পশ্চিমে আমেরিকানদের রিসার্চ বেস

আই.আই.ফাইভ, মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। কিন্তু ইভেনকো তাকিয়ে আছে পূবে। বরফ-দ্বীপের বাইরে জ্যাস্ত পোলার প্যাক আড়মোড়া ভাঙছে, চাঁদের আলোয় ভাঙা কাঁচের সীমাহীন স্তূপের মত দেখতে লাগল। ঘরগুলো তার পিছনে, সমতল ছাদ তুষারে ঢাকা পড়ে আছে। পায়ের আওয়াজ ওদিক থেকেই এল। শক্ত কাঠ হয়ে গেল ইভেনকো।

এই আওয়াজ তার চেনা। সিকিউরিটি এজেন্ট পিটার আন্তভ তার ওপর কড়া নজর রাখছে। পায়ের আওয়াজ ঠিক পিছনে এসে থামল। ‘আপনার শরীর খারাপ, কমরেড অ্যাকাডেমিশিয়ান?’

‘এরচেয়ে ভাল কখনও ছিলাম না!’

‘না, রাত শেষ হয়নি বাইরে চলে এসেছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।’ সুর শুনে মনে হবে না যে জেরা করছে, তবে উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় থাকে।

‘রোজই এ-সময় ঘুম ভাঙে আমার, এতদিনে কথাটা তোমার জানা উচিত ছিল।’ সে যে রেগে গেছে তা গোপন করার চেষ্টা করল না ইভেনকো। কাজ হলো, গজগজ করতে করতে ঘরগুলোর দিকে ফিরে গেল আন্তভ।

কোটের পকেটে ইভেনকোর দস্তানা পরা হাত দুটো কঠিন মুঠো হয়ে উঠল। আন্তভ একটা সমস্যা হতে যাচ্ছে। ঘর থেকে সে বেরলেই তার পিছু নিচ্ছে লোকটা। রেগে ওঠার আরেকটা কারণ, পরিকল্পনার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁচেছে সে যখন সিকিউরিটির কাউকে দেখলেই তার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। পিটার আন্তভ কর্নেল বলটুয়েভের বিশ্বস্ত এজেন্ট, আর কর্নেল বলটুয়েভের স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসই ছয় মাস আগে তার



প্রাণপ্রিয় সুমাইয়া নাজিনকে খুন করেছে।

সুমাইয়ার কথা মনে পড়তেই চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল ইভেনকোর। তারই মত ইহুদি ছিল সুমাইয়া। দু'জনের বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হলেও, পরস্পরকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু লেনিনগ্রাদে যখনই গেছে সে, দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মত একসাথে থেকেছে। হঠাৎ একদিন এন.পি.সেভেনটিনে খবর এল, সুমাইয়া সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে।

কিছুদিন পর লেনিনগ্রাদে ছুটিতে এসে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারল ইভেনকো। সুমাইয়া আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের সাথে জড়িত, জানত সে। গোপনে চাঁদা তুলত সুমাইয়া, প্রতিভাবান ইহুদিদের ইসরায়েলে পালাবার ব্যবস্থা করে দিত। আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের আরেকটা কাজ ছিল গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা, সময় মত সে-সব ইসরায়েলে পাচার করা হত। যেভাবেই হোক, কর্নেল বলটুয়েভ সন্দেহ করতে শুরু করে সুমাইয়াকে। এক গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টারে। সেখানে সুমাইয়ার ওপর কি ধরনের নির্যাতন চালানো হয় তা জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষ শুধু তার আত্মীয়দের জানায়, সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল সুমাইয়ার, তাতেই মারা যায় সে।

হাতঘড়ি দেখল ইভেনকো। চারটে দশ, স্থানীয় সময়। আরও বিশ ঘণ্টা পর রওনা হবে সে।

সময়ের হিসেবটা ভারি গুরুত্বপূর্ণ, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে শ্রেফ মারা পড়বে সে। আমেরিকানরা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, সে তার রওনা হবার দিন-তারিখ নিজেই নির্ধারণ

করবে, এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখ আর বদল করা চলবে না।

ছোট ভাই ইউরির সাথে কিয়েভে দেখা করেছে সে। ইউরির সাথে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্ট ডকিনসের। ডকিনসের মাধ্যমে আমেরিকানরা তার রওনা হবার নির্দিষ্ট তারিখ জেনে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা, আর বিশ ঘণ্টা পর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়া। তারপর যা থাকে কপালে।

কর্নেল বলটুয়েভ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। শনিবার সকাল এগারোটার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জড়ো করা হলো হেডকোয়ার্টারে, কর্নেল নিজে তাদেরকে জেরা করল। জেরা করার পর প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা করে মন্তব্য করল সে। মাদাম নাতাশা সম্পর্কে বলল, 'একটা দুশ্চিন্তা গাভী, জুনায়েভ। এ-ধরনের মেয়েদেরই যমজ বাচ্চা হওয়া উচিত, দিন-রাত দুখ খেয়েও শেষ করতে পারবে না। ওকে দেখে আমারই ইচ্ছে হচ্ছিল সদ্যজাত খোকা হয়ে যাই। নিশ্চয়ই ডকিনসেরও তাই হয়েছিল।'।

পুলিস লোকটার সাথেই সবচেয়ে বেশি সময় কাটাল কর্নেল। কর্নেলের ঘর থেকে এক ঘণ্টা পর যখন বেরুল সে, মনে হলো তার ওপর স্টীম রোলার চালানো হয়েছে। হোটেল লেনিনগ্রাদের বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাইকে জেরা করা হলো। তলব পেয়ে আসতে হলো এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালদের।

কিন্তু কারও কাছ থেকেই সন্দেহ করার মত কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

সবশেষে জুনায়েভ বলল, 'কর্নেল কমরেড, আমার মনে হয়, ইহুদিদের সাথে ডকিনসের কোন সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া বৃথা।'।

চেয়ার-টেবিল, দেয়াল, আলমারি, সব কাঁপতে লাগল, কারণ কর্নেল বলটুয়েভ থপ থপ পা ফেলে পায়চারি করছে। ‘ওদেরকে যে কেউ টাকা এনে দিচ্ছে, এ আমরা জানি,’ বলল সে। ‘একে একে পাঁচদিন মিউজিয়ামে গেল ডকিনস, প্রতিবার সাথে ছিল গাভীটা। তারপর, কাল কি ঘটল?’

‘রোড-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল সে,’ নিরীহ ভঙ্গিতে বলল জুনায়েভ।

‘তার আগে!’ চোখ পাকাল কর্নেল। ‘রুটিন ব্রেক করেছে সে, জুনায়েভ! গাইডকে রাতেই বলে রাখল শরীর খারাপ, কাল সে বাইরে বের হবে না, অথচ চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল—একা। কেন, জুনায়েভ, কেন?’ মেঝেতে সবুট পা ঠুকল সে।

‘শরীর ভাল ছিল তাই মিউজিয়ামে যাচ্ছিল...’

‘চারটেয়, যখন মিউজিয়াম বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে?’

‘হয়তো কারও সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল...’

কর্নেলের চেহারায় বিজয়ের উল্লাস ফুটে উঠল। ‘ঠিক তাই। কিন্তু কার সাথে? দেখা যে হয়নি, এটা পরিষ্কার, কারণ তার আগেই সে মারা যায়। এসো, গোটা ব্যাপারটা আবার স্মরণ করি। ডকিনস হোটেল থেকে বেরল, পার্কে ঢুকল...’

‘আছাড় খেয়ে পা মচকাল...’

‘মনে হলো আছাড় খেয়ে পা মচকেছে, জুনায়েভ,’ বাধা দিয়ে বলল কর্নেল। ‘দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আছাড় খেলো সে একজন নাবিকের সামনে। কেন? কে এই নাবিক?’

‘যে-কেউ হতে পারে,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জুনায়েভ।

‘উঁহু, তার পরিচয় জানতে হবে আমাদের। লোকটার বগলে

একটা এয়ারব্যাগ ছিল, যাচ্ছিল বন্দরের দিকে।’ টেবিলের সামনে পায়চারি থামাল সে, দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করল। ডকে কি ঘটছে না ঘটছে তার দৈনন্দিন রিপোর্ট লেখা হয় এই ফাইলে। ‘কাল একটাই মাত্র জাহাজ নোঙর তুলেছে, বার্জেন, একটা ট্রলার। তারমানেই দাঁড়াল, নাবিক লোকটা বার্জেনে ওঠার জন্যে বন্দরে যাচ্ছিল।’

‘ফাইলটা আমি দেখেছি, কর্নেল কমরেড,’ বলল জুনায়েভ। ‘বার্জেনের ড্রুর সংখ্যা তিরিশ...’

‘কিন্তু তালিকাটা এখানে নেই—যোগাড় করো! বিকেলের মধ্যে চাই আমি।’

‘কিন্তু এত অল্প সময়ের ভেতর...’

‘সেটা তোমার সমস্যা!’ নিজের চেয়ারে বসল কর্নেল। দাবার পকেট সংস্করণ ছকটার ভাঁজ খুলে খেলায় মন দিল সে। জুনায়েভ দরজার কাছে পৌঁছুল। ‘ভাল কথা, এ হুগুয় আমি মস্কোয় থাকার সময়, ফিরে এসে দেখলাম, আবার তুমি ইভেনকো রস্তুভের এন.পি. সেভেনটিনে যাবার আবেদনে সই করেছ। আমার ধারণা ছিল, রস্তুভ তার কাজ শেষ করেছে ওখানে।’

‘প্রায় শেষ করেছে, হ্যাঁ,’ দরজার কাছ থেকে বলল জুনায়েভ। কর্নেল হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করায় সামান্য অস্বস্তি বোধ করল সে। ‘শেষ-বারের মত কয়েকটা ডেপথ-সাঁউন্ডিং এক্সপেরিমেন্ট বাকি ছিল, তাই...তাছাড়া, তার হাবভাবে মনে হলো ব্যাপারটা আপনিও জানেন...’

‘ঠিক আছে, জুনায়েভ,’ মুখ না তুলেই বলল কর্নেল। ‘ঠিক আছে। ওখানে তার আর কোন কাজ নেই মনে করেছিলাম, তাই

অবাক লাগল।’

চল্লিশ হাজার ফিট উঁচু আকাশ-পথে ওয়াশিংটন থেকে থিউলে পৌঁছতে হয় ঘণ্টা লাগল। শনিবার সকাল এগারোটায় ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল ওদের বোয়িং গ্রীনল্যান্ডে নামার জন্যে এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্রর দিতে শুরু করেছে। সকাল, কিন্তু ধবধবে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসনকে বলল, ‘মনে হচ্ছে যেন এই তো পাঁচ মিনিট আগে ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়েছি।’

সদ্য ভাঁজ ভাঙা নীল সুট পরে আছে মরিসন, নিখুঁত দাড়ি কামানো মুখে একটা সিগারেট গুঁজে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। ‘তুমি তো দিব্যি ঘুমালে। আমার মনে হচ্ছে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে।’

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। ভোর পাঁচটায় বোয়িং টেক অফ করার পাঁচ মিনিট আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছায় মরিসন। শেষ মুহূর্তের নির্দেশে প্লেনে চড়তে হয়েছে তাকে, কাঁধে গুরুদায়িত্ব-থিউল-এ একজন রশ গুপ্তচর আছে, খুঁজে বের করতে হবে তাকে। বেচারার নার্ভাস না হয়ে উপায় কি!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায় গ্রীনল্যান্ড আইসক্যাপের সমতল ধু-ধু প্রান্তর। খানিক দূরে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে হাজার ফিট লম্বা রাডার মাস্ট, মাথায় লাল সতর্ক-সংকেত জ্বলছে আর নিভছে। চারদিকে তিন হাজার মাইল রেঞ্জ ওটার, ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের প্রধান স্টেশন।

‘টেনিসনের অফিসে দেখা করব তোমার সাথে,’ হঠাৎ বলল

মরিসন। ‘হয়তো সন্দের দিকে কোন এক সময়।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। কথাটার একটা তাৎপর্য আছে। মরিসন বলতে চাইছে সন্দের মধ্যে কাঁকড়ার পরিচয় বের করে ফেলবে সে। নাকি এরই মধ্যে পরিচয়টা জেনে ফেলেছে? বেসে পৌঁছেই গ্রেফতার করবে তাকে?

বোয়িং ল্যান্ড করল। রানার জন্যে অপেক্ষা করছে মাইকেল জনসন। রানার পরনে ফার পারকা থাকলেও, স্থির বাতাস প্রচণ্ড ঘূসির মত আঘাত করল চোখে মুখে। জিরো থেকে চল্লিশ ডিগ্রী নিচে রয়েছে টেমপারেচার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাইকেল জনসনের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রানা, দু’জনেই দস্তানা পরে রয়েছে।

জনসন একটু খাটো, পাঁচ ফিট চার। লম্বাটে মুখে বেমানান গান্ধীর্ষ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তবে চারপাশ কুঁচকে সরু হয়ে নেই চোখ। করমর্দন করার সময় রানাকে সে বলল, ‘আপনার অভিযানের জন্যে সব রেডি করে রেখেছি, মি. রানা...।’ সিঁড়ির মাথায় মরিসনকে দেখে থেমে গেল সে। তরতর করে নেমে এল মরিসন, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল টেনিসনের দিকে এগোল। কর্নেল টেনিসনই ক্যাম্প কমান্ডার। ‘কে ও?’

একটা কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘কি জানি,’ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ও। ‘বোবা তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্লেনে কোন কথাই বলেনি। আমি অবশ্য ঘুমিয়েই...’

মুখ তুলে আবার সিঁড়ির মাথার দিকে তাকাল সিকিউরিটি চীফ, চীফ পাইলট ধাপ বেয়ে নেমে আসছে। ‘এক্সকিউজ মি,’ পাইলটের পথরোধ করে দাঁড়াল সে। ‘দ্বিতীয় লোকটা-কে ও? কথা ছিল এই ফ্লাইটে শুধু মি. মাসুদ রানা আসবেন।’

পাইলটের এক হাতে ফ্লাইট হেলমেট দেখা গেল, অপর হাত দিয়ে পারকার হুডটা মাথায় পরল সে। ‘যখনই আসি এখানে, আগের বারের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। চিনি না, একেবারে শেষ মুহূর্তে প্লেনে চড়ল লোকটা। সরকারি গাড়ি করে এল...’

‘আমি এখানকার সিকিউরিটি চীফ, অথচ...,’ রানাকে ইশারা করে রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়াল জনসন, একটা জীপের দিকে নিয়ে চলল রানাকে। ‘ঠিক আছে, ওর ব্যাপারটা পরে চেক করব আমি।’ রানাকে পাশে নিয়ে জীপে বসল, চাবি ঘোরাল ইগনিশনে। ‘যা বলছিলাম, আপনার অভিযানের জন্যে সব রেডি করা আছে, মি. রানা। ইস্ট গ্রীনল্যান্ড কোস্টে অর্থাৎ কার্টিস ফিল্ডে একজোড়া সিকোরস্কি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে। আপনার জন্যে মি. নিয়াজ আর মি. বিনয় অপেক্ষা করছে হেডকোয়ার্টারে।’ চওড়া রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে জীপ চালাচ্ছে সে। ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে ওরা। সামনের জীপে, বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ক্যাম্প কমান্ডার কর্নেল টেনিসন আর এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসন। ‘একজোড়া নরওয়েজিয়ান-টাইপ স্লেজ-ও পাঠানো হয়েছে কার্টিস ফিল্ডে...’

‘ওগুলো কোন কাজেরই নয়,’ বাধা দিল রানা। ‘আমি এক্সিমো স্লেজের কথা বলেছিলাম-ওগুলো অনেক বেশি ভারী, বরফ যতই এবড়োখেবড়ো হোক ভেঙে পড়ে না।’

জনসনকে বিস্মিত দেখাল। ‘আমরা নিজেরাও তো নরওয়েজিয়ান-টাইপ স্লেজ ব্যবহার করি। এক্সিমো স্লেজ নেইও আমাদের...’

‘আছে। শেষবার যখন এসেছিলাম, বড় হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গারের পিছনে একজোড়া দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে।’

‘লজ্জা দিলেন, মি. রানা!’ হাসতে লাগল সিকিউরিটি চীফ। ‘একবার উঁকি দেবেন নাকি? সামনের বাঁকে পৌঁছে সোজা না গিয়ে ডান দিকে গেলেই...’

‘এখনই?’

‘নয় কেন!’ বলল জনসন। ‘যতদূর বুঝেছি, আপনার খুব তাড়া আছে।’

রোলার দিয়ে চ্যাপ্টা করা তুষার-পথ ধরে ছুটল জীপ, তেমাথায় পৌঁছে ডান দিকে ঘুরে গেল। বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল ক্যাম্প-গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ঢালু ছাদ লাগানো অনেকগুলো ঘর। ওদের সামনে, সে-ও অনেকটা দূরে, বিরাট একটা হ্যাঙ্গার। সিকি মাইল সামনে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সামরিক বিমানঘাঁটি চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে-গোটা রানওয়ে নিরেট বরফে ঢাকা। বেড়ার সামনে, হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি, কমলা রঙের নিশ্চল একটা স্লো-প্রাউ দেখা গেল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জনসন। ‘গোটা এলাকার রিপোর্ট। ঠিক কোন্ এলাকার ওপর আপনি ইন্টারেস্টেড আমি জানি না। এবড়োখেবড়ো বরফ...না কি যেন বললেন?’

‘রাফ আইস।’

হল ফোটানো আর্কটিক বাতাস সহ্য হচ্ছে না রানার। এরইমধ্যে অসাড় হয়ে গেছে মুখ, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। প্রধান রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কমান্ডার টেনিসনের জীপ, পিছনের লাল আলো জোড়া দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে এল। হঠাৎ আরেকটা জীপ দেখতে পেল রানা। প্রধান রাস্তা ধরে ক্যাম্পের দিক থেকে

আসছে। না, ওদের দিকে নয়, বোয়িং-এর দিকে ছুটে গেল সেটা।

‘কুয়াশার খবর কি?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ভাঁজ খুলে চোখ রাখল ওয়েদার রিপোর্টে।

‘থ্যাক্স গড, কোথাও কোন ছিটেফোঁটা কুয়াশাও নেই। এখান থেকে নরওয়ে পর্যন্ত আবহাওয়া একেবারে পরিষ্কার।’

‘কিন্তু এই অবস্থা কতক্ষণ থাকে সেটাই হলো কথা।’

কাঁধ বাঁকাল জনসন। ‘আর্কটিক ওয়েদার মেয়েদের মনের মত, দেবতারাও হৃদিস পান না।’

জীপের গতি কমিয়ে দিল জনসন, তাকাল রানার দিকে। রানা রিপোর্ট পড়ছে। জীপ থামল। দস্তানা পরা ডান হাতটা মুখের সামনে তুলে আঙুলগুলো বার কয়েক ভাঁজ করল জনসন। ‘পোকা ঢুকল না মাছি!’ আপনমনে বিড়বিড় করল সে। ইঞ্জিন সচল, বন্ধ করা হয়নি। দস্তানা খুলে ডান হাতটা পকেটে ভরল সে। বেরিয়ে এল পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন নিয়ে। বিদ্যুৎগতিতে রানার কপালের পাশে ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল সে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। কপালের পাশটা ভেতর দিকে দেবে না গিয়ে, ঢুল সহ খুলির খানিকটা চামড়া হারাল। হেঁ দিয়ে ইগনিশন থেকে চাবিটা বের করেই তুষারের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। এবার রানার মাথার মাঝখানটা লক্ষ্য করে রিভলভারের ব্যারেল নামাল জনসন। চোখ-ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ ঘটল মাথার ভেতর, পরমুহূর্তে ঘন কালো অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল রানা।

## চার

কুণ্ডলী পাকিয়ে তুষারের ওপর পড়ে আছে রানা। জ্ঞান ফিরে এলেও প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা তুলতে পারছে না। ফর্সা, ভরাট একটা হাসিখুশি মুখ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। হাতের ফ্লাস্কটা রানার ঠোঁটের কাছে ধরল সে। ‘এক ঢোক খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, রানা।’

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু করল মাথা। সব ঝাপসা, কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেও লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল না। মুখ খুলল, খানিকটা ব্র্যান্ডি চালান করে দিল পেটে। প্রায় সাথে সাথে কেটে গেল ঝাপসা ভাব। লম্বা করে হিম বাতাস টানল কয়েকবার। ব্র্যান্ডির চেয়ে বেশি কাজ হলো তাতে। ‘সরো, বিনয়...’ নিজেই উঠে বসল রানা, তারপর দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

‘আরেকটু বিশ্রাম নিয়ে...’

তবু দাঁড়াল রানা, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। পড়ে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ধরে সিঁধে হতে সাহায্য করল বিনয়। জনসনের জীপ কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রানার মনে পড়ল চাবিটা তুষারে ফেলে দিয়েছিল সে। আরও খানিক দূরে আরেকটা জীপ দেখা গেল-উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ ফেটে গেছে, সামনের ডান দিকের টায়ার বসে পড়েছে। ‘কোন্ দিকে গেল জনসন?’

‘এয়ারফিল্ডের দিকে...ব্যাপারটা কি, রানা? জনসন আমাকে গুলি করছে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম...’

‘সে-ই কাঁকড়া-সিকিউরিটি লিক।’ এয়ারফিল্ডের দিকে

তাকিয়ে কিছুই দেখল না রানা। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানে গেট, গেটের পাশে গার্ড-পোস্ট, খানিক দূরে কমলা রঙের স্লো-প্লাউ, আরও সামনে হ্যাঙ্গার। জনসনের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

বিনয় প্রথমে ভেবেছিল রানা মারা গেছে। কিন্তু ওকে নড়তে দেখে নিজের অজান্তেই হাসতে শুরু করে সে। ‘সিকিউরিটি লিক সম্পর্কে একটা গুজব অবশ্য আমরাও শুনেছি। তোমাকে নিতে আসতে দেরি করে ফেলি আমি, পাইলট বলল জনসন তোমাকে জীপে করে নিয়ে গেছে...’ হঠাৎ বোকা লাগল নিজেকে, এত কথা কাকে বলছে সে?

বাতাসের গতিতে এয়ারফিল্ডের দিকে ছুটছে রানা। পিছু নিল বিনয়। বলল, ‘তার পালাবার কোন উপায় নেই। তোমার প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে টেনিসন। বেস সীল করে দেয়া হয়েছে...’

‘তুমি জানো জনসন কপ্টার চালাতে জানে না?’ পাল্টা চিৎকার করল রানা। বিনয় ভাবল, মাথায় দগদগে ঘা নিয়ে, সদ্য জ্ঞান ফেরা একজন লোক এত জোরে কিভাবে দৌড়ায়?

মাথার ক্ষতটা দপ দপ করছে, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে রানার। প্রচণ্ড রাগ আর জেদের বসে ছুটে চলেছে ও। হতে পারে জনসন রাশিয়ান স্পাই, কিন্তু ওর সাথে তার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই-তবু ওকে মারল কেন সে? ও যদি মারা যেত?

না, এই লোককে ছাড়া যায় না।

নির্জন গার্ড-পোস্ট। খানিকটা দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে চলে এল বিনয়।

‘রিভলভার আছে তোমার কাছে? গুড।’ রিভলভারটা বিনয়ের

হাত থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা। ‘পিছনে থাকো!’

হাতে উদ্যত কোল্ট পয়েন্ট ফরটিফাইভ নিয়ে সাবধানে গার্ড পোস্টের দিকে এগোল রানা। ঘরটা কংক্রিটের, সামনে তুষারের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের একটা আকৃতি। আরও কাছে এসে চিনতে পারল রানা। একজন মার্কিন সৈনিক কারবাইনটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। বুকের কাছে পারকায় এরই মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। জানে বেঁচে নেই, তবু পালস দেখে নিশ্চিত হলো রানা।

খুব সহজেই কাজটা সারতে পেরেছে জনসন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার মানে হলো কেউই এয়ারফিল্ডে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু জনসন ক্যাম্পের সিকিউরিটি চীফ, তাকে আসতে দেখে কিছুই সন্দেহ করেনি গার্ড। জনসন জানত, সিকিউরিটি চীফ হলেও কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, তাই বাধা দূর করার জন্যে একেবারে কাছে এসে গুলি করেছে সে। ‘এয়ারফিল্ডে পৌঁছে গেছে,’ বিনয় কাছে আসতে বলল রানা। বেড়ার ওদিকে তাকিয়ে কিছুই নড়তে দেখল না। ‘হ্যাঙ্গারে কপ্টার আছে, তারই একটা নিয়ে পালাবে। এসো!’

‘দু’জন গার্ড আছে হ্যাঙ্গারে,’ দ্রুত বলল বিনয়। ‘গার্ড-পোস্ট থেকে ফোন করতে পারি আমরা...’

গার্ড-পোস্টের ভেতরে ঢুকতে হলো না, বাইরে থেকেই দেখা গেল ফোনের তার ছেঁড়া। ছুটে এগোল রানা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে দুধ-সাদা বিস্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল। এয়ারফিল্ডের কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ‘গেল কোথায়!’ পরমুহূর্তে দৃষ্টি কেড়ে নিল স্লো-প্লাউটা।

এখন ওটা ছোট দেখাচ্ছে, কমলা রঙের ছারপোকাকার মত গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের দিকে। চিৎকার করে লাভ নেই, এতদূর থেকে শুনতে পাবে না গার্ডরা। আবার ছুটতে শুরু করল রানা। বিনয়ের পায়ে বুট থাকলেও, রানা এখনও রাবার-সোল লাগানো জুতো পরে রয়েছে। সমতল বরফ লোহার মত শক্ত, দৌড়াতে কোন অসুবিধে হলো না। কয়েক মিনিট প্রাণপণে দৌড়বার পর হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি এসে পিছলে গেল পা, দড়াম করে আছাড় খেলো রানা। বিনয় কাছে পৌঁছবার আগেই দাঁড়াতে পারল বটে, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখল পা ব্যথা করছে, রিভলভারটা কোথায় পড়েছে খুঁজে পাচ্ছে না।

আলগা খানিকটা বরফের ভেতর অর্ধেক মুখ লুকিয়ে রয়েছে রিভলভার, দেখতে পেয়ে তোলার জন্যে ঝুঁকল রানা, যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন শুনে শিরশির করে উঠল ঘাড়ের পিছনটা। হ্যাঙ্গারের ভেতর হেলিকপ্টারের এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

হাতে রিভলভার নিয়ে ঝোঁড়াতে ঝোঁড়াতে ছুটল রানা, হ্যাঙ্গার এখনও দুশো গজ দূরে। ‘পিছনে থাকো!’

হ্যাঙ্গারের মুখের কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে প্লাউটা, বিদ্যুৎ চালিত বিশাল দরজাটা এখন খোলা। হ্যাঙ্গারের মুখ প্রকাণ্ড কালো একটা গহ্বর। মুখ থেকে দশ গজ দূরে রানা, এইচ-নাইনটিন সিকোরস্কি গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল। বন বন করে ঘুরছে ব্লেন্ডগুলো। তুষার আর বরফের কুচি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, দ্রুত রানার দিকে ধেয়ে এল যান্ত্রিক ফড়িংটা।

দু’পা একটু ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা। লক্ষ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, দু’হাতে রিভলভার ধরেছে ও। দশ সেকেন্ডের মধ্যে

ওকে পিষে এগিয়ে যাবে হেলিকপ্টার। ককপিটের দিকে রিভলভার তাক করেছে রানা, হেলমেট পরা পাইলটের কাঁধ আর মাথা ঝাপসা লাগল চোখে। বুক ভরে বাতাস টানল ও, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। ক্লিক আওয়াজটা শুনতে পেল না, অনুভব করল—কপ্টারের গর্জন হাতুড়ির বাড়ির মত ঘা মারছে কানে। ফায়ারিং মেকানিজম কাজ করছে না, গুলি বেরবে না।

‘লুক আউট!’ বিনয়ের আত্ননাদ যান্ত্রিক আওয়াজের ভেতর হারিয়ে গেল।

কপ্টারটাকে সোজা রানার দিকে ছুটিয়ে আনল জনসন। একপাশে ডাইভ দিল রানা, বরফে কাঁধ দিয়ে পড়ল, পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। অশরীরী গর্জন গ্রাস করল ওকে। খক খক করে উঠল মটর, বদলে গেল আওয়াজটা। শেষ গড়ানটা দিয়ে মুখ তুলে রানা দেখল এরইমধ্যে ছয়-সাত মানুষ উঁচুতে উঠে গেছে কপ্টার। বসল রানা, হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে তুষার আর বরফের কুচি ঝাড়ল। পাশে এসে দাঁড়াল বিনয়। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্লো-প্লাউটার দিকে তাকাল সে। প্লাউ-এর ব্লেডের তলায় অর্ধেক বেরিয়ে আছে লোকটা, গার্ডদের একজন। এই খুনটাও খুব সহজে সারতে পেরেছে জনসন। গ্রীনল্যান্ড এয়ারফিল্ডের স্লো-প্লাউ কোন অপরিচিত জিনিস নয়, ওটাকে এগিয়ে আসতে দেখে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে আসে গার্ড। স্লো-প্লাউটা সোজা তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয় জনসন।

হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে হোঁচট খেলো রানা। আরেকটু হলে দ্বিতীয় গার্ডের লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ঠিক কি ঘটেছে কল্পনা করতে পারল ও। এক ছুটে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে চিৎকার

জুড়ে দেয় জনসন, ‘ভয়ঙ্কর একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে!’ তাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে ছুটেছিল লোকটা, জনসন ঘাঁচ করে তার পিঠে আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছে ছোরা।

টর্চের আলোয় ওরা দেখল, পিঠের ওপর শুধু ছোরার হাতলটা বেরিয়ে আছে। কোল্ট ফেলে দিয়ে নিহত সৈনিকের কারবাইনটা তুলে নিল রানা। তারপর আবার ছুটল।

হ্যাঙ্গারের পিছন দিকে, হুড পরানো ল্যাম্পের নিচে, আরেকটা হেলিকপ্টার রয়েছে। দেয়ালের সুইচবোর্ড থেকে একটা ইলেকট্রিক কেবল নেমে এসে মেশিনের ভেতর ঢুকেছে, কপ্টারের মটরকে গরম রাখার জন্যে। প্লাগ থেকে কেবল খুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল রানা, দরজা খুলে কেবিনে ঢুকল। পিছু পিছু এল বিনয়।

‘কোন লাভ আছে?’ জিজ্ঞেস করল সে।

হেলমেট আর হেডসেট পাইলটের সীটেই থাকে, পারকা খুলে ফেলে সেগুলো পরল রানা। ‘চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।’ ওর সামনে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল—রাডার অলটিমিটার, ফ্যুয়েল গজ, রেভ কাউন্টার, ইত্যাদি। কালেকটিভ স্টিক, কপ্টারের ওপরে ওঠা নিয়ন্ত্রণ করে, ওর বাঁ দিকে। সাইক্লিক কন্ট্রোল স্টিক, ফ্লাইটের দিক বদল নিয়ন্ত্রণ করে, ওর ডান দিকে। টুইস্ট-গ্রিপ থ্রটল, দেখতে অনেকটা মটরসাইকেল থ্রটলের মত, কালেকটিভ স্টিকটাকে আঙুলের মত ঘিরে আছে। মটর চালু করল রানা।

গোটা কেবিন কেঁপে উঠল, শব্দের বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ল হ্যাঙ্গারের চারদিকে। মাথার ওপর রোটর ব্লেডগুলো থেমে থেমে ঘুরছে—স্টার্ট নেয়, থামে, স্টার্ট নেয়, থামে। তারপরই বাড়তে শুরু করল ইঞ্জিনের শক্তি। কংক্রিটের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে

শুরু করল চাকা।

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল সিকোরস্কি। সেই সাথে দেখা গেল প্রায় তারার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া রাডার মাস্ট। থ্রটল ব্যবহার করল রানা। হিম বাতাস কেটে পঞ্চাশ ফিট রোটর বন বন করে ঘুরছে, আওয়াজ শুনে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে কপ্টার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ওগুলো। গোটা মেশিন থরথর করে কাঁপছে। কয়েক সেকেন্ড পর বরফ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল সিকোরস্কি।

কাঁটাতারের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় গার্ড-পোস্টের কাছে একটা গাড়ি দেখল ওরা। হেডলাইটের আলোয় গার্ডের লাশ দেখছে কয়েকজন লোক। তাদের একজন রাইফেল তুলল আকাশের দিকে।

হেলমেট আর হেডসেট পরে রানার পাশে অবজারভারের সীটে বসেছে বিনয়, মাউথপীসে কথা বলল সে, ‘ওকি! ওরা গুলি করেছে কেন!’

এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল রাইফেলের আওয়াজ। ‘কেন আবার,’ হেলিকপ্টার নিয়ে দ্রুত আরও ওপরে উঠছে রানা। ‘মরিসনের ধারণা এখানে জনসন আছে।’

প্রায় খাড়াভাবে উঠে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এল ওরা। দিগন্তে প্রথম সিকোরস্কির কোন হদিস নেই। পূর্ব দিকে কোর্স বদল করল রানা, ওর ধারণা ওদিকেই যাবার কথা জনসনের।

‘মরিসন কে?’

‘এফ.বি.আই. এজেন্ট,’ বলল রানা। ‘কাঁকড়াকে থ্রোফতার করতে এখানে আসা তার। কথা ছিল বোয়িং থেকে নেমে কমান্ডার টেনিসনকে নিয়ে সরাসরি ক্যাম্পে যাবে সে, তারপর আমাকে



নিয়ে জনসন ক্যাম্পে পৌঁছুলে একটা বৈঠকে বসা হবে। মরিসনের ধারণা ছিল, কয়েকজনকে জেরা করলেই কাঁকড়ার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে।’ পুব দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় গোটা আকাশ ফাঁকা দেখল রানা।

‘কি ঘটল?’

‘মরিসনকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নেয় জনসন,’ বলল রানা। ‘জরুরী অবস্থা ঘোষণা করায় সন্দেহ তার আগেই হয়েছিল। কাজেই কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে।’

‘ওদিকে, রানা!’ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বিনয়। ‘উত্তরে!’

বাঁ দিকে তাকাল রানা। আরও অসংখ্য আইসক্যাপ-নির্জন, ঠাণ্ডা, ফাঁকা। তারপর চোখে পড়ল। জনসনের কম্পটার, আন্দাজ করল রানা, দশ মাইল দূরে। বরফ থেকে খানিকটা উঁচুতে, আবছা অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান আলোর একটা নিবু নিবু কম্পন। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর বরফের ওপর প্রথম হেলিকপ্টারের ছায়া দেখল ওরা। কোর্স বদল করল রানা। শুরু হলো ধাওয়া।

‘তোমার মেসেজ পেয়ে আমরা কিন্তু...’

‘হ্যাঁ, মেসেজে সব কথা বলা সম্ভব ছিল না,’ বিনয়কে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। ‘বলতে পারো, এই অ্যাসাইনমেন্টে আমেরিকাকে, সোজা কথায় সি.আই.এ-কে আমরা পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছি।’

‘হোয়াট!’

‘সব ঝুলে বুঝতে পারবে।’ সংক্ষেপে, কিন্তু কিছু বাদ না দিয়ে যা যা ঘটেছে সব বলে গেল রানা।

রানা থামতে বিনয় বলল, ‘রাশিয়ানরাও চাইছে ইভেনকো রুস্তভকে আমরা নিয়ে আসি, তারমানে ওরা আমাদের বাধা দেবে না...?’

‘বাধা দেবে, তবে সেটা হবে লোক-দেখানো-অন্তত আমি তাই আশা করছি,’ অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। মনে মনে ভাবল, ওরাও কোন প্যাঁচ কষছে কিনা সময়েই তা জানা যাবে।

‘কিন্তু রানা,’ অবাক হলো বিনয়, ‘রুশদের আমরা সাহায্য করছি, তাই না? তাই যদি হয়, জনসনকে পালিয়ে যেতে দিলেই তো পারি! ধরার দরকারটা কি!’

‘সাহায্য আমরা কে.জি.বি-কে করছি বিনয়,’ ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা। ‘জনসন কে.জি.বি. এজেন্ট নয়, স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক। স্পেশাল সিকিউরিটি অতীতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করবে। তাছাড়া, জনসনের সাথে এটা আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া।’

গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাল বিনয়কে। ‘ব্যাপারটা জটিল লাগছে, রানা। আমার জানা মতে, কে.জি.বি. আর এস.এস.এস. দুটো প্রতিষ্ঠানই যার যার গোপন ব্যাপারে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, কেউ কাউকে কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চায় না। জন মিলার, যে তোমাকে ইভেনকো রুস্তভকে এন.পি. সেভেনটিন থেকে নিয়ে আসার অনুরোধ করেছে, সে কে.জি.বি.-র লোক, কিন্তু আর্কটিকে রুশ ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে স্পেশাল সার্ভিস।’

‘আর্কটিকে স্পেশাল সার্ভিস কাজ করেছে তা সত্যি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু দেশ-বিদেশের সমস্ত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার

রয়েছে একমাত্র কে.জি.বি-র। কে.জি.বি. নির্দেশ দিলে সেটা স্পেশাল সার্ভিস মানতে বাধ্য।’

বিনয় আর কিছু বলল না বটে, কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় ভাব প্রকাশ করল। রানার কোল থেকে নাইটগ্লাসটা তুলে নিয়ে চোখে চেপে ধরল সে। ‘এখনও উত্তর দিকেই যাচ্ছে জনসন।’

জনসনের হেলিকপ্টার কখনও রানা দেখছে কখনও দেখছে না, তবে বরফের ওপর ছায়াটা একবারও হারায়নি। ‘সম্ভবত হামবোল্ডট গ্লেন্সিয়ারের দিকে যাচ্ছে ও। কারণটা বুঝি না। পূর্বদিকে গেলে উপকূল পেত। কোথাও থেকে ফিরে এসে ল্যান্ড করার সাথে সাথে ট্যাংক ভরে দেয়া হয়, কাজেই ফুয়েল কোন সমস্যা হবার কথা নয়। হামবোল্ডট গ্লেন্সিয়ারে কি আছে!’

‘ওদিকে কোথাও হয়তো একটা ট্র্যাপমিটার লুকানো আছে,’ বলল বিনয়।

‘সম্ভব,’ বলল রানা। ‘তা যদি থাকে, লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে ও।’

‘কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভের সাথে?’

‘লোকটা আমার সম্পর্কে জানে,’ তিঙ্ক একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘আমিও তার সম্পর্কে জানি। কেউ আমরা কাউকে দেখিনি। অথচ স্পেশাল সিকিউরিটির প্রতিটি এজেন্টের ওপর কর্নেল বলটুয়েভের নির্দেশ আছে, আমাদের দেখা মাত্র খুন করতে হবে। পুরস্কার-একসাথে তিনটে প্রমোশন।’

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় জিজ্ঞেস করল, ‘কারণ?’

‘রাশিয়া থেকে আমার মিগ-একত্রিশ নিয়ে আসাটাকে সবাই সহজভাবে নেয়নি, বিনয়,’ বলল রানা। ‘কর্নেল বলটুয়েভের

ধারণা, রুশ এয়ারফোর্স, রুশ সামরিক বাহিনী, এক কথায় গোটা রুশ জাতিকে দুনিয়ার চোখে আমি ছোট করেছি।’

খানিক গুম হয়ে থাকার পর বিনয় জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে জনসন তোমাকে সুযোগ পেয়েও খুন করল না কেন?’

হেসে উঠল রানা। ‘কে বলল চেষ্টা করেনি?’

‘বাঁট দিয়ে মাথায় না মেরে গুলি করলেই তো পারত!’

‘তোমার রিভলভারের ট্রিগার আমিও তো টানলাম, কিন্তু গুলি কি বেরল?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘ভুলে যেয়ো না, এটা গ্রীনল্যান্ড, বিলো ফরটি ডিগ্রী টেমপারেচার। ট্রিগার টানার পর গুলি নাও বেরতে পারে, জানত জনসন-জানত, তারপর আর সুযোগ পাবে না সে, ওকে কাবু করে ফেলব আমি। তাই কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। প্রথমে আমাকে আহত করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল।’

‘বুঝেছি! তোমাকে আহত করে বরফে নামিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি পৌঁছে গেছি দেখে সুযোগটা হারায়।’

রানা কিছু বলল না।

বিনয় আবার বলল, ‘তারমানে গোটা অ্যাসাইনমেন্টের চেহারা বদলে যাচ্ছে। কে.জি.বি-র নির্দেশ যদি পেয়ে থাকে কর্নেল বলটুয়েভ, ইভেনকো রুস্তভকে আমেরিকায় পালিয়ে আসতে দেবে সে। কিন্তু তোমাকে খুন করার সুযোগ হাতছাড়া করবে না।’

রানা বলল, ‘আমারও তাই বিশ্বাস।’

ওদের হেলিকপ্টার যত কাছাকাছি হলো, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো বিস্ময়কর হামবোল্ডট গ্লেন্সিয়ার। বহু উঁচু আইসক্যাপ থেকে

বিশাল এক নদী বিস্তৃত হয়ে নেমে এসেছে অনেক নিচের খাঁড়িতে, চকমকে বরফ নিয়ে আধ মাইল চওড়া একটা নদী, চাঁদের আলোয় সহস্র ফাটল ধরা স্ফটিকের বিস্তার যেন। আইসক্যাপ থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমেছে ওটা, তারপর বরফ-প্রাচীরের মাথা থেকে জল-প্রপাতের আকৃতি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে কয়েকশো ফিট নিচের খাঁড়িতে পড়েছে। আরও কাছে এসে ওরা দেখল, বরফের খাড়া পাঁচিল ঘেরা খাঁড়ির নিচে, নিরেট তীরের কাছাকাছি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেকগুলো আইসবার্গ। এরই মধ্যে জনসনের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছে, গ্লেসিয়ারের পাশের একটা ছোট বরফ-পাহাড়ের মাথায়। কিন্তু জনসনকে কোথাও দেখল না ওরা। তৃতীয়বারের মত অদৃশ্য হয়েছে সে।

বসে থাকা কপ্টারকে ঘিরে চক্র দিচ্ছে রানা। ‘কি জ্বালা, বারবার শুধু হারিয়ে যায়।’

‘হয়তো কপ্টারের ভেতরই ঘাপটি মেরে বসে আছে,’ বলল বিনয়। ‘আমরা ল্যান্ড করলেই টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।’

দুশো ফিট ওপরে থেকে চক্র দিচ্ছে রানা। গ্লেসিয়ারের খাড়া কিনারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচ্ছন্ন বোধ করল ও, বারবার ঘুরে উঠতে চায় মাথা। হঠাৎ কপ্টার একদিকে কাত করল ও। ‘দেখেছি ওকে!’ বিনয়ের এয়ারফোনে বিস্ফোরিত হলো রানার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ‘গ্লেসিয়ারের আরও নিচে, ছোট একটা ঢিবির মাথায়। ওই দেখো, নড়ছে...’

‘নামো ঢিবিতে।’

‘পিচ্চি-কিনারা থেকে খসে পড়তে পারি,’ বলল রানা। ‘তারচেয়ে প্রথমটার পাশেই নামি, তাহলে আর বাছাধনকে

পালাতে হবে না। ল্যান্ড করার পর তুমি কিন্তু বেরুবে না। আমাকে যদি ফাঁকি দেয়, তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে। থিউল-এর সাথে যোগাযোগ হয় কিনা দেখো দেখি।’

পাঁচবার চেষ্টা করেও রেডিও যোগাযোগ সম্ভব হলো না। ‘দরকারের সময়ে যদি কোন কাজে আসে!’ বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। ছোট পাহাড়ের ওপর, প্রথম কপ্টারের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, নিরাপদে ল্যান্ড করল ওরা। প্রথম কপ্টারটাকে কেমন যেন পরিত্যক্ত লাগল, জনসন যেন ওটার কাছে আর ফিরে আসবে না বলেই গেছে।

সুইচ অফ করল রানা। ‘আশা করি ঘটনাখানেকের মধ্যে ফিরে আসতে পারব, বিনয়।’ দ্রুত পারকাটা পরে নিল ও।

মাথা ঝাঁকাল বিনয়, মনে মনে জানে জনসনের কাছে রাইফেল থাকলে এক ঘণ্টার অনেক আগেই মারা যাবে রানা। কিন্তু অযথা কথা বলা স্বভাব নয় তার। সে জানে, রানা একটা কাজে যাচ্ছে। কাজটা করতে গিয়ে কি ঘটবে না ঘটবে সেটা তর্ক করার বিষয় নয়।

কেবিনের ভেতরটা খুব গরম, এক হাতে কারবাইন নিয়ে দরজা খোলার সময় নিজেকে শক্ত করল রানা। এক নিমেষে ঝপ করে নেমে এল টেম্পারেচার-প্লাস ফরটি থেকে মাইনাস ফরটিতে। লাফ দিল রানা, নিরেট বরফ হাতুড়ির বাড়ি মারল পায়ের তলায়। অসাড় করা ঠাণ্ডায় দম বন্ধ হয়ে এল। পারকাটা গলা পর্যন্ত তুলে বাঁধল ও, হুড দিয়ে মাথা ঢাকল। পিছনে তাড়াহুড়ো করে দরজা বন্ধ করে দিল বিনয়। রানার সাথে কাজ করার সময় এই নিয়মটা মেনে চলে বিনয় আর নিয়াজ, অযথা

কথা বলে এনার্জি নষ্ট করে না। রানার মাথার ওপর ব্লুডগ্লো এখন আর ঘুরছে না। আর্কটিক রাতের শীতল নিস্তব্ধতা চেপে ধরল ওকে।

খুদে পাহাড়ের কিনারায় বসে রয়েছে জনসনের হেলিকপ্টার, ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সেটাকে পাশ কাটাল রানা। কিনারায় দাঁড়িয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাওয়া গ্লোসিয়ারের বিশাল ঢালের দিকে তাকাল ও। গ্লোসিয়ারের আরও অনেক নিচে দ্বিতীয় টিবিটা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, উল্টো করা পেয়ালা আকৃতির পাথর, মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পৌঁতা রয়েছে কর্কশ কাঠের কয়েকটা ক্রস চিহ্ন। একটা এক্সিমো কবরের ওপর দাঁড়া মত কি যেন রয়েছে, সেটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনসন। গ্রীনল্যান্ডে এক্সিমোদের কবর অত্যন্ত পবিত্র জায়গা বলে মনে করা হয়, ডেনিশ কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ কোন অবস্থাতেই কবরের পবিত্রতা নষ্ট করা চলবে না। দাঁড়াটা খাড়া করল জনসন, এতক্ষণে রানা দেখল দাঁড়া নয়, ওটা আসলে একটা এরিয়াল, বাস্তব আকৃতির ট্রান্সমিটার থেকে বেরিয়ে রয়েছে।

গ্লোসিয়ারের পাথরের পাশটা বড় বেশি খাড়া, এ-পথে নিচে নামা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই গ্লোসিয়ারের বরফ ঢাল বেয়ে নামতে হবে ওকে। হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিল রানা, এক হাতে কারবাইন। ধীরে ধীরে, টলমল করতে করতে শুরু হলো নামা। চাঁদের আলো যথেষ্ট নয়, এত দূর থেকে গুলি করলে লাগানো প্রায় অসম্ভব। ঢালের গায়ে হাজারো ফাঁদ। নিরেট মনে করে পা ফেলছে রানা, হুস করে তুষারে ডুবে যাচ্ছে গোড়ালি। কোথাও বরফের গা এত মসৃণ আর পিচ্ছিল যে ঘুর পথে এগোতে

হলো। ঢালটা সোজাসুজি নেমে যায়নি, কাত হয়ে আছে একদিকে। একবার যদি পিছলাতে শুরু করে, থামার যো থাকবে না, ঢালের কিনারায় পৌঁছে যাবে, প্রপাতের সাথে কিনারা থেকে নেমে যাবে কয়েকশো ফিট নিচের খাঁড়িতে।

রানা সাবধান, তবু যত দ্রুত সম্ভব নামতে চেষ্টা করছে। ও চায় না, এস.এস.এস. হেডকোয়ার্টার লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করুক জনসন।

রানা আরও খানিক নিচে নামার পর টিবির আড়ালে হারিয়ে গেল জনসন। যত নিচে নামল রানা, বিপদের আশঙ্কা বাড়ল তত। মাঝে মাঝেই ফাঁক হয়ে গেছে গ্লোসিয়ার, মুখ ব্যাদান করে আছে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল, কিনারা থেকে নিচের দিকে গাঢ় ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেছে ফাটলের দেয়াল, কেউ জানে না কোন্ অতলে। আরও সাবধান হয়ে গেল রানা। কারবাইনের ব্যারেল দিয়ে বরফের গা পরীক্ষা করে নিয়ে এক পা এক পা করে নামছে এখন। এমন অনেক ফাটল আছে যে-গুলোর মুখ খোলা নয়, বরফের পাতলা চাদর ঢেকে রেখেছে নিখুঁতভাবে। একবার পা পড়লে স্যাঁৎ করে তলিয়ে যেতে হবে। তবু একের পর এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতেই হলো। সামনে পড়ল তিন হাত চওড়া খাদ, ওপারের বরফ পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না-লাফ দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে হলো।

রানা নামছে, সেই সাথে বেদখল হয়ে যাচ্ছে গোটা শরীর। দস্তানার ভেতর, পারকার ভেতর, জুতোর ভেতর এরই মধ্যে ঢুকে কামড় বসাতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা। জায়গায় জায়গায় সাড় পাওয়া যাচ্ছে না।

টিবির খুব কাছে চলে এসেছে রানা। বরফ পরীক্ষা বাদ দিয়ে কারবাইনটা কোমরের কাছে ধরে তৈরি হয়ে আছে ও। প্রকৃতির চেয়ে মানুষই এখন তার বড় শত্রু হয়ে উঠতে পারে। সামনে বিশ ফিট উঁচু টিবি, হঠাৎ টিবির আরেক প্রান্ত থেকে এদিকের মাথায় চলে এল জনসন। রানাকে বোধহয় আগেই দেখেছে সে, হাতটা মাথার ওপর তোলাই ছিল, সজোরে কি যেন ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। থ্রেনেড মনে করে ছাঁৎ করে উঠল রানার বুক। এক ঝটকায় কারবাইন তুলল ও। ঢালের গায়ে পড়ল জিনিসটা, একটা পাথর। বিদ্যুৎ চমকের মত উপলব্ধি করল রানা, জনসন নিরস্ত্র।

দারুণ টিপ জনসনের, বরফে ড্রপ খেয়ে তীরবেগে ছুটে এল পাথরটা। সময়মত সরে না গেলে রানার ঠিক বাঁ পায়ে লাগত। লাফ দিয়ে সরে গেল রানা ঠিকই, কিন্তু তাল হারিয়ে ফেলল। বরফে আছাড় খাবার আগেই পিছলে গেল শরীরটা। ভারী বস্তার মত পিচ্ছিল বরফের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। নিচে কিনারা, কিনারা থেকে নেমে গেছে প্রপাত, কয়েকশো ফিট নিচে।

কারবাইনটা খসে গেছে হাত থেকে। সেটার কথা এই মুহূর্তে মনেও নেই রানার। পতন ঠেকাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল ও। কিন্তু সবই বৃথা। হাত নয় যেন বাঘের থাবা, কিন্তু বরফের ছাল তুলতে পারলেও ভেতরে সঁধোল না। পতনের গতি কমিয়ে আনার জন্যে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল রানা, মুখের একটা পাশ আর মাথা ঠুকল বরফের গায়ে, সরু চিড়ের ভেতর বাধাবার চেষ্টা করল পা-কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিমেষের মধ্যে গোটা জীবনের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছেলেবেলা, কৈশোর, প্রথম প্রেম, সামরিক ট্রেনিং, প্রিয়জন,

মাতৃভূমি। ঢং ঢং বিদায়ের ঘণ্টা বাজল কানের পাশে, যেন ছুটি হয়ে গেল স্কুল। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।

তবু আর সব সাধারণ মানুষের সাথে ওর পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় বার মরে না ও। মৃত্যু অবধারিত জানার পরও বেঁচে থাকার চেষ্টায় কোন ক্রটি থাকে না। পতন থামছে না, চোখে-মুখে বাড়ি খাচ্ছে হিমবাতাস, কাত হয়ে থাকা ঢাল বেয়ে সোজা না নেমে একটু তেরছাভাবে নামতে চেষ্টা করছে ও, ইচ্ছে কোন ফাটলের ভেতর পড়া।

সামনে মসৃণ বরফের গা ত্রিশ ডিগ্রী কাত হয়ে আছে। পতনের গতি আরও বেড়ে গেল, তবু গায়ে পারকা থাকায় চামড়া অক্ষত আছে।

না, সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। থামা তো দূরের কথা, পতনের গতি কমাতে পর্যন্ত পারল না রানা। চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি, দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়। ঢালের কিনারা পরিষ্কার দেখতে পেল ও, কঠিন একটা রেখা, ওপারে কিছুই নেই, ফাঁকা শূন্যতা। কিনারা থেকে ঝপ করে নেমে গেছে গ্লোসিয়ারের গা, কয়েকশো ফিট নিচে খাঁড়ি।

কিনারার দিকে মুখ আর মাথা, শরীরটা পিছনে। কিনারা থেকে নিচে খসে পড়ার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি রানা। হাত দুটো সজোরে মাথার দু'পাশে বরফের ওপর নামিয়ে আনল, থাবড়া মারার ভঙ্গিতে। কিনারায় পৌঁছে গেল ও। খসে পড়ছে। সীমাহীন শূন্য বিস্তার, গভীরতা, চোখা একটা কালো কি যেন মুখ ব্যাদান করে আছে ওর নিচে। বাঁ হাতে ঠেকল বোল্ডার, গ্লোসিয়ারে গাঁথা একটা চোখা পাথর।

সচেতন কোন চেষ্টা নয়, নিখাদ রিফ্লেক্স-বাঁকা হয়ে গেল আঙুলগুলো, ধরে ফেলল পাথরটাকে। পতনের গতি তাতেও রোধ হলো না। ঘুরে গেল শরীরটা, পিছলে কিনারা থেকে নেমে গেল পা সহ কোমর আর বুক। শরীরের নিচের অংশ বুলে পড়ায় বাঁকি খেলো বাঁ হাত, পাথর থেকে খুলে আসতে চাইল আঙুলগুলো। স্থির হলো শরীর, বুলে থাকল, কনুই ভাঁজ করা একটা মাত্র হাতের ওপর।

নিচে চট করে একবার তাকিয়ে কিছুই দেখল না রানা, খাড়া বরফের গা শুধু নিচ থেকে আরও অনেক নিচের দিকে নামতে নামতে হারিয়ে গেছে। সবটুকু শক্তি দিয়ে পাথরটা ধরে আছে ও। কিনারায় ওঠার চেষ্টা করল এবার। বোল্ডারটাকে ডান হাত দিয়ে পৌঁচাল। দুই হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে। ধীরে ধীরে উঠতে চেষ্টা করল ও। বোল্ডারের ওপর দিয়ে এতক্ষণে তাকাল ঢালের দিকে। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে জনসন।

বরফের রাজ্যে জমাট বেঁধে আছে হিম নিস্তন্ধতা, শুধু বুটের চাপ খেয়ে আলগা বরফ মুড়মুড় করে কুচি হচ্ছে। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল রানার। জনসনের পায়ে ক্র্যাম্পন বুট, তলায় লোহার কাঁটা লাগানো, বেশ নিরাপদেই নামতে পারছে সে। কিন্তু পেল কোথায়? নিশ্চয়ই আগেই রেখে দিয়েছিল জীপে। তারমানে থিউল থেকে রওনা হবার সময়ই প্ল্যান করেছিল পালাবে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে বোয়িং-এর জন্যে অপেক্ষা করার একটাই কারণ, রানাকে খুন করে তিনটে প্রমোশন বাগানো।

রানার কাছে পৌঁছুতে আধ মিনিটও লাগবে না জনসনের। কিনারায় ওঠার চেষ্টা বাদ দিল রানা। হঠাৎ একজন নয়, দু'জন

লোককে ঢাল বেয়ে নেমে আসতে দেখল ও। বিনয়?

পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল রানা। চোখ পিট পিট করে আরেকবার বোল্ডারের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, একা জনসনই, আর কেউ নেই। অর্থাৎ, দৃষ্টিভ্রম ঘটছে ওর।

জনসনের ডান হাতে একটা ছোরা। একেবারে কাছে চলে এসেছে সে, এই সময় একদিকে কাত হয়ে পড়ল রানার মাথা, বোল্ডার থেকে খসে পড়ল ডান হাত।

ডান হাতটা অসাড় হয়ে গেল, মরা সাপের মত নেমে এল বোল্ডারের পিছনে। শরীরের ভার বাঁ হাতটা আর ধরে রাখতে পারছে না, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে ওটা। পারকার ভেতর দরদর করে ঘামছে রানা। বোল্ডারের কাছ থেকে তিন ফিট দূরে থামল জনসন। বুঝল এতটা দূর থেকে ছোরা নাগাল পাবে না। সাবধানে আরও দু'পা এগোল সে। উবু হয়ে পাথরটার পিছনে বসল। লোহার কাঁটাঅলা বুট তুলল সে, লক্ষ্যস্থির করল রানার দস্তানা পরা বাঁ হাতের ওপর। কাঁটাগুলো আধ ইঞ্চি লম্বা, গায়ে বরফের আবরণ।

লাথি মারল জনসন, বোল্ডারের ওপর দিয়ে উঠল রানার ডান হাত। জনসনের গোড়ালি পৌঁচিয়ে ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল। নিজের দিকে নয়, একপাশে টানল ও। ওর হাতে ঘষা খেলো কাঁটা, তাল হারিয়ে ফেলে পিছলাতে শুরু করল জনসন। বোল্ডারটাকে ঘুরে হড়কে কিনারার দিকে চলে এল সে, হাত দুটো এলোপাতাড়ি বরফের ওপর বাড়ি মারল কিছু একটা ধরতে পারবে এই আশায়। শেষ পর্যন্ত পাথরটা ধরে ফেলল, ভাবল এ-যাত্রা বেঁচে গেছে। ডান হাত দিয়ে আবার আঘাত করল রানা। এবার নির্ভেজাল বিরাশি

সিঁকার ঘুসি, দু'মুখো সাপের নাক বরাবর। হাঁ করল জনসন, নিঃশব্দে চিৎকার করল, খসে পড়ল কিনারা থেকে। গভীর খাদ থেকে উঠে এল তার আতঁচিৎকার, তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল। কিনারা থেকে নিজেকে তোলার চেষ্টা করল রানা।

বোল্ডার টপকে এসে নেতিয়ে পড়ল ও। জ্ঞান হারায়নি, তবে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। খানিকক্ষণ নিঃসাড় পড়ে থাকার পর বাঁ হাতটা ডলতে শুরু করল। তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো, কিনার থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচে।

একেই বলে দর্শনীয় মৃত্যু। কিনারা থেকে তিনশো ফিট খাড়া নেমে গেছে গ্লোসিয়ারের দেয়াল, তারপর আবার শুরু হয়েছে ঢাল। ঢালের গা থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে বরফের থাম, মাথাগুলো ছুরির ডগার মত চোখা। এই রকম একটা চোখা থাম জনসনের পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। ঢাল থেকে পনেরো ফিট উঁচুতে, থামের মাথায় শেষ আশ্রয় নিয়েছে কাঁকড়া।

‘নিয়ে চলো, বিনয়।’

ফাটা বেলুনের মত অবজারভারের সীটে নেতিয়ে পড়ল রানা। চেহারা বা চোখে কোন ভাব নেই, রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিনয়। ‘ট্র্যাসমিটার ছিল?’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘কমান্ডার টেনিসন কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।’

‘ট্র্যাসমিট করতে পেরেছে?’

‘জানি না,’ ক্লান্ত স্বরে বলল রানা। ‘করলেও কিছু আসে যায় না। কর্নেল বলটুয়েভ জানবে আমরা যাচ্ছি।’

## পাঁচ

লেনিনগ্রাদে শনিবার রাত আটটা। এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রুস্তভ আর আট ঘণ্টা পর আই.আই. ফাইভের উদ্দেশে রওনা হবে। কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ এখনও তার অফিসে। স্টোভের আঁচে ঘরের ভেতরটা ঝলসাচ্ছে।

‘ইভেনকো রুস্তভের ব্যাপারে, কর্নেল কমরেড, মাথা ঘামাবার আমি তো কোন কারণ...’

‘তোমার ওটাকে তুমি মাথা বলো?’ মাটিতে পা ঠুকল কর্নেল। বাধা পেয়ে ওটা (মাথাটা) নিচু করল জুনায়েভ। নিজের গম্বুজ আকৃতির কামানো মাথায় হাত বুলাল কর্নেল। ‘ঘটনা ঘটার আগেই এখানে তার ছবি ফুটে ওঠে, সেজন্যেই ওই চেয়ারটায় বসতে দেয়া হয়েছে আমাকে।’ আরও দ্রুত হলো তার পায়চারি। ‘জুদের তালিকা দেখে আমার চোখ খুলে গেছে, বুঝলে?’

‘বার্জেনের ডেপুটি মেট, ইউরি রুস্তভের কথা বলছেন?’

‘সুমাইয়া নাজিন নামে কোন মেয়ের কথা মনে পড়ে কিনা দেখো তো।’ কর্নেল চোখ পাকাল।

‘সুমাইয়া নাজিন...আমাদের এই হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল-হ্যাঁ, মনে পড়ে। সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল...’

‘সেই সাথে মন ভেঙেছিল ইভেনকো রুস্তভের, তা জানো?’

‘হ্যাঁ,’ শান্ত গলায় বলল জুনায়েভ। ‘মেয়েটাকে ভালবাসত ইভেনকো রুস্তভ।’

‘সুমাইয়া ইহুদিদের আভারখাউন্ড সেলের একজন সদস্য

ছিল,’ বলল কর্নেল। ‘জেরার মুখে স্বীকার করেছিল, আমেরিকা থেকে টাকা পায় তারা। আমার এখন সন্দেহ, আমেরিকানদের টাকা এখন লেনিনগ্রাদে পৌঁছে দেয় আমাদের এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, ইভেনকো রুস্তভ।’

জুনায়েভ হতভম্ব হয়ে গেল। নাহ্, মনে মনে স্বীকার করল সে, কর্নেলকে বুঝতে পারা তার কর্ম নয়। ‘কিন্তু কিভাবে?’

‘তিন বছর ধরে আর্কটিকে রয়েছে সে,’ গড়গড় করে উত্তরটা আউড়ে গেল কর্নেল। ‘পোলার প্যাকের তলায় মেরিলিন সিস্টেমের কেবুল আর সোনার বয়া পাতার কাজ করছে। আমেরিকানরা কি করছে না করছে দেখার জন্যে কয়েকবারই আই.আই. ফাইভে গেছে সে।’ পায়চারি থামিয়ে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল, মেঝে থেকে আধ ইঞ্চি লাফিয়ে উঠল টেবিলটা। ‘টাকা কিভাবে হাত-বদল হয়েছে বুঝতে পারছ, জুনায়েভ? ফিরে আসার পর কেউ তাকে সার্চ করেনি।’

‘কিন্তু...’

‘চোপ!’ হুংকার ছাড়ল কর্নেল। ‘সে তার ভাই ইউরির সাথে কিয়েভে দেখা করে—ছুটি নিয়ে দু’জনেই তারা ওখানে গিয়েছিল। ইউরি এখানে ফিরে আসে নিজের জাহাজে চড়ার জন্যে, এবং পার্কে আমেরিকান ট্যুরিস্ট ডকিনসের সাথে দেখা করে। ডকিনসকে একটা মৌখিক খবর দেয় সে—নিশ্চয়ই ইভেনকোর পাঠানো কোন মেসেজ।’

‘কিন্তু, কর্নেল কমরেড, ইভেনকো রুস্তভ ইহুদি হলেও অত্যন্ত নামকরা একজন বিজ্ঞানী...’

‘জানি,’ হঠাৎ মুচকি হেসে বলল কর্নেল। ‘তাই সরাসরি এখনি

তাকে আমরা ঘাঁটাব না। কিন্তু তার ভাই ইউরি তো আর বিখ্যাত কেউ নয়? তাকে খোঁচা মেরে দেখতে দোষ কি? বার্জেনের সামান্য একজন নাবিক, কতল করলেও কেউ নাক গলাবে না। বার্জেনের বর্তমান পজিশন জেনেছ?’

‘তালিন থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ দূরে...’

‘তালিন এয়ারপোর্টে একটা প্লেন পাঠিয়ে দাও, ইউরি ওখানে পৌঁছুলেই তাকে ধরে আনতে হবে। ট্রলার মাস্টারকে তার পাঠিয়ে নির্দেশ দাও, সোজা তালিনে পৌঁছুতে হবে। বন্দরে পৌঁছুবে পাঁচ ঘণ্টায়, এয়ারপোর্ট থেকে বন্দরে যেতে-আসতে আধ ঘণ্টা, প্লেন এখানে ফিরে আসতে আরও এক ঘণ্টা। সাত ঘণ্টার মধ্যে এই অফিসে ইউরিকে চাই আমি, রোববার সকাল তিনটের সময়। জুনায়েভ, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?’ সহকারীর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

একা হওয়া মাত্র পকেট সংস্করণ দাবা নিয়ে বসে পড়ল কর্নেল। নতুন একটা সমস্যার সমাধান পেতে হবে তাকে।

দযেরবিনস্কি স্ফায়র, কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টার।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলতে হবে, অতি গোপনীয়তাই হিতে বিপরীত ডেকে আনল। শুধু তাই নয়, নিয়ম ভাঙা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধ, অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়ে সেটা আরেকবার প্রমাণ করে গেলেন জেনারেল পিটার কুরাডিন।

শুরু থেকে সুষ্ঠুভাবেই এগোচ্ছিল কাজটা। স্পেশাল সিকিউরিটিতে কে.জি.বি.-র লোক আছে, তার কাছ থেকেই জেনারেল কুরাডিন প্রথম আভাস পান ইভেনকো রুস্তভ দেশ ত্যাগ



করে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে পারে। তাঁর উচিত ছিল, স্পেশাল সিকিউরিটির কর্নেল বলটুয়েভকে ব্যাপারটা জানানো, কিন্তু তা না জানিয়ে গোপনে ইভেনকো রুস্তভের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি।

কর্নেল বলটুয়েভ তখন মস্কোয়, আর্কটিক থেকে ছুটি নিয়ে স্পেশাল সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টার লেনিনগ্রাদে আসে ইভেনকো রুস্তভ। মেরিলিন চার্টের একটা কপি আছে ওখানে, সেটা দেখার জন্যে নিয়ে প্রতিটি শীটের ফটো তোলে সে। গোটা মেরিলিন সিস্টেমের প্ল্যান তারই করা, কাজেই চার্টটা দেখতে চাইলে কর্নেল বলটুয়েভের সহকারী জুনায়েভ তাকে বাধা দেয়নি।

মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম নিয়ে আর্কটিকে, এন.পি.সেভেনটিনে ফিরে যায় ইভেনকো রুস্তভ। ওখানে কে.জি.বি.-র এজেন্ট আছে, জেনারেল কুরাডিনের নির্দেশ পেয়ে মাইক্রোফিল্ম বদলের কাজটা নিখুঁতভাবে সারে সে। ইভেনকো রুস্তভ তখন তার ঘরে ছিল না, ভেতরে ঢুকে আসল মেরিলিন চার্টটা খুঁজে বের করে সে, সেটা পকেটে ভরে তার জায়গায় নকল আরেকটা চার্টের মাইক্রোফিল্ম রেখে আসে।

মেরিলিন চার্ট চুরি বা পাচার হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আগেই নকল অনেকগুলো চার্ট তৈরি করে রাখা হয়েছিল, সবগুলোই দেখতে প্রায় এক রকম। নকলগুলো তৈরি করেছে তরুণ কিছু বিজ্ঞানী, এবং এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ইভেনকো রুস্তভকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। তরুণ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই বলতে হবে, দেখার সুযোগ পেলে ইভেনকো রুস্তভেরও ওগুলোকে নকল বলে সন্দেহ করতে প্রচুর সময় লেগে যাবে।

মাইক্রোফিল্ম বদল সম্ভব হয়েছে, এই খবর পেয়ে মস্কোয় বসে খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করলেন জেনারেল কুরাডিন। কাজ শেষ করে মস্কোয় ফিরে এল তাঁর এজেন্ট, নতুন দায়িত্ব দিয়ে ফিনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে।

জেনারেল কুরাডিনের অধীনে অন্তত ছয়জন কে.জি.বি. এজেন্ট শুধু আমেরিকাতেই কাজ করছে। তার মধ্যে জন মিলার একজন। কোডেড মেসেজের সাহায্যে এই ছয়জনের সাথে যোগাযোগ রাখেন জেনারেল। এই কোড তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার, তিনি আর তাঁর ছয়জন এজেন্ট ছাড়া আর কারও পক্ষে তা ভাঙা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটন থেকে জন মিলারের প্রথম অ্যারলেস মেসেজ পেলেন জেনারেল, আমেরিকানরা ইভেনকো রুস্তভকে এন.পি.সেভেনটিন থেকে নিয়ে আসার প্ল্যান করছে। কোড ভেঙে মেসেজটা পড়লেন জেনারেল, তারপর পুড়িয়ে ফেললেন। নিয়ম ভাঙাই তাঁর নিয়ম, কোন মেসেজই কোথাও টুকে রাখেন না। তিনি অবশ্য ফটোগ্রাফিক মেমোরি-র অধিকারী, একবার যা শোনে বা দেখেন, জীবনে কখনও ভোলেন না।

জন মিলারকে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো, কে.জি.বি.-ও চাইছে ইভেনকো রুস্তভ পালিয়ে যাক।

এরপর দ্বিতীয় মেসেজে জন মিলার জেনারেল কুরাডিনকে জানাল, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকানদের বরফ-দ্বীপ আই.আই.ফাইভে আসবে, সেখান থেকে তাকে তুলে আনবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এজেন্ট মাসুদ রানা। মিলার আরও জানাল, আমেরিকানরা গায়ের জোরে রানাকে দিয়ে

কাজটা করিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু রানাকে রাজি করাতে পারেনি, রানা শুধু আমেরিকানদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তার অনুরোধে রাজি হয়েছে।

এ ঘটনা শনিবার সন্ধ্যার। এর আগের মেসেজগুলোর মত এই শেষ মেসেজটাও ছিঁড়লেন জেনারেল, তারপর পুড়িয়ে ফেললেন। বুকে চিন চিনে ব্যথা নিয়ে আপনমনে হাসতে লাগলেন তিনি। মঞ্চ সাজানো হয়ে গেছে, এখন যে যার ভূমিকায় সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করে গেলেই তাঁর মনের আশা পূরণ হয়। এক টিলে কয়েকটা পাখি মারার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কর্নেল বলটুয়েভ তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী, এক হাত নেয়া যাবে তাকে। বেঙ্গমান ইহুদিটা ভাবছে আমেরিকায় একবার পৌঁছুতে পারলেই সবাই তাকে জামাই আদর করবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি। মাইক্রোফিল্ম যে নকল, দু'দিন আগে বা পরে ঠিকই টের পাবে সে। তখনই শুরু হবে তার উভয় সঙ্কট। মাইক্রোফিল্ম নকল এটা স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন হবে, কারণ তাহলে আর আমেরিকানদের কাছে তার কোন মূল্য থাকবে না। আবার স্বীকার না করলেও বিপদ, কারণ নকল মেরিলিন চার্ট ব্যবহার করে আমেরিকানরা আর্কটিকের তলায় অনন্তকাল অপেক্ষা করলেও সোভিয়েত রাশিয়ার কোন সাবমেরিনের দেখা পাবে না। অনন্তকাল নয়, কিছুদিন পরই ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। ধীরে ধীরে টের পাবে তারা, মন্ত একটা ঠক দিয়েছে তাদেরকে কে.জি.বি.।

আনন্দে এতই আত্মহারা হলেন জেনারেল, বুকের ব্যথাটাকে আমলই দিলেন না। সারা শরীরে পুলক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবলেন তিনি। সব কিছু এখন নির্ভর করছে

ইভেনকো রুস্তভকে আই.আই. ফাইভে যেতে দেয়ার ওপর। কিন্তু তাকে যদি কোন রকম বাধা দেয়া না হয়, যদি ধাওয়া না করা হয়, আমেরিকানরা সন্দেহ করবে। অর্থাৎ বাধা দেয়ার ভান করতে হবে।

নর্থপোলে কে.জি.বি.-র কোন নোটও অর্ক নেই। কাজটা স্পেশাল সিকিউরিটির। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন জেনারেল। কর্নেল বলটুয়েভের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবেন তার স্পেশাল সিকিউরিটির ওপর টেকা দিয়েছে কে.জি.বি, তারপর সব ঘটনা খুলে বলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

সবার অলক্ষ্যে মিটিমিটি হাসছিলেন তিনি। বিধাতার এই স্বভাবটা মানুষের কল্পনা মাত্র হলেও, কেন যেন মনে হয় মানুষ যা আশা করে তার ঠিক উল্টোটা ঘটিয়ে সত্যি বুঝি মজা পান তিনি।

জেনারেল কুরাডিন ঠিক করলেন, অয়্যারলেস রুমে গিয়ে মেসেজটা নিজে পাঠাবেন। কিন্তু চেয়ার ছাড়তে গিয়ে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন, সেই সাথে ঘুরে উঠল মাথা। বন্ধ ঘরের ভেতর, সকলের অগোচরে, তিন মিনিট পর মারা গেলেন তিনি।

জন মিলার জানল না, জেনারেল কুরাডিন মারা গেছেন।

কর্নেল বলটুয়েভ জানল না, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় চলে যাবার প্ল্যান করেছে, এবং তাকে যেতে দিতে হবে।

রানা জানল না, ভান নয়, রাশিয়ানরা ওর ওপর সত্যি সত্যি হানবে মরণ-আঘাত।

‘কাঁকড়ার কাছ থেকে এইমাত্র একটা মেসেজ এসেছে।’ আধঘণ্টা পর কর্নেলের অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট করল জুনায়েভ। ‘কোড

ভাঙছে ওরা।’ লক্ষ করল, টেবিলে বসে গভীর মনোযোগের সাথে ইভেনকো রপ্তভের ফাইলটা পড়ছে কর্নেল।

ফাইল থেকে মুখ না তুলেই কর্নেল জিজ্ঞেস করল, ‘আর কিছু?’

‘না। কাঁকড়া কে, কর্নেল কমরেড?’

‘একজন এজেন্ট, শুধু আমিই তাকে চিনি। ডিকোড করার সাথে সাথে মেসেজটা দেখতে চাই আমি।’

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরই ফিরে এল জুনায়েভ। কর্নেলের হাতে ধরিয়ে দিল সে মেসেজটা।

ন’টা বাজে। এরই মধ্যে কোর্স বদলে তালিনের দিকে রওনা হয়েছে ট্রলার বার্জেন। জুনায়েভ যে প্লেনটা পাঠিয়েছে আর দশ মিনিট পর তালিন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে সেটা।

ওয়াশিংটনের ঘড়ির কাঁটা লেনিনগ্রাদের চেয়ে আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, ডকিনসের মেসেজ আসছে না দেখে নিজের অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন জেনারেল ফচ। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টমাস। এখনও তারা জানে না ডকিনস মারা গেছে। রানাকে আসলে মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, টমাসকে সাসপেন্ড করা হয়নি। রানা ওয়াশিংটন ত্যাগ করার পরপরই জেনারেলের অফিসে ফিরে এসেছে সে।

গ্রীনল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটাও লেনিনগ্রাদের চেয়ে আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, হামবোল্ডট গ্লেশিয়ার থেকে ফিরে আসছে রানা আর বিনয়।

জনসন ওরফে কাঁকড়ার মেসেজ এইমাত্র কর্নেল বলটুয়েভের হাতে পৌঁছল।

‘ডিকোড করতে হিমশিম খেয়ে গেছে ওরা,’ ব্যাখ্যা করল জুনায়েভ। ‘মেসেজটা কেমন যেন এলোমেলো...’

পড়া শেষ করল কর্নেল। মন্তব্য করল, ‘চমৎকার!’ কামানো মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার পড়ল মেসেজটা। ‘আমেরিকানরা প্রস্তুতি নিচ্ছে...আই.আই. ফাইভ থেকে রওনা হতে যাচ্ছে মাসুদ রানা...কার্টিস ফিল্ডে আমেরিকান প্লেন...রানার সাথে একটা দল রয়েছে...পোলার প্যাকের ওপর দিয়ে যাবে ওরা...সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে...’

উঠে দাঁড়াল কর্নেল, পাশের ঘরের দিকে এগোল। তার পিছু নিল জুনায়েভ। পাশের ঘরে টেলিগ্রাফিস্টার, অয়্যারলেস, টেলিফোন, ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তভাবে কাজ করছে কিছু লোক। ভেতরে ঢুকে সোজা ওয়াল-ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কর্নেল।

জেনারেল ফচ আর কর্নেল বলটুয়েভের ওয়াল-ম্যাপ প্রায় একই রকম দেখতে, এটায় শুধু আর্কটিক এলাকাটাকে অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। মেঝের কাছাকাছি রয়েছে রাশিয়ান উপকূল; গ্রীনল্যান্ড, কানাডা, আর আলাস্কা উপকূল সিলিঙের কাছাকাছি। ‘এটা কার্টিস ফিল্ড,’ হাতের টোবাকো পাইপ তাক করে জুনায়েভকে দেখাল কর্নেল। ‘আই.আই. ফাইভের সবচেয়ে কাছের এয়ারফিল্ড।’ ডেস্কের পিছনে বসা এক লোককে ডাকল সে। ‘বদোনভ, এলাকায় জাহাজগুলোর পজিশন বলো আমাকে।’

‘ট্রলার ফ্লীট এম. সিক্সটি-নাইন, কর্নেল কমরেড?’

‘ওটা দিয়েই শুরু করো।’

‘যেমন দেখছেন, কর্নেল কমরেড, এই মুহূর্তে আইসল্যান্ডের অনেক উত্তরে রয়েছে ফ্লীটটা, তবে দক্ষিণ দিকে

এগোচ্ছে-উদ্দেশ্য, ন্যাটো-র ওয়াটার কিং যে মহড়ার পরিকল্পনা করেছে সেটার ওপর নজর রাখা। আমাদের ফ্লীটে বারোটা জাহাজ রয়েছে, প্রত্যেকটি নরমাল ইলেকট্রনিক গিয়ারে সাজানো...'

‘অয়্যারলেস-জ্যামিং অ্যাপার্যাটাস সহ?’

‘জী, কর্নেল কমরেড। স্পিট বার্জেনের পশ্চিম থেকে হেলিকপ্টার-ক্যারিয়ার নার্ভা-ও একই মিশনে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে...’

‘আর রিগা? ওটাই তো আইসবার্গ অ্যালি-র সবচেয়ে কাছে।’

‘রিগা এখন কয়েক হুগা ওখানেই থাকবে। আমেরিকান উপগ্রহগুলোর ওপর নজর রাখছে...’

আরও ওপরের একটা চিহ্নের ওপর পাইপ ঠেকাল কর্নেল।

‘আর এই আমেরিকান জাহাজটা...?’

‘আইসব্রেকার কিউট, কর্নেল কমরেড। এইমাত্র ওটার পজিশন আমাদের ম্যাপে বদলাতে হয়েছে, এক ঘণ্টাও হয়নি। যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে, কোর্স বদলে আবার উত্তরে রওনা হয়েছে। নার্ভার একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে ওটাকে।’

‘ধন্যবাদ, কমরেড,’ বলে গট গট করে অফিসে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল কর্নেল। বিস্ফোরণোন্মুক্ত মেজাজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, জুনায়েভকে নাটকীয় নির্দেশগুলো দেয়ার সময় শান্ত এবং সুস্থির দেখাল তাকে। ‘গোটা আর্কটিক জোনে জরুরী অবস্থা জারি করে দাও। প্রত্যেকটা কোস্টাল বেস, প্রত্যেকটা এয়ারফিল্ড, প্রত্যেকটা আইস আইল্যান্ড, এমনকি আলাস্কা উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপগুলোও জরুরী অবস্থার আওতায় থাকবে। মারমানস্কে রেডিও মেসেজ পাঠাও, রাত-দিন চব্বিশ

ঘণ্টার জন্যে আমার জন্যে একটা বাইসন বম্বার রেডি রাখতে হবে, ভরা ট্যাংক নিয়ে। লেনিনগ্রাদ এয়ারপোর্টকে বলে রাখো, মারমানস্কে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এক ঘণ্টার নোটিশে একটা প্লেন চাই।’

‘তার আগে আমি কি, কর্নেল কমরেড, মস্কোর সাথে যোগাযোগ করব...’

‘খুস্কায়েভ আর তার স্পেশাল ডিটাচমেন্টকে মারমানস্কে পাঠিয়ে দাও-ওদের প্লেন যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে টেক-অফ করে...’

‘কর্নেল কমরেড, মস্কোর অনুমতি...’

‘ডিটাচমেন্টের সবাই সাদা পোশাক পরে যাবে, পারসোনাল আর্মস থাকবে সাথে। আই.আই. ফাইভ এরিয়ার আবহাওয়া রিপোর্ট এনে দাও...’

‘মস্কোকে কিছুই জানাব না, কর্নেল কমরেড? এই স্কেলের একটা অপারেশন জেনারেল মিঝিরিভস্কির অনুমতি ছাড়া...!’

একমনে পাইপে টোবাকো ভরছে কর্নেল বলটুয়েভ। ‘তোমাকে আমি বারবার বলেছি, জুনায়েভ, মাথাটা কামিয়ে ফেলো। তবে যদি ঘটে কিছু বুদ্ধি...’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, কাঁকড়ার মেসেজে পরিষ্কার কিছু নেই!’

‘কাঁকড়াকে চিনলে তুমি বুঝতে পারতে, আছে। আমেরিকানরা তাদের আই. আই. ফাইভের কাছে পিঠে বড় ধরনের কোন অপারেশন করতে যাচ্ছে। রাশিয়ার চরম শত্রু মাসুদ রানার সাহায্য নিচ্ছে ওরা। এর বেশি আর কিছু জানার দরকার আছে কি? মাসুদ রানা মানেই তো বিপদের মিছিল। কে.জি.বি-কে সে

ধোঁকা দিতে পারে, ধোঁকা দিয়ে ক্ষমাও পেতে পারে, কিন্তু স্পেশাল সিকিউরিটিকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়, আর কর্নেল বলটুয়েভ শত্রুকে ক্ষমা করতে জানে না।’ হঠাৎ চোখ পাকাল সে। ‘কি, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে যে?’

দরজার কাছে গিয়ে ফিরল জুনায়েভ। ‘এখনও আপনি চান, কর্নেল কমরেড, ইউরি রুস্তভকে তালিন থেকে এখানে নিয়ে আসা হোক?’

‘অবশ্যই,’ পাইপে আগুন ধরাল কর্নেল। ‘ওটা আলাদা একটা সমস্যা।’

রানা একাই যেন একশো, যেন একটা প্রতিষ্ঠান। গত ষোলো ঘণ্টায় ওয়াশিংটন থেকে থিউল-এ উড়ে এসেছে ও, কপ্টার নিয়ে জনসনকে ধাওয়া করে হামবোল্ডট গ্লোসিয়ারে গেছে, ওখান থেকে ফিরে প্লেনে করে গ্রীনল্যান্ডের সবটুকু প্রস্থ পেরিয়ে পৌঁচেছে কার্টিস ফিল্ডে। শনিবার, ওয়াশিংটন সময় সন্ধ্যা তখন সাতটা। ন’টার মধ্যেই ওদের যাত্রা শুরু সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেল। এ যেন কোন মানুষ নয়, রানাকে দেখে কার্টিস ফিল্ডের লোকজন উপলব্ধি করল: মূর্তিমান ঘূর্ণি-ঝড়।

প্লেন থেকে নেমেই রানা অর্ডার করল, ‘দু’ঘণ্টার মধ্যে একজোড়া সিকোরস্কি তৈরি অবস্থায় চাই আমি। পুরোপুরি সার্ভিস করা, ভরা ট্যাংক...’

‘সম্ভব নয়,’ বাঁঝের সাথে বাধা দিল এয়ারফিল্ডের কন্ট্রোলার হাওয়ার্ড ম্যাকলিন।

‘আরও লোক লাগান! নাকি জেনারেল ফচকে ফোন করব?’

দায়টা আপনাদের...’

দু’ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের মাথায় হেলিকপ্টার দুটো তৈরি হয়ে গেল। আগেই আই.আই.ফাইভের কাছাকাছি এলাকার আবহাওয়া চেক করার জন্যে একটা প্লেন পাঠানো হয়েছিল, ফিরে এসে পাইলট রিপোর্ট করল ওদিকে কোন কুয়াশা নেই। ক্যাম্প সেঞ্চুরি থেকে একজোড়া এফিমো-টাইপ স্লেজ আনিয়ে রাখা হয়েছে। খাবারদাবার, রেডিও ট্রানসিভার, রাইফেল, অ্যামুনিশন, এবং একটা ইলিয়ট হোমিং বীকন প্যাক করে তোলা হলো।

‘বীকন কেন?’ জিঙ্কস করল ম্যাকলিন।

‘ইন্সুরেন্স।’

বাটপট, ছোট্ট করে উত্তর দেয় রানা, কোন তথ্য প্রকাশ পায় না। অস্থিরভাবে হ্যান্ডারের ভেতর ঘুর ঘুর করতে লাগল ও। সিকোরস্কির কন্ট্রোল চেক করল, স্লেজে যে প্যাকেটগুলো তোলা হবে সেগুলো বাঁধার কাজে সাহায্য করল, বারবার রেডিও রুমে গিয়ে জানতে চাইল ওয়াশিংটন থেকে কোন মেসেজ এসেছে কিনা। তার প্রাণশক্তির যেন সীমা নেই, নিমেষের মধ্যে এয়ারফিল্ড কর্মীদের মধ্যে তা সংক্রমিতও হয়ে গেল, চার ঘণ্টার কাজ দু’ঘণ্টায় তুলে দিল তারা। রানার এই তৎপরতা দেখার সুযোগ ঘটলে কর্নেল বলটুয়েভ নিশ্চয়ই ভারী উদ্বেগ বোধ করত।

ওদিকে, রেডিও রুমে, থিউল-এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে বিনয় মুখার্জি। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হলো। ‘আমি চাই কুকুরগুলো এখনি পাঠানো হোক। কি, কোন প্লেন নেই? শুধু একটা হারকিউলিস পয়েন্ট ব্যারো-য় যাবার জন্যে টেক-অফ করতে যাচ্ছে? বেশ, চেয়ার থেকে পাছা তুলে ওটাকে

থামান, কুইক! ওটা যদি টেক-অফ করে, জেনারেল ফচকে দিয়ে মাঝ-আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনাব...'

'কুকুরগুলোর এক ঘণ্টা আগে আসার কথা ছিল,' পিছন থেকে ভারী গলায় বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিনয়। তিক্ত হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'এখুনি চাও, নাকি যখন পৌঁছুবে?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'বোথ-অ্যান্ড সুনার!'

দু'ঘণ্টা পর ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে বিনয় রিপোর্ট করল, 'কুকুর পৌঁছে গেছে।'

রানা বলল, 'নিয়াজকে বলো চেক করে দেখে নিক...'

রানার কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকল নিয়াজ মাহমুদ।

'যাও, কুকুরগুলো চেক করো,' তাকে বলল বিনয়। 'পতাকার মত ওটা কি নাড়ুছ শুনি?'

একগাল হাসল সুদর্শন নিয়াজ। 'জেনারেল ফচের আর্জেন্ট মেসেজ। এক্সুগি রওনা হবার জন্যে রেডি হতে বলা হয়েছে।'

এর কোন নজির নেই, তাই আবহাওয়াবিদরা একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে গ্রীনল্যান্ডে নিম্নচাপ অসম্ভব একটা ব্যাপার।

এই নিম্নচাপই সে বছরের পরের মাসগুলোয় উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপে বিপর্যয় ডেকে আনে, গ্রীষ্মকাল হয়ে ওঠে ভয়াবহ শীতকাল, আইসবার্গগুলো ভাসতে ভাসতে দূর দক্ষিণে চলে যায় আগে যেখানে কখনও যায়নি, ফলে ট্রান্স-আটলান্টিক জাহাজগুলোর জলপথ বন্ধ হয়ে যায়, বিশাল লাইনারগুলো বাধ্য

হয় কোর্স বদলাতে। আর, এই নিম্নচাপই ডেকে আনে ভীতিকর কুয়াশা।

নোভাইয়া জেমলাইয়ার সোভিয়েত আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা টের পায়নি কুয়াশা আসছে। পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে প্রতিদিন উড়ে যায় ইউ.এস. ওয়েদার প্লেন, তাদেরও চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু রানা যখন কার্টিস ফিল্ডের হ্যাঙ্গারে অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক সেই সময় আই.আই. ফাইভের উত্তরে নেমে আসছে আধ মাইল উঁচু, বহু মাইল চওড়া ঘন কালো কুয়াশার হিমশীতল আবরণ।

ঘরের মাঝখানে গোল স্পট লাইট, আলোর মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে ইউরি রুস্তভ। তার পিছনে অন্ধকার, খুক করে কেশে কেউ একজন জানান দিল সে আছে। ইউরির সামনেও অন্ধকার, অন্ধকার থেকে মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে চেয়ারের কাঁচ কাঁচ আওয়াজ। কর্নেল বলটুয়েভ নড়াচড়া করছে চেয়ারে বসে।

তালিন থেকে প্লেনে করে নিয়ে আসার সময় ইউরি রুস্তভকে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অজানা আশঙ্কায় এমনিতেই কুঁকড়ে ছিল বেচারী, তারপর এই ঘরের পরিবেশ তাকে একেবারে দিশেহারা করে তুলেছে।

কর্নেল বলটুয়েভ জানে না, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ইউরিকে মচকাতে হবে তার। আর চল্লিশ মিনিট পর লেনিনগ্রাদে চারটে বাজবে, এন.পি. সেভেনটিনে বাজবে রাত বারোটা। ঠিক চল্লিশ মিনিট পর পোলার প্যাক ধরে অদৃশ্য হয়ে যাবে ইভেনকো রুস্তভ।

'ঘটনাটা আবার শোনা যাক,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল কর্নেল,

তাতেই ইউরির কানের পাশে যেন বোমা ফাটল। ‘তুমি পার্কে ঢুকলে, এখান থেকে শুরু করো।’

ইউরির মাথা ঘুরছে। পনেরো বার, নাকি পঁচিশ বার? ঘটনাটা কত বার বর্ণনা করেছে এখন আর মনে করতে পারে না সে। ‘পার্কের ঢুকলাম...’

বাধা। ‘কেন?’

‘আমি ডকে যাচ্ছিলাম...’

‘তাহলে নিশ্চয়ই নেভস্কি প্রসপেক্ট ধরে যাও তুমি, ওটাই সহজ রাস্তা।’

‘হ্যাঁ, নেভস্কি প্রসপেক্ট ধরে যাচ্ছিলাম...’, একঘেয়ে কণ্ঠস্বর ইউরির, যেন কোন বাচ্চা পড়া মুখস্থ করছে।

‘না, তা তুমি যাওনি-গেলে পার্কে ঢুকতে না। কেন, পার্কে ঢুকলে কেন?’

বিদেশী লোকটা পার্কের রাস্তায় আছাড় খেলো, ঘটনার এই পর্যায়ে এল ওরা। এবার নিয়ে ছাব্বিশ বার একই প্রশ্ন করল কর্নেল, ‘আমরা তার শুধু নামটা জানতে চাই। এরমধ্যে আর কিছু নেই, কমরেড। শুধু নামটা।’

‘আমেরিকান একজন লোকের নাম আমি জানব কিভাবে...’ হঠাৎ চুপ করল ইউরি। ভুল যা হবার হয়ে গেছে।

যেমে গোসল হবার জন্যে ইউরিকে পুরো এক মিনিট সময় দিল কর্নেল। ওরা কেউ ইউরিকে বলেনি ডকিনস একজন আমেরিকান ছিল। ডকিনসের কাপড়চোপড় ছিল রাশিয়ানদের মত। তাছাড়া, ইউরি বারবার বলছে, বিদেশী লোকটার সাথে তার কোন কথা হয়নি। ‘নিচে নিয়ে যাও ওকে,’ নিজের লোকদের

নির্দেশ দিল কর্নেল। ঘর খালি হয়ে যেতে সহকারী জুনায়েভকে আদেশ করল সে, ‘যা জানে সব বের করো, জলদি।’

একজন নাবিকের কাছে ডুবে মরাটা সবচেয়ে বেশি আতঙ্ককর। তাই ওরা তার ওপর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করল।

বেসমেন্ট সেলারে একটা কাউচে বসিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হলো ইউরি রক্তভকে, কাউচটা ইচ্ছেমত সামনে পিছনে হেলানো যায়। অন্ধকার কোথাও ভরা একটা বালতিতে চামচ বা খুন্তি নেড়ে পানির আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

‘আমেরিকান লোকটা কি মেসেজ দিল তোমাকে?’ জিজ্ঞেস করল নিকিতা জুনায়েভ।

‘কোন মেসেজ দেয়নি...’

একজন লোক ইউরির চোয়াল দু’হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল, দ্বিতীয় আরেকজন তার মুখের ভেতর পুরে দিল রাবারের চোঙ, তৃতীয় লোকটা চোঙের ভেতর পানি ঢালছে। বিষম খাওয়ার অনুভূতি হলো ইউরির, বন্ধ হয়ে এল দম, ডুবে যাবার অনুভূতিটা আরও পরে হবে। ইউরির পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে একজন ডাক্তার, ইউরির নগ্ন বুকে চেপে ধরে আছে স্টেথসকোপ।

ইউরির চোখ কাপড়ের পট্টা দিয়ে বাঁধা। হাত-পা ছুঁড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু এক চুল নাড়তে পারছে না। গলা দিয়ে নামছে পানি, পেট ভরে গেল, ফুসফুস ডুবে গেল। তার মনে হতে লাগল সে ডুবে যাচ্ছে। মনে হলো, তার সারা শরীর ফুলে উঠেছে। এভাবে আরও তিন মিনিট কাটল। এক সময় বাট করে জুনায়েভের দিকে ফিরল ডাক্তার।

মাথা ঝাঁকাল জুনায়েভ। কাউচ খাড়া করা হলো, বসার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে আনা হলো ইউরিকে। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল সে। হ্যাঁচকা টানে তার চোখের পট্টি খুলে নিল জুনায়েভ।

‘বলো, কি কথা হলো তার সাথে?’

দু’চোখ ভরা নগ্ন ঘৃণা নিয়ে জুনায়েভের দিকে তাকিয়ে থাকল ইউরি। তারপর চট করে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে। লক্ষ করে হাতঘড়িটা কজি থেকে খুলে নিল জুনায়েভ।

ঘড়ি হারিয়ে মাথা খারাপের মত অবস্থা হলো ইউরির। তার ওপর যত নির্যাতনই চালানো হোক, ভাই ইভেনকোকে পালাবার একটা সুযোগ দিতে চায় সে। জানে, শেষ পর্যন্ত মুখ তাকে খুলতেই হবে। কিন্তু ইভেনকো এন.পি. সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে যাবার পর, তার আগে নয়। ঘড়ি না থাকায় এখন সে বুঝবে কিভাবে ইভেনকো রওনা হয়ে গেছে কিনা...?

আবার শুরু হলো ওয়াটার ট্রিটমেন্ট। এক সময় ইউরির মনে হলো, সে মারা যাচ্ছে। মনে হলো, একটানা বিশ মিনিট পানি খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। প্রাণে বাঁচতে হলে, অন্তত দিন কয়েক বেঁচে থাকতে হলে, সব কথা স্বীকার করা দরকার এবার।

আসলে বিশ মিনিট নয়, নতুন করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট শুরু হবার পর মাত্র পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে।

বাইশ ঘণ্টা বিছানার ধারেকাছে যায়নি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, অথচ লোকজনকে তাড়া করার বহর দেখে মনে হলো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে সে। জুনায়েভের কাছ থেকে খবর পেয়ে নয়, একটা

মেসেজ পেয়ে বাড় তুলল সে।

ঘরে ঢুকে জুনায়েভ বলল, ‘কর্নেল কমরেড, ইভেনকো রক্ষণ্ডভ আমেরিকায় পালাচ্ছে...’

‘কথাটা আদায় করতে দু’ঘণ্টা নিলে তুমি, জুনায়েভ,’ প্রচলন হুমকির সুরে বলল কর্নেল, চট করে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে পাঁচটা বাজে। ‘অনেক দেরি করে ফেলেছ। এই মেসেজটা দেখো, এন.পি. সেভেনটিন থেকে এসেছে।’

কর্নেলের অফিসে স্টোভ জ্বলছে, এরই মধ্যে ঘামতে শুরু করেছে জুনায়েভ। কাগজটা নিয়ে পড়তে শুরু করল সে, ‘ইভেনকো রক্ষণ্ডভ ডগ টীম নিয়ে এন.পি. সেভেনটিন ত্যাগ করেছে। সিকিউরিটি এজেন্ট আন্তর্ভের লাশ পাওয়া গেছে বরফে। সার্চ পার্টি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ পাঠান। ড. নিকোলাই সোরভ।’

নিজের হাতে মেসেজের উত্তর লিখল কর্নেল, ‘ইভেনকো যত দূর যেতে পারে তারচেয়ে আরও পশ্চিমে যে-ক’টা হেলিকপ্টার পাওয়া যায় পাঠাও। তারপর ওগুলো এন.পি.সেভেনটিনের দিকে ফিরে আসতে শুরু করবে। আই.আই. ফাইভের কাছে পিঠে কোন রকম তৎপরতা দেখামাত্র রিপোর্ট করবে। বলটুয়েভ।’ মেসেজটা নিয়ে রেডিও রুমের দিকে ছুটল বদোনভ।

একগাদা নির্দেশ পেল জুনায়েভ। মারমানস্কের সাথে যোগাযোগ করে জানতে হবে বাইসন বন্সার এই মুহূর্তে টেক-অফ করার জন্যে তৈরি আছে কিনা। জানতে হবে লেনিনগ্রাদ এয়ারপোর্টে প্লেন রেডি করে রাখা হয়েছে কিনা। এম.সি.সি.টি-নাইন আর রিগাকে সিগন্যাল পাঠিয়ে উত্তর চাইতে হবে এলাকায়



আমেরিকানদের কোন তৎপরতা আছে কিনা। হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভাকে জিঙ্কস করতে হবে মার্কিন আইসব্রেকার কিউটের বর্তমান পজিশন।

অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের ডিরেক্টর, সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘুম ভাঙার কথা নয়। তবু মস্কোয় তাঁর নাম্বারে টেলিফোন করল কর্নেল।

‘আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, বলটুয়েভ!’ অ্যাডমিরাল প্রায় খঁকিয়ে উঠলেন। ‘মারমানস্ক থেকে এইমাত্র খবর পেলাম আপনি আর্কটিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ওরা ভুল বুঝেছে, তাই না?’

‘না, অ্যাডমিরাল। ওরা ঠিকই বুঝেছে।’

‘আমার অথরিটি ছাড়া?’

‘এ শুধু সতর্ক থাকার জন্যে...’

‘ফার্স্ট সেক্রেটারি ব্যাপারটা শুনেছেন—ক্রেমলিন থেকে এখুনি ডেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে।’

‘ভাল।’

‘কি বললেন?’ গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি।

‘এই সতর্কতার প্রয়োজন আছে,’ কঠিন সুরে বলল কর্নেল বলটুয়েভ। তুরূপের তাসটা এবার ছাড়ল সে, ‘এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রুস্তভ পালিয়েছে, বুঝলেন? ভাববেন না শুধু মগজটা নিয়ে যাচ্ছে। এইমাত্র জানতে পারলাম, গেল হাওয়া আমি মস্কোয় থাকার সময় ইভেনকো সিকিউরিটি রুমে ঢুকে দু’ঘণ্টা ছিল। আমার ধারণা, মেরিলিন চার্টের ফটো তুলেছে। আমাদের গোটা আন্ডারওয়াটার সিস্টেমের ব্লু-প্রিন্ট সাথে নিয়ে যাচ্ছে সে।’

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলেন অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি। শান্ত গলায় জানতে চাইলেন ইভেনকোকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কর্নেলের কি কি সাহায্য দরকার। কর্নেলের উত্তর শুনে চোখ কপালে উঠল তাঁর।

‘ক্যারিয়ার নার্ভা, ট্রলার ফ্লীট এম.সি.ব্লকটি-নাইন, আর রিসার্চশিপ রিগার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব,’ বলল কর্নেল। ‘পার্সোনাল কন্ট্রোল।’

‘কি বলছেন! আপনি জানেন এ-ধরনের কোন দৃষ্টান্ত নেই!’

‘এ-ধরনের পরিস্থিতিরও কোন দৃষ্টান্ত নেই,’ বাঁঝের সাথে বলল কর্নেল। ‘ফার্স্ট সেক্রেটারি ইচ্ছে করলে অনুমতি দিতে পারেন, সেজন্যেই আপনি ক্রেমলিনে যাচ্ছেন বলে আমি খুশি।’

‘প্রথম সুযোগেই আবার যোগাযোগ করব,’ থমথমে গলায় বললেন অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি। ‘ইতিমধ্যে আপনি প্রস্তুতি নিতে থাকুন।’

‘আমার প্রস্তুতি নেয়া শেষ,’ বলে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দিল কর্নেল। ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে বিশেষ খাতির আছে তার, কাজেই চীফকে তেমন গ্রাহ্য করে না সে।

ঘরে ঢুকল জুনায়েভ। খবরের আশায় আগ্রহের সাথে মুখ তুলে তাকাল কর্নেল। বলল, ‘তৈরি হও, জুনায়েভ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর্কটিকে পৌঁছব আমরা।’

নিজের অফিসেই একটা বিছানা পেতে নিয়েছেন জেনারেল ফচ। রোববার রাত একটায় ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। মাথার আর দোষ কি, চব্বিশ ঘণ্টায় দু’ঘণ্টা ঘুমালে ব্যথা তো

করবেই।

দশ মিনিট পর দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল টমাস।  
'হেলসিঙ্কি থেকে এখনও কোন খবর নেই,' বলল সে। চেহারার  
খমখম করেছে। 'প্লেন লেট হতে পারে—এখনও আমি আশা করছি  
ডকিনস বেরিয়ে আসতে পারে।'

'তারমানে আমরা অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা ভুলও হতে পারে,' মাথা চুলকালেন জেনারেল। 'অথচ  
করারও আমাদের তেমন কিছু নেই। কে জানে, ইভেনকো হয়তো  
এরইমধ্যে বরফ পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আচ্ছা,  
আই.আই.ফাইভে তো আমরা একটা প্লেন পাঠাতে পারি, পারি  
না?'

'কিন্তু...'

সহকারীকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল বললেন, 'জানি।  
ইভেনকো রওনা না হয়ে থাকলে আই.আই.ফাইভে প্লেন দেখে  
রাশিয়ানরা সতর্ক হয়ে উঠবে।'

যে লোক মারা গেছে তার কাছ থেকে মেসেজ পাবার  
অপেক্ষায় ছটফট করছে ওরা। ওদিকে কর্নেল বলটুয়েভ দূর-দৃষ্টির  
পরিচয় দিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া শেষ করেছে। গোটা পরিস্থিতিটা  
যেন অনেকটা এরকম: খেলা শুরু হবার আগেই জিততে শুরু  
করেছে সে।

রোববার দুপুরে কর্নেল বলটুয়েভের অফিসে পায়ের ধুলো দিলেন  
সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি। সাথে অ্যাডমিরাল

মিঝিরিভস্কি।

ফার কোট খোলার পর দেখা গেল গাড়ি রঙের বিজনেস সুট  
পরে আছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। কোন রকম ভণিতা না করে  
সরাসরি আলোচনা শুরু করলেন তিনি। 'বলটুয়েভ, ট্রলার ফ্লীটের  
ছ'টা জাহাজ, হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা, আর রিসার্চ শিপ রিগার  
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মনে  
রাখতে হবে ওগুলোর তৎপরতা দেখে কোনমতেই যেন মনে না  
হয় মিলিটারি অপারেশন শুরু করেছে আমরা। কি বলতে চাইছি,  
বুঝতে পারছ?'

'অবশ্যই কোন ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট ঘটা চলবে না।'

'ঠিক তাই, কোন ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট নয়,' ভারী গলায়  
বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মক্ষোয়  
আসার কথা, আমি চাই তিনি আসুন—কাজেই খুব সাবধান।'

'কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসিডেন্ট ঘটতেই পারে,' ফিসফিস  
করে বলল কর্নেল বলটুয়েভ। 'এলাকাটা আমি চিনি, সব কিছুই  
ঘটতে পারে ওখানে। খোলা ফাটলে পড়ে যেতে পারে মানুষ,  
তুষার ঝড়ে পথ হারাতে পারে...'

ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'সব  
খুলে বলার দরকার নেই, প্লীজ। আমি জানি, ইনসিডেন্ট আর  
অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিভাবে কি  
করবে, তুমি জানো—ওটা তোমার জগৎ।' তাঁর ঘন ভুরু কুঁচকে  
উঠল। 'কিন্তু আমার কাছে তুমি শুধু একটা ব্যাপারে দায়ী  
থাকবে—ইভেনকো। সে বা মেরিলিন চার্ট যেন ওয়াশিংটনে না  
পৌঁছায়। গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব কতখানি তোমাকে বোঝাবার

জন্যেই লেনিনবাদে আমার আসা।’

‘আমেরিকানদের চেয়ে তিন চাল এগিয়ে আছি আমরা,’  
জবাবে বলল কর্নেল।

‘এগিয়ে থাকতেও হবে,’ বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি,  
অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কির দিকে তাকালেন তিনি। অ্যাডমিরালের  
হাতে একটা লেদার ফোল্ডার দেখা গেল। ‘জাহাজগুলোর সাথে  
যোগাযোগ করার জন্যে কোড আর ওয়েভলেংথ রয়েছে  
অ্যাডমিরালের কাছে। এরইমধ্যে ওগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার  
দিকে রওনা হতে বলা হয়েছে।’

‘আমিও এখনি রওনা হতে চাই,’ অ্যাডমিরালের হাত থেকে  
ফোল্ডারটা নিয়ে বলল কর্নেল। ‘তা না হলে দেরি হয়ে যাবে...’

ফার্স্ট সেক্রেটারি কর্নেলের একটা হাত চেপে ধরলেন,  
বললেন, ‘পয়মাল, অর্ডার নয়, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি,  
ইভেনকোকে ফিরিয়ে আনো—ভরাডুবি থেকে বাঁচাও রাশিয়াকে।’

রোববার, বিশেষ ফেব্রুয়ারি, বিকেল তিনটেয় মারমানস্ক থেকে  
বাইসন বম্বারে চড়ে রওনা হয়ে গেল কর্নেল বলটুয়েভ। সাথে  
সহকারী নিকিতা জুনায়েভ ছাড়াও ফার-কোট পরা পঞ্চশজন  
লোক থাকল। ওরা খালি ডেকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে,  
প্রত্যেকের সাথে একটা করে রাইফেল। বম্বারে চড়েই একটা ম্যাপ  
খুলে বসল কর্নেল, আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটের অবস্থান  
চিহ্নিত করা আছে তাতে।

বিকেলের আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় বালমল  
করছে প্রকৃতি। ছুটে চলল বম্বার। গন্তব্য: এন.পি.সেভেনটিন।

‘হেলসিক্সি থেকে এখনও কোন খবর নেই।’ পাশের সীটে বসে  
জেনারেল ফচের হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিল টমাস।  
‘এইমাত্র এল। আমার মনে হচ্ছে ডকিনসের কিছু একটা  
ঘটেছে...’

‘সে তো আমি ঘণ্টা কয়েক আগেই সন্দেহ করেছি।’  
কাগজটার দিকে জেনারেল তাকালেন কি তাকালেন না, বললেন,  
‘ডকিনস বা তার মেসেজ কোন দিনই আর পৌঁছুবে না—বাজি  
ধরবে?’

পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়, কর্নেল বলটুয়েভই সতর্ক  
করে দিয়েছে জেনারেল ফচকে। গত চার ঘণ্টা ধরে জাহাজ,  
ওয়েদার প্লেন, আর উপগ্রহ থেকে একের পর এক রিপোর্ট  
আসছে, প্রতিটি রিপোর্ট থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে আর্কটিক  
এলাকায় বিরাট কিছু একটা করতে যাচ্ছে রাশিয়ানরা।

প্রথমে জেনারেল শুনলেন, সোভিয়েত হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার  
নার্ভা কোর্স বদলেছে, এখন সেটা ফুল স্পীডে ছুটছে উত্তরে,  
আইসফিল্ডের দিকে। এক ঘণ্টা পর খবর এল ট্রলার ফ্লীট  
এম.সিক্সটি-নাইন-এর ছয়টা জাহাজ, গাদা গাদা ইলেকট্রনিক  
গিয়ার নিয়ে কোর্স বদলে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ আগে পাওয়া  
খবর অনুসারে ন্যাটোর ওয়াটার কিং-এর ওপর নজর রাখার কথা  
ওটার। শেষ খবরটা আরও চাঞ্চল্যকর—বিশাল সোভিয়েত রিসার্চ  
শিপ রিগাও কোর্স বদলেছে। টমাস তাঁকে জানাল, ‘রিগা  
আইসবার্গ অ্যালাই-র দিকে যাচ্ছে।’

এরপর আর চুপ করে থাকা যায় না, জরুরী একটা ফোন

করলেন তিনি। ত্রিশ মিনিট পর চশমা পরা সুবেশী এক লোক ঢুকল তাঁর অফিসে। প্রেসিডেন্টের সহকারী, একান্ত বিশ্বস্তদের একজন, বাধা না দিয়ে ঝাড়া পনেরো মিনিট জেনারেলের কথা চুপচাপ শুনে গেল। সবশেষে জেনারেল বললেন, ‘কলিন, এই হলো পরিস্থিতি। মস্কোয় শীর্ষ বৈঠকে বসার সময় প্রেসিডেন্টের পকেটে যদি মেরিলিন চার্ট থাকে, সব দিক থেকে ফলাফল আমাদের অনুকূলে থাকবে। সম্ভবত যে-টুকু কনসেশন আমরা চাইব, রাশিয়া অন্তত গোয়ার্তুমি করে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না...’

প্রেসিডেন্টের সাথে তিন মিনিট কথা বলল সহকারী। রিসিভার রেখে দিয়ে জেনারেলকে বলল সে, ‘আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সময় না থাকলে ওয়াশিংটন কি সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। শুধু একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট যেন না ঘটে। তাহলে শীর্ষ বৈঠক বানচাল হয়ে যেতে পারে।’

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন জেনারেল, পাশের সীট থেকে টমাস তাকিয়ে আছে লক্ষ করে হাতের মেসেজটার কথা মনে পড়ল তাঁর।

খুক করে কেশে টমাস বলল, ‘হঠাৎ করে কোথেকে ঘন কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলেছে আই.আই.ফাইভকে।’ গম্ভীর দেখাল তাকে। ‘রানার জন্যে খুব কঠিন হয়ে গেল কাজটা।’

রিপোর্টটা পড়া শেষ করে সীট-স্ট্র্যাপ বাঁধলেন জেনারেল ফচ। বোয়িং নামছে। গন্তব্য ছিল কার্টিস ফিল্ড। পৌঁছে গেছে বিমান।

## ছয়

বরফ-দ্বীপ এন.পি. সেভেনটিন। সরু এক ফালি এয়ারস্ট্রিপ ছুটে এল বাইসনের দিকে। দু’সারি ঝাপসা আলোর মাঝখানে বম্বারের নাক তাক করল পাইলট, থ্রটল পিছিয়ে এনে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিল নিজেকে। ফালিটা বাইসনের জন্যে খুব ছোট।

বরফ উড়ে এল তার দিকে, নিচ দিয়ে তীরবেগে পিছিয়ে গেল, ঘষা খেলো চাকা। বম্বার ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষল পাইলট। বিস্ফোরিত হলো তুষার মেঘ, সাদা কুয়াশার মত ছলকে উঠে ঢেকে দিল জানালাগুলো। টুকরো বরফ কামানের গোলার মত আঘাত করল আন্ডারকারিজে, আওয়াজ শুনে মনে হলো কয়েক হাজার মেশিনগান থেকে গুলি ছুটছে। প্লেন থামল না, এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে...

পটকা ফাটার মত চটাস করে একটা আওয়াজ হলো প্লেনের ভেতর। কিছু না, উরুর ওপর একটা চাপড় মারল কর্নেল বলটুয়েভ। উরুটা আর কারও হলে ইঞ্চিখানেক ফুলে উঠত সন্দেহ নেই। ‘ভারি একসাইটিং, তাই না, জুনায়েভ?’ তার চোখ জোড়া পুলকে চকচক করছে।

তার পাশের সীটে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে জুনায়েভ। দস্তানা পরা হাত দিয়ে সীটের হাতল চেপে ধরে আছে সে, চোখ বন্ধ। আপন মনে হাসল কর্নেল। কে বলবে এই জুনায়েভই সম্ভ্রান্ত লোকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তথ্য আদায়ে ওস্তাদ?

এয়ারস্ট্রিপের ঠিক কিনারায় পৌঁছে থামল বম্বার, একটুর

জন্যে দুর্ঘটনা ঘটল না। প্লেন থামতেই সীট-স্ট্র্যাপ খুলে দরজার কাছে পৌঁছে গেল কর্নেল, তার পিছনের ডেকে গাদাগাদি করে শুয়ে থাকা লোকগুলো নড়ে ওঠার আগেই। ঝাঁউ স্টাফরা লোহার সিঁড়ি খাড়া করার আগেই দরজা খুলে ফেলল সে।

সিঁড়িতে পা দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল কর্নেল। ‘চলে গেছে ওটা? খুস শালা!’

তরতর করে ধাপ বেয়ে নামল সে, সামনের দিকে কাত হয়ে থাকা পাহাড়ের মত দাঁড়াল বেস লীডার ড. নিকোলাই সোরভের সামনে। জুনায়েভের মতই ড. সোরভ মোটাসোটা, তেমন লম্বা নয়। তার চোখের স্লো-গগলসে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করার সাথে সাথে মেজাজ খিঁচড়ে গেল কর্নেলের।

‘কি চলে গেছে, কর্নেল কমরেড?’

‘কি আশ্চর্য! আমি দেখলাম, তুমি কেন দেখোনি? আমরা ল্যান্ড করার সময় একটা প্লেন ছিল আকাশে...’

‘দেখেছি, কর্নেল কমরেড। পশ্চিম দিকে উড়ে গেছে ওটা...’

‘রাডার, রাডার চেক করেছ?’

‘না, কর্নেল কমরেড। এক মিনিট। এক্সুগি আসছি...’

‘তুমি জানো, জুনায়েভ, অযোগ্য লোকদের নিয়ে কি অসুবিধে?’ জিঙ্কস করল কর্নেল, জুনায়েভ এই মাত্র সিঁড়ি বেয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

‘জ্বী,’ মিনমিন করে শুরু করল জুনায়েভ, ‘...’

‘ধমক দেয়া যায় না, প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। সোরভ পোলার বেয়ারের চেয়ে ভয়ঙ্কর-সব ইডিয়টই তাই।’ পারকার ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজের চারদিকে তাকাল কর্নেল। ঘাঁটির

নির্জনতা তার মনে একটা ছাপ ফেলল। সবগুলো দিকেই সিকি মাইল পর্যন্ত মোটামুটি সমতলই বলা যায়, তারপরই শুরু হয়েছে জ্যাস্ত, ভয়ঙ্কর পোলার প্যাক-বিশাল বরফ খণ্ডের নারকীয় স্তূপ, মনে হলো যেন লাফ দিয়ে উঠে এসে গোটা দ্বীপটাকে গ্রাস করার জন্যে ছটফট করছে।

‘দ্বীপের আয়ু শেষ,’ গলায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে মন্তব্য করল সে।

আমেরিকান রিসার্চ বেসে ক্যাম্প এরিয়া থেকে এয়ারস্ট্রিপ যথেষ্ট দূরে থাকে, এখানে তা নয়। এন.পি. সেভেনটিনের সমতল ছাদঅলা ঘরগুলো থেকে মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে রানওয়ে। ছোট কলোনির মাথার ওপর একশো ফিট উঁচু হয়ে আছে রাডার মাস্ট, রাডারের ডানা আকৃতির কান অনবরত ঘুরছে। জুনায়েভকে এক পশলা নির্দেশ দিল কর্নেল, ড. সোরভ এক ছুটে ফিরে আসতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

‘রাডারে এখন ওটা পিনের মাথা, দেখা যায় কি যায় না,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সোরভ। ‘আমেরিকান পাইলট আপনাদের দেখেই লেজ তুলে গ্রীনল্যান্ডের দিকে ফিরে গেছে আবার।’ গর্বের সাথে হাসল সে, যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছে। কর্নেল বলটুয়েভ হাত লম্বা করে তার গগলসটা কপালের ওপর তুলে দিল।

‘দিন নয়, ঝড় নয়, এটা পরে সং সেজে আছ কেন?’ বেস লীডারের দিকে ঝুঁকে পড়ল কর্নেল। ‘হেলিকপ্টারগুলো ইভেনকোর খোঁজ পেয়েছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছ? স্লোক্যাটস পাঠিয়েছ? এমন কিছু করেছ যাতে ভাল কিছু আশা করা যায়?’

‘ইভেনকোকে এখনও পাওয়া যায়নি...,’ নার্ভাস হয়ে পড়ল

সোরভ, ঘন ঘন নিচের ঠোঁট মুখের ভেতর পুরে চুষছে। ‘এখনও সার্চ করছে ওরা...’

‘নামো তোমরা!’ হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এয়ারস্ট্রিপের ওপর দিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল। বাইসন থেকে কারা নামছে দেখার জন্যে মার্কিন প্লেনটা কাছেপিঠে নেই, কাজেই পিছন ফিরে তাকাবার গরজও অনুভব করল না।

বাইসনের ল্যান্ড করতে সুবিধে হবে ভেবে ছয়টা হেলিকপ্টারকে এয়ারস্ট্রিপের সামনে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ‘ওগুলো এখানে কেন, আকাশে নয় কেন?’

কর্নেলের পাশে থাকার জন্যে রীতিমত ছুটতে হচ্ছে ড. সোরভকে। ‘ওগুলো এইমাত্র নার্ভা থেকে এসে পৌঁছেছে, কর্নেল কমরেড...’

‘ডিমে তা দিতে? অঁ্যা? আবহাওয়ার শেষ খবর কি?’

‘আই.আই. ফাইভের ওপর কুয়াশা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই কুয়াশার জন্যেই সার্চ করা কঠিন...’

‘ছিটেফোঁটা ঘিলু যদি বা মাথায় থাকে, সব খেয়ে ফেলছে তোমার ওই চুল-প্রথম সুযোগেই কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে যাবে। এটা আমার আদেশ। বুদ্ধি কাঁহিকে, কুয়াশা থাকলে আমেরিকানরা ইভেনকোকে প্লেনে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না।’ ঘরগুলোর কাছাকাছি চলে এল ওরা, ছাদ থেকে বরফের বুরি আর থাম নেমে এসেছে, গ্রীষ্মকালের আগে গলবে না ওগুলো। ‘কুয়াশা সরে গেলেই বরফ থেকে ওকে তুলে গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে যাবে ওরা।’ অন্যমনস্ক দেখাল, যা ভাবছে বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, ‘আই.আই.ফাইভের পশ্চিমে আমাদের লোক পঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে

থাকবে। ওদের মাথার ওপর ছাতার মত বুলে থাকবে হেলিকপ্টারগুলো। ইভেনকোকে নিতে আসছে মাসুদ রানা,কেউ যদি তাকে জ্যাস্ত ধরে এনে আমার হাতে তুলে দিতে পারে, বিদেশে চাকরির সুযোগ সহ তিনটে প্রমোশন। লাশ এনে দিতে পারলে শুধু প্রমোশন-তিনটে।’

‘কর্নেল কমরেড,’ ভয়ে ভয়ে, ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল ড. সোরভ, ‘সেটা কি বিপজ্জনক হয়ে যাবে না? আমেরিকানরা ব্যাপারটাকে...’

‘কেউ জানবে কেন?’ চোখ পাকাল কর্নেল। ‘দুর্ঘটনার মত করে সাজাতে হবে।’

‘আর ইভেনকোর ব্যাপারে, কর্নেল কমরেড?’

‘ইভেনকো রপ্তা একটা উন্মাদ,’ ঘোষণার সুরে বলল কর্নেল। ‘একজন খুনী। আমাদের একজন বিজ্ঞানী, ওশেনোগ্রাফার পিটার আস্তভকে খুন করেছে সে।’

‘জ্বী, কর্নেল কমরেড?’ চোখ কপালে তুলল ড. সোরভ। ‘এ আপনি কি বলছেন! আস্তভ তো সিকিউরিটি এজেন্ট...’

‘তুমি এত বড় গবেট, বিশ্বাস করা কঠিন!’ বরফে পা ঠুকল কর্নেল। ‘এইমাত্র আস্তভ একজন ওশেনোগ্রাফার হয়েছে। ইভেনকো একজন ক্রিমিনাল, সে তার একজন সহকর্মীকে খুন করে পালিয়েছে, কাজেই তাকে গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা ছিল পলিটিক্যাল কেস, এখন হয়ে গেল পুলিশ কেস।’

‘পুলিস কেস?’ চিন্তিত দেখাল ড. সোরভকে। ‘পরিস্থিতি তাতে পাল্টে যাবে, বলছেন?’

‘যাবে না! পুলিশ কেস মানেই হলো এখন আমরা ইভেনকোকে দেখা মাত্র গুলি করতে পারব, তার সাথে যারা থাকবে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। অজুহাত তৈরি হয়ে গেছে-ইভেনকো রক্ত্ত একটা বিপজ্জনক ম্যানিয়াক। অর্থাৎ, সোরভ, আমাদের এই অভিযান মানুষ শিকারের অভিযান!’

কার্টিস ফিল্ডে রানার সাথে দেখা করার কয়েক মিনিট পরই আবার প্লেনে চড়লেন জেনারেল স্যামুয়েল ফচ। দুই সীটের একটা সেসনা, তরণ পাইলট লিয়ন চ্যাপেল সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে। গ্রীনল্যান্ডকে পিছনে ফেলে পোলার প্যাকের ওপর চলে এল প্লেন। পূর্ব দিকে যাচ্ছে ওরা।

‘বলছি না আই.আই.ফাইভকে খুঁজে বের করো,’ পাইলটকে অভয় দিয়ে বললেন জেনারেল। ‘আমি শুধু পরিস্থিতিটা নিজের চোখে দেখতে চাই।’

কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো লিয়ন চ্যাপেল, ‘স্লেজ নিয়ে বা হেঁটে, বরফের ওপর দিয়ে বেসে পৌঁছানো সম্ভব বলে আমি মনে করি না, স্যার। কুয়াশা কেটে গেলে প্লেন নিয়েই যেতে হবে মি. রানাকে-বরাবর আমরা যেভাবে যাই।’

দু’হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে সেসনা। নিচে পোলার প্যাক বহুদূর পর্যন্ত সমতল, শুধু প্রেশার রিজগুলো উঁচু বাঁধের মত ঢেউ তুলে আছে। ওপর থেকে ঝাপসা, চিড় ধরা কাঁচের মত দেখাল বরফের গা। ত্রিশ মিনিট পর সীটের কিনারায় প্রায় ঝুলে থাকতে দেখা গেল জেনারেলকে, ঝুঁকে পড়ে ধূসর রঙের ঘন কুয়াশা

দেখছেন। এরকম কুয়াশা আগে কখনও দেখেননি তিনি, ঢেউ খেলানো নিরেট মেঘ যেন, নিচের বরফ সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে। কুয়াশার ওপরের কিনারায় খুদে হারপোকা আকৃতির একটা বিন্দু দেখা গেল, ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। ‘দেখতে পাচ্ছ, চ্যাপেল?’

‘হেলিকপ্টার, স্যার। রাশিয়ান।’

‘সাবমেরিন কিলার?’

‘হ্যাঁ।’

‘প্যাকের দক্ষিণে ওদের একটা ক্যারিয়ার আছে, নিশ্চয়ই ওটা থেকে এসেছে। আরও কাছ থেকে দেখতে চাই। ডাইভ!’

খসে পড়ার মত দ্রুত নিচের দিকে নামতে শুরু করল সেসনা। রাশিয়ান হেলিকপ্টার মাত্র আধ মাইল দূরে। যত দ্রুত নামছে সেসনা, কুয়াশা তত দ্রুত উঠে আসছে ওদের দিকে। একটা ঝাঁকি খেয়ে প্লেন সিধে হলো, সীট থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়ার কথা জেনারেলের। কিন্তু তৈরি ছিলেন তিনি। হেলিকপ্টার এখন ওঁদের তিনশো ফিট নিচে। তারপরই হারিয়ে গেল ওটা, ঢুকে পড়ল কুয়াশার ভেতর।

‘যেন লজ্জাবতী লতা, পালিয়ে বাঁচল!’ জেনারেলের বলার ভঙ্গিতে খেদ প্রকাশ পেল। ‘এদিকে আগে কখনও দু’একটা চোখে পড়েছে, চ্যাপেল?’

‘এত পশ্চিমে-না, অন্তত এই মডেলের নয়। আই.আই.ফাইভকে ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে এসেছি, স্যার।’ কুয়াশার শেষ প্রান্তের কিনারা দেখতে পেল ওরা, আরও সামনে চাঁদের আলোয় স্ফটিকের মত চকচক করছে পোলার প্যাক। ‘এন.পি.সেভেনটিন,

রাশিয়ান বেসের কাছাকাছি চলে এসেছি।’

‘ওরা কি করছে দেখতে চাই। তোমার ভয় করছে?’ একটু যেন কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

‘তাড়া করবে, স্যার,’ বলল চ্যাপেল। ‘প্রায় এখানেই একবার ওদের একটার সাথে আমারটার আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত।’ আপন মনে হাসল সে। ‘প্রতিবেশী হিসেবে তেমন সুবিধের নয়, স্যার। আপনি চাইলে আরও কাছে যেতে পারি। ওই দেখুন, স্যার!’

বরফের ওপর সবুজাভ ফসফরেসেসের আভা দেখে বোঝা গেল নিচে এন.পি. সেভেনটিনের ওপর ওটা এয়ারস্ট্রিপ। ঘরগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্য একটা জিনিস ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। চোখের চারপাশ কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকলেন জেনারেল। ‘ঠিক সময়ে এসেছি! তোমার মেডেল পাওয়া উচিত, চ্যাপেল, মাই বয়।’ দূর থেকে ছোট ছায়ার মত দেখাল জিনিসটাকে, আকাশ থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে, পিছনে ছেড়ে আসছে পেন্সিল-সরু বাষ্প। এন.পি. সেভেনটিনে একটা বাইসন বম্বার নামছে।

‘ফিরে যাব, স্যার?’

‘খামো!’

দ্রুত চিন্তা চলছে জেনারেলের মাথায়। বাইসন বম্বার! ভারি ইন্টারেস্টিং তো! রাশিয়ানরা সাধারণত আর্কটিকে বাইসন ব্যবহার করে না, তারমানে মারমানস্ক থেকে জরুরী কিছু বয়ে আনছে। যন্ত্রপাতি, নাকি মানুষ? গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে গেল বম্বার, দু’সারি আলোর মাঝখানে। এতক্ষণে ঘরগুলো দেখতে পেলেন জেনারেল।

‘ওদের রাডারে আছি আমরা,’ সাবধান করে দিয়ে বলল চ্যাপেল। ‘এবার ওরা তাড়া করার জন্যে প্লেন পাঠাবে।’

‘নিচে তাকাও, বোকা!’

সাতশো ফিট নিচে তাকিয়ে চ্যাপেল দেখল, এয়ারস্ট্রিপের দু’পাশের আলো নিভে গেছে। তারমানে এই মুহূর্তে কোন প্লেন আকাশে উঠবে না। কাছিম আকৃতির ছয়টা স্লো-ক্যাট দেখল সে, সোভিয়েত বরফ-দ্বীপের পশ্চিমে। সরাসরি আই.আই.ফাইভের দিকে যাচ্ছে ওগুলো। এত উঁচু থেকে মনেই হয় না নড়ছে বলে, কিন্তু পিছনে রেখে যাচ্ছে ক্যাটারপিলার চাকার দাগ।

বাইসন বম্বার আর স্লো-ক্যাট দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন জেনারেল ফচ।

‘ফেরো,’ বললেন তিনি। সাথে সাথে প্লেন ঘোরাতে শুরু করল চ্যাপেল, সেই সাথে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। ‘কার্টিস ফিল্ডের সাথে যোগাযোগ করো...’

‘ব্যাড স্ট্যাটিক, স্যার...’

‘চেষ্টা করো,’ গর্জে উঠলেন জেনারেল। ‘একটাই মেসেজ-টেকনিকালার। বারবার, হাজারবার-টেকনিকালার!’

এই কোড সিগন্যালের জন্য কার্টিস ফিল্ডে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে রানা। পেলেই আই. আই. ফাইভের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে ও।

গ্রীনল্যান্ড উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে, পোলার প্যাকের ওপর খাড়াভাবে নামতে শুরু করল একজোড়া সিকোরস্কি হেলিকপ্টার, যেন তারের শেষ মাথায় ঝুলছে ওগুলো। বিপজ্জনক



একটা মুহূর্ত-অচেনা বরফে যে-কোন ধরনের ল্যাভিং বিপজ্জনক। আকাশ থেকে বোঝার উপায় নেই নিচে ওখানে নিরেট বরফ আছে কিনা। দেখে মনে হতে পারে মুক্ত বরফ, কিন্তু বরফে চাপ পড়লে ফেটে যেতে পারে, বাহনসহ আরোহীরা তলিয়ে যেতে পারে হিম আর্কটিক মহাসাগরে। ওপর থেকে অনেক সময় বরফ সমতল কিনা তাও বোঝা যায় না। সমতল না হলে উল্টে যেতে পারে কপ্টার, ফলে বরফে ধাক্কা খায় প্রথমে ঘুরন্ত রোটর ব্লেড। আরোহীরা হয়তো নামার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, পরমুহূর্তে দেখা যাবে রোটর ব্লেড তাদেরকে কচুকাটা করছে। অবশ্য যদি না ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়; হলে, পুড়ে মরতে হবে সবাইকে।

উদ্বিগ্ন রানা একটা ঝাঁকির জন্যে অপেক্ষা করছে। ঝাঁকিটাই বলে দেবে শক্ত বরফে নামতে পেরেছে হেলিকপ্টার। পাইলটের পাশে অবজারভারের সীটে বসেছে রানা, আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছে কালেকটিভ স্টিক ধরা পাইলটের হাতের দিকে। স্টিকটা ওদের নিচে নামা নিয়ন্ত্রণ করছে। আশার কথা, পাইলটের হাত একটুও কাঁপছে না। তার মুখের দিকে চট করে একবার তাকাল ও-হেলমেট, গগলস্, আর হেডসেটের আড়ালে যতটুকু দেখা যায়। শক্ত হয়ে আছে চেহারা, সম্ভবত ঝাঁকিটা অনুভব করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে।

রানার পিছনের সীটে নয়টা কুকুরকে নিয়ে বসেছে বিনয়, কুকুরগুলো নাকি সুরে গোঙাচ্ছে, কপ্টারের এই খাড়াভাবে খসে পড়া পছন্দ করছে না ওগুলো। আর একদল কুকুর ও স্লেজ নিয়ে নিয়াজ মাহমুদ রয়েছে দ্বিতীয় কপ্টারে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। পাইলট রিচার্ড ওয়েন জানিয়েছে ত্রিশ

সেকেন্ডের মধ্যে পোলার প্যাকে নামবে ওরা। আর বিশ সেকেন্ড।

খানিক আগে রানা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এখানে নামার ঝুঁকি নিতে তুমি?’

‘না!’ মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিতে ইতস্তত করল না ওয়েন। ‘কিন্তু আমার ওপর অর্ডার আছে আপনাকে নামাতে হবে, ইফ হিউম্যানলি পসিবল। কাজেই ঝুঁকিটা নিতে হবে, তাই না?’

ঈয়ার-প্যাড অ্যাডজাস্ট করল রানা। সবকিছু কাঁপছে-পায়ের নিচে মেঝে, গম্বুজ আকৃতির সিলিং, পাইলটের সামনে কন্ট্রোল। পাশে বসা একটা কুকুরের মাথায় হাত রাখল রানা, দস্তানা পরা হাতে খুলির কাঁপন পরিষ্কার অনুভব করতে পারল। ট্রান্সপোর্ট প্লেনে চড়ে অভ্যেস আছে ওগুলোর, হেলিকপ্টার দু’চোখের বিষ। পতন থামছে না। স্টিকে ফিট করা টুইস্ট-গ্রিপ থ্রটল অ্যাডজাস্ট করল ওয়েন। দশ সেকেন্ড।

আয়ুও হয়তো তার বেশি নয়।

যথেষ্ট নিচে নেমে এসেছে ওরা, গম্বুজ আকৃতির সিলিংয়ের বাইরে বরফ দেখতে পেল। চুর চুর কাঁচের সীমাহীন বিস্তার বলে মনে হলো। দরজা খোলার সাথে সাথে ঝপ করে আশি কি নব্বুই ডিগ্রী নেমে যাবে টেমপারেচার, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। যদি না তলিয়ে যায় কপ্টার, যদি না উল্টে যায়। সিকোরস্কির নিচে স্কিড আছে-স্কি-কপ্টারকে সিধে রাখতে সাহায্য করবে। যদি না একটা স্কি হড়কায়, আর দ্বিতীয়টা দেবে যায়। পাইলট তাকাতে একটা চোখ টিপল রানা। কৌতুকের পাণ্টা কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গগলসের পিছনে ওয়েনের চোখ ভাবলেশহীন। আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে সে। এই সময় বরফে নামল স্কিড।

সিকোরস্কি টলমল করতে লাগল। রানা অনুভব করল, ওর দিকে কাত হয়ে পড়ছে। পোর্টের দিকে নরম বরফ, স্টারবোর্ডের দিকে কঠিন। ওয়েনের হাত যেন স্টিকের সাথে ঝালাই করা। বিপদ টের পেয়ে গেছে কুকুরগুলো, গলার ভেতর থেকে করুণ ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। রোটর ব্লেড এখনও ঘুরছে, ডুবে যাবার অনুভূতিতে কোন ছেদ নেই এখনও। কেবিনের ভেতর উত্তেজনা যেন সশরীরে উপস্থিত, আতঙ্কে তিনজনই ঘামছে দরদর করে। হঠাৎ করেই সিধে হলো মেশিন, স্থির হলো। সুইচ অফ করল ওয়েন, গগলস কপালে তুলল। চকচক করছে ভিজ়ে মুখটা।

‘নাইস ল্যান্ডিং,’ হেডসেট খুলে বলল রানা, দরজার দিকে হাত বাড়াল। দরজা খুলতেই ছুরি খেলো রানা-ধারাল আর্কটিক ঠাণ্ডা। মুখ ফুলিয়ে গরম বাতাস ছাড়ল রানা, লাফ দিল বরফ লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে খানিকটা দৌড়ে থামল ও, মুখ তুলে তাকাতেই ছাঁৎ করে উঠল বুক। প্রেশার রিজের ওপর নামছে নিয়াজের সিকোরস্কি। ধাক্কা খেয়ে নির্ঘাত বিধ্বস্ত হবে।

রানার পিছনে আনন্দ-উল্লাসে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরগুলো, বিনয় ওগুলোকে নামতে সাহায্য করছে। পূব দিকে, সিকি মাইল দূরে, চাঁদের আলোয় ঝুলে থাকতে দেখা গেল ভারী কুয়াশার নিশ্চিদ্র পর্দা, ধূসর নোংরা মেঘ যেন নিচের বরফে নোঙর ফেলেছে। নিয়াজের সিকোরস্কি একটা প্রেশার রিজের আড়ালে খসে পড়ল, রিজটা মোচড় খাওয়া দশ ফিট উঁচু নিরেট পাঁচিল। বরফে ধাক্কা খেলো স্কিড, রিজের ওপর রোটর ব্লেড ঘুরছে। ‘এ-যাত্রা বেঁচে গেল নিয়াজ,’ রানার পিছন থেকে বিকৃত শোনাৎ বিনয়ের গলা। ‘মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল...’

‘বাঁচেনি-হেলিকপ্টার উল্টে যাচ্ছে!’ বরফের ওপর দিয়ে ছুটল রানা, বুটের তলায় কচকচ করে গুঁড়ো হচ্ছে বরফ কুচি। গোটা এলাকা সম্প্রতি জমাট বেঁধেছে, কোথাও উঁচু-নিচু, কোথাও নরম। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে ওর-এখনও রিজের মাথায় দেখা যাচ্ছে রোটর ব্লেড, কিন্তু কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। একটা ফাঁক গলে পাঁচিল পেরোল ও, বিপদের মুহূর্তে বিদ্যুৎগতি নিয়াজ এরই মধ্যে খুলে ফেলেছে সিকোরস্কির দরজা, একের পর এক লাফ দিয়ে নিচে নামছে কুকুরগুলো, ছুটে আসছে ফাঁকটার দিকে।

রোমহর্ষক একটা দৃশ্য। সিকোরস্কির একদিকের স্কিড নরম বরফে দেবে যাচ্ছে এখনও, স্ট্রাটের খানিকটা এরই মধ্যে ডুবে গেছে, একদিকে অস্বাভাবিক কাত হয়ে পড়া সত্ত্বেও রোটর ঘুরছে। এরচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত হতে পারে না। ছুটে আরও কাছে চলে আসছে রানা, ভাবছে পাইলট ব্যাটা করছে কি! সুইচ অফ করেনি কেন! স্লেজটাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজায় উদয় হলো নিয়াজ, ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে। ‘ওটা ছাড়ো!’ রানার চিৎকার যান্ত্রিক গর্জনে হারিয়ে গেল। লাফ দিল ও, আঁচড়া-আঁচড়ি করে উঠে পড়ল কেবিনে। কন্ট্রোলের পিছনে বসে আছে পাইলট, তার দিকে না তাকিয়ে হাতের এক ঝাপটায় সুইচ অফ করল ও।

‘না!’ প্রতিবাদ জানাল পাইলট। ‘আমি টেক-অফ করতে যাচ্ছি...’

‘ইঞ্জিন চালু করো, আমি তোমার ঘাড় মটকাব!’ শাসাল রানা। ‘ওই স্লেজের ওপর আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, হাত লাগিয়ে নামাও ওটাকে। মেশিন গেলে মেশিন আসবে-আমরা গেলে?’ নিয়াজকে সাহায্য করার জন্যে ফিরে এল ও। ‘আলগোছে,

নিয়াজ। নিচে বরফ স্পঞ্জের মত।’ সিকোরস্কির পাশে বিনয়কে দেখতে পেল ও। ‘বিনয়, কোথায় নামে লক্ষ রাখো, ডুবে যেতে পারে...’

‘তাড়াতাড়ি-পা দেবে যাচ্ছে...’

আস্ট্রে-ধীরে, একটু একটু করে দরজা দিয়ে অর্ধেকটা বের করে দিল ওরা ভারী স্লেজটাকে। লাফ দিয়ে বিনয়ের পাশে নামল রানা, দু’জন মিলে ভারটা সামলাবে। শেষ ক’মুহূর্ত প্রায় স্থির হয়ে থাকল সিকোরস্কি, যদিও কাত হয়ে থাকার ভঙ্গিটা মারাত্মক একটা হুমকির মত, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনা হলো স্লেজ। বরফে চাপ পড়তেই দেবে যেতে শুরু করল। খপ্ করে হারনেস ধরে ফেলল ওরা, টেনে শক্ত বরফের ওপর নিয়ে আসার চেষ্টা করল। প্রেশার রিজের ফাঁকের কাছে পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই।

পাইলটের দিকে তাকাল রানা। এখনও কন্ট্রোলার পিছনে গ্যাট হয়ে বসে আছে। ‘জানের মায়া থাকলে লাফ দাও হে, তোমার কফিন ডুবছে।’

গোঁ ধরে বসেই থাকল পাইলট, রানার কথায় কান দিল না। ‘চেষ্টা করে দেখব, টেক-অফ করতে পারি কিনা।’

‘নেমে এসে এক নজর দেখো না, নাকি বউকে এতই ভালবাসো ইস্রুয়েলের টাকাটা এখনি তাকে পাইয়ে দিতে চাও?’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচে নামল পাইলট, পা ডুবে যাচ্ছে টের পেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে চলে এল রানার পাশে-বরফ এখানে কঠিন। সিকোরস্কি এখন প্রায় সিধে হয়ে গেছে, কারণ পোর্ট সাইডের মত স্টারবোর্ড সাইডের স্কিডও ডুবে গেছে বরফের তলায়।

‘এটা এখন একটা আপদ,’ বাঁঝের সাথে বলল রানা। ‘দূর করতে হবে।’

প্রায় রুখে উঠল পাইলট লী রয়, ‘তারমানে?’

‘ওখানে ওটার ওভাবে থাকা চলবে না,’ বলল রানা। ‘হয় তুলতে হবে, নাহয় ডোবাতে হবে। তা না হলে রাশিয়ানরা হেলিকপ্টার থেকে দেখে বুঝে নেবে কোথেকে আমরা কুয়াশার ভেতর ঢুকেছি।’ এক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। ‘মটর স্টার্ট দিলে কাঁপুনিতেই বোধহয় ডুবে যাবে...’

তীব্র প্রতিবাদের সুরে লী রয় বলল, ‘ওটা সরকারি সম্পত্তি, মি. মাসুদ রানা। একটা টীম আনতে পারলে টেনে তোলা সম্ভব।’

‘অত সময় নেই,’ কঠিন সুরে বলল রানা। ‘সরে থাকো, চেষ্টা করে দেখি তোলা যায় কিনা।’

‘রানা,’ কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ মন্তব্য করল, ‘ভেবে দেখো, ওটার সাথে আমাদের লীডারই যদি তলিয়ে যায়...’

কিন্তু রানা ততক্ষণে সাবধানে কেবিনে উঠতে শুরু করেছে। ওর ভারেও সিকোরস্কি দুলাল না, বা আরও বেশি বরফের নিচে দাবল না। পাইলটের সীটে বসল ও, ভাল করে দেখে নিল সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে কিনা। সবচেয়ে দূরে সরে গেছে পাইলট লী রয়, পাঁচিলের ফাঁকটার কাছে। নিয়াজ আর বিনয় অপেক্ষা করছে কাছেই, ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের নাগালের ঠিক বাইরে। কাজটায় ঝুঁকি আছে রানা জানে। আর কাউকে এই ঝুঁকি ও নিতে দিত না। কিন্তু সিকোরস্কির একটা ব্যবস্থা না করলেও নয়।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার আগে এক মুহূর্ত গুম হয়ে থাকল রানা।

বরফ থেকে যদি তোলা সম্ভব হয়, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথম হেলিকপ্টারের পাশে ল্যান্ড করাবে। ক্ষিউগুলো গাঢ় রঙের কাদাটে তরল বরফে ডুবে গেছে। কাঁপুনি শুরু হলে বেশিরভাগ সম্ভাবনা আরও তলিয়ে যাবে ওগুলো, গোটা হেলিকপ্টার হঠাৎ হুস করে অতল তলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তৈরি থাকতে হবে ওকে, কপ্টারটা যেন ওকেও সাথে করে নিয়ে না যায়। বিসমিল্লাহ বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, সিকোরস্কি উঠছে। টলমল করল যান্ত্রিক ফড়িং, ইঞ্জিন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোলার চেষ্টা করল ভারী দেহটাকে। তারপরই পোর্ট সাইড নিচু হতে শুরু করল। এত দ্রুত, ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। তারপর কি ঘটেছে, পরিস্কার মনে করতে পারল না রানা। দরজা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ও, বরফের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল-সিকোরস্কি ওর ওপরই কাত হয়ে পড়ছে।

সাথে সাথে ব্যাপারটা টের পায়নি রানা। আওয়াজ শুনে মুখ তুলল ও, দেখল রোটর ব্লড ওর বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে। আতঙ্কের হিম একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ায়। স্রেফ দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে ও। হামাগুড়ি দিতে শুরু করে উপলব্ধি করল বুট জোড়া নরম বরফের তলায় ঢুকে গেছে, বুটের ভেতর চুইয়ে ঢুকছে তরল বরফ। হাঁটু জোড়া গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের কাছে তুলতে চেষ্টা করল ও, বুটসহ পা দুটো আগে মুক্ত করতে হবে। রোটরের আওয়াজ কালা করে দিল ওকে। নাগালের মধ্যেই রয়েছে শক্ত বরফ, কিন্তু হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটাই সার, এক চুল এগোতে পারল না রানা।

মাথা নিচু করে রোটর ব্লডের নিচে পৌঁছল নিয়াজ, ওগুলো আর ছ'ইঞ্চি নেমে এলে ভবলীলা সাজ হয়ে যাবে তার। আরও নিচু হলো সে, বরফ থেকে রানার হাত তুলে টানল। 'একেই কি বলে যমে মানুষে টানাটানি, রানা?' অবিশ্বাস্য হলেও মিথ্যে নয়, দাঁত বের করে হাসছে নিয়াজ।

'শুয়ে পড়ো,' নিয়াজের পিছন থেকে বিনয় আর সামনে থেকে রানা প্রায় একযোগে চিৎকার করল।

তাই করল নিয়াজ, তার পা ধরে পিছন থেকে গায়ের জোরে টানতে লাগল বিনয়। বন বন করে ঘুরছে ব্লডগুলো, হঠাৎ অনেকটা নেমে এসে ওদের মাথা ছুঁতে গেল।

টান পড়ায় তরল বরফ থেকে বেরিয়ে এসেছে রানার বুট, ঝল করে সরে এল ও। দাঁড়াল ওরা, ছুটল। পাঁচিলের গায়ে ফাঁকটার কাছে পৌঁছে থামল, পিছন ফিরল। খক খক করে উঠে থেমে গেল ইঞ্জিন। তরল বরফে সঁধিয়ে গেছে ফিউজিলাজ। রোটর এখনও ঘুরছে, তবে গতি কমে আসছে দ্রুত। তারপর হঠাৎ, এক নিমেষে, ডুবে যাওয়ার হুসু আওয়াজ তুলে আর্কটিক সাগরে নেমে গেল সিকোরস্কি। এই ছিল, এই নেই। জায়গাটা উল্টো করা গম্বুজের মত দেখতে হয়েছে, নিচ থেকে বুদ্ধ উঠল একরাশ, তারপর উথলে উঠল তরল বরফ।

'সরকারি সম্পত্তি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল লী রয়, 'রক্ষা করার আপনারা কোন চেষ্টাই করলেন না। এরজন্যে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে...'

লোকটার পাছায় কষে একটা লাথি মারল নিয়াজ, তার পিছনে দড়াম করে আছাড় খেলো বরফে, কোমরে ব্যথা পাবার ভান করে

খানিক কাতরাল, বিনয়ের অবতার সেজে বলল, ‘সত্যি দুঃখিত!’

## সাত

যে-কোন সঙ্কটের পর মানুষের মধ্যে সাধারণত একটা জড়তা আসে, নিয়াজের লাথি সেটাকে আসন গাড়তে দিল না। তার ওপর রানার ব্যস্ত তাগাদা তো আছেই। প্রথম সিকোরস্কি থেকে স্লেজ নামাতে হবে, কুকুরগুলোকে স্লেজের সাথে হারনেস দিয়ে বাঁধতে হবে, এলাকা ছেড়ে কুয়াশার ভেতর ঢুকে পড়তে হবে রাশিয়ান প্লেন এসে পড়ার আগেই।

রানা বলল, ‘পনেরো মিনিটের মধ্যে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যেতে চাই আমরা।’

সকৌতুক হাসি নিয়ে নিয়াজ বোধহয় আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, তার মুখের ওপর দড়াম করে কপ্টারের দরজা বন্ধ করে দিল লী রয়, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রিচার্ড ওয়েন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো স্লেজ টীম জোড়া লাগানো হলো, খোঁচা দিয়ে দাঁড় করানো হলো কুকুরগুলোকে—জুম পেলেই ছুটবে এবার। সিকোরস্কি আকাশ থেকে ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওটা চলে যাবার সাথে সাথেই ভারী কোন বস্তুর মত ওদের তিনজনের ওপর নেমে এল অশরীরী নির্জনতা, উত্তর মেরুর অটুট নিস্তন্ধতা বিস্ফোরণের মত বাজল কানে।

গ্রীনল্যান্ড থেকে একশো মাইল দূরে সম্পূর্ণ একা ওরা। জমাট সাগরে তিনজন মানুষ, আঠারোটা কুকুর, দুটো স্লেজ—সব মিলিয়ে বিশাল বরফ-রাজ্যে পিনের মাথার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওদের

পায়ের নিচে বরফ সম্ভবত বারো ইঞ্চি পুরু, তবে কোথাও কোথাও আধ বা সিকি ইঞ্চি পুরুও নয়। গোটা বরফ-রাজ্য, আর্কটিক, পানির ওপর ভাসছে। দেখে মনে হবে সব কিছুই স্থির হয়ে আছে, কিন্তু আসলে প্রতি মুহূর্তে বরফের সাথে ভেসে চলেছে ওরা। শক্তিশালী গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট গোটা বরফ-রাজ্যকে টেনে নিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে, আইসবার্গ অ্যালির দিকে—প্রতিদিন দশ মাইল গতিতে। বরফের নিচে দশ হাজার ফিট গভীর সাগর। লিডিং টামের দায়িত্ব বিনয়ের কাছ থেকে নিজে নিল রানা, বলল, ‘আর দেরি নয়। কুয়াশার ভেতর না ঢোকা পর্যন্ত নিরাপদ নই আমরা।’

‘আমরা একটু অন্য জাতের মানুষ,’ সামনে থেকে সহাস্যে বলল নিয়াজ। ‘চেষ্টা করছি কত তাড়াতাড়ি নরকে ঢোকা যায়।’

হাসি চেপে রওনা হয়ে গেল রানা। গুরু করাটাই ঝামেলা। চাবুক খেয়েও নড়তে চায় না কুকুর, নির্মম ঠাণ্ডায় উঠতে চায় না নিজেদের পা। নিয়াজ কিছু বাড়িয়ে বলেনি, কালচে কুয়াশা আকাশ থেকে বরফ পর্যন্ত যেভাবে পাঁচিলের মত ঝুলে আছে, দেখে সত্যি গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। এ যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, এরপর কি আছে কেউ জানে না। বাতাস নেই, কিন্তু ঠাণ্ডা যেন অদৃশ্য গরল ঢেলে দিচ্ছে গায়ে। স্থির হয়ে আছে কুয়াশা।

স্থির কুয়াশার ভেতর কি ঘটছে কেউ জানে না। দৃষ্টি চললে দেখা যায় বরফ কোথায় ফাটছে, কোথায় চিড় ধরছে, বা কোথায় দু’পাশের চাপে মাথাচাড়া দিচ্ছে প্রেশার রিজ। কুয়াশার ভেতর সে-সুযোগ নেই। অথচ ভাসমান বরফ কখন যে কি মূর্তি ধারণ করবে কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে, কুয়াশার

ভেতর গোটা স্লেজ টীম অকস্মাৎ ডুবে গেছে আর্কটিক সাগরে। নিমেষে। হয়তো সরাসরি একটা খাদের মধ্যে পড়েছিল, নয়তো ওখানটায় বরফের আবরণ নামমাত্র ছিল কি ছিল না।

কুকুরগুলোর ওপর নির্দয় না হয়ে উপায় থাকল না। কষে বার কয়েক চাবুক মারার পর হাঁটতে শুরু করল ওগুলো। তারপর ছুটল, তবে তার আগে আরও কিছু চাবুকের বাড়ি জুটল কপালে।

দ্বিতীয় স্লেজ চালাচ্ছে বিনয়, সবার কয়েক ফিট সামনে কম্পাস নিয়ে রয়েছে নিয়াজ। ‘এরইমধ্যে নার্ভাস রোগে পেয়েছে এটাকে,’ কম্পাসটা উঁচু করে দেখাল সে। অনেক সমস্যার একটা-দুনিয়ার এই অংশে বেঈমানী করার কুখ্যাতি রয়েছে কম্পাসের।

স্লেজ চালানোটা বছর দুয়েক আগে বিনয়ের কাছ থেকেই শিখেছে রানা, এ-ব্যাপারে বিনয় তার ওস্তাদ। কিন্তু শিষ্যের সাথে তাল বজায় রেখে ছুটতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল বিনয়। হয়তো রানাকে ভয় করছে কুকুরগুলো, কিংবা হয়তো ওগুলো তাকে পছন্দ করছে, কারণটা যাই হোক, ঝড়ের বেগে ছুটছে ডগ-টীম। বিনয়ের কুকুরগুলোর নেতার নাম, ওরই দেয়া, তুফান। প্রকাণ্ড, অসুরের শক্তি রাখে গায়ে, ওটাই বাকি কুকুরগুলোকে পথ দেখিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে হাঁক ছাড়ল, ‘সমস্যা, রানা?’

টীমকে দাঁড় করিয়ে, একদিকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে রানা। ‘চুপ। কি যেন শুনলাম।’

অপেক্ষা করছে সবাই। কুকুরগুলো এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি। কোথাও কিছু নেই, না শব্দ, না

নড়াচড়া-শুধু লক্ষ্য কোটি টন নিস্তব্ধতা চেপে বসছে ওদের ওপর। ফার পারকা আর ফার হুডে বিশাল দৈত্যের মত লাগছে রানাকে, চাঁদের আলোয় অটল একটা মূর্তি। মুখটা পূব দিকে ঘোরানো, খাড়া কান যেন রাডারের খুঁদে ডানা। কুয়াশার পর্দা কাছেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনে, স্থির ঘোঁয়ার মত ঝুলে আছে। আবার শব্দটা শুনতে পেল রানা, অস্পষ্ট রোটরের আওয়াজ বাড়ছে। কাছে চলে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

‘আইলো রে, আইলো!’ নিয়াজের পা যেন বিদ্যুতের গতি পেল, কুয়াশার দিকে খিঁচে দৌড় দিল সে। কেউ হাসল না, নিয়াজের নিজের মুখও শুকিয়ে গেছে। ‘কুয়াশার ভেতর...’

‘ওরা দেখে ফেলার আগে...,’ সপাং করে চাবুক কষে নিয়াজের কথাটা শেষ করল রানা।

বিপদ টের পেয়ে প্রাণপণে ছুটল কুকুরগুলো, ইঞ্জিনের আওয়াজ দ্রুত আরও কাছে চলে এল। আওয়াজটার দিকেই ছুটছে ওরা, ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে কুয়াশার ওপর দিকের শেষ প্রান্তে। কালো পর্দার মাথা থেকে যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে রাশিয়ান হেলিকপ্টার। বিনয়ের লীডার কুকুর তুফান রানার পায়ের গোড়ালি লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে, কিন্তু একবারও স্পর্শ করতে পারছে না, দুটো স্লেজ একই গতিতে ছুটছে। উঁচু-নিচু বরফ, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে স্লেজ থেকে পড়ে যেতে পারে রানা। সেরকম কিছু ঘটলে সাহায্য করবে বলে পিছিয়ে এসেছে নিয়াজ, রানার পাশে থেকে ছুটছে সে। দরকার হলে লাফ দিয়ে স্লেজে উঠে হ্যান্ডেলবার ধরবে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজ, র্যাট-ট্যাট-ট্যাট, একেবারে কাছে

চলে এল। সপাং সপাং চাবুক মারল রানা।

‘পাতলা বরফ!’ হুঙ্কার ছাড়ল নিয়াজ। সাথে সাথে তোবড়ানো বরফের দিক থেকে স্লেজ ঘুরিয়ে নিল রানা। ঢালটাকে পাশ কাটাবার সময় স্বচ্ছ বরফের পাতলা আবরণের নিচে কালচে পানি দেখা গেল। হেলিকপ্টারের আওয়াজ ঘন ঘন ড্রাম পেটানোর মত শোনাল, তারমানে খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ওটা। সামনে পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে বরফের বিস্তৃতি, স্লেজের গায়ে একটা কাঁধ ঠেকিয়ে উল্টে পড়া থেকে বাঁচাল নিয়াজ। বাধাটা না টপকে, ঘুর পথে পেরিয়ে এল বিনয়। কুয়াশার ভেতর ঢোকান মুহূর্তে রানার মনে হলো মাথার ওপর কি যেন দেখল সে। পরমুহূর্তে কালো কুয়াশা গ্রাস করল ওদেরকে। ওদের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল বিনয় আর তার স্লেজ।

ঘন অন্ধকার, আলোহীন রাত। মাত্র কয়েক ফিট দূরের কুকুরগুলোকেও পরিষ্কার দেখা গেল না। হ্যাণ্ডেলবার টেনে ওগুলোকে থামাল রানা। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ও। ইঞ্জিনের আওয়াজ সরাসরি ওপর থেকে আসছে।

‘নিশ্চয়ই রুশ,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘শত্রুবেশে পাকা দোস্তু অতিশয়!’

‘রুটিন পেট্রল হতে পারে,’ বলল বিনয়। ‘এন.পি. সেভেনটিন খুব বেশি দূরে নয়—কপ্টারের জন্যে। আমেরিকানরা কি করছে না করছে দেখার জন্যে প্রায়ই এদিকে আসে বলে শুনেছি।’

আওয়াজটা নড়ছে না, সেই একই জায়াগা থেকে আসছে। ওদের মনে হলো, পাইলট বোধহয় দলটাকে দেখতে পাচ্ছে। অথচ তা সম্ভব নয়।

খানিক পর সরে গেল শব্দটা, কিন্তু আবার ফিরে এল। ‘চক্কর দিচ্ছে ওরা,’ বলল রানা।

‘তবু রুটিন হতে পারে,’ বলল বিনয়। ‘অথবা ইভেনকো রুস্তভকে খুঁজতে বেরিয়েছে।’

ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, অথচ তার কোন দরকার নেই।

‘কিংবা আমাকে,’ শান্ত গলায় বলল রানা।

‘ওটাকে যদি কর্নেল বলটুয়েভ পাঠিয়ে থাকে,’ কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম উল্লাসের সুর ফুটিয়ে তুলে বলল বিনয়, ‘তাহলে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমাকেই খুঁজছে ওরা, রানা। সেক্ষেত্রে আমার বা নিয়াজের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কর্নেলের যত রাগ একা তোমার ওপর।’

‘হ্যাঁচা কথা কইছ, সোনার চান,’ ভেংচি কাটল নিয়াজ। পরমুহূর্তে গম্ভীর দেখাল তাকে। ‘রানাকে যদি স্পেশাল সিকিউরিটি খুন করে, নিশ্চয়ই ওরা কোন সাক্ষী রাখবে না।’

হেসে উঠল বিনয়। ‘তবু ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে, মাত্র দু’চার সেকেন্ড হলেও রানার চেয়ে আমাদের আয়ু বেশি।’

ওদের কথা শুনছে না রানা। ইঞ্জিনের আওয়াজের দিকে মনোযোগ। ‘পনেরোটা সাবমেরিন কিলার...’

এন.পি. সেভেনটিন। ঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ভালুকের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে কর্নেল বলটুয়েভ। চাঁদের আলোয় পথ চিনে শেষ হেলিকপ্টারটা নেমে এল। পেট ফোলা কাকের মত দেখতে একেকটা, সবগুলো এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েত কপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা থেকে এল ওগুলো। প্রত্যেকটা

সাবমেরিন কিলারের ভেতর 'সোনার ডিভাইস' আছে, একজোড়া চাকার ওপর বসানো।

'আমি চাই,' আবার বলল কর্নেল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার আকাশে উঠুক ওগুলো। ইভেনকোকে না পাওয়া পর্যন্ত নামা চলবে না। শুধু রিফুয়েলিং দরকার হলে ফিরে আসবে।'

'কিন্তু, কর্নেল কমরেড, প্রতিটি কপ্টারের জন্যে মাত্র একজন করে পাইলট..., 'জুনায়েত মিনমিন করে শুরু করল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বরফে পা ঠুকল কর্নেল। 'যথেষ্ট।'

'পাইলটদের কি বলব যে মাসুদ রানা...'

'হ্যাঁ, দেখামাত্র। তবে কোন সাক্ষী রাখা চলবে না।'

ত্রিশ মিনিট পর এক এক করে আকাশে উঠে গেল পনেরোটা সাবমেরিন কিলার। কুয়াশার ভেতর ঢোকার সময় গুলোরই একটার আওয়াজ শুনেছিল রানা। ও জানে না, কুয়াশা ভেতর ঢোকার আগের মুহূর্তে টেলিফটো লেপের সাহায্যে ফটো তোলা হয়েছে ওদের।

প্রতি মুহূর্তে জীবন হারাবার ঝুঁকি থাকলেও, কুয়াশার ভেতর প্রথম কয়েক ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। কোন দিকে যাচ্ছে ওরা বোঝার উপায় নেই, অন্য কোন পরিস্থিতিতে দলটাকে থামার নির্দেশ দিত রানা, কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প ফেলে অপেক্ষা করত। কিন্তু বাতাস না থাকায় কুয়াশার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না, তাছাড়া হাতে সময়ও কম। পিছনে দল নিয়ে এগিয়ে চলল রানা, স্নেজের সামনে বেশিরভাগ সময় শুধু সর্দার কুকুরটাকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। ওটা অদৃশ্য হলে সাবধানে সামনে

এগোচ্ছে নিয়াজ, বরফ পরীক্ষা করে সন্ধেত দিচ্ছে রানাকে।

সিকোরস্কি থেকে নামার পর সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তারাগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছিল নিয়াজ, তার হিসেবে যদি মারাত্মক কোন ভুল না থাকে, সিকোরস্কি থেকে মাত্র কয়েক মাইল পূর্বে গেলেই আই.আই.ফাইভে ওদের পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু শীতের সময় আর্কটিকে কোন হিসেবই নিখুঁত হতে পারে না। নিয়াজ যাই বলুক, রানার মনে সন্দেহ থেকেই গেছে।

উদ্বেগ আর উত্তেজনা হঠাৎ করেই দেখা দিল। কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করেছে, নতুন করে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। আচমকা চাঁদের আলো হেসে উঠল, মাথার ওপর থেকে ভেসে সরে যেতে লাগল কুয়াশা। কপ্টারও সেই সাথে কাছে চলে এল। 'হল্ট!' স্নেজের হ্যাভেলবার কষে টেনে ধরল রানা। 'চেষ্টা করো কুকুরগুলো যেন নড়াচড়া না করে। নিয়াজ, হ্যাভেলবার ধরো।' হ্যাভেলবারের সাথে আটকানো কেস থেকে নাইটগ্লাস বের করে স্নেজের কাছ থেকে কয়েক গজ হেঁটে এল ও, মাথার ওপর কুয়াশার পর্দায় বড় একটা গর্ত তৈরি হচ্ছে। এই মুহূর্তে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে চাঁদের আলো রয়েছে আশপাশে। চোখে নাইটগ্লাস তুলল ও। গর্তের কিনারায় দেখা গেল হেলিকপ্টার, খুব নিচ দিয়ে ঝাপসা একটা ফড়িং আকৃতির ছায়া সরে গেল দ্রুত।

খুব কম সময় পেল রানা, রাশিয়ান কিনা চিনতে পারল না। পরমুহূর্তে আরও একটা কপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। এবার তৈরি ছিল ও, আগেরটার মত একই কোর্সে এগিয়ে গেল দ্বিতীয়টাও, জেড-পড আর পাইলটের হেলমেট আবছাভাবে ধরা পড়ল লেন্সে। 'সাবমেরিন কিলার,' স্নেজের কাছে ফিরে এসে



নিয়াজকে বলল ও। ‘দূরে ওদিকে আরও একটা রয়েছে।’

‘অভ্যর্থনা কমিটি আর কি,’ বলল নিয়াজ। ‘কুয়াশার সবগুলো কিনারায় নজর রাখছে।’

‘লক্ষণটা একদিক থেকে শুভই বলতে হয়,’ স্নেজের দায়িত্ব নিয়ে বলল রানা। ‘জেনারেল ফচের ধারণাই ঠিক বোধহয়, ইভেনকো রওনা হয়ে গেছে। একসাথে এতগুলো সোভিয়েত মেশিন এদিকে কখনও আসে বলে শুনি।’

‘শুভ বৈকি,’ কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ মন্তব্য করল, ‘যদি আমাদেরকে খুঁজতে বেরিয়ে থাকে।’

আবার শুরু হলো এগোনো। প্রায়ই মাথার ওপর কাছাকাছি চলে এল হেলিকপ্টার, তবে কুয়াশার পর্দা আবার জোড়া লেগে যাওয়ায় দেখে ফেলার ভয় থাকল না। কুয়াশা না থাকলে বিপদে পড়ত ওরা, কুয়াশা থাকতেও বিপদের ঝুঁকি কম নয়। পায়ের নিচে বরফ ভেঙে গেছে, কোথাও ফুলে উঠে খুদে টিবিবর আকার নিয়েছে, কোথাও ফাটল ধরেছে, আবার কোথাও দেবে গেছে নিচের দিকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হলো এই বুঝি উল্টে গেল স্নেজ। অস্ত্রির হ্যাভেলবারটাকে ধরে রাখতে গিয়ে ব্যথায় টনটন করতে লাগল রানার হাত। একই ভোগান্তির শিকার হলো বিনয়, তবে নিয়াজকে আরও কঠিন পরীক্ষা দিতে হলো। কুয়াশা যখন অন্ধকার রাতের মত গাঢ়, স্নেজের আগে থাকতে হলো তাকে। প্রতিবার সামনে পা ফেলার আগে ইহলোক থেকে বিদায় নিল মনে মনে, ‘হে ডিস্টেক্টর, ভুল আর পাপ যা করেছি সব তুমি মাপ করে দিয়ো...।’ জানে, বরফের আবরণ যেখানে ভেঙে গেছে সেখানে একবার পা পড়লেই দশ হাজার ফিট নিচে গিয়ে থামবে ওর

কঙ্কাল।

সত্যিকার বিপদ হত সময়টা যদি হত গরমকাল। তখন ফ্রিজিং পয়েন্টে বা দু’এক ডিগ্রী ওপর দিকে থাকত টেমপারেচার। বেশিরভাগ জায়গাতেই বরফের কোন আবরণ থাকত না। তারপর যদি এরকম কুয়াশা থাকত, স্নেজ নিয়ে বেরতে হত না—বেরলে পাইকারী আত্মহত্যা হত সেটা। চলতি ফেব্রুয়ারিতে ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে চল্লিশ ডিগ্রী নিচে রয়েছে টেমপারেচার, এক কথায় পৈশাচিক নির্যাতন ভোগ করছে ওরা। লম্বা উলেন আন্ডারঅয়্যার পরে আছে সবাই, ফার দিয়ে কিনারা মোড়া বুটের ভেতর দু’জোড়া করে মোজা, একজোড়া করে উলেন পুলওভার, কিনারায় ফার লাগানো জ্যাকেট, তার ওপর রয়েছে উলফস্কিন পারকা। তবু জমে বরফ হবার মত অবস্থা সবার। হাত আর পায়ে কোন সাড় নেই। ছডের বাইরে মুখের সামান্য যেটুকু বেরিয়ে আছে, অসহ্য ব্যথা।

পাঁচ ঘণ্টা পর প্রথম যাত্রাবিরতি। কুকুরগুলো আটচল্লিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার খায়, শুধু ওরা তিনজন স্নেজে বসেই শুকনো মাংস খেয়ে নিল। ‘মুখরা রমণী—যত দূরেই যাও তুমি, তার ঘ্যানর ঘ্যানর ঠিকই শুনতে পাবে,’ খেতে খেতে মন্তব্য করল নিয়াজ।

রুশ হেলিকপ্টারগুলোর কথা বলছে ও। কখনও কাছে, কখনও দূরে, আওয়াজ আসছেই। ঠিক যেন বেহায়া মাথাব্যথার মত, ছাড়ে না। মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠল বিনয়ের। ‘অনেকক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে একটাই রয়েছে এদিকে,’ বলল সে। ‘ভেঙে পড়ছে না কেন? ফুয়েল শেষ হলেও বাঁচতাম।’

‘উহু,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘এন.পি. সেভেনটিন থেকে ফুয়েল নেবে ওরা।’

‘হ্যারে, বিনয়,’ হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে বলল নিয়াজ। ‘শেষ পর্যন্ত তুই জাত খোয়ালি, আঁয়া?’

বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো বিনয়ের। ‘কেন, কি হয়েছে?’

‘গলায় দড়ি দে, শালা,’ তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল নিয়াজ। ‘না, দাঁড়া, গলায় দড়ি দিলেও বিপদ, কাঠ কই যে তোকে পোড়াব? ঠিক আছে দড়ি নয়, তুই বরং গলায় আঙুল দে।’

উঠে দাঁড়াল বিনয়, ঘুসি বাগিয়ে এগিয়ে এল। ‘কি হয়েছে বলবি, না...?’

‘লে বাবা, ভাল করতে চাইলে ভূতে কিলায়,’ আহত সুরে বলল নিয়াজ। ‘জাত বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তাড়াতাড়ি কর-গলায় আঙুল দিয়ে বমি কর। তুমি বৎস গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছ!’

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়াল বিনয়, তারপর ঝট করে রানার দিকে ফিরল।

রানা গম্ভীর। বলল, ‘ইয়ে, মানে, বমি আসলে নিয়াজেরই করা উচিত।’

বিনয় আর নিয়াজ একযোগে জানতে চাইল, ‘কেন, কেন?’

‘গরুর মাংস নয়, ক্যানে ওটা শুয়োরের মাংস ছিল।’ নির্লিপ্ত দেখাল রানাকে। ‘খুব সম্ভব আমেরিকানরা ইচ্ছে করে শয়তানীটা করেছে। দেখছ না, ক্যানের গায়ে কোন লেবেল নেই, আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।’

বিনয়ের মুখে হাসি আর ধরে না। নিয়াজকে বলল, ‘দুঃখিত, দোস্ত। ব্যাপারটা তোর জন্যে বুঝে রাখো...’

নিয়াজ সে-কথায় কান না দিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল,

‘তারমানে তুমিও হারাম...?’

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রানা। ‘তওবা! ছাগল।’

‘মানে? ছাগলের মাংস খেয়েছ, নাকি গাল দিচ্ছ?’ মুখ বেজার করে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘খেয়েছি।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘স্বাদে আর গন্ধে,’ বলল রানা। ‘দেখোনি, আলাদা একটা ক্যান খুলে খেলাম!’

একসাথে তিনজনই হেসে উঠল ওরা, কারণ খোলা হয়েছিল একটাই ক্যান।

‘চুপ!’ হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা।

ব্যাপারটা আগে থেকেই ঘটছে, কিন্তু হেলিকপ্টারের আওয়াজে শোনা যায়নি। খাওয়া শেষ করার পরপরই নিয়াজের কাছে থেকে কম্পাসটা চেয়ে নিয়েছিল রানা, রসিকতার ফাঁকে কাঁটাটা সিঁধে করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ করেই চক্কর দেয়া বন্ধ করে পুব দিকে চলে গেল কপ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, হাতে কম্পাস, তাকিয়ে আছে দূরে। কোথাও কোন শব্দ নেই, জমাট বেঁধে আছে নিস্তব্ধতা, তবু আর কেউ শুনতে পেল না আওয়াজটা-শুধু রানা বাদে। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ, শুনতে পাবার কথা নয়। মৃদু পানির কলকল।

‘এখনি ফিরে আসব,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘যাই ঘটুক না কেন, কেউ এখান থেকে নড়বে না।’

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল রানা। কি ঘটছে বাকি দু’জন কিছুই জানে না। নড়তে নিষেধ করায় বিনয় মনে করল, রানা ভয় করছে

কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলবে ওরা। ফিরে এসে রানা দেখল স্নেজের পিছনে দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে আছে সে, নির্দেশ পেলেই রওনা হয়ে যাবে। নিয়াজের হাতে কম্পাসটা ধরিয়ে দিল রানা। ‘আপাতত এটা তোমার কোন কাজে আসছে না। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। ছোট একটা বরফের টুকরোর ওপর রয়েছি, আইসফিল্ড থেকে দূরে সরে যাচ্ছে টুকরোটা...’

‘তা কি করে হয়!’ স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল নিয়াজ। ‘বরফ ভাঙলে বোমা ফাটার আওয়াজ হবার কথা!’

‘বোমা ফাটার আওয়াজ হতে হবে তার কোন মানে নেই,’ বলল রানা। ‘তবে আওয়াজ ঠিকই হয়েছে, কন্সটারগুলো যখন কাছাকাছি ছিল—তাই শোনা যায়নি।’ হাত নেড়ে চারদিকটা দেখাল ও। ‘যেদিকেই হাঁটো, ত্রিশ গজ এগোলে পানিতে পড়বে। আমরা পোলার প্যাকে নেই আর—সাগরে রয়েছি।’

সম্ভাব্য বিপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপটা ঘটে গেছে। বিশাল আইসফিল্ড দু’ফাঁক হয়ে গেছে, বরফের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে সাগর, চওড়ায় সেটা কয়েক মাইলও হতে পারে। কখনও বাতাস, আবার কখনও বরফের তলায় বিরতিহীন স্রোত ফটল ধরিয়ে দেয় আইসফিল্ডে। ওদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, উন্মোচিত খালের দু’ভাগের কোন এক ভাগে ছিল না ওরা, ছিল মাঝখানের ছোট্ট একটা বরফ টুকরোর ওপর। খালটা যদি সাগরের সাথে মিশে না থাকে, আগে বা পরে এই ফাঁক আবার জোড়া লাগবে। জোড়া যদি না লাগে, ভাসতে ভাসতে মহাসাগরে গিয়ে পড়বে ওরা, তখন নিঃপ্রাণ কঠিন মূর্তিতে পরিণত হওয়াটাকে ভাগ্যের

একমাত্র লিখন বলে ধরে নিতে হবে।

দু’পাশ থেকে বিশাল আইসফিল্ড জোড়া লাগার জন্যে এগিয়ে আসছে, সেটাই রানার উদ্বেগের কারণ। দুই কিনারা আস্তে-ধীরে এগিয়ে এসে পরস্পরের সাথে মিলবে, ব্যাপারটা সেভাবে ঘটে না। দ্রুতগামী দুটো ট্রেন মুখোমুখি ধাক্কা খেলে যা হয়, তারচেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্কর হবে এই পুনর্মিলন। সংঘর্ষের আওয়াজ বহু মাইল দূর থেকে শোনা যাবে, যেন একসাথে গর্জে উঠবে এক হাজার কামান। ফুলে-ফেঁপে উঠবে বরফ, চোখের পলকে তৈরি হবে গতিশীল প্রেশার রিজ, একেকটা ত্রিশ গজ বা তারও বেশি উঁচু হয়ে উঠবে, তারপর চূড়া থেকে পাথর-বৃষ্টির মত ঝরে পড়বে আলগা বরফের শত সহস্র ভারী চাঁই। আইসফিল্ড যখন জোড়া লাগবে, মাঝখানের টুকরোটার অবস্থা কি হবে? স্রেফ কাগজের মত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে দু’পাশের চাপে। সেজন্যেই ওদেরকে প্রতি মুহূর্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে রানা।

এ-ধরনের প্রাকৃতিক বিপদ ঠেকাবার ক্ষমতা মানুষের নেই, বিপদ এসে পড়লে করারও কারও কিছু থাকে না। তবু দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা কখনোই হতাশায় মুষড়ে পড়ে না, করার কিছু না থাকলেও সতর্ক থেকে বিপদের আকার-আকৃতি চাক্ষুষ করার জন্যে তৈরি হয়। খুদে বরফ টুকরোর দুই কিনারায় পাহারা বসাল রানা, এক প্রান্তে বিনয়কে, আরেক প্রান্তে নিয়াজকে। একটা স্নেজের সাথে দুই প্রস্থ রশি বাঁধা হলো, রশির শেষ প্রান্ত দুটো থাকল নিয়াজ আর বিনয়ের কাছে। আইসফিল্ড কাছে চলে আসছে দেখলে কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ চিনে তাড়াতাড়ি স্নেজের কাছে ফিরে আসতে পারবে ওরা।

দু'জনকে পাহারায় পাঠিয়ে দিয়ে কুকুরগুলোকে খাওয়াতে বসল রানা। ক্যান থেকে মাংস বের করে ছুঁড়ে দিল, শান্তভাবে খেতে শুরু করল ওগুলো। সময় হয়নি, তবু সামনে বিপদ টের পেয়ে আগেভাগে পেট ভরে নিতে আপত্তি করল না কেউ।

খুদে দ্বীপ ওদেরকে বুকে নিয়ে মন্তরগতিতে ভেসে চলেছে। খোলা সাগরের দিকে কিনা জানার উপায় নেই। ওরা যে ভাসছে, বা ভাসতে ভাসতে এগোচ্ছে, সেরকম কোন অনুভূতি হলো না। আজ রাতে বাতাস নেই। তবে জানা কথা স্রোতের টানে সমান গতিতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে টুকরোটা, আই.আই.ফাইভের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে ওরা।

বরফের কিনারায় বসে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে বিনয়। ঘন কুয়াশা, কি ছাই দেখবে। ছয় ফিট, ব্যাস, তার বেশি দৃষ্টি চলে না। চারদিক নিস্তব্ধ, নিরুন্ম। কুয়াশা ভেদ করে আইসফিল্ড আসবে চলমান প্ল্যাটফর্মের মত, একেবারে হঠাৎ করে। কঠিন, ইম্পাতের মত শক্ত হবে তার কিনারা। হয়তো তার আগে আগে আসবে ছোট ছোট কিছু ঢেউ। পানি লাফিয়ে উঠে বুট ছুঁলেই বুঝতে হবে, এসে গেছে।

কুয়াশার সামনে কালো পানি যেন পানি নয়, ভেসে থাকা তেল। ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে টেমপারেচার। প্রতি মুহূর্তে জমে বরফ হয়ে যেতে চাইছে পানি, বরফের নতুন আবরণ সৃষ্টি হতে চাইছে—কিন্তু বাধা দিচ্ছে স্রোতের অব্যাহত ধারা। পিছন দিকে তাকিয়ে ঠোট কামড়াল বিনয়, কালচে বাষ্পের মত কুয়াশা ছাড়া দেখল না কিছু। সন্দেহ হলো, রানা, নিয়াজ, স্লেজ, কুকুর—সব আছে তো? নাকি টুকরোটার ওপর একা ভাসছে

সে? আশ্চর্য নির্জন লাগল পরিবেশটা, গোটা পৃথিবীতে যেন সে একা বেঁচে আছে।

গা শিরশির করে উঠল। কিছুই অসম্ভব নয়। ছোট টুকরোটা হয়তো আবার মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগে সে একা, আরেক ভাগে ওরা। ওদের নতুন টুকরোটা হয়তো আকারে ছোট, স্রোতের টানে দ্রুত এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে তারটা। চিৎকার করে রানাকে ডাকতে ইচ্ছে হলো তার। অনেক কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে। ও ভয় পেয়েছে জানতে পারলে হেসে কুটি কুটি হবে নিয়াজ। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর রানা? দুঃখ পাবে সে। বিনয় মুখার্জি অসমসাহসী যুবক, এ-কথা জানে বলেই এই অভিযানে নিয়েছে সে তাকে। নির্বাচনে ভুল হয়েছে বুঝতে পারলে দুঃখ তো পাবেই।

কাজে মন দিল বিনয়, ভয় তাড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কাজ বলতে কান দুটোকে খাড়া করে রাখা। ওদের এই টুকরোটা যদি ভাঙতে শুরু করে, ক্ষীণ একটু হলেও আওয়াজ হবে। টুকরোটা খুব যদি পাতলা হয়, সে-আওয়াজ নাও শোনা যেতে পারে। মুশকিল হলো, কতটা পাতলা ওরা জানে না। বরফের কিনারায় হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো সে, যেন তৃষ্ণার্ত কোন পশু নদীতে মুখ দিয়ে পানি খেতে চাইছে। কুয়াশার ভেতর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল সে। বুটের ভেতর পা ব্যথা করছে, অসাড় হয়ে গেছে হাত। শুধু মৃত্যুভয় সজাগ রাখছে ওকে।

আওয়াজটা হঠাৎ করেই এল।

কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল বিনয়, উত্তেজনায় ইম্পাত হয়ে গেছে পেশী। সত্যি একা হয়ে গেছে সে। ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে

টুকরোটা। চারদিকের যদিকেই দু'পা এগোবে, ঝপ্ করে পড়তে হবে কালো পানিতে। তিন মিনিটের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ। আতঙ্কিত হয়ে ঝট্ করে ঘুরল সে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল, বাঁচার কোন না কোন উপায় বেরবেই। অন্তত নিয়াজ আর রানা তাকে...

টান পড়ল রশিতে। ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। বরফের টুকরো ভাঙেনি, এখনও ওরা একসাথেই আছে। ধীরে ধীরে নিচু হলো সে, বরফের ওপর বসল। বুটের চাপ লেগে বরফ ভাঙার শব্দ হলো, ঠিক এই শব্দই খানিক আগে শুনেছিল সে। আতঙ্ক কেটে যাওয়ায় দুর্বল আর বোকা লাগল নিজেকে।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক হলো ভেসে চলেছে ওরা। ক্লান্তি লাগছে।

আরও চব্বিশ ঘণ্টা পর জোড়া লাগল আইসফিল্ড।

রানার ঘড়িতে রাত সাড়ে দশটা। টলমল করছে বরফের টুকরো, ঘুরছে-উল্টোমুখী একটা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে। পুব দিকে পাতলা হচ্ছে কুয়াশা। ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল নিয়াজ। 'ওদিকটা যেন পরিষ্কার লাগছে,' হাত তুলে দেখাল সে। 'সৌভাগ্য, তুমি আরেকবার আসিয়া, যাও মোরে হাসাইয়া...', রানার দিকে ফিরল সে। 'রানা, এবার বোধহয় কিছু একটা দেখতে পাব, কি বলো?'

'এখনই দেখতে পাচ্ছি আমি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তীর বলে মনে হচ্ছে।'

শব্দটা নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ঝাপসা রেখা যেটা দেখতে পাচ্ছে, বরফের কিনারা ছাড়া আর কিছু হতে

পারে না। নাকি রেখাটা ওর কল্পনা, দৃষ্টিভ্রম? কুয়াশার দিকে একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নানা ধরনের কৌতুক শুরু করে দেয় দৃষ্টি-গাছপালা, পাহাড়, আরও সব অসম্ভব বস্তু দেখিয়ে তামাশা করে। চোখ বন্ধ করে আবার খুলল রানা। দ্রুত পাতলা হয়ে আসছে কুয়াশা, ফাঁক পেয়ে চাঁদের আলো অনেক নিচে নেমে আসার সুযোগ পাচ্ছে। হ্যাঁ, রেখাটা ঝাপসা হলেও আছে এখনও। কিন্তু ওটা কি স্থির কিছু? স্রোতের ধারা বদলে যাওয়ায় ওরা কি ধীরে ধীরে স্থির আইসফিল্ডের দিকে এগোচ্ছে?

নিয়াজের গলা তিক্ত শোনাগ, 'মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে ওটা।'

পানির ওদিকে সিকি মাইল বা তারও কম দূরে ওটা, সাদা একটা প্ল্যাটফর্ম- দেখতে মহাদেশের কিনারার মত। কিনারার সামনে ছায়া ছায়া ভাঁজ, সম্ভবত ছোট ছোট ঢেউ। পশ্চিম দিকে, ওদের দিকে আসছে। 'নিয়াজ, চোখ রাখো। বিনয়কে বলি আমি।'

রশি ধরেই এগোল রানা, যদিও তার কোন দরকার নেই আর। কুয়াশা যথেষ্ট পাতলা হয়ে এসেছে। খুদে দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাপসা মূর্তির মত দেখা গেল বিনয়কে। দ্বীপের কিনারা থেকে কয়েকশো গজ দৃষ্টি চলে, তারপর আবার ঘন কুয়াশার পর্দা। 'ওদিক থেকে আইসফিল্ড এগিয়ে আসছে, বিনয়।'

'বিপদ?'

'বিপদ। কুকুরগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে, পারলে যেন এখনি লাফ দেয়। তুমি বরং এখানেই থাকো। কিছু যদি ঘটে, ডাক পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।'

কিছু যদি ঘটে...তারমানে, রানার সন্দেহ, একদিক থেকে নয়,

দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে আইসফিল্ড। টুকরোটোর মতিগতি ভাল ঠেকছে না ওর। ধীরে ধীরে ঘুরছে, তারমানে একাধিক স্রোতের পাল্লায় পড়েছে। কুকুরগুলোর সাথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে নিয়াজের কাছে ফিরে এল রানা।

‘চেউগুলো দেখো,’ বলল নিয়াজ।

কাছে চলে আসায় ছায়া ছায়া ভাঁজগুলোকে এখন পরিষ্কার চেউ বলে চেনা যাচ্ছে। এখনও ছোট দেখাচ্ছে ওগুলোকে, তবে ওগুলোর পিছনে যে লক্ষ কোটি টন পোলার প্যাকের ধাক্কা কাজ করছে সেটা পরিষ্কার। আরও পাতলা হয়েছে কুয়াশা, কিন্তু আইসফিল্ডের আরও সামনে দৃষ্টি চলে না। সাদা প্ল্যাটফর্মটাকে গোটা একটা উপকূল মনে হলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বরফের উঁচু পাহাড় আর জমাট প্রেশার রিজ।

‘রানা...!’

বিনয়ের চিৎকারে ঝট করে ঘুরল রানা। একটা, মাত্র একটা চেউ ওদের খুঁদে দ্বীপের কিনারা উপকে উঠে এল। পিছন দিকে, বিনয়ের পায়ের কাছে। আরও সামনে তাকাল রানা-আইসফিল্ডের আরেক চোয়াল এগিয়ে আসছে মৃদুগতিতে। ঠিক এই ভয়ই করেছিল ও। ‘চলে এসো!’ ওর চিৎকার শুনে দৌড় দিল বিনয়। আধ পাক ঘুরে পূর্ব দিকে তাকাল রানা। প্রলয় ঠেকানো সম্ভব নয়, সাথে সাথে উপলব্ধি করল ও। আইসফিল্ডের পশ্চিম চোয়াল প্রথম কামড় বসাবে, তারপরই ওরা পূর্ব চোয়ালের নাগালের মধ্যে পড়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে এক সেকেন্ডও অনেক বেশি সময় এখন। রানা ঠিক করল, পূর্ব দিকের আইসফিল্ডে যেতে পারলে

ভাল হয়। ‘কুকুরগুলোকে সামলাও, নিয়াজ!’ পিছনে একটা শব্দ হলো, ঘাড় ফেরাতেই দেখল চেউগুলো দ্বীপের গায়ে ভাঙছে, কালচে পানিতে ভেসে যাচ্ছে বরফ। বিনয়ের বুট ডুবে গেছে এরইমধ্যে। কাছে পৌঁছবার আগেই ওরা দেখল, কুকুরগুলোর পা ডুবে গেছে, ক্যান্ডারর মত লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে ওগুলো, হারনেস টেনে ধরেও শান্ত করা যাচ্ছে না।

‘পিছনের ফিল্ড ঠেলে নিয়ে যাবে...’, চেষ্টা করে বলল রানা।

নিজের স্নেজের দায়িত্ব নিয়ে কুকুরগুলোকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বিনয়। দ্বিতীয় স্নেজের হ্যান্ডেলবার ধরেছে রানা এক হাতে, আরেক হাতে চাবুক। ওদের চারপাশে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে পানির স্রোত। পায়ের নিচে বরফ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না, মনে হলো সাগরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কুকুরগুলো ভাবল ডুবে যাচ্ছে তারা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটতেও হয়তো তাই যাচ্ছে। নির্ভর করে যে বরফে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেটা কতটুকু পুর, কতটুকু তার সহায়কমতা। পিছন থেকে যে বিশাল বরফ প্রান্তর এগিয়ে আসছে সেটা যদি টুকরোটোর কোন দুর্বল জায়গায় প্রথম ধাক্কাটা মারে, নিমেষে দু'টুকরো বা সহস্র টুকরো হয়ে যেতে পারে। অথবা একপলকে একরাশ পাউডার হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে চারদিকে। পানিতে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার সুযোগও মিলবে না, দুই আইসফিল্ডের চাপে...

পূর্ব চোয়াল এখনও একশো গজ দূরে, চেউগুলো ওদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, এই সময় সংঘর্ষ ঘটল-যাকে বলে রাম ধাক্কা, ওদের নিচে কেঁপে উঠল বরফ। বিকট আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল কুকুরগুলো। তীব্র স্রোত বয়ে গেল খুঁদে দ্বীপের ওপর দিয়ে, নিচু

আর তোবড়ানো জায়গাগুলোয় পানি রেখে গেল। এতক্ষণে অনুভব করল ওরা, বরফের ভেলা ভেসে চলেছে। এক আইসফিল্ড সেটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আরেক আইসফিল্ডের দিকে। ঘাড় ফেরাল রানা, পিছনের এগিয়ে আসা আইসফিল্ডের কিনারা ওদের ভেলার চেয়ে ফিটখানেক বেশি হবে উঁচু, প্রকাণ্ড একটা ধাপের মত। ‘ওদিকের কিনারায়!’ ওর কণ্ঠস্বর বিস্ফোরিত হলো।

নির্দয় হয়ে উঠল বিনয় আর রানা। সপাং সপাং চাবুকের বাড়ি খেয়ে খেপে উঠল কুকুরগুলো। প্রায় উড়ে চলল স্নেজরথ। কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরগুলো। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। উচিত ছিল পিছন থেকে এগিয়ে আসা চোয়ালের দিকে যাওয়া, কিন্তু এখন ভুল সংশোধন করার সময় নেই। পূর্ব দিকের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে ভেলার ওপর, পা ডুবে যাওয়ায় আবার পাগলা হয়ে গেল কুকুরগুলো। বজ্রকঠিন হাতে হ্যান্ডেলবার ধরে থাকল রানা, আরেক হাতে চাবুক উঁচিয়ে ধরেছে। পায়ের চারপাশ থেকে পানি সরেনি, এই সময় ফাঁকটা জোড়া লাগল। স্নেজ দুটো পাশাপাশি রয়েছে। চিৎকার করতে করতে ছুঁড়ের ভেতর ফুলে উঠল ওদের মুখ। বিনয় আর রানার হাতে তীক্ষ্ণ শব্দে লকলকিয়ে উঠল চাবুক। সংঘর্ষের ঠিক আগের মুহূর্তে লাফ দিল কুকুরগুলো। পায়ের নিচে সম্পূর্ণ ডুবে গেল ভেলা, হাঁটুর কাছে উঠে এল পানির স্তর।

প্রলয়ংকরী সংঘর্ষ ঘটানোর আগেই ফাঁকটা পেরিয়ে এল স্নেজ জোড়া। তারপরই শোনা গেল দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরণের আওয়াজ। আইসফিল্ডের কিনারা থেকে বেশ খানিকদূর সমতল বরফ প্রায় মসৃণ, পিছলে ছুটে চলল স্নেজ। বিস্ফোরণের আওয়াজে

কানে তালি লেগে গেছে ওদের, আইস শীটের মুখোমুখি ধাক্কায় প্রেশার রিজ তৈরি হতে দেখল ওরা, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনতে পেল না। ছোট বাড়ি আকারের বরফের অসংখ্য টুকরো সদ্য তৈরি চওড়া পাঁচিলের মাথায় টলমল করছে। রানার পাশে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোট্ট সময় পা পিছলে পড়ল নিয়াজ। তার পিছনে প্রেশার রিজ ধেয়ে এল ছুটন্ত লাভার মত, লাভার সামনে এক দেড়শো মণ ওজনের বরফের চাঁই একের পর এক আছড়ে পড়ছে।

‘রানা...!’ এক নিঃশ্বাসে বলল নিয়াজ, ‘খেমো না...!’ ক্ষীণ, কিন্তু পরিষ্কার, করুণ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

তাকে পড়তে দেখল রানা, হ্যান্ডেলবার আর চাবুক ধরল একহাতে, নিয়াজের বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল খপ করে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়েছে নিয়াজ, নির্দয়ভাবে তার হাত টানল রানা। স্প্রিংয়ের মত খাড়া হলো নিয়াজ, হোঁচট খেতে খেতে স্নেজের সাথে ছুটল আবার। ওদের পিছনে বিশ টন ওজনের বরফের একটা চাঁই পড়ল, ঠিক যেখানে আছাড় খেয়েছিল নিয়াজ। আরও পিছনে, আইসফিল্ড যেখানে জোড়া লেগেছে, বরফের সহস্র চাঁই যেন জ্যাকপট হয়ে উঠে পরস্পরের সাথে বাধিয়ে দিয়েছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

নরম বরফ চিরে ঐক্যবৈক্যে ছুটল ফাটল। রানার স্নেজের পাশে ধস নামল, বিকট চড়চড় শব্দের সাথে তৈরি হতে হতে ছুটল গভীর একটা খাদ, ভেতরে কালচে পানি পারদের মত টলটল করছে। স্নেজের নাক ঘোরাল রানা, পরমুহূর্তে আরও একটা ফাটলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে আবার দিক বদল করতে হলো।

চারদিকে ধ্বংস প্রলয় শুরু হয়ে গেছে, একনাগাড় বোমাবর্ষণের মত আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওদের গলা ফাটানো চিৎকার আর চাবকের সপাং সপাং। হঠাৎ করেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখবোধ করল রানা। চাবকাবার কোন দরকারই নেই, প্রাণের মায়ায় সবটুকু শক্তি নিয়ে ছুটছে কুকুরগুলো। আধ মাইল চলে এল ওরা, সামনে কুয়াশার কিনারা, হাত তুলে সবাইকে থামতে নির্দেশ দিল রানা। কুকুরগুলোর অনুকরণে বেদম হাঁপাচ্ছে ওরা। পারকার ভেতর কাপড়চোপড় চটচট করছে ঘামে। পিছন দিকে তাকাল ওরা। এখনও তাগুবলীলায় মেতে আছে আইসফিল্ড। নিঃপ্রাণ দানবদের লঙ্কাকাণ্ড চলতেই থাকবে এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

‘কারা ওরা!’

ফার মোড়া তিনটে আকৃতি, কুয়াশার ভেতর ঝাপসা দেখালেও মানুষ বলে চিনতে ভুল হয় না। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল, তারপরই স্ক্রীনে শুধু ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই।

এন.পি.সেভেনটিনের একটা ঘরে বসে আকাশ থেকে টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো মুভি ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখছে ওরা। ঘন ঘন পাইপ টানছে কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, কিন্তু অনেক আগেই সেটা নিভে যাওয়ায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

‘আশ্চর্য তো!’ মন্তব্য করল জুনায়েভ।

চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ‘কিছুই বোঝা গেল না,’ বলল সে। ‘কুয়াশার কিনারায় তিনজন মানুষ, একজোড়া ডগ-টীম। রানার দল তাহলে কোথায়? আর্কটিকে অভিযানে বেরলে দলে কম করেও পঞ্চাশ জন লোক, দু’ডজন স্নেজ

থাকবে-কোথায় সে-সব?’ হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল সে। ‘মাথামোটা পাইলটরা ঠিক জায়গায় খোঁজ করেনি।’

থপ থপ পা ফেলে টেবিলে বিছানো ম্যাপের সামনে দাঁড়াল কর্নেল। আর্কটিকের নিচের দিকে মনোযোগ দিল। এলাকার সমস্ত জলযানের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে ম্যাপে-ট্রলার ফ্লীট এম.সিক্সটি-নাইনের ছটা জাহাজ, কপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা, বিশাল রিসার্চ শিপ রিগা, এবং আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট। সবগুলোই সমান গতিতে এগোচ্ছে আইসফিল্ডের দিকে।

ম্যাপের পাশে আই.আই.ফাইভের ব্লো-আপ, আকাশ থেকে তোলা। চার হুগা আগে ধরাবাঁধা কাজের অংশ হিসেবে তোলা হয়েছিল ছবিটা। ‘আই.আই.ফাইভে আমাদের স্যাবোটাজ টীম ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবার কথা, তাই না, জুনায়েভ?’

ঘড়ি দেখল জুনায়েভ, রাত সাড়ে দশটা। তার জানার কথা নয়, ঠিক এই সময় পঁচিশ মাইল পশ্চিমে ফাটল ধরা আইসফিল্ড জোড়া লাগার জন্যে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, মাঝখানে রানা আর তার দল। ‘আমাদের টীম এক ঘণ্টা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে,’ বলল সে। ‘কুয়াশা থাকলেও, রাডারের সাহায্যে আমেরিকান বেস পেয়ে গেছে ওরা।’

‘শুধু কিন্তু র‍্যাম্প নয়, এয়ারস্ট্রিপও,’ বলল কর্নেল। ‘ওটাও একেজো করে দিয়ে আসতে হবে।’

‘সেরকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে ওদের,’ কর্নেলকে আশ্বস্ত করল জুনায়েভ।

‘মনে আছে তো, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট বরদাস্ত করব না আমি!’ চোখ পাকাল কর্নেল।



‘যাই ঘটুক, দেখে মনে হবে অ্যাক্সিডেন্ট-অথবা অ্যাক্সিডেন্টের মিছিল। আশা করছি আর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বাইরের দুনিয়ার সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আই.আই.ফাইভ।’

‘কিন্তু যদি ওদের অয়্যারলেস হাট অক্ষত থাকে?’

‘থাকবে না, কর্নেল কমরেড। ওটাকেও বরফের সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসবে ওরা।’

কিন্তু জুনায়েভের কথা কর্নেলের কানে ঢুকল না। ‘মাসুদ রানা,’ আপন মনে বিভ্রিড় করছে সে, ‘এসেছ যখন, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। কত ধানে কত চাল বুঝবে তখন। তালুতে তোমার মগজ নিয়ে চটকাতে না পারলে আমার শাস্তি নেই।’

‘তুমি বোধহয় ভুল করছ...’

‘পুবদিকে যাব আমরা,’ এবার নিয়ে কথাটা দু’বার নিয়াজকে বলল রানা। ‘তাহলে পৌঁছুতে পারব আই.আই.ফাইভে।’ হাত কাঁপছে, অনেক কষ্টে একটা সিগারেট ধরাল ও। প্রথম টানটাই বিশ্বাস লাগল-সিঁদেল চোরের মত কোথাও ঢুকতে বাকি রাখেনি কুয়াশা, ফুসফুসেও ঢুকেছে। দু’মিনিট ধরে তর্ক চলছে ওদের-কোন দিকে যাওয়া উচিত তাই নিয়ে।

‘বরফের ভেলায় চড়ে অনেক দক্ষিণে সরে এসেছি আমরা,’ নিজের যুক্তিতে এখনও অটল নিয়াজ। ‘নেভিগেটর হিসেবে আমি বলছি...’

‘শুনেছি, কিন্তু তোমার সাথে আমি একমত নই,’ শান্ত সুরে

বলল রানা। ‘সব কিছুই দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে, খুব দ্রুতই বলা চলে। আইসফিল্ড, আই.আই.ফাইভ, এন.পি.সেভেনটিন, আমরা যে ভেলায় ছিলাম-স-ব। প্রত্যেকটা একই গতিতে। কাজেই ভেলা কতটুকু ভাসিয়ে এনেছে, সে হিসেব বাদ দিতে পারো তুমি।’

‘একটা পয়েন্ট পর্যন্ত তোমার কথা ঠিক...’

‘আমার কথা নয়, আমার হিসেব-নির্ভুল। তাছাড়া, নিয়াজ, এখানে কোন পার্লামেন্ট অধিবেশন বসেনি। কাজেই তর্ক বাদ দিতে পারো। এখুনি আমরা রওনা হব, ওই পুব দিকেই।’

যুক্তিতে হেরে গিয়েই হোক, বা নেতার প্রতি সম্মান দেখিয়েই হোক, স্যাণ্ডিট ঠুকে হাসল নিয়াজ। ‘ইয়েস, বস!’

ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা। পায়ের নিচে উঁচু-নিচু বরফ। যখন যে স্লেজ উল্টে পড়ার উপক্রম করে তখন সেটার দিকে ছুটে গিয়ে ঠেক দেয়ার চেষ্টা করল নিয়াজ। কয়েক মিনিট পরই স্থির দাঁড়িয়ে থাকা প্রেশার রিজ পথরোধ করল ওদের। যেন চীনের প্রাচীন, ঘুরে যাবার উপায় নেই। শাবল আর কোদাল হাতে কাজে বাঁপিয়ে পড়ল তিনজন, পাঁচিল ভেঙে পথ তৈরি হলো। হলো বটে, কিন্তু কাজটা সমস্ত শক্তি যেন চুষে বের করে নিল ওদের। তবে কোমরে টনটনে ব্যথা নিয়েও হাসাবার কাজটা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করল নিয়াজ: ‘দাদা তোর পায়ে পড়ি রে, মেলা থেকে বউ এনে দে...’

‘মেলা?’ খেঁকিয়ে উঠল বিনয়। ‘শালার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।’

একদিক থেকেই শুধু ভাগ্যটা ভাল ওদের, এখন পর্যন্ত

হেলিকপ্টারের কোন আওয়াজ পায়নি।

‘মনে হচ্ছে রাশিয়ানরা হাল ছেড়ে দিয়েছে,’ স্লেজ নিয়ে পাঁচিলের ফাঁক গলার সময় বলল বিনয়। ‘কিংবা ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে...’

‘তোরা যে যাই বলিস ভাই, আমার ট্রিপল ফাইভ চাই,’ দ্বিতীয় স্লেজের পাশাপাশি ছুটছে নিয়াজ, বিনয়ের বুকের কাছে হাত পাতল।

ওদের কথা শুনছে না রানা। ভাবছে বাকি রাতের জন্যে এখানেই ক্যাম্প ফেলবে কিনা। সাড়ে এগারোটা বাজে, সবাই ক্লান্ত। নিয়াজের দিকে তাকাল ও। তার হুডের ওপর গগলস, লেসে নিরেট বরফের আবরণ। প্রতিটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেই তুষার হয়ে গিয়ে গ্লাসে জমছে।

মুচকি হেসে বলল রানা, ‘শোবার ভাল একটা জায়গা পেলে আমরা থামব।’

‘শুতে পেলে নিয়াজ বউ চাইবে না তো?’ রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাল বিনয়কে।

নিয়াজ গম্ভীর। ‘রেডিওতে যদি সাড়া পাই, প্রথমেই ওদেরকে বলব রাঙা টুকটুকে একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিক...’

অন্যান্য ইকুইপমেন্টের সাথে স্লেজে একটা রেডিফন জি-আর-থ্রী-ফোর-ফাইভ ট্রানসিভার এবং ডিরেকশন-ফাইন্ডার রয়েছে-পোর্টেবল হাই-ফ্রিকোয়েন্সি সেট, পনেরো ওয়াটের। কার্টিস ফিল্ড তো বটেই, ওটা দিয়ে থিউল-এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারবে ওরা। সিকোরস্কিগুলো ওদেরকে বরফে নামিয়ে ফিরে যাবার পর তিনবার সেটটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে

ওরা, আশা ছিল আই.আই.ফাইভের ট্রান্সমিশন শুনতে পাবে। কিছুই শুনতে পায়নি, আই.আই.ফাইভের যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

যোগাযোগটুকু দরকার শুধু, ডিরেকশন-ফাইন্ডারের সাহায্যে আই.আই.ফাইভকে খুঁজে নেয়া পানির মত সহজ। কিন্তু আই.আই.ফাইভের কোন সাড়া না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা, তবে কাউকে কিছু টের পেতে দিল না। ‘সম্ভবত স্ট্যাটিক-জানে আমরা কিছু শুনতে পাব না তাই ওরা ট্রান্সমিট করার চেষ্টাই করছে না।’ নিয়াজের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাটা দিল ও।

ওদের সামনে, বরফের কাছাকাছি, পাতলা হতে শুরু করেছে কুয়াশা। কিন্তু ওপর দিকে যেমন ঘন ছিল তেমনি আছে। এতক্ষণে আরও সমতল এলাকায় চলে এল ওরা। ক্যাম্প ফেলল এখানেই। পা পিছলে প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কুকুরগুলো, সহ্য ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওগুলো। ‘ফাইভ স্টার হোটেল পাওয়া বোধহয় দুরাশা,’ বলল রানা। ‘চিৎ হতে চাইলে এখানেই, কি...,’

হঠাৎ থেমে গেল রানা, হাতে এখনও হ্যান্ডেলবার, তাকিয়ে আছে সামনে। পাতলা হচ্ছে কুয়াশা, তার ভেতর লাল কি যেন লকলকিয়ে উঠল। এই আছে, এই নেই। চোখ পিট পিট করল ও, জানে, ভুল দেখেনি। এমনভাবে সরল কুয়াশা, কেউ যেন গুটিয়ে টেনে নিল পর্দা। সাথে সাথে লাল শিখা বিক্ষোভিত হলো আবার, ওপরের কুয়াশা ছোঁয় ছোঁয়। ঘোঁয়ার একটা গন্ধ, খুবই অস্পষ্ট। কুকুরগুলোই আগে পেল, পেয়েই লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে।

‘ঘটনাটা কি?’ হাঁ হয়ে গেছে নিয়াজের মুখ।

জবাব না দিয়ে তার হাত থেকে কম্পাসটা একরকম কেড়ে নিল রানা। বিয়ারিং নেয়ার জন্যে ঝুঁকল ও। আবার যখন মুখ তুলল, বিপজ্জনক চেহারার শিখাটা স্নান আভা হয়ে উঠেছে।

‘কি ওটা?’ আবার প্রশ্ন করল নিয়াজ। ‘রানা তুমি কিছু বলছ না কেন?’

‘আই.আই.ফাইভের কথা ভুলে যাও,’ গম্ভীর সুরে বলল রানা। ‘খামার উপায় নেই, চলার মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের। খুব সম্ভব আই.আই.ফাইভ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!’

## আট

‘এ স্যাবোটাজ, কোন ম্যানিয়াকের কাজ!’ রাগে ফুঁসে উঠল বেস লীডার ড. কর্ডন।

ওদেরকে ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে কুয়াশা। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া রেডিও-রুমটাকে শক্তিশালী ল্যাম্পের আলোয় ঘুরে ফিরে দেখছে ওরা। আগুন নিভলেও, ছাইয়ের ভেতর থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া আর পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে—নেভেনি মনের জ্বালা।

‘স্যাবোটাজ বলছেন কেন?’ রাইফেলটা কাঁধে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘আপনারা পৌঁছেই যার সাথে আলাপ করলেন, জেমস কাজম্যান,’ বলল বেস লীডার, ‘সে-ই প্রথম আগুন দেখে ছুটে আসে। তার চিংকার শুনে ছুটে আসি আমি। দেখি, দরজার খানিকটা ছাড়া ঘরের বাকি অংশ দাউ দাউ জ্বলছে। তালার

চারপাশের কাঠ ভাঙা দেখলাম...’

‘তাতেই ধরে নিতে হবে স্যাবোটাজ?’ বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। ‘অনেক কারণে ওটাকে ভাঙা বলে মনে হতে পারে।’ দশ মিনিট আগে এখানে পৌঁছে আই.আই. ফাইভের তিন বিজ্ঞানীকে বরফের ওপর উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও, সেই থেকেই ওদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। স্যাবোটাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

‘প্রমাণ শুধু এই একটাই নয়,’ গম্ভীর সুরে বলল ড. কর্ডন। ‘ঘরের ভেতর তিনটে কোলম্যান স্পেস হিটার ছিল—ওই যে, দল পা কানো মেটাল। ঘর থেকে জেমস শেষবার বেরুবার সময় খাড়া করা ছিল ওগুলো।’

এখন উল্টে রয়েছে কিছুতকিমাকার আকৃতিগুলো। ‘আগুনেরও ধাক্কা আছে, তাতে উল্টে যেতে পারে,’ বলল রানা।

‘ফর গডস সেক, মি. মাসুদ রানা, আপনি কি আমাকে পাগল ঠাউরেছেন?’ বাঁঝের সাথে বলল ড. কর্ডন। ‘আপনিও জানেন কি রকম ভারী ওগুলো, ঝেড়ে লাথি না মারলে নড়ে না।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে—শান্ত হোন,’ বলে ধীর পায়ে সরে এল রানা। আই.আই.ফাইভে বছর দুয়েক আগে একবার এসেছিল ও, কিন্তু কুয়াশায় এখন আর চেনা চেনা লাগছে না। দূর থেকে আগুন জ্বলতে দেখে র্যাম্প না খুঁজে সরাসরি বরফের ওপর দিয়ে বেসে চলে এসেছে ওরা। র্যাম্পের বদলে বিশ ফিট উঁচু একটা ঢালের মাথায় চড়তে হয়েছিল, ঢাল থেকে স্লেজ টীম নিয়ে দ্বীপে নামতে অমানুষিক খাটতে হয়েছে ওদেরকে।

‘কোণে ওই যে তালগোল পাকানো মেটাল দেখছেন, জী,

ওটাই আমাদের ট্র্যাসমিটার ছিল,’ রানার পিছন থেকে বলল ড. কর্ডন। ‘মেইনল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় নেই আমাদের। প্লেন যদি আসে, তবেই আবার সভ্যতার মুখ দেখতে পাব।’

‘তাও দশ দিন পর আসবে বলে শুনেছি,’ বলল রানা। ‘সময়টা এত পিছিয়ে ধরা হয়েছে কেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল ড. কর্ডন। ‘আমারই দোষ। এতটা দক্ষিণে ডেপথ-সাইডিং আর স্যালাইনিটি টেস্টের সুযোগ আগে আমরা পাইনি, ভাবলাম সুযোগটা হাতছাড়া করব না। কে জানত এভাবে হঠাৎ কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যাবে। এখন আবার দেখুন...’

‘কাকে দায়ী করেন আপনি?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘কে আছে এখানে যে...?’

‘আমরা তিনজন, কেউ হতে পারি না।’ কিন্তু এক মুহূর্ত থেমে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ড. কর্ডন। ‘কি জানি!’ রানার দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল সে, ‘কে একজন রাশিয়ান আসবে, তার কি হলো? কে সে?’

‘রুস্তভ, ইভেনকো রুস্তভ।’ ড. কর্ডনের সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স নেই, ভোলেনি রানা। ‘ভদ্রলোক সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। ওয়াশিংটন থেকে ধারণা দেয়া হয়েছে, রুশ রাজনীতির সেট-আপ সম্পর্কে উনি নাকি পরিষ্কার কিছু বলতে পারবেন। কথা আছে এন.পি.সেভেনটিন থেকে এখানে চলে আসবেন তিনি।’

‘সেজন্যেই কি আপনি এখানে?’

‘আমার দায়িত্ব তাঁকে নিয়ে কার্টিস ফিল্ডে ফিরে যাওয়া। সামান্য একটা কাজ।’

হাঁ হয়ে গেল ড. কর্ডন। ‘বরফের ওপর দিয়ে? সামান্য একটা কাজ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি হলে, শুধু কেউ যদি অমরত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আর প্রতিশ্রুতি দিত তাহলেই এই ঝুঁকি নিতে রাজি হতাম।’ কাঁধ ঝাঁকাল সে, দস্তানা পরা হাত দিয়ে ভুরু থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ল সে। ‘নিজের মরণ নিজে বেছে নিয়েছেন,’ নিঃশব্দে হেসে রানাকে পাশ কাটাল। ‘চলুন ওদের কাছে ফেরা যাক।’

‘নিরিবিলিতে আলাপ করতে পারি, শুধু আমি আর আপনি?’

‘রিসার্চ হাট এই তো সামনে।’ অক্ষত ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোল ড. কর্ডন। তার পিছু নিয়ে আবারও মনে হলো রানার, কুয়াশা পাতলা হচ্ছে। ড. কর্ডন ভুল করেনি, রেডিও-রুমে কেউ ইচ্ছে করে আগুন দিয়েছে। কিন্তু উত্তেজনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাছাড়া মুখ বুজে থাকার আরও কারণ আছে। ইভেনকো রুস্তভ যদি পৌঁছুতে পারে এখানে, তাকে একা নিয়ে রওনা হবে ওরা, বিজ্ঞানীদের থেকে যেতে হবে। ড. কর্ডনের ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই, লোকটাকে বেশ ক’বছর ধরে চেনে। কিন্তু জেমস কাজম্যানকে চেনে না। আর ড. রডেনবার্গকে ওর চেনার কোন দরকারই নেই। গ্র্যাভিটি স্পেশালিস্ট লোকটার দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়, যে-কোন মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। ইভেনকোকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর রাশিয়ানরা পৌঁছে চাপ দিলেও বিজ্ঞানীরা কোন তথ্য দিতে পারবে না—যদি না জানে।

‘এখানে মাথা গুঁজতে হবে আপনাকে,’ সারির শেষ ঘরটার তালা খুলে বলল ড. কর্ডন। ‘হিটার আগে থেকেই জ্বালানো

আছে।’

বেসে পৌছেই হেডকোয়ার্টার রুমে ঢুকেছিল রানা, বিশ ফিট লম্বা, পনেরো ফিট চওড়া। এই ঘরটাও তাই। ঘাঁটি ত্যাগ করার প্রস্তুতি শেষ, বোঝা যায় দেয়াল ঘেঁষে থাকা কাঠের বাস্তবগুলো দেখে। এক কোণে বড়সড় একটা লোহার তেপায়া দেখা গেল, মাথায় প্রকাণ্ড উইঞ্চ মেকানিজম। তেপায়াটা দেখিয়ে ড. কর্ডন বলল, ‘সী-বেডে নামাবার জন্যে আভারওয়াটার ক্যামেরা ওটায় বাঁধা হয়। একটাই গর্তের ভেতর ড্রিলিং কোর-ও নামাই আমরা। দেখার শখ আছে?’

প্রশ্নই ওঠে না। রানা কি বিজ্ঞানী? কিন্তু দেখাতে যখন চাইছে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ঝুঁকে পড়ে তেপায়ার নিচ থেকে কাঠের মেঝে খানিকটা সরাল ড. কর্ডন। চার ফুট একটা চৌকো ট্র্যাপ-ডোর। ছ’ফিট নিচে আরেক প্রস্থ মেঝে দেখা গেল। ‘দেখুন, জায়গাটা আপনার পছন্দ হয় কিনা। ইমার্জেন্সি দেখা দিলে কমরেড মহাশয়কে ওখানে আমরা লুকিয়ে রাখতে পারি।’ একটু গম্ভীর হলো সে। ‘স্বীকার করি, খুব ঠাণ্ডা লাগবে তাঁর, কিন্তু এর বেশি কিছু করা...’

হঠাৎ হেসে ফেলল রানা। ‘আসলে কি বলতে চান?’ কি ঘটেছে তা যেন আন্দাজ করতে পারছে ও।

ড. কর্ডন কিন্তু গম্ভীর হয়েই থাকল। ‘জেনারেল ফচ চিঠিতে যা লিখেছেন, আপনিও ঠিক তাই বলছেন, কিন্তু আমার নিজেরও তো কিছু বুদ্ধিভুলি আছে? কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে এসেছেন আপনারা, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে। তারমানেই ইভেনকো রপ্তভ বেড়াতে আসছেন না, পালিয়ে আসছেন। তাঁকে

রিসিভ করার জন্যে এই আয়োজন দেখেই তো বোঝা যায়, সোনা বা হীরের চেয়েও দামী কোন খনি হবেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর পিছু পিছু নির্ঘাত রুশ সিকিউরিটিও আসবে। ঠিক কিনা?’

‘হ্যাঁ, আপনাকে তো আমি বলেছি...’

‘কিন্তু এই একই কারণে আমার রেডিও-রুম স্যাবোটাজ করা হয়েছে তা বলেননি! কাজটা ওরা ইচ্ছে করে করেছে, ওরা এসে পৌঁছুলে আমরা যাতে কার্টিস ফিল্ডের সাথে যোগাযোগ করতে না পারি।’

‘দ্বিতীয় মেঝের নিচে কি আছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘ভাল কথা, গুন্টার রডেনবার্গ আর জেমস কাজম্যান যেন সব কথা না জানে।’

আবার ঝুঁকল ড. কর্ডন, হকের সাথে আটকানো একটা রশি ধরে টান দিল। নিচের মেঝে থেকেও চৌকো একটা তক্তা, ট্র্যাপডোর, সরে গেল। ভেতরে অন্ধকার। ল্যাম্পের সুইচ অন করে আলো ফেলল সে। দ্বিতীয় ট্র্যাপ-ডোরের অনেক নিচে পর্যন্ত আলো গেল, কিন্তু তবু কিছু দেখা গেল না—শ্যাফটটা আরও অনেক গভীর। কটু একটা গন্ধ পেল রানা। শ্যাফটের দেয়ালে বরফ জমে রয়েছে।

‘আরও নিচে বরফ, তারপর আর্কটিক সাগর,’ বলল ড. কর্ডন। ‘লাশ লুকাবার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর পাবেন?’

‘আপনার বুঝি ধারণা, দরকার হলে ইভেনকোকে মেরে ফেলব আমরা, তবু রাশিয়ানদের জানতে দেব না তাকে আমরা ভাগিয়ে এনেছি?’

হেসে ফেলল ড. কর্ডন। ‘স্রেফ একটা জোক, মি. মাসুদ

রানা। তাও টেনশন থেকে রিলিজ পাবার জন্যে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, মেজাজ চড়ে আছে আমার? কারণটা বুঝতে পারবেন, যখন দেখবেন পাশের ঘরে বসে চুরট ফুঁকছেন আপনার ইভেনকো রুম্ভা।’

রুশ ফেরারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের চীফ ওশেনোগ্রাফার, মেরিলিন সিস্টেমের ডিজাইনার এবং স্রষ্টা, ইভেনকো রুম্ভা ঘরের দেয়ালে লাগানো বাংকে শুয়ে বিচ্ছিন্ন শব্দে নাক ডাকছেন। বেরিয়ে আছে শুধু মুখটা, পা থেকে গলা পর্যন্ত কমলে মোড়া। ঘরে ধোঁয়া, চুরটের গন্ধ, চুরটটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে-নিভে গেছে। ঘুমের মধ্যে খক খক করে কাশছেন তিনি, ঘুমন্ত চেহারায় অশান্তি আর উদ্বেগের ছাপ।

‘আপনারা আসার আধ ঘণ্টা আগে পৌঁচেছেন,’ ব্যাখ্যা করল ড. কর্ডন। ‘রেডিও-রুম পুড়ছে, পাশে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি, টলতে টলতে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কমরেড। এই ঘরটাই কাছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে এলাম।’

এক অর্থে বিপরীতে হিত হয়েছে, ভাবল রানা। রাশিয়ানরা রেডিও-রুমে আগুন ধরিয়েছিল বলেই পথ চিনে আই.আই.ফাইভে আসতে পেরেছেন ইভেনকো। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন তিনি, তার মুখের কাছে কান নামাল রানা।

‘সুমাইয়া...।’ স্বপ্নে বোধহয় প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

‘কেমন বুঝছেন ওঁর অবস্থা?’ ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা। ‘এক সময় তো মেডিসিন নিয়ে চর্চা করেছেন।’

‘ফ্রস্টবাইট ততটা মারাত্মক নয়। ওষুধ দিয়েছি। কিন্তু প্রলাপ থামানো যাচ্ছিল না।’

‘ঠোট পুড়ল কিভাবে?’

‘চুরটটা আমিই ধরিয়ে দিই, কিন্তু উল্টো করে ধরে মুখে পুরলেন,’ বিষণ্ণ দেখাল ড. কর্ডনকে। ‘ভয় পাবার কিছু নেই, ঘুম ভাঙার পর আপনার চেহারা দেখলেই আবার উনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।’

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

‘বললাম না, প্রলাপ থামানো যাচ্ছিল না?’ হাসতে লাগল ড. কর্ডন। ‘পরিস্কার ইংরেজিতে বারবার একই কথা বলছিলেন-দ্য হিরো, দ্য গ্রেটেস্ট স্পাই অভ দ্য সেঞ্চুরি, হয়্যার ইজ হি? তারপর বললেন, তাকে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার সামনে হাজির করতে না পারো, আমি ফিরে যাব, সুইসাইড করব। কাজেই বাধ্য হয়ে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম। এমন ভাবে কথা বলছিলেন, তিনি আসবেন আমি যেন জানি।’

‘এলেন কিভাবে?’

‘সম্ভবত স্নেজে চড়ে...’

‘সোজা করে কথা বলুন। সম্ভবত আবার কি?’

‘এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে...’

‘নয়? স্নেজটা যদি কুয়াশার ভেতর কোথাও পড়ে থাকে আর রাশিয়ানরা দেখতে পায়, তাহলে...?’

হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল ড. কর্ডন। ‘দুঃখিত। বললেন, এখানেই কাছাকাছি কোথাও কুকুরগুলো হারিয়ে ফেলেন তিনি। অগত্যা নিজেই স্নেজটাকে টেনে নিয়ে আসছিলেন, অসুস্থ হয়ে

পড়ার সেটাও একটা কারণ। তারপর আগুন দেখে কম্পাস বের করেন, বেয়ারিং নিয়ে হেঁটে চলে আসেন এখানে-স্নেজটাকে ফেলেই।’ রানার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল ড. কর্ডন, খস্ করে দিয়াশলাই জ্বালার আওয়াজে নড়ে উঠলেন ইভেনকো রুস্তভ। ‘আমার ধারণা, ক্লিফের ওদিকে আধ মাইল দূরে স্নেজ পড়ে আছে। ভয়ের ব্যাপার?’

‘খুব একটা নয়। কি করে বুঝলেন উনিই ইভেনকো রুস্তভ?’

‘উনিই বললেন...’

‘এটা কি ওঁর জ্যাকেট?’ বলে টেবিল থেকে জ্যাকেটটা তুলে পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল রানা। ‘যতদূর মনে পড়ে, গতবার এখানে এসে এই ঘরে বাংকটা আমি দেখিনি।’

‘দেখেননি,’ বলল কর্ডন। ‘বলতে পারেন, আজ আমার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ইভেনকো। সবার কাছ থেকে পালিয়ে একা কিছু ভাবতে হলে এখানে চলে আসি আমি। বাংকটা তৈরি করে নিয়েছি, দরকার হলে ঘুমিয়েও নিতে পারি।’

‘আসলে রডেনবার্গের কাছ থেকে পালিয়ে আসার দরকার হয় আপনার, তাই না?’ মানিব্যাগটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে রানা। জিনিসগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখছে।

‘গুণী লোকের বুদ্ধির প্রশংসা করতে নেই, তাতে নাকি তাকে অপমানই করা হয়,’ হাসতে হাসতে বলল ড. কর্ডন। ‘হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন-প্রায় উন্মাদই হয়ে গেছে রডেনবার্গ। কাজম্যানও হচ্ছে, একটু একটু করে। আতঙ্ক জিনিসটা সংক্রামক কিনা। ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র এত খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে কি?’ গলার সুরে একটু যেন অসন্তোষ।

‘আছে। যেমন এই কার্ডটা বলছে উনি ইভেনকো রুস্তভ। মুশকিল হলো, ভদ্রলোকের কোন ছবি আমরা পাইনি আগে। সিকিউরিটি পিছু নিয়েছে, এ-ধরনের কিছু বলেছেন উনি?’

মাথা নাড়ল ড. কর্ডন। ‘আমি জানি না উনি আসছেন, এটা টের পেয়েই বোধহয় আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। ইঞ্জেকশন দিতে একটু জোর খাটাতে হয়েছে।’

ইভেনকোর ভিজে পারকাটা তুলে নিল রানা। স্পেস হিটারের কাছে ছিল ওটা, বরফ গলে গেছে।

‘উনি যে এসেছেন আর কেউ তা জানে না,’ বলল ড. কর্ডন। ‘আমি চাইনি আতঙ্ক আরও বাড়ুক। তাছাড়া, রুশ সিকিউরিটি এলে রডেনবার্গ মুখ বুজে থাকবে বলে বিশ্বাস হয় না।’

‘আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়-থুড়ি!’

দু’জনেই হাসল, নড়ে উঠলেন ইভেনকো।

‘রাশিয়ানরা যদি এসেই পড়ে,’ বলল রানা, ‘আপনার ওই গর্তেই ভদ্রলোককে রাখতে হবে।’

‘জ্যাক্ত মানুষকে?’ প্রতিবাদ জানাল ড. কর্ডন। ‘বললাম না, জোক করেছি? ওখানে ওঁকে রাখলে শ্রেফ আধ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন...’

‘ফার দিয়ে মুড়ে রাখলেও, আর পাশে যদি একটা হিটার ঝুলিয়ে রাখি? কিছুক্ষণের জন্যে, সার্চ করে রাশিয়ানরা চলে গেলে আবার তুলে আনব।’

চাপা গলায় গর্জে উঠল ড. কর্ডন। ‘আমেরিকান বেস সার্চ করবে রুশ সিকিউরিটি?’

‘নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে প্রস্তাবটা আমরাও দিতে পারি,’

বলল রানা। ইভেনকোর পারকার পকেট থেকে লম্বা একটা টিউব বের করল ও। বেশ ভারী, লম্বায় এক ফুট। ‘বিপদের গুরুত্বটা শুধু আপনাকেই বলছি। আই.আই.ফাইভে আটকা পড়ে গেছি আমরা। কোন প্লেন আসছে না। রেডিও-ও নেই। আমরা এখানে যারা আছি হঠাৎ এই মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে গেলে কেউ কোন দিন প্রমাণ করতে পারবে না আসলে কি ঘটেছিল।’

ধীরে ধীরে কাঠের একটা চেয়ারে বসল ড. কর্ডন, বোবা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ‘কে এখন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে?’ জোর করে হাসল সে। ‘আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না...ওদের এত বড় সাহস হবে...?’

‘পরিষ্কার জেনে রাখুন,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা, ‘খুব বেশি সাহসের দরকার নেই, দরকার শুধু খানিকটা নিষ্ঠুরতার। ধরুন, আপনাদের একটা স্লো-ক্যাট এখান থেকে খানিক দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল-ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। কুয়াশা সবে যাবার পর কার্টিস ফিল্ড থেকে উড়ে এসে কি দেখবে ওরা? বেস খালি, রেডিও-রুম ছাই, স্লো-ক্যাট পরিত্যক্ত। কি বুঝবে?’

‘কুয়াশা আসছে দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, রেডিও-রুমে আগুন ধরে যাওয়ায় স্লো-ক্যাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি...’

‘ফুয়েল ফুরিয়ে যায়,’ বলল রানা। ‘কাজেই আপনারা বেসে ফেরার জন্যে হাঁটা ধরেন। এবৎ...’

‘ফেরার পথে কোন ফাটলে পড়ে...’

‘কিংবা কোন মুভিং প্রেশার রিজ আপনাদের গিলে নেয়।’

‘কিন্তু সেটা হবে পাইকারী হত্যাকাণ্ড!’ প্রতিবাদ জানাল ড. কর্ডন। ‘রাশিয়ানরা...’

‘যোগফলটা কি হতে পারে তাই শুধু কল্পনায় রাখতে বললাম,’ বলল রানা। ‘কি ঘটবে সেটা পরের কথা। কারা আসছে সেটা ভুলে যাবেন না। কে.জি.বি. হলে তবু কথা ছিল, কিন্তু এ যে বলটুর পোষা কুকুর-এস.এস.এস.।’

‘আমরা যাচ্ছি কখন?’

হেডকোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকের একটা ঘরে কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখছে নিয়াজ। ঘরের তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটার ওপর একটা কাঠের বাস্ক, সবগুলোয় জিনিস-পত্র ভরে তালা মেয়ে দেয়া হয়েছে। বেস ত্যাগ করার প্রস্তুতি প্রায় শেষ, বেশিরভাগ ঘর খালি পড়ে আছে। অথচ ওদেরকে নিতে প্লেন আসবে দশ দিন পর।

‘ইভেনকো আগে সুস্থ হোন,’ বলল রানা। ‘ইমার্জেন্সি দেখা দিলে আলাদা কথা।’

স্পেস হিটারটা অ্যাডজাস্ট করছে নিয়াজ, মুখ তুলে তাকাল। ‘ইমার্জেন্সি মানে? স্পেশাল সিকিউরিটি?’

‘এরই মধ্যে একবার এসে গেছে ওরা। বোধহয় ফিরেও যায়নি, কাছে পিঠে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।’ এক সেকেন্ড ভাবল রানা। ‘এখানের কাজ শেষ করে আমাদের ট্রান্সমিটারটা বের করো। কার্টিস ফিল্ডে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার। ওদের বলো, আই.আই. ফাইভের রেডিও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। স্যাবোটাজ-শব্দটা কয়েকবার রিপটি করবে। আর কিছু না। সাথে সাথে প্যাক করে রেখে দেবে ট্রান্সমিটার।’

‘মেসেজ রিসিভ করল কিনা শুনবও না?’



‘মেসেজটা কার্টিস ফিল্ডের জন্যে নয়,’ বলল রানা।  
‘এন.পি.সেভেনটিনের মনিটরিং সেটে রাশিয়ানরা রিসিভ করবে ওটা।’

‘রহস্যময়। জানতে পারি...?’

‘পরে। কাজটা শেষ করে ঘরটা পাহারা দিতে চাও, বিনয়কে সাথে রাখো।’ কোন্ ঘরটা তা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করল না। ‘বিপদ দেখলে, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করবে। পালা করে পাহারা দেবে তোমরা, একজন ঘুমাবে।’

‘ঘুম শুধু বুঝি আমাদেরই দরকার?’

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে হিম রাতে বেরিয়ে এল রানা, দরজা বন্ধ করার সময় শক্ত হয়ে উঠল মুখের চেহারা। দু’সারি ঘরের মাঝখানে প্রায় সমতল বরফ-পথ, মাত্র ছ’ফিট চওড়া। কুয়াশা আবার ঘন হয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে গাঢ় হচ্ছে আরও। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল ও। কাছাকাছি কোথাও থেকে জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। দূর থেকে আরও একটা শব্দ আসছে, দ্বীপটাকে ঘিরে পোলার প্যাকের আক্ষালন।

বরফ-রাজ্যের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত যখন দ্বীপটা ভাঙবে, কলমা পড়ার সময়ও পাওয়া যাবে না। পলকের মধ্যে লম্বা লম্বা চিড় ধরবে বরফে, নিমেষে সেগুলো চওড়া ফাটলে পরিণত হবে। অথবা, এমনও হতে পারে, মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা দ্বীপ বিস্ফোরিত হবে, বরফের কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে।

দ্বীপের নিরাপত্তা নয়, এই মুহূর্তে রানার উদ্বেগ: কুয়াশার ভেতর কি নড়াচড়া করছে। পাহাড়টা দেখা যায় না, কিন্তু আছে, সেদিকে তাকাল রানা। চল্লিশ ফিট উঁচু, গায়ে বড় বড় বোল্ডার।

সবচেয়ে কাছের উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে সাগরে ভাসছে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা, ব্যথা করছে চোখ। নিয়াজ মিথ্যে বলেনি, ওর-ও ঘুম দরকার। পথটুকু পেরিয়ে হেডকোয়ার্টার হাটের দরজায় নক করল ও। পারকা পরে বেরিয়ে এল বিনয়।

ইভেনকোর উপস্থিতি সম্পর্কে শ্রেফ শুনে গেল বিনয়, কোন মন্তব্য করল না। হাতের রাইফেল কাঁধে ঝোলাবার সময় শুধু বলল, ‘রডেনবার্গ আত্মহত্যা করলে খুশি হতাম। একটা আপদ।’

হেডকোয়ার্টারের ভেতর ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। ড. কর্ডনের সাথে মারমুখো হয়ে ঝগড়া করছে রডেনবার্গ। ‘রেডিও নেই, প্লেন আসছে না, দ্বীপটা ভাঙছে—অর্থাৎ আমরা মারা যাচ্ছি। কেন তাহলে এখানে অপেক্ষা করব আমরা? প্রাণের ওপর তোমার মায়া না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। কেউ যদি না যায়, আমি একাই বেরিয়ে পড়ব...’

নিচের একটা বাংকে শুয়ে রয়েছে জেমস্ কাজম্যান, রডেনবার্গের দিকে তাকিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠি চিবাচ্ছে। বুকে হাত বেঁধে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ড. কর্ডন।

থোঃ করে থুথু ফেলে ধমকে উঠল কাজম্যান, ‘ঈশ্বরের দোহাই, একটু ঘুমাও রডেনবার্গ।’ রডেনবার্গের পিছন থেকে তার একটা হাত ধরে বাংকের দিকে টানল অয়্যারলেস অপারেটর। ‘অন্তত এই ভদ্রলোকের সম্মানে ঝগড়া ঝাঁটি...’

বাটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে প্রায় ছুটে রানার সামনে এসে দাঁড়াল রডেনবার্গ, চিৎকার করে জানতে চাইল, ‘এই যে ভদ্রলোক, আপনারা এখানে কি মনে করে এসেছেন, জানতে পারি?’

‘আগেই তো বলেছি,’ শান্ত সুরে জবাব দিল রানা। ‘আমাদের হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করায়...’

‘মিথ্যে কথা! আমি বিশ্বাস করি না!’

এক পাশে সরে রাইফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল রানা। তারপর পারকা খুলে টেবিলের ওপর রেখে বলল, ‘তুমি মদ খেয়েছ, তাই না?’ গন্ধটা ঘরে ঢুকেই পেয়েছে ও।

‘ঈশ্বর জানেন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বোতলটা,’ বলল ড. কর্ডন। ‘কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি...’

‘কোথায় আবার, যেখানে ও হাত লাগাতে দেবে না,’ বলল রানা। ‘ওর গায়ে।’

হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে একটা শাবল তুলে মাথার ওপর উঁচু করল রডেনবার্গ। ‘কেউ আমাকে সার্চ করতে এলে আমি তার...’

‘নামাও ওটা!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ করল ড. কর্ডন।

‘শালার ভেতো বাঙালী আমার ওপর মাতব্বরী ফলাতে চায়!’ হিস হিস করে উঠল রডেনবার্গ। ‘দেখো না কেমন হলুদ মগজ বের করে দিই...’

সাবধান করে দিল রানা, ‘জেমস, নড়বে না। ওর যা খুশি করতে দাও।’ পারকাটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ‘আমি কোন গোলমাল চাই না, ড. কর্ডন। অন্য কোন ঘরে থাকব আমি।’ পারকাটা পরতে শুরু করল ও। ঠিক এই সময় ওর মাথা লক্ষ্য করে শাবলটা নামিয়ে আনল রডেনবার্গ।

একপাশে সরে গিয়ে পারকা দিয়ে রডেনবার্গের মুখ আর মাথা ঢেকে দিল রানা। শাবলটা রানার মাথায় না লাগায় তাল হারিয়ে

পড়ে যাচ্ছিল রডেনবার্গ, তাকে ধরে সিঁধে করল রানা। তারপর ডানহাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল তার পেটে। কৌঁক করে আওয়াজ হলো, বসে পড়ল রডেনবার্গ। তার মাথা থেকে পারকা খুলে নিল রানা। গ্র্যাভিটি স্পেশালিস্ট শুয়ে পড়ল, জ্ঞান হারিয়েছে।

কেউ কোন কথা বলল না। এগিয়ে এসে রডেনবার্গকে সার্চ করল ড. কর্ডন। সত্যিই পারকার ভেতরের পকেট থেকে মদের একটা প্রায়-খালি বোতল বেরুল। তার পালস পরীক্ষা করল সে। ‘প্রচুর গিলেছে, ঘণ্টা কয়েকের আগে জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না।’

‘অন্য কোন ঘরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?’

‘পাশের ঘরে দুটো বাংক আছে...’

‘ওখানেই তাহলে,’ বলল রানা। ‘বেঁধে রাখবেন।’

চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল ড. কর্ডন। ‘বেঁধে?’

‘বেঁধে।’ শাবলটা মেঝে থেকে তুলল রানা। ‘যে লোক কোন কারণ ছাড়াই এটা দিয়ে মারতে আসে, তাকে না বেঁধে উপায় কি? ঘরটায় বাইরে থেকে তালাও লাগাতে হবে।’ বাংক থেকে নেমে এগিয়ে এল কাজম্যান, অচেতন রডেনবার্গকে কাঁধে তুলতে শুরু করল। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল ড. কর্ডন, তাকে বাধা দিল রানা, ‘তালা লাগাতে বলছি, কারণ আছে।’ এগিয়ে গিয়ে লম্বা কাবার্ডের সামনে দাঁড়াল ও। হাত উঁচু করে কাবার্ডের মাথা থেকে মদের আরও একটা বোতল নামাল। ‘আমি আপনার চেয়ে লম্বা, তাই ঘরে ঢুকেই এটা দেখেছিলাম। দু’একটা বোতল আরও কোথাও থাকতে পারে।’

রানার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ড.

কর্ডন। ‘আশ্চর্য! এগুলো পেল কোথায়!’ লেবেলেই লেখা রয়েছে, রাশিয়ান ভদকা। ‘ড. সোরভের কাছ থেকে পেতে পারে না, তিনি হার্মলেস-এন.পি.সেভেনটিনের চার্জে আছেন ভদ্রলোক। আমরা কেমন আছি দেখার জন্যে মাঝে মধ্যে আসেন এখানে...’

‘আসেন তথ্য সংগ্রহের জন্যে,’ কঠিন সুরে বলল রানা। ‘ভদকার বিনিময়ে। রডেনবার্গকে সাধু মনে করার কোন কারণ নেই। এবার নিশ্চয়ই ওর ঘরে তালা লাগাতে আপত্তি করবেন না, ড. কর্ডন?’

‘মেসেজটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে,’ জেনারেল ফচ পায়চারি করতে করতে বললেন, ‘সংকট দানা বাঁধছে, টমাস। কাজেই আই.আই. ফাইভে আমি একটা প্লেন পাঠাচ্ছি।’

‘কিন্তু কুয়াশা এখনও সরেনি,’ প্রতিবাদ জানাল টমাস। ‘পাইলট ল্যান্ড করবে কিভাবে?’

‘পাঁচবার স্যাবোটাজ শব্দটা ব্যবহার করেছে ওরা,’ কটমট করে সহকারীর দিকে তাকালেন জেনারেল। ‘রেডিও-রুম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।’ খোসা ছাড়ানো রসুনের কোয়া না গিলে চিবাতে শুরু করলেন তিনি। ‘প্লেন তৈরি হয়ে আছে, বললেই টেক-অফ করবে। ম্যাট ইসটনকে পাঠাচ্ছি আমি।’

‘কিন্তু ল্যান্ড করবে কিভাবে?’

‘জানি না। শুধু জানি, কেউ যদি ল্যান্ড করতে পারে তো সে ইসটন। আর্কটিকের বিভিন্ন এলাকায় আই.আই.ফাইভে পাঁচবার ল্যান্ড করেছে সে। হাজার মাইলের মধ্যে তার চেয়ে দক্ষ সিভিলিয়ান পাইলট আর নেই। আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও

তাকে।’

‘আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না,’ বলে ফোনের রিসিভার তুলে নিল টমাস। এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলারের সাথে কথা বলবে।

‘ইসটনেরও হবে না,’ গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল ফচ।

‘মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি,’ ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল নিয়াজ। চারদিকে তাকাল সে। ‘কোথায় সবাই?’

‘রডেনবার্গকে শোয়াতে গেছে।’ কি ঘটেছে সব নিয়াজকে শোনালা রানা। ‘কেউ বোধহয় ধরতে পারেনি, আমাকে যাতে মারতে আসে সেজন্যে ইচ্ছে করেই খোঁচাই ওকে। বিপদের সময় উটকো বামেলা চাই না।’

‘তুমি ভাবছ রাশিয়ানরা আসবে?’ টেবিলের ওপর রানার পারকার ওপর নিজেরটা রাখল নিয়াজ। ‘বাইরে শালার বজ্জাতটা বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে মনে হলো।’ ঠাণ্ডাকে গাল পাড়ল সে। ‘খানিকপরই বিনয়কে রেহাই দিতে যাব।’

‘ভাবছি না, জানি,’ বলল রানা। ‘প্রশ্ন হলো আমরা চলে যাবার আগে না পরে আসবে? যদি আগে হয়, সব ফাঁস করে দেয়ার জন্যে দুর্বল একটা বোন থাকুক, চাই না।’ ইঙ্গিতে ভদকার বোতল দুটো দেখাল ও। ‘মদের বিনিময়ে আগে থেকেই তথ্য পাচার করে আসছে সে। রেডিও-রুমের কথা তার কাছ থেকেই জেনেছে ওরা।’

‘রেডিও-রুমের কথা কারও কাছ থেকে জানতে হবে কেন? আকাশ-ছোঁয়া মাস্ট থাকতে?’

ফ্লাস্ক থেকে দুটো কাপে কফি ঢালল রানা। ‘রেডিও-রুমে কেউ শোয় না, এই তথ্য? কোন কোন বেসের রেডিও-রুমে

অপারেটরের জন্যে একটা বাংক থাকে, এখানে তার দরকার হয়নি। শুধু ট্রান্সমিটার ব্যবহার করবার দরকার পড়লে ওখানে যেত জেমস।’ রানার হাত থেকে ধূমায়িত কফির কাপটা নিল নিয়াজ। টেবিলের ওপর পাশাপাশি লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা টিউব জোড়া নিয়াজকে দেখাল রানা। ‘চিনতে পারো?’

‘ওগুলোর একেকটার ভেতর পঁচিশ হাজার বছরের ইতিহাস পোরা আছে।’ একটা টিউব তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখাল নিয়াজ। ‘ভাবতে আশ্চর্যই লাগে, ড্রিলের শেষ মাথায় আটকে দিয়ে এগুলোর ফাঁপা একটা দশ হাজার ফিট নিচে সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়া হয়, উঠে আসে সী-কোর নমুনা নিয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে মহাসাগরের ভীষণ চাপে জিয়োলজিক্যাল স্তর তৈরি হয়েছে। পঁচিশ হাজার বছর ধরে, অথচ তোমার পকেটে ভরে রাখতে পারো।’

‘কৃতিত্বটা ইভেনকো রপ্তভের। দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি ধরতে পারো?’

দ্বিতীয় টিউবটাও পরীক্ষা করল নিয়াজ। দুটোর গায়েই মরচে ধরেছে। কোনটাই ফাঁপা নয়, ভেতরে কোর রয়েছে। ‘শুধুই অতল তল থেকে তুলে আনা শাঁস,’ একটা বাক্সের ওপর ড. কর্ডনের সাজানো টিউবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, ‘ওগুলোয় যা আছে, তাই।’

‘দুটোর মধ্যে একটা ইভেনকোর,’ নিয়াজের হাত থেকে দ্বিতীয় টিউবটা নিয়ে বলল রানা। টিউবের একটা প্রান্ত পেন-নাইফ দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল। তিন ইঞ্চি লম্বা নিরেট একটা কোরের টুকরো পড়ল তালুতে। টিউবটা ঝাঁকাতে শুরু করল ও, অপরপ্রান্তের কোর

তাতে পড়ল না, যেমন ছিল তেমনি থাকল। কিছুক্ষণ ঝাঁকাবার পর হঠাৎ করেই রানার তালুতে চকচকে এবং শক্ত করে গোল পাকানো কি যেন পড়ল আবার। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। জিনিসটা নিয়াজের চোখের সামনে, আলোর কাছাকাছি ধরল ও। থারটি-ফাইভ মিলিমিটার ফিল্মের একটা অংশ। ‘যদি ভুল না হয়, আমার হাতে মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম দেখছ তুমি, নিয়াজ।’

‘হরিবল!’

‘আর্কটিকে রাশিয়ানদের গোটা আন্ডারওয়াটার সিস্টেমের রেকর্ড, নিয়াজ।’ ফিল্মটা আবার গুটিয়ে নিল রানা। টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে কোর দিয়ে বন্ধ করে দিল মুখ। ‘যদিও,’ গলা খাদে নামিয়ে বলল ও, ‘এটা নকল বলেই আমার ধারণা। রাশিয়ানরা জানে মেরিলিন চার্ট নিয়ে পালিয়ে আসবে ইভেনকো, নিশ্চয়ই আসলটা নিয়ে আসতে দেয়নি।’

‘কিন্তু আমেরিকান বন্ধুরা এ-সব কথা জানে না,’ বলল নিয়াজ। ‘এটাকেই তারা আসল বলে ধরে নেবে। কাজেই জিনিসটা আমাদের কাছে লুকানো থাকাই ভাল।’

‘কে.জি.বি-র ওপর খুব একটা আস্থা আমার নেই,’ অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। ‘ধরো, ইভেনকো নিজের ইচ্ছায় এসেছেন। সেক্ষেত্রে কে.জি.বি. বা স্পেশাল সিকিউরিটি নকল মেরিলিন চার্ট চুরি করতে দেবে ইভেনকোকে। কিন্তু যদি এমন হয়, সে ব্যবস্থা কোন কারণে করা হয়নি? যদি এমন হয়, আসল চার্টই আনতে পেরেছেন ইভেনকো?’

‘রানা, তুমি কি ওটা এখনি নষ্ট করে ফেলতে চাইছ?’

‘দূর বোকা!’ হাসল রানা। ‘নষ্ট করা মানে নিজেদের বিপদ

ডেকে আনা। আমেরিকানদের বুঝ দেব কি দিয়ে?’ গলা আরও খাদে নামাল রানা, ‘পাহারায় থাকছি আমি। ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ?’

‘পারকার পকেটে।’

‘তাড়াতাড়ি সারবে,’ বলে দরজার দিকে এগোল রানা। ‘একটা কপি আমাদের কাছেও থাকুক। কেউ আসছে দেখলে নক করব।’ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা, তার আগেই কাজে হাত দিয়েছে নিয়াজ।

কাজটা মাত্র শেষ করেছে নিয়াজ, বিস্ফোরিত হলো দরজা। ঘরে ঢুকল বিনয়। ‘রাশিয়ানরা পৌঁছে গেছে! ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি আমি!’

## নয়

এন.পি.সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে কুয়াশার কিনারায় ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার। একটা স্নো-ক্যাট অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ে বসল কর্নেল বলটুয়েভ। স্নো-ক্যাটের ড্র্যাকগুলো দেখতে অদ্ভুত, আর্কটিকে অল্প দূরত্ব পেরোবার কাজে ব্যবহার করা হয়। চারটে ক্যাটারপিলার ড্র্যাক, সামনের দুটোর ওপর বসানো আছে ড্রাইভারের ক্যাব। বাকি দুটো ড্র্যাকের পিছনের অংশের ভার বহন করছে।

‘একটার দিকে আই.আই.ফাইভে পৌঁছুব আমরা, কমরেড

কর্নেল,’ বলটুয়েভের পাশের সীটে বসতে বসতে বলল জুনায়েভ। তার ঘাড়েই স্নো-ক্যাট চালাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে।

‘আমাদের হিসেব বলে প্রায় ওই একই সময়ে ইভেনকো বেঙ্গমানটাও পৌঁছবে ওখানে।’

কুয়াশা সত্ত্বেও আই.আই.ফাইভকে খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না। সিকিউরিটি ডিটাচমেন্ট আগেই রওনা হয়ে গেছে। আই.আই.ফাইভের পিছনে, পাথুরে পাহাড়ের মাথায় একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস রোপণ করে রেখেছে তারা, ডিভাইসের অপর অংশটা রয়েছে জুনায়েভের সামনে। সেটার ওপর চোখ রেখে সোজা স্নো-ক্যাট চালাচ্ছে সে। পথ ভুল করার কোন উপায় নেই, সোজা আই.আই.ফাইভে পৌঁছে যাবে দলটা। অসুবিধে শুধু একটাই, হৃদয়হীন ঠাণ্ডা। জুনায়েভ তো কাঁপছেই, পিছনে বসা লোক দশজনও হি হি করছে। কিন্তু ঠাণ্ডাকে যার সবচেয়ে ভয়, ঘরের ভেতর সব সময় যে হিটার বা স্টোভ জ্বলে রাখে, সেই কর্নেল বলটুয়েভ সবাইকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিল। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। ভাবটা, দেখো, ঠাণ্ডা আমাকে এতটুকু কাবু করতে পারেনি। ঠাণ্ডা তাকে কাবু করতে পারছে না, এর চেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হলো তার হাসি। জুনায়েভের অভিজ্ঞতা বলে, সাপের পা সে দেখে থাকলেও দেখতে পারে, কিন্তু কর্নেলের হাসি দেখছে এই প্রথম।

আরও আশ্চর্য, প্রায় প্রতি মুহূর্তে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছে সারা মুখে। কর্নেল নিজে স্বীকার না করলে কারও বোঝারও উপায় নেই যে সে আসলে ঠাণ্ডার থাবা থেকে বাঁচার জন্যে এই কৌশলটা বেছে নিয়েছে। বেদম হাসলে গা গরম থাকে, কোথায় যেন শুনেছে

সে। এক টিলে দুটো পাখি মারছে কর্নেল। গা তো গরম রাখছেই, সেই সাথে চোখে আঙুল দিয়ে জুনায়েভকে দেখিয়ে দিচ্ছে—শীত আমার কাছে নস্যি।

স্লো-র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল ওরা, ওটা ব্যবহার করলে স্লো-ক্যাট নিয়ে সরাসরি আই.আই.ফাইভে উঠতে পারত। স্লো-ক্যাট পোলার প্যাকে রাখল ওরা, বাকি পথটুকু এগোল পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের পিছনে পৌঁছে থামল দলটা। ক্লাইমিং ইকুইপমেন্ট সাথেই আছে, চুড়ায় উঠতে অসুবিধে হলো না। পাহাড়ের মাথায় উঠে কম্পাস ব্যবহার করল জুনায়েভ, দেখে নিল কোন দিকে উত্তর।

হোল্ডারের মাঝখান দিয়ে নেমে এল ওরা। খানিক দূর হেঁটে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কর্নেল। ‘কোথাও ভুল হয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন?’

ভুল অবশ্যই হয়েছে। শেষবার আকাশ থেকে আই.আই.ফাইভের ফটো তোলার পর দ্বীপটা কয়েক ডিগ্রী ঘুরে গেছে। তবে ভাগ্য ভাল ওদের, খানিক খোঁজাখুঁজি করতেই আই.আই.ফাইভের ঘরগুলো দৃষ্টিগোচর হলো।

হেডকোয়ার্টার হাটের সামনে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল, সেটা দেখেই টলতে টলতে এগিয়ে এল ওরা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে হাতুড়ি পেটার মত আওয়াজ করল কর্নেল দরজায়। সেই সাথে হেঁড়ে গলায়, ইংরেজীতে, হুঙ্কার ছাড়ল, ‘গেস্ট!’

কেউ দরজা খুলবে তার সময় দিল না কর্নেল, নিজেই ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। ঘরের ভেতর আলোটা আরও বেশি উজ্জ্বল, কুয়াশা থেকে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কপালে হাত তুলে চোখে

ছায়া ফেলল সে। তিনজন লোক রয়েছে ঘরে, তাই থাকার কথা। বাংকে বসে রাইফেল পরীক্ষার করছে একজন, মাজ্‌ল্টা দরজার দিকে তাক করা। দরজার পাশে আরেকজন, তার এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে হেঁড়া কম্বলের টুকরো। বয়স্ক আরেকজন লোক টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো বুকে বাঁধা, খাড়া শিরদাঁড়া।

‘টোকার ইচ্ছে থাকলে তাড়াতাড়ি,’ রাইফেল পরীক্ষার করতে করতে বলল রানা। ‘তা না হলে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিন।’ রাইফেলের মাজ্‌ল্ কর্নেলের বুকের দিকে উঠল। ‘না!’ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল রানা। ‘শুধু আপনি একা-বাকি সবাই বাইরে অপেক্ষা করবে।’

কর্নেলের পিছনে ফার মোড়া আরও লোক রয়েছে, প্রত্যেকে তার চেয়ে অন্তত এক ফুট ছোট। লোকগুলো নড়েচড়ে উঠল, ভেতরে একা ঢুকল কর্নেল। একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ‘এন.পি. সেভেনটিন থেকে আসছি আমরা...’

‘দরজাটা বন্ধ করতে বলেছি আমি,’ শান্ত কণ্ঠে কর্নেলকে বাধা দিল রানা।

‘ড. জুনায়েভকে এখানে আপনাদের দরকার হবে,’ বলল কর্নেল। রানাকে দেখে ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে তার চোখ। ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে আপনাদের সাবধান করতে চায় সে।’

‘ঠিক আছে, জুনায়েভ আসতে পারে। আর কেউ নয়।’

‘কিন্তু বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা...,’ শুরু করল কর্নেল।

‘কেউ আপনাদের দাওয়াত দেয়নি।’

রাগের মাথায় নয়, বুদ্ধির ওপর ভর করে কাজ করছে কর্নেল বলটুয়েভ। দেখামাত্র মাসুদ রানাকে গুলি করার ইচ্ছেটা জাগলই না মনে, বরং শঙ্কিত হয়ে উঠল রানার রাইফেল তার দিকে তাক করা রয়েছে দেখে। দরজার পাশে দাঁড়ানো নিয়াজ বাইরে যারা রয়েছে তাদের মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের চারদিকে দ্রুত তাকিয়ে ইভেনকো আছে কিনা দেখে নিল কর্নেল। কাঠের একটা বাক্সের ওপর ড্রিলিং কোর দেখল, পাশে একটা আইস-পিক। টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক আর কাপ। যথেষ্ট লম্বা কর্নেল, কাবার্ডের মাথায় পাশাপাশি দাঁড়ানো ভদকার বোতল দুটোও দেখল। ভিজে পারকা খুলে একটা চেয়ারের পিছনে রাখল সে। ‘আমার নাম কলোনভ,’ দ্বিতীয়বার ঘরের চারদিকে চক্কর দিল তার দৃষ্টি। ‘অনেকগুলো সোভিয়েত রিসার্চ বেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, এন.পি. সেভেনটিনেরও। নিকিতা জুনায়েভ ওখানকার মেডিকেল অফিসার। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, আপনারা সবাই ভাল তো?’

‘কোন কারণ ঘটেছে ভাল না থাকার?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

‘কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসার সময় কিসের যেন একটা গন্ধ পেলাম, পোড়া পোড়া...’

‘আমাদের অ্যায়ারলেস হাট পুড়ে গেছে,’ বিস্ফোরিত হলো ড. কর্ডন। ‘কোন ম্যানিয়াকের কাজ, ইচ্ছে করে পুড়িয়ে দিয়েছে। কাজটা কার বা কাদের জানেন বলেই কি জিজ্ঞেস করছেন আমরা ভাল আছি কিনা?’

মনে মনে খুশি হলো রানা, চাইছিল ঠিক এভাবেই হঠাৎ করে বলা হোক কথাগুলো। যা আশা করেছিল, কর্নেলকে নিমেষের

জন্যে হলেও খতমত খেতে দেখল ও। ‘ব্যাপারটা সিরিয়াস। এটা স্যাবোটাজ। কাজেই গ্রীনল্যান্ডে রিপোর্ট করতে হয়েছে আমাদের। দায়ী যে-ই হোক, মাসুল তাকে দিতেই হবে।’ মনে মনে রানা আশা করছে, যাবার আগে কলোনভ ওরফে কর্নেল বলটুয়েভ কিছু একটা ইঙ্গিত বা আভাস দেবে যাতে বুঝতে পারবে ও, ওকে বন্ধু হিসেবে নিচ্ছে রাশিয়ানরা। কিন্তু লোকটার চোখ জোড়া ধিকিধিকি জ্বলছে দেখে আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল ও।

‘আগুন ধরে গেছে, ধরতেই পারে—দুর্ঘটনা ঘটে না?’ তারপরই ব্যঙ্গের সাথে জিজ্ঞেস করল কর্নেল, ‘সিগন্যাল পাঠিয়েছেন গ্রীনল্যান্ডে? তা কিভাবে সম্ভব হলো বলবেন কি? ট্রান্সমিটারই যেখানে পুড়ে গেছে...’

‘স্পেয়ার ট্রান্সমিটার থাকতে নেই বুঝি?’ হাসল রানা। ‘বিশ্বাস না হয়, নিজেদের বেসে ফিরে গিয়ে মনিটরিং ইউনিটকে জিজ্ঞেস করুন।’

অপেক্ষা করছে রানা। বোঝাই যাচ্ছে, সিগন্যালের ব্যাপারে কর্নেলকে কিছু বলা হয়নি। খুন-খারাবির ইচ্ছা থাকলে বাতিল করে দেবে সেটা, অবশ্য সিগন্যালের কথাটা যদি বিশ্বাস করে। জানে গ্রীনল্যান্ডকে সতর্ক করার পর এখন যদি আই.আই.ফাইভের কারও কিছু ঘটে, আমেরিকানরা রাশিয়ানদেরই দায়ী করবে, এবং প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। সিগন্যালের কথা যদি বিশ্বাস না-ও করে, তবু মনে একটা দ্বিধা জাগবে কর্নেলের, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়ে বসার আগে চিন্তা-ভাবনার জন্যে সময় নেবে। এই সময়টুকু রানার দরকার।

‘মনিটরিং ইউনিট?’ হতভম্ব দেখাল কর্নেলকে।

রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল রানা, দুই শত্রু মুখোমুখি হলো। ‘ন্যাকামি রাখুন। আই.আই. ফাইভের সিগন্যাল শোনার জন্যে আড়িপাতা যন্ত্র সেই প্রথম থেকেই ব্যবহার করেছেন আপনারা।’ কর্নেলের সামনে দাঁড়াবার কারণ আর কিছুই নয়, লোকটার কাছ থেকে চোখ-ইশারা বা ওই ধরনের কোন সঙ্কেত আশা করছে ও।

কিন্তু কর্নেল বলটুয়েভের চোখে নগ্ন ঘৃণা আর খুনের নেশা ছাড়া আর কিছুই দেখল না রানা। কাছ থেকে দেখে পরিষ্কার হয়ে গেল, এ লোক শত্রু ছিল শত্রুই আছে, বন্ধুত্বের সন্দেশ নিয়ে আসেনি।

ট্রাউজারের পকেটে হাত দুটো ভরল ড. কর্ডন, তালুর ঘাম লুকাতে চাইছে। রাশিয়ানরা দু’একজন এর আগেও আই.আই. ফাইভে এসেছে, কিন্তু এভাবে দলবেঁধে বা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে আসেনি। ইভেনকো রুস্তভ মাত্র কয়েক গজ দূরে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না সে।

রাশিয়ানরা রেডিও-রুম পুড়িয়ে দিয়েছে শুনেই রানার সন্দেহ হয়েছিল, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। কথা ছিল ইভেনকোকে পালিয়ে আসতে দেবে ওরা, তাকে নিয়ে যাতে নিরাপদে পালিয়ে আসতে পারে সেজন্যে আমেরিকানদের অগোচরে রানাকে সাহায্যও করবে। কিন্তু রেডিও-রুম পুড়িয়ে রাশিয়ানরা ঠিক উল্টো আচরণ করল। এখন কর্নেল বলটুয়েভের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হলো-ইভেনকোকে পালিয়ে যেতে দিক বা না দিক, ওকে তারা খুন করবে প্রথম সুযোগেই।

গ্রীনল্যান্ডে সিগন্যাল পাঠানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। এতগুলো লোকের চোখের সামনে রানাকে একা মেরে রেখে

যাওয়া সম্ভব নয়। আবার সাক্ষী রাখতে না চাইলে সবাইকে মারতে হবে, প্রতি-আক্রমণের ভয়ে তা-ও সম্ভব নয়।

‘এ-সব প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যে আসিনি আমি,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কর্নেল। ‘সঠিক জানি না, তবে আমার সন্দেহ, আমাদেরই কোন একজন লোক আপনাদের রেডিও-রুমে আগুন ধরিয়ে থাকতে পারে।’

‘ইনভেস্টিগেশন শুরু হলে আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে,’ বলল রানা। ‘ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে খবরটা পৌঁছে গেছে। আর আপনি তো জানেন, স্যারোটাঁজকে কি চোখে দেখে আমেরিকানরা।’

‘এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আপনি আমেরিকান নন...,’ রানার দিকে খানিক ঝুঁকল কর্নেল।

‘আর আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আপনি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ নন!’ একই সুরে ব্যঙ্গ করল রানা।

‘আপনি আমাকে চেনেন?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

‘আমাকেও আপনি চেনেন,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

‘কেউ যাতে আতঙ্ক বোধ না করে সেজন্যে অনেক সময় মিথ্যে পরিচয় দিতে হয়,’ চোখ পাকিয়ে বলল কর্নেল।

‘আমারও সেই কথা,’ রানার গলায় শ্লেষ ঝরল।

‘জানতে পারি, আমেরিকান আর্কটিক বেসে আপনি কেন?’

হাঁ হয়ে গেল রানা, কৃত্রিম বিস্ময়ে। ‘সেকি! কে.জি.বি. কিছুই জানায়নি আপনাকে?’ পুরো পাঁচ সেকেন্ড সময় দিল ও, কর্নেল যাতে আভাসে হলেও ইতিবাচক কোন জবাব দেয়। কিন্তু কোন



সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর আবার বলল রানা, ‘শুনেছি কে.জি.বি. নাকি দুনিয়ার সব খবরই রাখে, এখন দেখছি কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়।’

‘যে কারণেই আপনি মরতে এসে থাকেন, আমি জানতে চাই না,’ বলল কর্নেল। ‘আমার কথা হলো...’

‘তার আগে শুনুন,’ বাধা দিল রানা, ‘কালকের সমস্ত কাগজে হেডিং থাকবে-রাশিয়ানরা মার্কিন ঘাঁটির ওপর হামলা চালিয়েছে।’

‘কি আবোলতাবোল বকছেন!’

‘কালকের কাগজ দেখতে ভুলবেন না।’

অনেক বছর পর আজ এই প্রথম ঘাবড়ে গেল কর্নেল বলটুয়েভ। সত্যি যদি সিগন্যাল পাঠানো হয়ে থাকে, এখানে তার কোন রকম বাড়াবাড়ি করা চলবে না, উপলব্ধি করল সে। ফার্স্ট সেক্রেটারি পই পই করে বারণ করে দিয়েছেন, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট যেন না ঘটে। ‘আমি পিটার আস্তভ সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করে দিতে এসেছি। আস্তভ একজন জুনিয়র ওশেনোগ্রাফার। সে পাগল হয়ে গেছে, আমাদের একজন লোককে, বেচারি ইভেনকো রস্তুভকে, খুন করে পালিয়েছে। এদিকেই এসেছে সে, স্লেজ টীম নিয়ে। ইভেনকোকে খুন করে তার কাগজ-পত্রও সাথে করে নিয়ে এসেছে আস্তভ, নিজেকে সে ইভেনকো বলে চালাবার চেষ্টা করতে পারে...’

‘কেন, তা সে কেন করতে যাবে?’

‘কারণ নিজের কাগজ-পত্র ঘরে রেখে এসেছে,’ শান্ত গলায় বলল কর্নেল। ‘সে জানে, আপনারা তার পরিচয়-পত্র দেখতে চাইবেন।’

‘পাগল হয়ে গেছে বুঝলেন কিভাবে?’ কর্নেলের সাথে একাই কথা বলছে রানা।

কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। ‘আই.আই.ফাইভের রেডিও-রুম পুড়িয়ে দিয়েছে, তার আগে খুন করেছে ইভেনকোকে-এরপরও বুঝতে বাকি থাকে?’ রানার দিকে এক পা বাড়াল সে। ‘শুনবেন, কিভাবে খুন করা হয়েছে ইভেনকোকে? প্রথমে তার বুকে আইস-পিক ঢোকানো হয়েছে, তারপর যেভাবে বেয়নেট চার্জ করে, গোটা মুখ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। এখনও বুঝতে পারছেন না সে একটা ম্যানিয়াক? তিন বছর আর্কটিকে থেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। হয়তো কাছে পিঠেই কোথাও আছে সে, খুনের নেশায় হটফট করছে...’

‘তাহলে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কি মনে করে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘যান, খুঁজে বের করুন।’

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল কর্নেল। ইঙ্গিতে জুনায়েভকে দেখাল সে। ‘ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভারি উদ্বিগ্ন। সব শোনার পর আপনারাও চাইবেন আমরা এখানে থেকে যাই। ড. জুনায়েভ সম্ভবত আমার চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। বসতে পারি?’ কেউ রাজি হবার আগেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল অনাবিল হাসি। ‘শুরু করো, জুনায়েভ...’

‘আস্তভ একটা সাইকোপ্যাথ...,’ ভাঙা ইংরেজীতে শুরু করল জুনায়েভ।

হাত তুলল রানা। ‘আমরা কেউ মেডিকেল কলেজের ছাত্র নই, কাজেই লেকচার শুনতে চাই না।’ কর্নেলকে আবার দাঁড় করাতে চায় ও। ‘আপ্যায়ন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত, এবার যদি

সম্মানিত মেহমানরা...,' ইচ্ছা করেই কথা শেষ করল না রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। দস্তানা পরা হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো করছে আর খুলছে—প্রচণ্ড রাগের লাগাম টেনে রাখার চেষ্টা। সাবধানে, বলটু, সাবধানে, নিজেকে সতর্ক করে দিল সে। কিভাবে যেন গোটা ব্যাপারটা উল্টে গেছে: এসেছিল আমেরিকানদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে, অথচ নিজেই তাল হারিয়ে ফেলেছে। 'আমরা এসেছিলাম আপনাদের সাবধান করে দেয়ার জন্যে,' টেবিল থেকে পারকা তুলে নিয়ে বলল সে। 'ভেবেছিলাম আপনাদের সহযোগিতা পাব...'

'সবগুলো আশাই আপনার পূরণ হয়েছে,' বলল রানা। 'আমরা সাবধান হয়ে গেছি। আমরা সহযোগিতা করেছি, যা যা বলেছেন মনোযোগ দিয়ে শুনছি। কিন্তু এ-ও আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাদের নিজেদেরও কিছু কাজ আছে।'

'ভাবছিলাম, আপনাদের ঘরগুলো সার্চ করার প্রস্তাব দেব—আপনাদের একজন ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। বলা তো যায় না, আন্তর্ভ হয়তো একটা ঘরে লুকিয়ে আছে।'

'রেডিও-ক্রম পুড়তে দেখে আমরাই সার্চ করেছি...'

রাগে ফেটে পড়ল ড. কর্ডন, 'তামাশা নাকি? কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভুলে যাবেন না, মি. বলটুয়েভ। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার টেরিটরিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আপনি। আপনার সাহস তো কম নয়, সার্চ করতে চান!'

পারকার বোতাম লাগাতে লাগাতে কর্নেল বলল, ড. কর্ডনের কথা যেন শুনতেই পায়নি, 'বন্ধু হিসেবে বলছি, প্লেন না আসা

পর্যন্ত বেস ছেড়ে কোথাও না গেলেই ভাল করবেন। সেটাই আপনাদের জন্যে নিরাপদ...'

'কি থেকে নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কুয়াশার ভেতর কাউকে নড়তে দেখলে আমার লোকেরা গুলি করবে— আন্তর্ভ মনে করে,' গম্ভীর সুরে বলল কর্নেল। 'ওদের আমি বলে দিয়েছি, যদি সম্ভব হয় অক্ষত অবস্থায় ধরবে তাকে। কিন্তু ওরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই ইভেনকোর বন্ধু, আন্তর্ভের ওপর খেপে আছে। প্রত্যেকে ওরা সশস্ত্র।' মাথায় ফার হুড পরল সে। 'জুনায়েভ, সহযোগিতা যখন পেলামই না, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।' রানার দিকে ফিরল সে। 'চলি, মি. মাসুদ রানা। আমি জানি, আবার আমাদের দেখা হবে।'

জুনায়েভকে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল কর্নেল।

পিছন থেকে রানা বলল, 'আমি তৈরি থাকব, কর্নেল বলটু।'

ওরা চলে যাবার পর নিয়াজকে পাঠাল রানা, সত্যি ওরা চলে গেছে কিনা দেখে আসার জন্যে। নিয়াজ বেরিয়ে যাবার পর ড. কর্ডনের দিকে ফিরল ও। বেস লীডার রুমাল দিয়ে হাতের ঘাম মুছেছে। 'ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল,' বলল রানা। 'কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের লেনিনগ্রাদ চীফ, ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগে আমি ওর ফটো দেখেছি।' ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে একটা। 'সকাল আটটায় ইভেনকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা, স্লেজে করে।'

'সকাল আটটায় কেন?'

'বাকি রাতটুকু পোলার প্যাক চষে ক্লাস্ত হয়ে পড়বে ওরা

সবাই। আটটার দিকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। তবে আমরা রওনা হবার সময় একটা ডাইভারশন দরকার হবে।’

একগাল হাসল ড. কর্ডন। ‘একটা স্লো-ক্যাট নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করব। র‍্যাম্প থেকে পোলার প্যাকে নেমে বেশ খানিক দূরে চলে যাব-ইভেনকো পালাচ্ছে মনে করে পিছু নেবে ওরা।’

ক্লান্তিতে চোখ আপনা থেকে বুজে এল রানার। ঘুম তাড়াবার জন্যে পায়চারি শুরু করল ও। ‘এখানে ওরা স্লো-ক্যাট নিয়ে এসেছিল, আল্লাই জানে কিভাবে। কোন ধরনের মোবাইল রাডারও ছিল সাথে। আপনি স্লো-ক্যাট নিয়ে বেরলে সহজেই ধাওয়া করতে পারবে ওরা। এদিক থেকে আমরা পশ্চিমে রওনা হব।’

ড. কর্ডন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল রানা, ‘কিন্তু আপনার কি হবে?’

‘ধাওয়া করলেও, ওরা আমাকে ধরতে পারবে না,’ বলল কর্ডন। ‘চক্কর দিয়ে এক সময় বেসে ফিরে আসব আমি, ততক্ষণে আপনারা পগার পার...’

‘কিন্তু আপনি কি আই. আই. ফাইভের পূর্ব দিকে এর আগে স্লো-ক্যাট চালিয়েছেন?’

‘কি যে বলেন! তিন বছর ধরে আছি না এখানে!’

পরবর্তী আধঘণ্টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। কুকুরগুলোর সাথে পাশের ঘরে ছিল বিনয়, তাকে ডেকে আনা হলো। বন্ধ ঘরের ভেতর ছিল অচেতন রডেনবার্গের সাথে কাজম্যান, তাকেও বের করে আনা হলো। রডেনবার্গের মত কাজম্যানও ইভেনকোর উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানে না।

হেডকোয়ার্টার হাটে থাকতে বলা হলো ড. কর্ডন আর

কাজম্যানকে, বিনয়কে নিয়ে ইভেনকোকে ‘রেফ্রিজারেটর’ থেকে বের করতে গেল রানা। নামকরণটা, বলাই বাহুল্য, নিয়াজের। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আগের মতই ঘুমিয়ে আছে ইভেনকো। ট্র্যাপ-ডোর থেকে তাকে বের করতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা আর বিনয়। কাঁধে তুলে নিয়ে রিসার্চ রুমে নিয়ে আসা হলো তাকে, আগে থেকেই এখানে একটা বাৎক তৈরি রাখা হয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ড. কর্ডন, সেই সাথে চোখ খুলল ইভেনকো রস্তুভ।

‘এ আমি কোথায়?’ চোখ খুলেই জিজ্ঞেস করল ইভেনকো। ‘প্রথমে তো এখানে আমাকে রাখা হয়নি।’

বয়স হলেও, শরীর ও মন দুটোই এখনও শক্ত আছে ভদ্রলোকের। রানা ভাবল, তা না হলে কি পালিয়ে আসার দুঃসাহস হয়! ওর ইঙ্গিতে ড. কর্ডন পরীক্ষা করল ইভেনকোকে।

মনে মনে অস্থির হয়ে আছে রানা। হিসেবে ওর ভুলও হতে পারে। অভ্যর্থনার ধরন দেখে কর্নেল বলটুয়েভ ধাক্কা খেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ধাক্কা সামলে নিতে সকাল আটটা পর্যন্ত সময় না-ও লাগতে পারে তার। আই.আই. ফাইভে আবার যদি সে হানা দেয়, কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।

‘উনি সম্পূর্ণ সুস্থ,’ পরীক্ষা শেষ করে সিধে হলো ড. কর্ডন। ‘আশ্চর্যই বলব! এরকম একটা ধকল সহ্য করার পর...’

এক মুহূর্ত দেরি না করে ইন্টারোগেশন শুরু করল রানা, তার আগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ড. কর্ডনকে বের করে দিল ঘর থেকে। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্যে রাশিয়ার বাইরে আসতে হয়েছে ইভেনকোকে, ইংরেজীটা মোটামুটি ভালই বলতে পারে।

রানার প্রথম প্রশ্ন, ‘আপনি কি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘শুধু আমাকে পাঠালে আমেরিকায় আসবেন, এই শর্ত দিয়েছিলেন কেন?’

নিঃশব্দে হাসলেন রুশ বিজ্ঞানী। ‘আপনি আমার হিরো, তাই। যে লোক রাশিয়া থেকে মিং-একত্রিশ নিয়ে যেতে পারে, তার অসাধ্য কিছু থাকতে পারে না। মনে হলো, কেউ যদি নিরাপদে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারে তো সে মাসুদ রানা।’

‘আমি যদি আপনার আবদার না রাখতাম?’

এক কথায় জবাব দিল ইভেনকো, ‘আসতাম না।’

‘সাথে করে যেটা এনেছেন, মেরিলিন চার্ট-আসল, না নকল?’

‘হোয়াট!’

‘আমার সন্দেহ, আমেরিকানদের বোকা বানাবার জন্যে নকল চার্ট দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে,’ বলল রানা।

রাগে কাঁপতে শুরু করল ইভেনকো, ‘এ আপনি কি বলছেন!’

‘চার্টটা তাহলে নকল নয়? আপনার মধ্যে তাহলে কোন ছল-চাতুরি নেই?’

বোকার মত কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ইভেনকো বলল, ‘এসব কি প্রশ্ন করছেন আপনি! প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে, শুধু ওদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এসেছি আমি। নকল চার্ট আনলে আমেরিকানরা আমাকে আস্ত রাখবে?’

‘কে.জি.বি. বা আর কোন প্রতিষ্ঠান আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানায়নি?’

‘কেন জানাবে?’ হতভম্ব দেখাল বিজ্ঞানীকে। ‘আমি তো কিছুই

বুঝতে পারছি না...’

যা বোঝার বুঝে নিল রানা, স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে ইভেনকো। কে.জি.বি.র গোপন নির্দেশে নয়। কিন্তু চার্টটা? সেটা নকল, না আসল?

‘শেষবার কিয়েভে গেছেন কবে?’

‘গত সপ্তায়।’

‘কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়েছে?’

‘আমার ভাই, ইউরি রুস্তভের সাথে।’

‘সে কি নেভীতে আছে?’

‘না, ট্রলারে।’

‘আপনার প্রেমিকার নাম? যে মারা গেছে?’

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ইভেনকোর। ‘ওর সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল...’

‘আমি তার নাম জানতে চেয়েছি,’ বলল রানা।

‘সুমাইয়া নাজিন। কিন্তু আপনি আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?’

‘দরকার আছে,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘আধ ঘণ্টাও হয়নি, এই ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল কর্নেল বলটুয়েভ।’

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ইভেনকোর চেহারা। ঘরের চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে, যেন কোণঠাসা একটা ইঁদুর। কিছু বলতে চেষ্টা করেও পারল না, ঘন ঘন ঢোক গিলল শুধু। ওয়াশিংটনে ইভেনকো রুস্তভের কোন ফটো নেই, ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা গেল, এ লোক কর্নেল বলটুয়েভের পাঠানো কোন স্পাই অন্তত নয়।

অনুমতি না নিয়েই ঘরে ঢুকল ড. কর্ডন। বিরূপ দৃষ্টিতে রানার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। ব্র্যান্ডির বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা ঢালল সে, ধরিয়ে দিল ইভেনকোর হাতে। থমথমে গলায় জানাল সে, ‘রিসার্চ রুমে কমরেডের জন্যে খাবার তৈরি হচ্ছে।’

ব্র্যান্ডিটুকু খেয়েও সুস্থির হতে পারল না ইভেনকো। বান্ধকের কিনারায় বসে বারবার শুধু মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

ইন্টারোগেশন শেষ হলো, এরপর পায়চারি শুরু করল সে। চেয়ারে শুকাচ্ছে তার পারকা, মাঝে মাঝেই সেটার কাছে থামল। কিন্তু একবারও ছুঁলো না। লক্ষ রাখছে, কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। যখন বুঝল, কেউ তাকিয়ে নেই, সুযোগটা নিল। দ্রুত পারকার পকেটে হাত গলিয়ে দেখে নিল টিউবটা জায়গামত আছে কিনা। এরপর আবার বান্ধে ফিরে এসে বসল সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিয়াজ, অন্য দিকে চোখ। আপনমনে হাসল সে।

বাকি রাতটুকু না ঘুমাতে মারা যাবে রানা। হেডকোয়ার্টার হাটে গুতে যাচ্ছে বলে বেরিয়েছে, এই সময় সবাই ওরা আওয়াজটা শুনতে পেল।

প্লেনের আওয়াজ।

জেনারেল ফচ স্যাবোটাজ সিগন্যাল পেয়ে হারকিউলিস ওয়ান-থ্রী-জিরো ট্রান্সপোর্ট প্লেন পাঠিয়েছেন আই.আই.ফাইভে। বরফদ্বীপের মাথার ওপর ঘুরছে ওটা, যদি ল্যান্ড করার সুযোগ মেলে।

আমেরিকান ট্রান্সপোর্ট প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেল কর্নেল বলটুয়েভ। পোলার প্যাক আর আই. আই. ফাইভের সেতুবন্ধন স্লো-র‍্যাম্পের কাছ থেকে কয়েকশো মিটার দূরে একটা স্লো-ক্যাটে বসে রয়েছে সে, পাশে জুনায়েভ। ঘন ঘন পাইপ টানছে কর্নেল।

‘ল্যান্ডিং লাইট অন করেছে ওরা,’ বলল সে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আরও দূরে নিঃসঙ্গ একটা ঝাপসা আলো মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল সে, তারপরই সেটা ঢাকা পড়ে গেল কুয়াশায়।

‘স্বাভাবিক,’ বলল জুনায়েভ। ‘সবাই চায় নিজেদের প্লেন নিরাপদে ল্যান্ড করুক।’

‘আচ্ছা, এখনও তুমি মনে করো, ইভেনকো ওখানে নেই?’

‘আমার বুদ্ধি আর কতটুকু, কর্নেল কমরেড!’ বিনয়ে বিগলিত হলো জুনায়েভ। ‘আপনি থাকতে আমি কোন্ সাহসে বুদ্ধি খাটাতে যাই!’

‘ভেবেছিলাম আমাদের দেখে ওরা ভয় পাবে,’ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। ‘কিন্তু ঘটল উল্টোটা। বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা-বলো, প্রত্যেকের চেহারায় এসবই তো দেখা গেছে?’

মাথা ঝাঁকাল জুনায়েভ।

‘সম্ভবত ইভেনকো এখনও পৌছায়নি ওখানে, কি বলো?’

‘জ্বী-হ্যাঁ, মানে, না।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। তারপর জুনায়েভ বলল, ‘কিন্তু যদি পৌঁছে থাকে? আর যদি প্লেনটা ল্যান্ড করতে পারে?’

হেসে উঠল কর্নেল। ‘তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। দেখোই না কি হয়। যে চাল চলেছি, মাসুদ রানাকে আর পালাতে হচ্ছে না!’

(পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য)

## মরণখেলা-১

### কাজী আনোয়ার হোসেন

শ্রুচণ্ড বাড়িঘটি উপেক্ষা করে তীব্র বেগে  
ছুটে চলেছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস।  
লম্বা জানি। চলন্ত ট্রেনের দোলায়  
নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলো রানা স্নীপিং কারে,  
মুহু মুহু হাসছিল সুখ-স্বপ্নের ঘোরে।

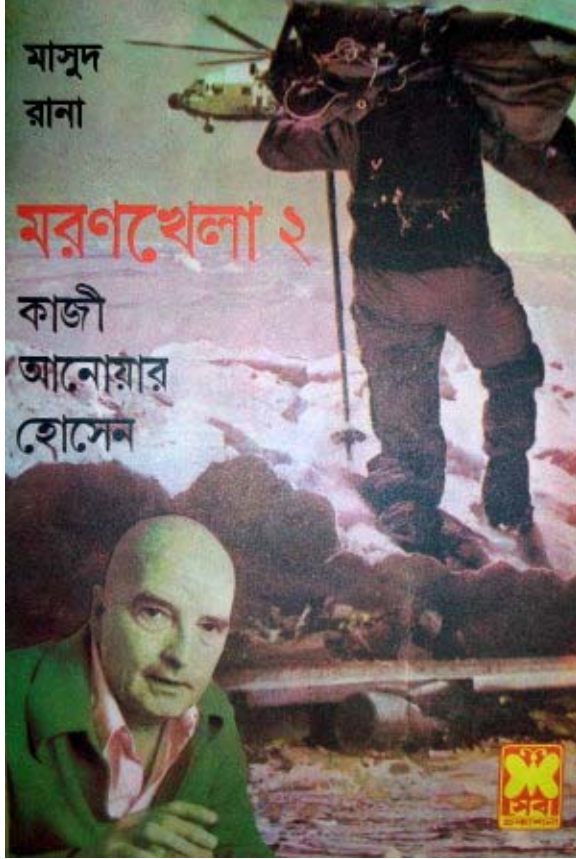
হঠাৎ অজায়গায় থেমে দাঁড়ালো ট্রেন ;  
কয়েকজন যন্তুমার্কী লোক উঠে এলো। সি. আই. এ.।  
অস্ত্রের মুখে নামানো হলো রানাকে ছোট্ট এক স্টেশনে,  
গ্রেফতার করা হলো বিনা অপরাধে।

তারপর আবার কাজ চাপাতে চায়।  
থেপে যাবে রানা—সেটাই স্বাভাবিক নয় ?  
কিন্তু ওরাও জোর খাটাবে, ভয় দেখিয়ে, উরচার করে  
কাবু করতে চাইবে ওকে—সেটাই স্বাভাবিক।  
নির্যাতনের এক পর্যায়ে রাজি হয়ে গেল রানা।  
পাঠক, কি মনে হয় ?  
ও কি সাহায্য করবে সি. আই. এ.-কে ?



সেবা বই  
প্রিয় বই  
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০  
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



## এক

ছোট বরফ দ্বীপ আই.আই. ফাইভের সাতশো ফিট ওপরে চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা। কন্ট্রোল সামনে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে পাইলট ম্যাট ইসটন। নিচে কিছুই দেখা যায় না, ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে ঠাণ্ডা প্রকৃতি। তার পিছনে, কার্গো কমপার্টমেন্টে দু'সারিতে বারোটা সীট, পারকা পরা বারোজন লোক বসে আছে।

ওরা সবাই ইউ.এস. কোস্টগার্ড সার্ভিসের লোক, এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে বাছাই করা হয়েছে ওদের। লেনিনগ্রাদ থেকে রাশিয়ানরা আর্কটিকে একটা স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্ট পাঠিয়েছে, কারণ তা না হলে অভিযানের ধরনটা অসামরিক থাকে না। ইচ্ছে করলে তারা সামরিক বাহিনী পাঠাতে পারত, কিন্তু তা পাঠালে আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঝুঁকি থাকত, কয়েক মাস পর মস্কোয় শীর্ষ বৈঠক বসার কথা রয়েছে বলে সে ঝুঁকি তারা নিতে চায়নি। ওয়াশিংটনও একই সাবধানতা অবলম্বন করেছে সেই একই কারণে। কোনভাবেই ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্টের ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

পাইলটের কেবিন ঘেঁষে আরও এক জোড়া সীট দখল করে

রয়েছে দু'জন আরোহী, একজন ডাক্তার, অপরজন নার্স। ডা. পল ফ্লেমিং, বক্ত্রিশ, একহারা চেহারার সুদর্শন প্রেমিক। সে তার হবু রাশিয়ান রোগী ইভেনকো রুস্তভের জন্যে সাথে করে মেডিকেল কিট আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে প্লেনের বাইরে তাকিয়ে আছে ডা. ফ্লেমিং, মেঘের মত ভেসে যেতে দেখছে গাঢ় কুয়াশা। তার পাশের সীটে বসে আছে নার্স এরিকা ফোলি। দু'জন ওরা দু'জনের হাত ধরে আছে।

দু'জনেই ওরা কোস্টগার্ড সার্ভিসে চাকরি করে, কিন্তু আর্কটিকে পাঠাবার জন্যে জরুরী তলব পেয়েছিল একা ডা. ফ্লেমিং। নার্সদের মধ্যে নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ দিলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা ভেবে না-ও যেতে চাইতে পারে, তাই স্বেচ্ছাসেবিকা চাওয়া হয়। একজনই এগিয়ে আসে এবং তাকেই পাঠানো হয়েছে।

পল ফ্লেমিং আর এরিকার মধ্যে তিন বছর ধরে প্রেম চলছে। আগামী মাসের পনেরো তারিখে ওদের বিয়ে। এরিকা স্বেচ্ছায় যেতে চেয়েছে শুনে দিশেহারা বোধ করে পল। তার আপত্তি শুনে এরিকা জবাব দেয়, 'ধরা পড়ে গেলে তো! এতক্ষণ বলছিলে কাজটা মোটেও বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যে-ই আমি যেতে চাইছি অমনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছ। ওসব ধানাইপানাই ছাড়ো, তোমার সাথে যাচ্ছি আমি। নাম প্রত্যাহার করার কথা ফের যদি মুখে আনো, আমি তাহলে বিয়ের তারিখটাও অনির্দিষ্টকালের জন্যে পিছিয়ে দেয়ার কথা তুলব।'

দু'বছর নয় মাস সতেরো দিন সাধনার পর এরিকাকে রাজি করিয়েছে ফ্লেমিং, কাজেই এরপর চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নেয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল কি?

মিষ্টি চেহারার এরিকা শুধু মিষ্টভাষী নয়, তার হাবভাব এবং অঙ্গভঙ্গিতে এমন একটা মাধুর্য আছে যে কেউ একবার তার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারে না। মার্কিন সমাজে কুমারী যুবতী দুর্লভ, অথচ এরিকা তাই। তাকে সামান্য একটা চুমো খাওয়ার ভাগ্য আজ পর্যন্ত কোন পুরুষের হয়নি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিজের কথা নয়, এরিকার কথাই ভাবছে পল। এই উদ্ধার অভিযান কতখানি বিপজ্জনক ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না, এরিকার যদি কিছু ঘটে...

'তোমার কি মনে হয়, ক্যাপটেন ম্যাট ল্যান্ড করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল এরিকা, পলকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত রাখতে চাইছে সে।

পলও ঠিক তাই চাইছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। ওকে আমি চিনি, হার মানার লোক নয়। যতক্ষণ না এয়ারস্ট্রিপ দেখতে পায় চক্রর দিতেই থাকবে। পাইলট হিসেবে ওর জুড়ি মেলা ভার।'

কিন্তু পাইলটের কেবিনে পরিবেশটা থমথমে। ম্যাট ইসটন আশার কোন আলো দেখছে না। কুয়াশার ভেতর কোথাও কোন ফাঁক নেই, নিচে কোথায় কি আছে দেখবে কিভাবে? অসহায় বোধ করল সে। ওপর দিকে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার, নিচে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। ফুয়েল গজের দিকে তাকাল সে। প্রচুর রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ চক্রর দিতে পারবে প্লেন। যখন দেখবে কার্টিস ফিল্ডে ফিরে যাবার মত ফুয়েল আছে, তখন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত...

পাইলটের চিন্তায় বাধা পড়ল। এডওয়ার্ড ড্রেক, কো-পাইলট পাশ থেকে বলল, 'এখন আমারই সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি ল্যান্ডিং লাইট দেখেছিলাম আমি?'



‘মনে হচ্ছে ফিরে যেতে চাও, ড্রেক?’ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল পাইলট। ‘আলোটা কি সত্যি দেখোনি?’

‘দেখেছি।’

‘ব্যস। চক্কর আমরা দিতে থাকব।’

আই.আই.ফাইভের বেস লীডার ড. কর্ডন সুইচ অন করার পর থেকেই একটা ল্যান্ডিং লাইটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। উদ্বেগে কাতর হয়ে আছে ও। কুয়াশার ভেতর ল্যান্ডিং লাইটটাকে সবুজাভ আভার মত লাগছে। এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় ড. কর্ডনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঘাঁটির ঘরগুলো থেকে সিকি মাইল দূরে। উদ্বেগে কাতর আরও পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছে ওখানে। হঠাৎ করে আবার শুনতে পাওয়া গেল ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ। গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করল ড. কর্ডন। ‘ধরেই নিয়েছিলাম হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেছে।’

সত্যিই, মনে মনে রানাও ভাবল। একটু হলেও কুয়াশা যেন পাতলা হয়েছে। প্লেনটা শুধু একবার ল্যান্ড করতে পারলেই যথেষ্ট, তারপর আবার টেক-অফ করতে না পারলে না-ই পারল। কার্টিস ফিল্ডে জেনারেল ফচের সাথে কথা হয়েছে রানার, তখনই ওকে জানানো হয়েছে, একটা কোস্টগার্ড ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়ে থাকবে। রানার বিশ্বাস, এই প্লেনের ডিটাচমেন্টের বারোজন সশস্ত্র লোক নিশ্চয়ই আছে। দলে ওই বারোজন যোগ হলে কে আর গ্রাহ্য করে কর্নেল বলটুয়েভকে। তখন দু’পক্ষের শক্তি প্রায় সমান সমান দাঁড়াবে।

‘কি মনে হয় আপনার, এই অবস্থায় ল্যান্ড করতে পারবে পাইলট?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ড. কর্ডন।

যেন কুয়াশায় চারপাশ ঢাকা ভৌতিক পরিবেশে জোরে কথা বলা মানা। বাতাস নেই বললেই চলে, অথচ কোথাও স্থির হয়ে নেই কুয়াশা। কখনও ঢেউ-এর মত এগিয়ে আসছে, কখনও ঢেউ ভেঙে গিয়ে পাহাড়, হাতি, তিমি, টাওয়ার, বিশাল দানব বা টানেলের আকৃতি নিচ্ছে। আর ঠাণ্ডা! গায়ে আগুন ধরার অভিজ্ঞতা আছে যার শুধু বুঝি তাকেই বোঝানো সম্ভব আর্কটিকের এই ঠাণ্ডার কি জ্বালা। বুটের ভেতর অনবরত পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করছে ওরা, তা না হলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্থির হয়ে নেই-হাত, পা, কোমর, ঘাড় সব সময় নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখছে। খানিক পরই একেবারে মাথার ওপর চলে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, সেই সাথে মনে হলো কুয়াশা যেন আরও একটু হালকা হয়েছে। ‘এখনও ল্যান্ড করার কথা ভাবছে না পাইলট,’ বিড়বিড় করল রানা। ‘ওপর থেকে কি দেখছে না দেখছে কে জানে...’

প্লেন নিয়ে আরও নিচে নেমে এসেছে পাইলট, পাঁচশো ফিট ওপর থেকে নিচটা আগের চেয়ে একটু ভাল দেখাল। দূর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে প্লেনের নাক আরও একটু নিচের দিকে তাক করল সে। শুধু কো-পাইলট ড্রেক পাইলটের এই আওয়াজের অর্থ জানে। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ক্যাপটেন ম্যাট ইসটন। এ-ধরনের কোন ঝুঁকি নেয়ার সময় নিজের অজান্তেই আওয়াজটা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

কুয়াশা হালকা হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ডিং লাইট দেখতে পেয়েছে

পাইলট। জানে, এই শুভ পরিস্থিতির আয়ু বেশিক্ষণ নয়, যে-কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন ঢেউ এসে আবার সব ঢেকে দিতে পারে। ক্ষীণ আলোর সমান্তরাল দুটো রেখা এতই অস্পষ্ট, মনে হলো চোখের ভুল। আর যদি চোখের ভুল না হয়, এয়ারস্ট্রিপটা কোথায় আন্দাজ করতে পারছে সে। যা থাকে কপালে, রেখা জোড়ার মাঝখানে ল্যান্ড করবে সে।

‘আমরা নামছি,’ শান্ত গলায় বলল সে। ‘ওদের জানাও।’

সীট ছেড়ে কার্গো কমপার্টমেন্টে ঢুকল কো-পাইলট, চোদ্দজন আরোহীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘সীট-বেল্ট বাঁধুন, আমরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছি...’

‘দেখলে তো, বলেছিলাম না?’ এরিকার হাতে চাপ দিয়ে বলল পল। ‘ক্যাপটেন ঠিকই ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।’ এরিকার দিকে ঝুঁকল সে খানিক, যেন মনে হলো চুমো খেতে যাচ্ছে। আশ্চর্য, সেটা ধরতে না পারলেও, নিজে থেকেই পলের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল এরিকা।

প্রেমিকার কপালে আলতো করে ছোট্ট একটা চুমো খেলো পল। এরিকা রাগা হয়ে উঠল, সরে বসল একটু, কিন্তু কেউ কারও চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরাল না।

ওদিকে, কন্ট্রোল কেবিনে ঘামতে শুরু করেছে পাইলট ম্যাট ইসটন। প্লেনের ডানা একদিকে কাত করে নিয়ে আই.আই. ফাইভ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে। এয়ারস্ট্রিপের দিকে সরাসরি ফিরে আসবে, এটা তারই প্রস্তুতি। ল্যান্ডিং লাইট অদৃশ্য হলেও, মনে মনে প্রার্থনা করেছে সে, অর্ধ বৃত্ত রচনা শেষ করে ফেরার সময় আবার যেন ওগুলো দেখতে পায়।

নিচে পোলার প্যাক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। প্লেন সিধে করে নিল ইসটন। কুয়াশার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ, শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল সে। শালার আলোগুলো আগের চেয়েও অস্পষ্ট, মনে হলো তার। কুয়াশার অনেক নিচে ঝাপসা একটা ভাব, আলো কিনা বলা কঠিন। ডাইভ দিল প্লেন, ঝাপসা ভাবটুকু দ্রুত ছুটে আসছে কাছে। গিয়ার আর ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে সে। দু’জোড়া প্রপেলার কুয়াশায় আলোড়ন তুলে ঘুরছে। এঞ্জিনের আওয়াজে কোন উত্থান বা পতন নেই। ঠিক এ-ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আরও অনেক বার যেতে হয়েছে ক্যাপটেন ইসটনকে। আর্কটিকের বিভিন্ন অংশে আই.আই.ফাইভে পাঁচবার ল্যান্ড করেছে সে—প্রতিবারই এই অক্ষাংশ থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে।

সীমানা পেরোনো চলবে না!—নিজেকে সাবধান করে দিল ম্যাট ইসটন। ল্যান্ড করার জন্যে যথেষ্ট লম্বা এয়ারস্ট্রিপ, শুধু যদি ঠিক সময়ে টাচ ডাউন করতে পারে প্লেন। ঝাপসা ভাবগুলো হয়ে উঠল আভা-দু’সারি। মসৃণ বরফ স্পর্শ করল স্কিড। হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইল প্লেন, মনে হলো ডিগবাজি খেতে যাচ্ছে। তারপর মনে হলো স্কিডগুলো বরফের ওপর পিছলাতে শুরু করেছে। দু’সারি আভা দ্রুত বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে দু’পাশ দিয়ে, কিন্তু কোথায় কোন্ দিকে চলেছে প্লেন বোঝা যাচ্ছে না। সামনে যখন কোন বাধা নেই, কি আর বিপদ ঘটতে পারে! প্রপেলারের বাতাস খাবলা মারছে তুষারে, দু’পাশে মেঘের মত উড়ছে তুষারকণা, আভাগুলো ঢাকা পড়ে গেল। প্লেনের গতি মন্থর হয়ে এল। ব্রেক কষে এবার থামার প্রস্তুতি নিল পাইলট।

এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রানা আর ড. কর্ডন এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বুঝল, পাইলট ল্যান্ড করতে আসছে। ‘পিছিয়ে আসুন,’ কথাটা শুনে রানার পিছু পিছু ছুটল ড. কর্ডন। এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসে আবার যখন ওরা ঘুরল, প্রথমবারের মত প্লেনের আলো দেখতে পাওয়া গেল-ওদের দিকে ঝুঁকে আছে, স্লো-মোশান ছবির ভঙ্গিতে নেমে আসছে নিচে।

‘ঈশ্বর!’ গুণ্ডিয়ে উঠল ড. কর্ডন। ‘স্ট্রিপের মাঝখানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, সীমানা পেরিয়ে যাবে!’

‘কি জানি!’ বিড়বিড় করল রানা। কুয়াশায় দূরত্ব আন্দাজ করা অসম্ভব। নিচে দাঁড়িয়ে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, ওপর থেকে নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার, তা না হলে ল্যান্ড করতে আসত না পাইলট। ডানা দুটো দেখতে পেল রানা, প্রতিটিতে একটা করে আলো। দুই খুদে আলোর মাঝখানে গাঢ় একটা আকৃতি, এয়ারস্ট্রিপ ধরে তুমুল গতিতে ছুটে আসছে। নিম্নরূপ আর্কটিক রাতে এঞ্জিনের আওয়াজ বিরতিহীন বিস্ফোরণের মত শোনা। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বেরিয়ে এল প্লেন। ওদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল স্ট্রিপের শেষ প্রান্তের দিকে। রানার যেন মনে হলো এঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে স্কিগলোর হিসহিস শুনতে পেয়েছে ও।

কুয়াশার ভেতর আবার ঝাপসা হতে শুরু করল প্লেন। এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে যেতে শুনল ওরা। দু’এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়বে ওদের বাহন। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট, প্রপেলারের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এল। এখনও ওরা প্লেনটাকে দেখতে পাচ্ছে, ঝাপসা, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

কাঠামোটা হঠাৎ করে বদলাল। বৃকে হেঁটে এগোচ্ছিল প্লেন, হঠাৎ বরফে নাক দিয়ে খাড়া হয়ে গেল, আকাশ ছুঁতে চাইল লেজ। ভোজবাজির মত ঘটে গেল ঘটনাটা। আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল লেজ। সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কায় বুটের তলায় ঝাঁকি খেলো বরফ। বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, তালা লেগে গেল কানে। কুয়াশার গাঢ় পর্দা চিরে বেরিয়ে এল আগুনের লকলকে শিখা, মুহূর্তের জন্যে ঝাঁপিয়ে গেল রানার চোখ। তারপর শুধু আগুনের চড়চড় আওয়াজ, আর কালো ধোঁয়া।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি থামার পর স্লো-ক্যাটের জানালা খুলে পাইপ থেকে তামাক ফেলল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ‘কি, বলিনি, জুনায়েভ?’ সহকারীর উদ্দেশ্যে শান্ত, সম্ভ্রষ্ট গলায় বলল সে, ‘প্লেনে করে পালাতে পারবে না ওরা।’

একজনও বাঁচল না। এতই প্রচণ্ড তাপ, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে একটা টানেল তৈরি হলো, টানেলের শেষ মাথায় আকাশ আর চাঁদের হাসি। একটু পরই টানেলটা ভরে উঠল কালো ধোঁয়ায়। হিম কার্পেটের ওপর পুড়ে ছাই হচ্ছে প্লেনটা। হঠাৎ করেই নিভে গেল আগুন, থাকল শুধু কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। পেট্রল, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, আর মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেল রানার।

ইতিমধ্যে ধোঁয়ার স্তম্ভটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে এসেছে রানা, ওর পিছু নিয়ে এতক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ড. কর্ডন। ‘কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে...’

‘কি করে আশা করেন!’

‘মি. রানা, এটা দেখুন...,’ কাঁপা গলায় বলল ড. কর্ডন, তেল মাখানো কি একটা তোবড়ানো জিনিস রয়েছে তার হাতে। জিনিসটার ভাঁজ খুলতেই চেনা গেল। নার্সরা পরে, একটা ক্যাপ। ‘প্লেনে একজন নার্সও আছে...’

‘ছিল।’

নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠল ড. কর্ডন, ‘কেন, কেন? সবই তো ঠিক ছিল-স্ট্রিপে নিরাপদে নামব, স্পীড কমল, থামার ঠিক আগের মুহূর্তে কি এমন ঘটল যে...’

‘এদিকে আসুন।’ এয়ারস্ট্রিপ ধরে কয়েক পা এগোল রানা, ঝুঁকে বড়সড় একটা জিনিসের গায়ে হাত রাখল। জিনিসটা কি চেনা যাচ্ছে না, বরফে ঢাকা। কাছাকাছি স্কিড-এর দাগ দেখা গেল। ‘প্লেন ত্র্যাশ করার এটাই কারণ।’ সিধে হয়ে জিনিসটার গায়ে বুটের কয়েকটা লাথি মারল ও, বরফের আবরণ খসে বেরিয়ে এল পাথর। ‘এই বোল্ডারটায় ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেছে প্লেন।’ প্লেনের একটা স্কিড ওই ওদিকে পড়ে আছে, বোল্ডারের সাথে ধাক্কা লাগায় ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকল ড. কর্ডন। তারপর অবিশ্বাস আর বিস্ময় ঝরে পড়ল তার গলা থেকে, ‘স্লো-প্লাউ দিয়ে মাত্র দু’দিন আগে স্ট্রিপ পরিষ্কার করেছি। আমি নিজে ছিলাম। ওটা ছিল না, থাকতে পারে না!’

‘শুধু এই একটাই নয়,’ বলে কয়েক পা এগিয়ে আরও একটা বরফ-ঢাকা বোল্ডার দেখাল রানা। হাত তুলে খানিক দূরে ড. কর্ডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। ‘ওখানে আরেকটা।’

এয়ারস্ট্রিপের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে তিন নম্বর বোল্ডারটাও দেখতে পেল ওরা। এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ল্যাম্পের আলো ফেলল ড. কর্ডন। লাথি মেরে সেটার গা থেকে বরফ খসাল রানা। ‘খুঁজলে হয়তো আরও পাওয়া যাবে, সবগুলো আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।’ ড. কর্ডন রাগের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল রানা, ‘কারণটা আর কিছুই নয়, স্ট্রিপ পরিষ্কার করার সময় ওগুলো এখানে ছিল না।’

‘তারমানে আপনি বলতে চান...’

‘হ্যাঁ। ক্যাম্পের পিছনের পাহাড়ে ছিল ওগুলো। পাথর তো আর সিকি মাইল পথ হেঁটে আসতে পারে না, কেউ ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছে। যদি কোন প্লেন ল্যান্ড করতে আসে, এই ভেবে। স্যাভোটার্জ, ড. কর্ডন। আবার। আল্লাই জানে ক’জন ছিল প্লেনে।’

‘বাস্টার্ডস!’

‘শান্ত হোন। ক্যাম্পে ফিরে যাই চলুন।’

‘আমেরিকার প্রতিটি খবরের কাগজে খবরটা যাতে ছাপা হয়...’

‘বোকার মত কথা বলবেন না।’ ড. কর্ডনের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা। ‘প্রমাণ কই?’

‘কেন, বোল্ডারগুলো প্রমাণ নয়?’

‘রাশিয়ানরা বলবে ওগুলো ওখানে আগে থেকেই ছিল-বাতাসের ধাক্কায় বরফ সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। ওরা বরং পাল্টা অভিযোগ করে বলবে, স্ট্রিপটা আপনারা ঠিকমত পরিষ্কার করেননি।’

‘তারমানে আপনি বলতে চান...’

‘সম্পূর্ণ অন্য কথা। এ-ধরনের দুর্ঘটনার আয়োজন আরও করা হয়েছে কিনা দেখা দরকার।’

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ঘুরছে ক্যাটারপিলার ট্রাক। বরফে দাঁত বসিয়ে এগিয়ে চলেছে স্লো-ক্যাট। ক্যাবের সামনেটায় আলো ফেলছে একটা হেডলাইট, জানালার বাইরে বসানো দ্বিতীয় হেডলাইটের আলো তির্যকভাবে নিচের দিকটা আলোকিত করে রাখছে। বরফের ওপর তির্যক আলোটা যেখানে পড়ছে, সামনের দিকে ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে আছে ড. কর্ডন। খানিক পর এই আলোটার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে তাকে। এই আলোই তাকে ঝপ করে বিশ ফিট নেমে যাওয়া খাদটা দেখতে পেতে সাহায্য করবে। খাদের নিচ থেকেই শুরু হয়েছে সীমাহীন পোলার প্যাক।

ফার পারকা আর ফার হুড পরে থাকায় এঞ্জিনের আওয়াজ তেমন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ড. কর্ডন। ঘড়ি দেখল, কাঁটায় কাঁটায় আটটা। সময়ের হিসেবে কোন ভুল হয়নি, নিজের হাতে অন করা এয়ারস্ট্রিপের ল্যান্ডিং লাইটগুলোর একটা দেখতে পাবার সময় হয়ে এসেছে। বড় লিভারটা ঘোরাল সে, ভারী ট্রাকের নাক একটু ঘুরে গেল। দিক বদলের সাথে সাথে চেক করল মাইলোমিটার। ড. কর্ডন শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু বিপদের কথা মনে রেখে পাশের সীটে লোড করা একটা রাইফেল রাখতে হয়েছে তাকে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে নীল ক্যাপটা—কে জানে কেমন দেখতে ছিল নার্স মেয়েটা! চোখ আর ভুরু কুঁচকে তাকাল

সে। উইন্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেছে, পরিষ্কার করার বদলে গ্লাস আরও নোংরা করে তুলছে ওয়াইপার। ক্যাট থামিয়ে ন্যাকড়া হাতে নেমে পড়ল সে।

চেউ খেলানো কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে স্লো-ক্যাটের ওপর দিয়ে, বাহনের পিছন দিকটা সম্পূর্ণ আড়ালে ঢাকা পড়ল। গ্লাসে ন্যাকড়া ঘষার সময় সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল ড. কর্ডন। চারদিকে কুয়াশা, কাছেপিঠে গোটা রাশিয়ান আর্মি লুকিয়ে থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। তাড়াতাড়ি গ্লাস পরিষ্কার করে ক্যাবে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিকটা হলেও স্বস্তি আর নিরাপত্তা বোধ ফিরে এল। মাইলোমিটার চেক করে বড় লিভারটা ঘোরাল, ধীরে ধীরে আবার এগোতে শুরু করল স্লো-ক্যাট। কাজটার বিপজ্জনক পর্যায় শুরু হলো এবার।

লিভারের ওপর ঝুঁকে তির্যক আলোর ওপর চোখ রাখল সে। হিসেব যদি ভুল না হয়ে থাকে, খাদের কাছাকাছি চলে এসেছে ক্যাট। প্ল্যানটা যদিও রানার, কাজটা সারার দায়িত্ব আর কাউকে না দিয়ে নিজে নিয়েছে ড. কর্ডন। স্লো-ক্যাটকে র্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, র্যাম্প বেয়ে নামা হবে পোলার প্যাকে, তারপর বরফ-দ্বীপ আই.আই. ফাইভের পাশ ঘেঁষে প্যাক ধরে খানিকদূর, এই সিকি মাইলটাক, এগোনো। তির্যক আলোর সাহায্যে খাদের দিকে একটা চোখ রাখবে সে, তাতে সীমাহীন বরফ রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকবে না।

এরপর স্লো-ক্যাট রেখে র্যাম্পের দিকে রওনা হবে ড. কর্ডন, পায়ে হেঁটে পোলার প্যাক থেকে ফিরে আসবে আই.আই. ফাইভে। স্লো-ক্যাট পোলার প্যাকে পড়ে থাকবে উত্তর দিকে মুখ

করে, স্টিয়ারিং মেকানিজম একেজো অবস্থায়। রাশিয়ানরা ওটা দেখে ভাববে, দ্বীপ থেকে কেউ পালিয়েছে। ধরে নেবে প্লেনটা ক্র্যাশ করায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তাই ভুল করে পশ্চিমের বদলে উত্তর দিকে গেছে ওরা।

এক হাতেই একটা সিগারেট ধরাল ড. কর্ডন, ভয় আর নিঃসঙ্গতা-বোধ একটু যেন দূর হলো। তারপর হঠাৎ করেই দিক বদল করল সে। তির্যক আলোয় খাদটা দেখতে পেয়েছে। দ্বীপ-প্রাচীরের কিনারা ঘেঁষে এগোল স্নো-ক্যাট। বিপদের ঝুঁকি এড়াবার জন্যে খাদের কিনারা থেকে বারো গজ সরে এল সে। এবার ক্যাবের মাথায় কাঠের থামে বসানো হেডলাইটের আলোয় সামনে, দূরে তাকাল সে। র‍্যাম্পটা এখন থেকে খুব বেশি দূরে হবার কথা নয়।

‘পুব...পুব...পুবদিকে! র‍্যাম্প, র‍্যাম্প!’

মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল জুনায়েভ। বরফ-দ্বীপ আই.আই.ফাইভকে ঘিরে থাকা পোলার প্যাকে ওদের লোকজন রয়েছে, সাথে মার্কিন ঝাঁচের ওয়াকি-টকি ট্রান্সমিটার। স্নো-ক্যাটটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে, এইমাত্র তাদের জানিয়ে দিল জুনায়েভ। এখন তারা কয়েক দিক থেকে স্নো-ক্যাট আর র‍্যাম্পের দিকে এগোবে।

কুয়াশার ভেতর স্থির হয়ে আছে কর্নেলের স্নো-ক্যাট। কর্নেলের পাশের সীটে রয়েছে জুনায়েভ। তাদের পিছনের কমপার্টমেন্টে, রাডার অপারেটর তার স্ক্যানার-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দ্বীপের ওপর দিয়ে ড. কর্ডনের বাহনটাকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখছে সে। তার মাথার ওপর,

ছাদে, ধীরে ধীরে ঘুরছে রাডার উইং। পোলার প্যাকে মৃত্যুপুরীর জমাট নিষ্করতা, দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে আই.আই. ফাইভের দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছে কর্নেল বলটুয়েভ।

‘আপনার কি মনে হয়, কর্নেল কমরেড, ইভেনকো ওদের সাথে যাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

‘বেকুব!’

‘তা তো বটেই!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল জুনায়েভ। ‘ব্যটা ধরে নিয়েছে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া খুব সহজ। বেঙ্গমান, নেমকহারাম, ইহুদি জাতটাই...’

বাধা দিল কর্নেল, ‘বেকুব আমি তোমাকে বলেছি, জুনায়েভ,’ ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। আড়চোখে লক্ষ করল, হাঁ হয়ে গেল জুনায়েভের মুখ। ‘ইভেনকো কোথায় তাই জানি না, জিজ্ঞেস করছ ওদের সাথে পালাচ্ছে কিনা!’

জুনায়েভ মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আবার মুখ খুলল কর্নেল, ‘ওদের সাথে থাকতে পারে সে, নাও পারে। যদি থাকে, সমস্যার সমাধান করা যাবে। যদি না থাকে, ওদের ছেড়ে যাওয়া ক্যাম্প গিয়ে উঠব আমরা, অপেক্ষা করব তার জন্যে।’ জানালা দিয়ে বাঁ দিকে তাকাল সে। কুয়াশা সরে যেতেই আরেকটা স্নো-ক্যাট দেখা গেল, চুপচাপ এঞ্জিন বন্ধ করে সেটাও স্থির হয়ে আছে। আরোহীর সংখ্যা আট, চারজনের কাছে রয়েছে অটোমেটিক উইপন। সময় দেখল কর্নেল। আটটা পাঁচ। আটটা পনেরোর মধ্যে দাবার বোর্ড থেকে আরও একটা ঘুঁটি তুলে নেয়া হবে, মুচকি হেসে ভাবল সে।

র‍্যাম্পে উঠে এল ড. কর্ডন।

সামনের ট্র্যাক নিচের দিকে ঝুঁকছে টের পেয়েই সাবধান হয়ে গেল সে। তিন বছর আগে পাহাড় থেকে পাথর এনে র‍্যাম্পটা তৈরি করেছিল তারা, পাথুরে অবলম্বনের ওপর দ্বীপ-প্রাচীরের গা ঘেঁষে ক্রমশ বাঁকা, চওড়া, এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা। ডান দিকে খাদ, আর কিনারা। ভারী বাহনটাকে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে ঘোরাল ড. কর্ডন, কাছাকাছি থাকল দ্বীপ-প্রাচীরের।

ব্রেক করল, এঞ্জিন চালু থাকল, বাইরে তাকাল জানালা দিয়ে। তির্যক আলোয় নিচে বা সামনে কোথাও কঠিন বরফের নাম-নিশানা নেই। ঢালু হয়ে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে র‍্যাম্প, মনে হলো পাহাড়ের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দস্তানার ভেতর ঘামে চটচট করছে হাত। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল। ঝুঁকিটা না নিলে কেমন হয়? এখানেই যদি ক্যাটকে ফেলে ফিরে যায় ক‍্যাম্পে?

রাশিয়ানদের বোকা বানানো কঠিন। নাহ, নিখুঁত হওয়া চাই কাজটা।

‘ধুস শালা, যা আছে কপালে!’

পোলার প্যাকে নিঃসঙ্গ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এই অভ্যেসটা হয়ে গেছে, একা একা কথা বলা। বিপজ্জনক দিকটার সবকিছু আড়াল করে রেখেছে কুয়াশা। অপরদিকে, হেডলাইটের আলোয় ঝাপসা মত সাদাটে দেখা যাচ্ছে দ্বীপ-প্রাচীর। ওটার কাছ ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে, খাদের দিকে তাকাবেই না।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথ ধরে এগোল ড. কর্ডন। নাজুক পরিস্থিতি, কারণ সামনের ক্যাটারপিলারগুলোকে অনুসরণ করে

পিছনের ট্র্যাকগুলোকে ঠিকমত বাঁক নিয়ে নেমে আসতে হবে। ঝাপসা বরফ-পাঁচিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। স্লো-ক্যাট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সীটের কিনারায় ঝুলে মত আছে। স্লো-ক্যাটের ডান দিকের ট্র্যাক খাদের কিনারা থেকে এক ফুট দূরেও নয়। হামাগুড়ি দিয়ে, ধীরে ধীরে এগোল স্লো-ক্যাট, লিভারটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে সে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিড়বিড় করল একবার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ক্যাটের মতিগতি এখনও ঠিক আছে, সুন্দর নেমে যাচ্ছে র‍্যাম্প বেয়ে।

ছাঁৎ করে উঠল বুক। ক্যাট ঠিকভাবেই এগোচ্ছে, খাদের কিনারা থেকে দশ ইঞ্চি দূরে রয়েছে ডান দিকের ট্র্যাক। অথচ যা ঘটছে তাও দুঃস্বপ্ন নয়। ব্যাপারটা কেন ঘটছে, প্রথমে টেরই পেল না ড. কর্ডন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কাত হতে শুরু করল ক্যাট, উল্টে যাচ্ছে।

বরফই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। অবলম্বন হিসেবে যে পাথরগুলো র‍্যাম্পের নিচে বসানো হয়েছিল, সেগুলোর নিচে ধসে যেতে শুরু করল বরফ। ক্যাটের অতিরিক্ত ওজন সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করল। কন্ট্রোল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ড. কর্ডন, এমনি সময়ে কাত হয়ে গেল ক্যাট, কিনারা থেকে খসে পড়ল রূপ করে।

অনেকটা অভ্যাসবশত, কিনারা থেকে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, এঞ্জিন অফ করে দিল ড. কর্ডন। পরমুহূর্তে তার মাথা নিচের দিকে আর পা ওপর দিকে হয়ে গেল। বিশ ফিট নেমে এল ক্যাট, প্যাকের শক্ত বরফে পড়ল ছাদ, ভারী ট্র্যাক চ্যাপটা করে দিল খুদে ক্যাব। সেই সাথে ভেঙে চুরে, ফেটে, গুঁড়িয়ে চ্যাপটা

হয়ে গেল হাড়, মাংস, কাঁচ, আর খাতু।

দ্বীপের অপর প্রান্তে, এক মাইল দূরে, ড. কর্ডনের এই করুণ পরিণতির কথা জানা হলো না রানার। নিজের দল নিয়ে দ্বীপ থেকে পোলার প্যাকে নেমে এসেছে ও। সপাং সপাং চাবুক খেয়ে ছুটছে কুকুরগুলো। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

## দুই

দুনিয়াটা একদিন এরকমই দেখতে ছিল, ভবিষ্যতেও হয়তো কোন দিন এরকম দেখাবে। প্রাণহীন, বন্ধা, জমাট বরফ-সূর্যের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মৃত গ্রহ, অসীম শূন্যে নিঃসঙ্গ পথচারী। চারদিকে তাকিয়ে রানা যেন মানব-জাতির বিলুপ্তি চাক্ষুষ করল।

ক্ষীণ বাতাসের মৃদু নাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেছে কুয়াশা। ক্ষীণ কিন্তু হিমশীতল, সরাসরি উত্তর মেরু থেকে আসছে। কুয়াশা সরে যাওয়ায় জমাট বরফ রাজ্য চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে যতদূর দৃষ্টি চলে। কোথাও কিছু নেই, শুধু বরফ, আর বরফ। মরুভূমিতে কিছু না কিছু গজায়, নিঃসঙ্গ মরুদ্যান থাকে, দু'এক জায়গায় কাঁটা-ঝোপ দেখা যায়, কোথাও টলটল করে নীল গরম পানি। এখানে সে-সব কিছু নেই, আছে শুধু ঠাণ্ডা বরফ।

ওদের সামনে প্রেশার রিজ বুলে আছে, বালিয়াড়ির মত ঢেউ খেলানো, দশ থেকে বিশ ফিট উঁচু। নিয়াজের কম্পাসের ওপর বিশ্বাস রেখে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। স্নেজ দুটোকে প্রাণপণে

টেনে নিয়ে চলেছে কুকুরগুলো। গন্তব্য সুদূর গ্রীনল্যান্ড, একশো মাইল দূরে। এখনও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল নয় রানা, মাঝে মধ্যেই ঝোঁক চাপছে পশ্চিমের বদলে দক্ষিণে যায়। দক্ষিণে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা-আইসবার্গ অ্যালি।

ঘন্টাখানেক হলো পর্দা তুলে নিয়েছে কুয়াশা, এখনও রাশিয়ানদের ছায়া চোখে পড়েনি। হতে পারে কর্নেল বলটুয়েভের লোকজন এখনও হয়তো আই.আই. ফাইভের চৌহদ্দি পাহারা দিচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভ আসবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে। স্নেজ চালাবার ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা, ছুটে তার পাশে চলে এল নিয়াজ। ‘ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারের খবর কি, নিয়াজ?’ জিজ্ঞেস করল ও।

‘মহাশয়ের পশ্চাদেশে বোধহয় ব্যাখ্যা,’ ফাজলামি করে বলল নিয়াজ। ‘তুমি জেরা করার পর সেই যে হাউকাউ শুরু করেছেন, থামাথামি নেই। বিনয়ের স্নেজে এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন, যেন চেঙ্গিস খান। তোমার অনুমতি পেলে মনের খানিকটা ঝাল মেটানো যেত।’

‘পরে। জানো তো না কি উপাদানে তৈরি, ঘাঁটালে পিছিয়ে দেবে আমাদের।’ হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল রানা। উত্তর-পূব থেকে গাঢ় একটা আলোক বিন্দু এগিয়ে আসছে, সোজা ওদের দিকে। কুৎসিত একটা পাখির মত রাতের আকাশ চিরে আসছে ওটা, এখনও এত দূরে যে রোটর ডিস্ক দেখা গেল না বা এঞ্জিনের আওয়াজও শোনা গেল না।

‘হেলিকপ্টার! গেট আন্ডার কাভার...!’ একই সাথে সপাং করে উঠল রানার হাতের চাবুক। জোরে, আরও জোরে ছুটল



কুকুরগুলো, যেন বুঝতে পেরেছে সামনের প্রেশার রিজগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিতে হবে।

বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল নিয়াজ। ইভেনকো রুস্তভকে স্নেজ থেকে নেমে ছুটতে বলছে সে। ইহুদি ভদ্রলোক চলন্ত স্নেজ থেকে নামতে গিয়ে বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করার নেই, সবাই তাঁকে ফেলে এগিয়ে গেছে, নিজের ভাষায় অভিশাপ দিতে দিতে দাঁড়ালেন তিনি, লম্বা পা ফেলে ছুটলেন। দ্রুত এগিয়ে আসছে যান্ত্রিক ফড়িং, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। প্রথম বরফ-পাঁচিলের একটা ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে গেল রানার স্নেজ, একটা করিডরের ভেতর থামল কুকুরগুলো। পিছু পিছু করিডরে ঢুকল বিনয়ের স্নেজ, রুশ বিজ্ঞানী তখনও উন্মুক্ত বরফ প্রান্তরে, অথচ একেবারে কাছে চলে এসেছে রাশিয়ান হেলিকপ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ল নিয়াজ, জানে, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভের হাত ধরে হাঁচকা একটা টান দিল সে, তাকে নিয়ে ছুটল আবার। বরফ-পাঁচিলের কাছাকাছি এসে পিঠে ধাক্কা খেলেন ওশেনোগ্রাফার। নিরাপদ আড়ালে ছিটকে পড়লেন তিনি।

রুস্তভাসে অপেক্ষা করছে সবাই, কুকুরগুলো পর্যন্ত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে-হাঁপাচ্ছে।

খুব নিচে দিয়ে উড়ে আসছে রুশ ফড়িং, পাঁচিলের জন্যে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। বেশি হলে বরফ থেকে দুশো ফিট উঁচুতে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। পনেরো ফিট উঁচু বরফ-পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পাঁচিলের মাথা ওদের দিকে ঝুলে আছে ভাঙতে শুরু করা

চেউয়ের মত। এঞ্জিনের আওয়াজ এখনও বাড়ছে, নালার ভেতরটা কাঁপছে। হঠাৎ বামেলা শুরু করল বিনয়ের একজোড়া কুকুর। এই আওয়াজের ওপর ওদের ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক, কারণ হেলিকপ্টারই ওগুলোকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কুয়াশার কিনারায়। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সামনে ছুটতে চাইল কুকুর দুটো, রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চায়। একটার মাথায় প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল বিনয়, ঝট করে বিনয়ের দিকে ঘুরল সেটা, ভীতিকর ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। করিডরের ভেতর কুকুরগুলো ছোটোছুটি করলে ওপর থেকে ওগুলোকে দেখা যাবে। কিছু নড়াচড়া করলে সেটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

উদ্বেগের সাথে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, নিজের টীম ছেড়ে নড়তে পারছে না। পরবর্তী দৃশ্যটা বিস্মিত করল ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ইভেনকো রুস্তভ, হাত বাড়িয়ে বিদ্রোহী কুকুরটার গলায় হাত বুলাল, রুশ ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বলে অভয় দিল সেটাকে। শান্ত হয়ে গেল কুকুরটা, তার অপর সঙ্গী আদরটুকুতে ভাগ বসাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় করিডরের ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা ছায়া।

এতক্ষণ উদ্বেগ ছিল, এবার বাসা বাঁধল ভয়। নিজেদের অজান্তেই আবার দম বন্ধ করল ওরা। এমনকি কুকুরগুলোও চুপ হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ স্থির। হেলিকপ্টার দেখেনি কেউ, দেখেছে তার ছায়া। মনে হলো পশ্চিম দিকে উড়ে গেল সেটা। ‘আমি না ফেরা পর্যন্ত নড়বে না কেউ,’ নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল রানা। খানিক দূর হেঁটে এসে থামল ও, পাঁচিলের মাথা এখানটায় বেঁকে নেই। বরফের গায়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে, ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল

চুড়ায়।

নজর রাখার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা। ওর সামনে আরও অনেক প্রশ্নের রিজ চেউ খেলে রয়েছে, নিচুগুলোর ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে। আধ মাইল পর আবার শুরু হয়েছে সমতল বরফ। স্লেজ চলবে ওখানে চমৎকার, কিন্তু পথে রাশিয়ানরা রয়েছে।

দলগুলো ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বারোটা, একটার কাছ থেকে আরেকটা যথেষ্ট দূরে। বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তরের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, বহুদূর গ্রীনল্যান্ডের দিকে। দলগুলোর সামনে, একজোড়া হেলিকপ্টার উড়ছে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা কপ্টার ল্যান্ড করল সমতল বরফে, একটা স্লেজ টিমের কাছাকাছি। রোটর থামার আগেই ছড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল কুকুর। পিছু পিছু নামল লোকজন আর স্লেজ। ওদের কাজ সারার নৈপুণ্য আর দ্রুতগতি দেখে একরকম মুগ্ধই হলো রানা। দশ সেকেন্ড হয়েছে উঁকি দিতে শুরু করেছে ও, আবার আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার, কোর্স বদলে ফিরে চলল উত্তর-পূর্বে। করিডরে নেমে, সবার কাছে ফিরে এল রানা। প্রায় সাথে সাথেই ঝড় শুরু হলো—বিতর্কের!

‘যাক বাবা, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি,’ হাঁফ ছাড়ল বিনয়। মৃদু হাসল রানা।

‘ওদের আসল কাজ ছিল আরও স্লেজ টিম নামানো।’

রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল নিয়াজ। ‘মূর্তিমান দুঃসংবাদ।’

‘আরও স্লেজ!’ বিনয় হতভম্ব।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘পশ্চিম দিকে, আধ মাইলও হবে না, বারোটা পর্যন্ত সার্চ টীম গুনেছি। মাথার ওপর টহলে রয়েছে হেলিকপ্টার।’

‘এদিকে আসছে?’

মাথা নাড়ল রানা।

বিনয় জোর দিয়ে বলল, ‘তাহলে আমরা ওদের পিছু পিছু, আস্তে-বীরে যেতে পারি, কি বলো?’

আবার মাথা নাড়ল রানা। ‘প্যাকের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় খোলা, সমতল মাঠ দেখেছিলাম, মনে আছে? ওই মাঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওটা পেরোতে গেলেই দেখে ফেলবে। তারপর কি হবে ভাবতে পারো?’

‘দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে বলটু,’ মন্তব্য করল নিয়াজ।

অনিদ্রায় ক্লান্ত, প্লেন দুর্ঘটনার দৃশ্য এখনও ভুলতে পারেনি, তিজ্জমেজাজ নিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল বিনয়। ‘তুমি ভুল করছ, রানা,’ শান্ত সুরে বলল সে। ‘শুধু পশ্চিম দিকেই নিরাপদ আশ্রয় পাব আমরা। বাঁচতে হলে গ্রীনল্যান্ড উপকূলে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন ভয় নেই। রাশিয়ানরা তো আর গ্রীনল্যান্ড আক্রমণ করতে পারবে না।’

‘নিখুঁত প্ল্যান,’ বলল রানা। ‘শুধু...’

‘ভুলে যাওয়া হচ্ছে,’ রানার কথা কেড়ে নিয়ে বলল নিয়াজ, ‘রাশিয়ানরা পথে বাধা দেবে আমাদের।’

‘বরফের মাঠটা বিশাল, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব,’ যুক্তি দেখাল বিনয়।

‘হয়তো,’ বলল রানা। ‘কিন্তু হেলিকপ্টারগুলোকে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তাহলে তুমিই বলো কি করব আমরা?’ বাঁবোর সাথে জানতে চাইল বিনয়। ‘উত্তর দিকে গিয়ে ব্লাডি পোলে মারা পড়ব? পুবে গিয়ে আই.আই.ফাইভে কয়েদ হব, বলটু যেখানে অপেক্ষা করছে? দক্ষিণে...’

‘দক্ষিণে,’ মাথা বাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সাথে ওদের কথাবার্তা শুনছিল ইভেনকো রুস্তভ, হঠাৎ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘দক্ষিণে? এ তো স্রেফ পাগলামি...!’

‘আপনার সাথে কেউ আলোচনা করছে না,’ বিরজিভরে হাত ঝাপটা মেরে বলল বিনয়। রানার দিকে ফিরল আবার। ‘দক্ষিণে গেলে সোজা আইসফিল্ডের কিনারায় গিয়ে পৌঁছব আমরা, সোজা আইসবার্গ-অ্যালিতে। তারপর? স্লেজ পানিতে ভাসে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।’

মাথা নাড়ল নিয়াজ। ‘মাফ চাই, বাবা, এর উত্তর দেয়ার সাধ্য আমার নেই।’

‘মাথা ঠাণ্ডা করো, বিনয়,’ বলল রানা। ‘আইসব্রেকার কিউটে চড়ব আমরা। এরই মধ্যে আইসবার্গ অ্যালির দিকে রওনা হয়ে গেছে ওটা। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে ভেবে জেনারেল ফচের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থাটা আগেই করে রাখা হয়েছে।’

বিমূঢ় হয়ে পড়ল বিনয়। ‘তুমি সত্যি বিশ্বাস করো কিউটের দেখা পাব আমরা?’

‘টেম্‌ মেরিডিয়ান ধরে আসছে কিউট, নিজেদের পজিশন চেক করার জন্যে বার কয়েক তারাগুলোকে দেখে নিতে হবে।’ কথা শেষ করে নিজের টীম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, যেন আর কোন আলোচনা নেই।

‘দোস্তু বিনয় কি ফিউজ হয়ে গেল?’ কৌতূহল প্রকাশ করল নিয়াজ।

না, বিনয়ের কথা এখনও শেষ হয়নি। ‘তুমি এমন সুরে কথা বলছ, রানা, আমরা যেন ঢাকা থেকে গারো পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছি। তুমি ভাল করেই জানো, স্টার-ফিক্স নিখুঁত হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা যেন-এক পিনের মাথা আরেক পিনের মাথাকে খুঁজছে, মাঝখানে প্রায় একশো মাইল ফারাক।’

আরেকটু হলে হাততালি দিয়ে ফেলেছিল নিয়াজ। ‘তর্কবাগীশ বিনয়ের জুড়ি মেলা ভার।’

হাত তুলে নিজের স্লেজটা দেখাল রানা। ‘বিজ্ঞানের সামান্য একটু সাহায্য পাব আমরা। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের সাথে ইলিয়ট হোমিং বীকন রয়েছে। কিউট রেঞ্জের মধ্যে এসে গেলে রেডিফন সেট অন করে সিগন্যাল পাঠাব। কিউটে হেলিকপ্টার আছে, সিগন্যাল অনুসরণ করে আমাদের কাছে চলে আসবে ওটা। এবার সম্ভব?’

‘ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,’ মুখ ভার করে বলল বিনয়। নিয়াজের দিকে ফিরল সে। ‘তুমি কি বলো?’

‘সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই,’ বলল নিয়াজ। ‘আলোচনা শুরুর আগে, রানা সবচেয়ে খারাপ কি করবে বলে ভেবেছিলে তুমি?’

‘দক্ষিণ দিকে যেতে চাইবে...’

‘কাজেই বলটুও ঠিক তাই ভাববে,’ বলল নিয়াজ। ‘অর্থাৎ আমরা দক্ষিণ দিকে যেতে পারি এ-সম্ভাবনা তার মাথাতেই আসবে না।’

দস্তানা পরা হাত কচলাচ্ছে ইভেনকো। হঠাৎ রাগে বিস্ফোরিত হলো। ‘আপনার মধ্যে, মি. মাসুদ রানা, এ-ধরনের পাগলামি আমি আশা করি না!’

‘প্রতিভাবানরা একটু পাগলাটেই হয়,’ ফোড়ন কাটল নিয়াজ। ‘আপনি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারেন না?’

নিয়াজের কথায় কান না দিয়ে রানাকে আবার বলল ইভেনকো, ‘মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, কিন্তু...’

‘যদি অনুমতি দেন, ভুলটা সংশোধন করতে চাই,’ আবার নিয়াজই মুখ খুলল। ‘আসলে আপনি আস্থা এনেছেন আমেরিকানদের ওপর...’

‘তা সত্যি,’ স্বীকার গেল ইভেনকো। ‘মুক্ত দুনিয়া বলতে তো আমেরিকাকেই বোঝায়। কিন্তু মিস্টার মাসুদ রানার ওপরও আমার আস্থা আছে।’

‘আচ্ছা, বলুন তো, বাংলাদেশ কোথায়?’ সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল বিনয়।

মুখ খুলল ইভেনকো, তারপর আবার বন্ধ করল।

‘ঠিক আছে, বলুন তো, আপনার হিরো কোথায় মানুষ হয়েছে?’

‘অবশ্যই আমেরিকায়,’ বেশ জোর দিয়ে বলল ইভেনকো।

‘তা না হলে...’

নিয়াজ হাসল। ‘আপনি বিশাল সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বাংলাদেশ বা রানা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি জানেন না, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে আমেরিকার কোন অবদান ছিল না, বরং রাশিয়ার ছিল। যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না, তার ভক্ত হন কিভাবে? কিভাবে সে আপনার হিরো হয়? আসলে আমার কথাই ঠিক, আপনি আমেরিকার ভক্ত। রানা আমেরিকানদের পোষ্য ধরে নেয়ায় তারও আপনি ভক্ত হয়ে পড়েছেন।’

স্লানমুখে ইভেনকো বলল, ‘মি. রানা, আপনার সহকারী আমাকে সম্ভবত অপমান করছেন...’

তার এই অভিযোগের উত্তরে কেউ কিছু বলল না। বিনয় বলল, ‘আমেরিকাকে তো চেনেন না, ওখানে কিছু দিন থাকলে টের পাবেন...’

‘আমেরিকা এতই যদি খারাপ, আপনারা তাহলে তাদের কথামত আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ইভেনকো।

‘আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে,’ বলল নিয়াজ। ‘কাজটা আমরা নিতে চাইনি।’

‘অন্যান্য আরও কারণও আছে,’ বলল বিনয়, ‘সব আপনাকে জানানো সম্ভব নয়।’ এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, ‘দক্ষিণে যেতে আপত্তি থাকলে ফিরতি পথ ধরে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে পারেন আপনি। আপনার জন্যেই একের পর এক বিপদে পড়তে হচ্ছে আমাদের। আমাদের লীডার যা বলেছে তাই হবে। দক্ষিণেই

যাব আমরা।’

তাড়া লাগিয়ে কুকুরগুলোকে দাঁড় করাল বিনয়, পিঠে চাবুকের বাড়ি খেয়ে রানার স্নেজকে অনুসরণ করল ওগুলো। পাঁচ মিনিট এগোবার পর নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নিল ওরা। সমতল বরফ প্রান্তর ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল। একনাগাড়ে দু’ঘণ্টা ছুটল স্নেজ। নালা আর প্রেশার রিজ পেরোল একের পর এক। তারপর কিছু সময়ের জন্যে বিরতি। আগেই ঠিক করা ওয়েভলেঞ্চে সিগন্যাল পাঠাল নিয়াজ, এই সিগন্যালের জন্যে কার্টিস ফিল্ডে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জেনারেল ফচ।

‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...’

কার্টিস ফিল্ড থেকে উত্তর পাবার জন্যে পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরতে হলো। এতটা সময় লাগায় ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ল বৈকি, কারণ রশ্মি ঘাঁটি এন.পি. সেভেনটিনের মনিটর সেট রেডিওর অস্তিত্ব ও অবস্থান জেনে নিতে পারবে—অন্তত পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে নেয়া উচিত। ঝুঁকিটা না নিয়েও কোন উপায় ছিল না। পেলিকান শব্দটা দিয়ে জেনারেল ফচকে জানিয়ে দেয়া হলো ইভেনকো রশ্মি এখন রানার হাতে, ওয়াশিংটন সিটি ব্যাংকে রানা এজেন্সির অ্যাকাউন্টে এক বিলিয়ন ডলার জমা দিতে হবে। টাকাটা জমা পড়ল কিনা সে-খবর সময় মত পেয়ে যাবে রানা, সে-ব্যবস্থা করাই আছে। আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের মানে, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। রেডিফন এরিয়াল নামিয়ে সেটের ভেতর ঢোকাল নিয়াজ, তারপর আকাশের দিকে তাকাল।

‘দু’ঘণ্টার ভেতর কোন রাশিয়ান প্লেন দেখিনি,’ বলল সে।

বিনয়ের স্নেজ থেকে কথা বলল ইভেনকো, ‘আমেরিকান প্লেনও।’

‘আমেরিকান পাইলটরা শীতের ছুটিতে দেশে ফিরে গেছে,’ বলল নিয়াজ। ‘কিউটের ক্যাপটেন না গেলেই বাঁচি।’

\*

‘...আর্জেন্ট ইউ পেনিট্রেন্ট আইসফিল্ড ফর পসিবল রিসিভো। ম্যাক্সিমাম রিস্ক মাস্ট বি অ্যাকসেসেপ্টেড। রিপিট। মাস্ট বি অ্যাকসেসেপ্টেড।’

ওয়াশিংটন থেকে তিন দিন আগে পেলেও, এখনও মেসেজটাকে সহজভাবে নিতে পারছেন না ইউ.এস. নেভীর কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। ছ’হাজার পাঁচশো পনেরো টনী আইসব্রেকার কিউটের ক্যাপটেন তিনি। যতই তিনি ভাবছেন, মেসেজের শেষ অংশটুকু ততই তাঁকে উদ্ভিগ্ন করে তুলছে। চরম ঝুঁকি নিতে হবে কথাটার মানে কি? এদিকের পানিতে আসা মানেই তো চরম ঝুঁকি নেয়া! নাকি ওয়াশিংটনে বসে কর্তা ব্যক্তির ভাবেন বরফে চাপা পড়ে বা আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ না ডোবা পর্যন্ত প্রমাণ হয় না যে চরম ঝুঁকি নেয়া হয়েছে?

তেতাল্লিশ বছর বয়স ক্যাপটেনের, পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কাঁধ, চুল আর ভুরু কুচকুচে কালো। ভাবলেশহীন চেহারা, যদিও গম্ভীর দেখায় না। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা যায় শুধু যখন ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়েন। তখন তাঁর গলাও শুকিয়ে যায়, বিয়ারের ক্যান খুলতে হয় দু’চারটে।

‘একটু দেখবেন, স্যার?’ কেন্ রাসেল, মেট, রাডারস্কোপ-এর সামনে থেকে এক পা পিছিয়ে এসে কোটের কলার তুলে দিল

ঘাড়ে। কিউটের উঁচু ব্রিজ গরম রাখার জন্যে হিটিং সিস্টেম আছে, কিন্তু সিস্টেমে বোধহয় কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আর্কটিক আবহাওয়াই বোধহয় দায়ী। খোলা ডেকে অমানুষিক পরিশ্রম করছে একদল লোক, কোদালে বরফ তুলে জাহাজের কিনারা দিয়ে নিচে ফেলছে। যত ফেলছে ততই আবার জমছে, যেন ভোজবাজির মত বাতাসই হয়ে উঠছে নিরেট বরফ। সাত্ত্বনা এইটুকুই যে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে আইসব্রেকার। আর্কটিক সাগরের ভাসমান বরফখণ্ড তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ইচ্ছে করছে না, তবু রাডারস্কোপে চোখ রাখলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। তিন ঘণ্টা আগে শেষবার যখন রাবার হুডের ভেতর মাথা গলিয়ে তাকিয়েছিলেন, স্কোপে ব্লিপ দেখা গিয়েছিল। দূরত্ব আর দিক হিসেব করে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ব্লিপগুলো কোন জাহাজের নয়। উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পূর্বে কোন জাহাজ থাকতে পারে না। এবার কোন ব্লিপ দেখা গেল না। নিরেট, নিভাঁজ বরফ-রাজ্যে সব কিছুই যেন স্থির।

‘ব্যারিয়ার,’ কোন দরকার ছিল না, তবু বলল কেন্ রাসেল।  
‘একেবারে সামনে।’

মেসেজের শেষ অংশটার কথা আবার মনে পড়ে গেল কমান্ডারের।

ব্লিপ দেখতে না পাবার এটা একটা কারণ, জানেন তিনি—এই ব্যারিয়ার। আইসফিল্ডের নিরেট একটা প্যাঁচিল কিউটের পথে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ভাসমান বরফখণ্ডগুলোকে দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই প্যাঁচিলের দিকেই এগোচ্ছে

আইসব্রেকার। স্পিটবার্জেন থেকে গ্রীনল্যান্ড পর্যন্ত লম্বা এই প্যাঁচিল। মুশকিল হলো, যেভাবে হোক আইসফিল্ডে ঢোকার জন্যে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে তাদের। আইসফিল্ড সী লেভেল থেকে সামান্য একটু উঁচু কি উঁচু নয়, এরকম একটা জায়গা চাই। সামান্য উঁচু হলে কিউটের বো বরফ ভেঙে ঠিকই ঢুকে যাবে ভেতরে। আশার কথা এইটুকু, সামনে কি আছে দেখার জন্যে রাডার রয়েছে তাঁদের। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তিনি, ঈশ্বর, কুয়াশা দিয়ো না।

দু’ঘণ্টা পর আইসফিল্ড থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াশা উঠতে শুরু করল। ব্রিজের সামনে, ক্রিয়ার-ভিশন প্যানেলে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান, পালা করে ঘন ঘন সামনে আর ডেকের দিকে তাকাচ্ছেন। দুটোর একটা দৃশ্যও তাঁকে উৎসাহিত করল না। ফোর-পীকে দ্রুত বরফ জমছে, নতুন একটা দল হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে তবু। বরফ ঢাকা রেইলের ওপর দিয়ে গুঁড়ো বরফ ফেলছে তারা, যতটুকু ফেলছে তারচেয়ে জমছে বেশি। শূন্য থেকে টেমপারেচার পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে।

‘পোলার বেয়ার...!’

ব্রিজ থেকে স্টারবোর্ড সাইডে বরফ-প্রাচীরের মাথায় তাকিয়ে আছে মেট কেন্ রাসেল। ব্রিজের মতই উঁচু প্যাঁচিলটা, মাত্র কয়েক কেবল দূরে। নিচের ফোর ডেক থেকে মখ তুলে তাকাল লোকজন, প্যাঁচিলটাকে মনে হলো কোন দালানের খাড়া গা। চাঁদের আলোয় তিনটে ঝাপসা হলদেটে মূর্তি তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। আইসফিল্ডের কিনারায় তিনটে পোলার বেয়ার, কৃকের সদ্য ফেলা

আবজ্ঞনার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসেছে পাঁচিলের মাথায়।

খুব ধীরে চলছে এঞ্জিন, কিন্তু আওয়াজটা জোরাল আর নিয়মিত, বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তির লাগাম টেনে রাখা হয়েছে। এঞ্জিন ঠিক থাকলে যত বিপদই আসুক, তোয়াক্কা করেন না কমান্ডার। কিন্তু সামনের দৃশ্য তাঁর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। ‘রাসেল, খাঁচায় উঠে যাও। ওপর থেকে তাকালে তবে যদি ভেতরে ঢোকান পথ চোখে পড়ে।’ নির্দেশটা তিনি অনিচ্ছার সাথে দিলেন।

অনিচ্ছা নিয়েই একশো ফিট উঁচু মই বেয়ে খাঁচায় উঠে গেল মেট। মাস্তুলের মাথায় এটা কিউটের অবজারভেশন পোস্ট। কুয়াশা উঠছে, নিচের দিকে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রী, এই পরিস্থিতিতে আসমানের ওপর এই ঠাঁই নরকের চেয়ে কম কিসে। ছোট্ট একটা ঘর, চামড়া-মোড়া টুলে বসল রাসেল। বিয়ের পরদিন জরুরী ডাক পেয়ে কিউটে চড়ে সাগরে ভাসতে হয়েছে তাকে। বন্দরে ফিরে যাচ্ছিল, এই সময় আবার জাহাজের কোর্স বদলাবার আদেশ পায় ওরা। বন্দরে আর ফেরা হলো না। অথচ নতুন বউ বসে আছে ওর পথ চেয়ে। ক্যাপটেনের মতই, মাসুদ রানা নামের অচেনা লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করতে পারছে না রাসেল।

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে চোখ রেখে দ্রুত একবার সামনেটা দেখে নিল সে। মাথায় হারনেস গলাল, অ্যাডজাস্ট করল মাইক, তারপর কথা বলল ব্রিজের সাথে, ‘পজিশনে, স্যার। সামনে বড় একটা আইসবার্গ।’

‘দেখেছি আমরা,’ তার বেয়ে কমান্ডারের গলা ভেসে এল। ‘ঢোকান কোন পথ দেখছ?’

‘কোথায়! পাথুরে পাহাড়ের মত নিরেট, স্যার।’

‘দেখতে থাকো।’

খাঁচার ভেতর নিরাপদ সে, জানে রাসেল, তবু নানা রকম ভয় এসে বামেলা করতে লাগল। মাস্তুলটা যদি ভেঙে পড়ে? চোখ বুজল সে, সরাসরি নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরছে। হঠাৎ যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে? লোহার মই বেয়ে কোন রকমে একজন লোক উঠতে পারে, সে কি কাঁধে করে নামাতে পারবে অসাড় ভারী একটা দেহ? জোর করে চোখ মেলল সে, হাত বাড়িয়ে কাঁচের দেয়ালগুলো ছুঁয়ে আশ্বস্ত হতে চাইল। ব্রিজে থাকতে মনে হয়েছিল হিটিং সিস্টেম ভালমত কাজ করছে না, আর খাঁচায় ওঠার পর মনে হচ্ছে সিস্টেমটা কোন কাজই করছে না।

ডেক থেকে একশো ফিট ওপরে রয়েছে সে, চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল। জাহাজ চলছে বলে মনেই হয় না। ভাসমান বরফ আকারে এক একটা বাড়ি, ওপর থেকে জমাট চিনির বিরাট স্তূপের মত দেখতে লাগল। কিউটের বো ধাক্কা দিয়ে স্তূপগুলোকে ভাঙছে, ভাঙা টুকরোগুলো দু’পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে আইসব্রেকারকে। আরও সামনে ঝুঁকে আছে দৈত্যাকার পাঁচিল, মাথার দিকে তাকাতে হলে মুখ তুলতে হচ্ছে রাসেলকে। আপাত দৃষ্টিতে অচল, যেন সাগরতলে নোঙর ফেলে আছে। কিন্তু আইসবার্গ থেমে নেই, ভেসে চলেছে দক্ষিণ দিকে। উল্টো দিকে, উত্তরে চলেছে কিউট।

প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে ঝুঁকে দু’পাশে তাকাল রাসেল। ওর ওপরে, বড়সড় রাডার উইং সমান গতিতে ঘুরে চলেছে, অনবরত ওয়ার্নিং ইকো ট্রান্সমিট করছে ব্রিজের হুড

পরানো স্কোপে। স্টারবোর্ডের দিকে ধীরবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে বরফ-পাঁচিল। পাঁচিলের মাথা থেকে পোলার বৈয়ারগুলো অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। নিচের ডেকে এত বেশি বরফ যে জাহাজ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, সাগর আর জাহাজের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। সুইচ অন করে মেসেজ পাঠাল সে, ‘ঘন কুয়াশা আসছে, স্যার। সিকি মাইল দূরে, নাক বরাবর।’

ত্রিশ মিনিট পর, এক অর্থে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল রাসেল। ঘন কুয়াশায় কিছুই সে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কামড় খেয়ে হাত আর পায়ে যে অসাড় ভাব দেখা দিয়েছিল, সেটা এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রক্ত চলাচল চালু রাখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, জগিং শুরু করল। কাঁচের দেয়ালগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। বাইরের কিছু দেখার একটাই মাত্র উপায় আছে, ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেল। কিন্তু প্যানেলে তাকিয়ে কুয়াশা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার। নিচে তাকিয়ে ডেক দেখতে চেষ্টা করল। নেই।

ভয় হতে লাগল, কোথায় রয়েছে সে! সাত আসমানে, নাকি অন্ধকার রাতে কোন প্লেনের কেবিনে?

‘তুমি বরং নেমে এসো, রাসেল,’ আদেশ করলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান।

‘কিন্তু যদি কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করে...’

‘বেশ। পনেরো মিনিট। তারপর নেমে এসো।’

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে গাল চেপে ধরে তাকাল রাসেল। মনে হলো বরফে ছাঁকা খেলো গালের চামড়া। কাঁচের গা ভিজে গেছে, তার ওপর কুয়াশায় ঝাপসা, কিছুই দেখতে পেল না। জাহাজ প্রায়

অচলই বলা চলে, রাডার উইং-এর সাহায্যে ধীর, অতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে-টের পাওয়া যায় কি যায় না। সামনে যদি কোন আইসবার্গ থাকে, রাডারের ধাতব চোখ প্রতিধ্বনি পাঠিয়ে সতর্ক করে দেবে।

কিন্তু রাডার মেকানিজম এই আবহাওয়ায় নির্ভুলতার কোন রকম গ্যারান্টি দেয় না, ডেপুটি মেট বেন ক্যাফম্যানের সে-কথা ভাল করেই জানা আছে। অভিজ্ঞ রাডার অপারেটর সে, ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্কোপে। পিং পিং পিং আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ। ওই আওয়াজ শুনেই শুধু বোঝা যাবে বড়সড় কিছু একটা রয়েছে বো-র সামনে।

একঘেয়ে শব্দে নামেমাত্র চালু রয়েছে ইঞ্জিন। জাহাজের সবচেয়ে লম্বা আর নিঃসঙ্গ মানুষ, কেন্ রাসেল, ঢেউ খেলানো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকল সম্মোহিতের মত।

‘রাসেল?’ ব্রিজ থেকে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

‘কিছুই রিপোর্ট করার নেই, স্যার।’ চারদিকের দেয়ালে গাল চেপে ধরে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রাসেল। মনে হলো সামনের কুয়াশা একটু যেন পাতলা হতে শুরু করেছে। এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তবে গাঢ় কুয়াশার ভেতর নতুন ধরনের একটা আলোড়ন পরিবর্তনের আভাস দেয়। ক্ষীণ একটু বাতাস বইছে না তো? লাফানো বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল সে। আবার প্যানেলে মুখ-গাল চেপে ধরল। হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই; কিছু একটা তাড়া করছে কুয়াশাকে।

পিং পিং সতর্ক-সঙ্কেত অনেক দেরিতে এল, এল হঠাৎ করে। স্কোপের কাঁটা এক নিমেষে পুরো এক চক্রর ঘুরে গেল, আচমকা



ফুটে উঠল নতুন একটা আকৃতি। ঝট করে মাথা তুলল বেন ক্যাফম্যান। চিৎকার দিল।

কেন্ রাসেল বোধহয় আসতেই দেখেনি ওটাকে। যদি দেখেও থাকে, তারপর আর আধ সেকেন্ডও সময় পায়নি। বরফের থাবা, পাঁচিলের মাথা থেকে লম্বা হয়ে কিউটের পথ পর্যন্ত বেরিয়ে আসা বাহু ডেক থেকে আশি ফুট উঁচু ছিল। ধীরগতিতে হলেও, সরাসরি সেই থাবার মধ্যে গিয়ে পড়ল আইসব্রেকার। মাস্তুলটা ঘঁ্যাচ করে কেটে গেল, অবজারভেশন পোস্ট আর রাডার উইং সহ মাস্তুলের মাথা নিচের অংশ থেকে চোখের পলকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে সংঘর্ষের আওয়াজ পেল ওরা, আর্টচিৎকার বেরিয়ে এল ক্যাফম্যানের গলা চিরে। খাঁচার ভেতর বন্দী কেন্ রাসেল প্রায় একশো ফিট ওপর থেকে স্টারবোর্ড সাইডে পড়ল। ডেক রেইলের গায়ে ধাক্কা খেলো খাঁচা, ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল, একটা টুকরো রাসেলকে নিয়ে ঝপ করে পড়ল হিম পানিতে। রাডার সহ মাস্তুলের মাথার ওজন হবে পাঁচ টন, পানিতে পড়ার সাথে সাথে তলিয়ে গেল। সাগরের গভীরতা এখানে নয় থেকে দশ হাজার ফিট।

নিহতদের তালিকায় যোগ হলো আরও একজনের নাম। তাকে নিয়ে এরইমধ্যে মারা গেছে বিশজন। বাকিরা-সিকিউরিটি গার্ড পিটার আন্তভ, মাইকেল জনসন, ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের মোলোজন আরোহী, এবং ড. কর্ডন।

কিউট এখন অন্ধ। রাডার নেই। তাকে গ্রাস করেছে কুয়াশা, ঘিরে আছে বরফ। আইসফিল্ডের কিনারায় আটকা পড়েছে আইসব্রেকার, যে আইসফিল্ডকে ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

যে-কোন বিচারে, চরম ঝুঁকি নিয়ে এত দূর চলে এসেছে কিউট, যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছে। আর কত? যে যাই বলুক, এরপর আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। কমান্ডার হ্যারি গোল্ডের সামনে একটাই পথ এখন খোলা-বো ঘুরিয়ে নিয়ে বন্দরে ফিরে যাবার চেষ্টা করা।

কার্টিস ফিল্ডে উৎসবমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। কোড-সিগন্যাল-‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান’ রিসিভ করেছেন জেনারেল ফচ, আনন্দে বগল বাজাচ্ছেন তিনি। ‘ইভেনকো রপ্তভ আমাদের হাতে! রানা তাকে নিয়ে দক্ষিণে আসছে কিউটে ওঠার জন্যে।’

কার্টিস ফিল্ডে ছোট্ট অফিসটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে জেনারেলকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। জানালার নিচে তিনটে হিটার জ্বলছে, ভেতরটা গরম। সিগন্যাল এই একটাই পাননি তিনি।

তাঁর সহকারী টমাস উড দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বসের দিকে তাকিয়ে আছে।

পায়চারি করতে করতে জেনারেল আবার বললেন, ‘আই.আই.ফাইভের পশ্চিমে গিজগিজ করছে রাশিয়ান সিকিউরিটি।’ নিভে যাওয়া চুরটে ঘন ঘন টান দিলেন, জ্বলজ্বল করছে মুখের চেহারা। ‘বরফের ওপর হেলিকপ্টার রয়েছে ওদের, প্যাকে রয়েছে স্লেজ-টীম। স্লো-ক্যাটও আছে।’

‘পরিস্থিতি ঘোলাটে,’ মন্তব্য করল টমাস।

‘ওয়াশিংটনে বসে বলেছিলেন, অপারেশনটা পানির মত সহজ,

মনে আছে?’ খেঁকিয়ে উঠলেন ফচ। ঘরে ঢুকল এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলার হাওয়ার্ড ম্যাকলিন। ‘ঠিক সময়েই এসেছ। উপকূল আর আই. আই. ফাইভের মাঝখানে গোটা এলাকায় ইনটেনসিভ এয়ার সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। যে মেশিনগুলো তুমি পাঠিয়েছ, তিন ভাগের এক ভাগ নজর রাখবে আই.আই. ফাইভের উত্তরে...’ সাথে করে নিয়ে আসা ম্যাপটা দেয়ালে আগেই ঝোলানো হয়েছে, সেটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘এখানে...আর এখানে।’

‘দক্ষিণে?’ জিজ্ঞেস করল হাওয়ার্ড ম্যাকলিন।

‘না! নন-স্টপ সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। পাইলটরা যাবে, ফিরবে, ফুয়েল নেবে, আবার যাবে...কোন বিরতি ছাড়া চলতেই থাকবে এভাবে।’

‘কিন্তু পাইলটদেরও একটা সহায়কতা আছে...’, প্রতিবাদের সুরে শুরু করল হাওয়ার্ড।

‘সেটা কতটুকু, জানার এমন সুযোগ আর পাবে না,’ উত্তরে বললেন জেনারেল ফচ। ‘জানার পর সেটা আরও বাড়িয়ে নিতে বলবে।’

‘বুঝলাম না,’ হাওয়ার্ড বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করল টমাস, ‘রানা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তাহলে উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠাবার মানে কি?’

‘তুমি যখন বোঝোনি, বলটুয়েভও বুঝবে না। পোলার প্যাকে রানাকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ভাগ্য যদি না সহায় হয়। কাজেই সে-চেষ্টা বাদ দিচ্ছি আমরা। তার বদলে রাশিয়ানদের ভুল বোঝাবার কাজটা জরুরী।’ জানালার

বাইরে দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল, রোটর আর এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন জেনারেল। ‘বরফের ওপর বলটুয়েভের হেলিকপ্টার আছে, দু’ঘণ্টার মধ্যে আমাদের প্লেনের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে ওদের পাইলটরা।’

‘বেশ। তারপর?’

‘কি ভাববে বলটু? ভাববে, আমেরিকানরা ইভেনকো রুস্তভকে খুঁজছে। ভাববে, কোথায় তাকে খুঁজতে হবে আমেরিকানরা তা জানে।’

‘ফলে দক্ষিণ থেকে সে তার হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনবে?’

‘ঠিক তাই। রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে আসার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে রানা।’

মাথা ঝাঁকাল টমাস। ‘প্ল্যানটা ভাল, তবে...’

‘ভাল নয়, চমৎকার!’ ধমকে উঠলেন জেনারেল। ‘বলটুকে আসলে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি আমরা—রানা উত্তর বা পশ্চিম দিকে যাচ্ছে!’

## তিন

‘উত্তর না পশ্চিম?’

রুশ আর্কটিক ঘাঁটি, এন.পি.সেভেনটিন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপনমনে বিড়বিড় করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। টেবিলে পকেট সংস্করণ দাবার ছক মেলা রয়েছে, পাশে একটা

খোলা বই। উনিশশো ছেষটি সালে সান্তা মোনিকায় ফিশার-স্প্যাসফি দাবা খেলার রেকর্ড রয়েছে বইটায়। উর্বর মস্তিষ্ক, তিনটে কাজ একসাথে সারতে পারে বলে প্রায়ই গর্ব করে কর্নেল। এই যেমন এখন-নিজের খেলা খেলছে, আরেকজনের খেলা পরীক্ষা করছে, সেই সাথে চলতি অপারেশন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করছে।

‘সব ক’টা হেলিকপ্টার আকাশে,’ চেয়ারের পিছন থেকে রিপোর্ট করল জুনায়েভ। ‘আই.আই.ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর রাখছে ওগুলো-সব ক’টা, শুধু ছয়টা বাদে। এই ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছেন।’

মার্কিন স্নো-ক্যাট র‍্যাম্পে ধ্বংস হবার পর আই.আই.ফাইভ থেকে দ্বিতীয়বার ঘুরে এসেছে ওরা। দেখে এসেছে বরফ-দ্বীপ পরিত্যক্ত, কেউ নেই সেখানে। বলটুয়েভের জানার কথা নয়, গুন্টার রডেনবার্গ আর জেমস কাজম্যান রয়ে গেছে ওখানে। ইভেনকো রুস্তভ যদি আসে, ভেবে ছোট একটা ডিটাচমেন্ট ওখানে রেখে এসেছে কর্নেল। এন.পি.সেভেনটিনে ফিরে আসার পরপরই লেনিনগ্রাদ রেকর্ডস থেকে একটা মেসেজ পায় সে। মেসেজটা তাকে হতভম্ব করে তোলে।

‘আমরা যে বারবার রানার দল রানার দল করছি, জানো ওরা ক’জন?’ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কর্নেল। ‘লেনিনগ্রাদ থেকে খবর এসেছে, নিয়াজ আর বিনয়, মাত্র এই দু’জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে আর্কটিকে এসেছে মাসুদ রানা।’

‘মাত্র তিনজন? ইভেনকো রুস্তভকে নিতে এসেছে?’ জুনায়েভের চেহারায় রাজ্যের অবিশ্বাস।

‘হ্যাঁ, তিনজন খুব কম লোক,’ বলল কর্নেল। ‘কিন্তু কোন কোন লোক একাই অনেক, এ-কথা জানো তো? ওদের দু’জনকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো জন ধরো, আর রানা একাই একশো-কত হলো? সংখ্যায় তিনজন, কিন্তু শক্তিতে দুশো। এবার সুবিধেগুলো হিসেব করো। সংখ্যায় কম, কাজেই কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় কম। ইভেনকো সাথে থাকলে চারজন, চারজন লোককে পোলার প্যাকে খুঁজে পাওয়া সহজ, না কঠিন, জুনায়েভ? কতটুকু কঠিন?’

‘প্রায় অসম্ভব, কর্নেল কমরেড।’

‘বারবার প্রমাণও হচ্ছে তাই,’ বলল কর্নেল। ‘দু’দিন আগে যে ছবিটা তোলা হয়েছে, মনে আছে? একদল লোক কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে পড়ছিল?’ হঠাৎ করেই মেঝেতে পা ঠুকল সে। ‘সব ক’টা কপ্টারকে কোডেড সিগন্যাল পাঠাও-ওরা আসলে ছোট একটা দলকে খুঁজছে। সম্ভবত একজোড়া স্লেজ-টীম আর চারজন লোক।’

‘যে ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছিলেন...’

‘ওগুলো দক্ষিণে যাবে-আই.আই.ফাইভের দক্ষিণে।’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, আমেরিকানরা উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর...!’

কর্নেল হুঙ্কার ছাড়ল, ‘এখনও তুমি যাওনি?’

একা হতেই পায়চারি শুরু করল সে। কিছু উদ্ভট সিদ্ধান্ত কখনোই সে ব্যাখ্যা করে না। জেনারেল দ্য গলের মত নিজের চারপাশে রহস্যের একটা অদৃশ্য বলয় তৈরি করে রাখতে পছন্দ করে। পরে যদি সিদ্ধান্তগুলো ভুল প্রমাণিত হয়, গা বাঁচানোর পথ খোলা থাকে। কি সে করতে চাইছিল তাই যদি কেউ না জানে, কোথায় ভুল করেছে ধরবে কিভাবে?

তবে কর্নেলের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা। মারমানস্ক থেকে বাইসন বন্মারে চড়ে আসার সময় জেনারেল ফচের ডোশিয়ে পড়েছে সে। জেনারেল ফচ ডিসেপশন অপারেশনে স্পেশালিস্ট। এ-ব্যাপারে মাসুদ রানা আরও এক কাঠি বাড়া। আমেরিকানরা আই.আই. ফাইভের উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠিয়েছে, এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্য করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়, ওদিকের এলাকাগুলো চেক করা না হলে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। কিন্তু আসলে দক্ষিণ দিকটাই তার মনোযোগ কাড়তে শুরু করেছে।

খানিক পর ফিরে এল জুনায়েভ। ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করেছে ওগুলো।’

‘চমৎকার! এবার হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভায় সিগন্যাল পাঠাও, আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটের পজিশন জানতে বলো ওদের।’

আবার বিস্ময় বোধ করল জুনায়েভ, কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস হলো না। ব্যস্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কেন যেন মনে হলো কর্নেলের, রানার সাথে অচিরেই আবার দেখা হতে যাচ্ছে তার। ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। পায়চারি থামিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ঘোড়ার চাল দিল আড়াই ঘর।

রানা কোন যুক্তি মানছে না। বলা ভাল, যেন পণ করেছে কারও কথাই শুনবে না ও। সহকর্মী আর কুকুরগুলোকে অমানুষিক খাটাচ্ছে, গোঁয়ারের মত জেদ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের

দিকে। কড়া নির্দেশ, কোন কারণেই থামা চলবে না। না বিশ্রামের জন্যে, না কিছু মুখে দেয়ার জন্যে। জোড়া স্নেজ-টীম টেবু মেরিডিয়ান ধরে বিরতিহীন ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে, ক্রমশ কাছে চলে আসছে আইসফিল্ডের কিনারা, আইসবার্গ অ্যাগলি।

চারদিক থেকে ওদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে প্রেশার রিজ, এবড়োখেবড়ো বরফের বিশাল প্রাচীর একেকটা। নালা-পথ ধরে ছুটছে কুকুরগুলো, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে সাদা প্রকৃতি। নিজের স্নেজ-টীম নিয়ে সামনে রয়েছে রানা, নির্দয়ভাবে মুহূর্মুহু চাবুক মারছে কুকুরগুলোর পিঠে। প্রাণপণে ছুটছে ওগুলো, শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে। বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছে বিনয়ের টীম, তার পাশে থাকার জন্যে ঝড়ের বেগে ছুটতে হচ্ছে নিয়াজকে।

‘এর কোন মানে হয়?’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘ওর সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বিনয়।

ছোট্ট গতি বাড়িয়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ। ‘রানা, কুকুরগুলোর বিশ্রাম দরকার। এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না...’

ফার ছড়ের ফাঁকে যতটুকু দেখা যায়, কঠোর রানার চেহারা। বার কয়েক সপাং সপাং করে উঠল হাতের চাবুক। কুকুরগুলো আরও একটু বাড়িয়ে দিল ছোট্ট গতি। সামনে মোড় নিয়েছে নালা, গতি যাতে মন্থর না হয় সেজন্যে বারবার চাবুক মারল রানা। মাত্র একদিকের রানার-এ ভর করে বাঁক নিল স্নেজ, বরফের ছাল তুলে একই গতিতে ছুটল। নিয়াজের কথা যেন

শুনতেই পায়নি ও।

‘আরেকবার ভাবো,’ অনুরোধের সুরে বলল আবার নিয়াজ।  
‘আমাদেরও বিশ্রাম দরকার। কিউট এখনও অনেক দূরে। আজ রাতে ওখানে আমরা পৌঁছুতে পারব না...!’

পাল্টা চিৎকার করল রানা, ‘বাঁচতে হলে ছুটতে হবে। তোমরা চাও বিশ্রামের জন্যে থেমে চির বিশ্রামের ঝুঁকি নিই?’

‘রুস্তভ সাহেবের কথা ভেবে দেখেছ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।  
‘উনি আর পারছেন না।’

তাড়াতাড়ি পিছন দিকে তাকাল রানা। বিনয় আর তার স্নেজ-টীমের পিছনে রয়েছে ইভেনকো রুস্তভ। পিছিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা, তবে ছুটছে এখনও। নজর বুলিয়েই বুঝল রানা, ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। একটু হয়তো নিষ্ঠুর, কিন্তু কৌশলটা কাজ দিচ্ছে, ভাবল ও। ওরই নির্দেশে সবার পিছনে থাকতে হয়েছে রুশ বিজ্ঞানীকে। যে-কোন একটা স্নেজে জায়গা দেয়া যেত তাঁকে, কিন্তু হিতে বিপরীত হত তাতে, গোটা দলটাকে পিছিয়ে দিত লোকটা। এরইমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের স্বভাবই হলো প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁত বের করে জেদ ধরা। স্নেজে ঠাঁই না পাওয়ায় সারাক্ষণ তার মনে একটা ভয় কাজ করছে, তাকে একা ফেলেই না চলে যায় ওরা। তিন ঘণ্টা আগে রানা বলেছিল, ‘ওঁকে একটা আতঙ্কের মধ্যে রাখতে হবে, তা না হলে প্রতি পদে বাধা দেবেন উনি।’

‘ওঁর বয়স হয়েছে...’, আবার শুরু করল নিয়াজ।

‘ব্যাপারটা যে পিকনিক পার্টি হবে না, জেনেই নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়েছেন উনি,’ বলল রানা। ‘দু’চারবার আছাড় না খাওয়া

পর্যন্ত ওঁর সাথে কেউ কথা বোলো না। আমার সাথেও নয়,...স্নেজ চালাচ্ছি।’

পিছিয়ে পড়ল নিয়াজ। রানার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, কারও কথা শুনবে না। ওর সাথে সামনে ছোট্টা ছাড়া উপায় নেই।

আসলে রানার মেজাজ মোটেও বিগড়ায়নি। নিয়াজকে চুপ করাবার সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিয়েছে ও। বিশ্রামহীন এই ছুটে চলা, এ-ও যুক্তিহীন কোন জেদ নয়। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখেছে রানা, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল কোন রাশিয়ান হেলিকপ্টার দেখেনি ওরা। কারণটা ওর জানা নেই। তবে চাঁদের আলোয় আকাশ পরিষ্কার থাকায় সুযোগটা হাতছাড়া করা চলে না। যতটা সম্ভব দক্ষিণে সরে যেতে হবে ওদের। তবেই যদি বলটুয়েভের হেলিকপ্টারগুলোকে ফাঁকি দেয়া যায়।

কিউটের সাথে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না রানা, ভেবে রেখেছে। কাউকে বলেনি, কারণ তর্ক বেধে যাবে। ওর নিজের মনেও সন্দেহ আছে, আজ রাতে কিউটের দেখা না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে আশা ছাড়েনি এখনও। সবাইকে নিয়ে এভাবেই সামনের দিকে ছুটবে ও, যতক্ষণ না কিউটের সাথে যোগাযোগ হয়। কিংবা যতক্ষণ না কুকুরগুলো বরফের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এক ঘণ্টা পর দক্ষিণ-পূবে উঁকি দিল আমেরিকান প্লেন।

‘হল্ট!’

পিছনের ওদেরকে সাবধান করার জন্যে ঝট করে হাত তুলল

রানা, সীসার মত ভারী লাগল হাতটাকে। কুকুরগুলোকে দাঁড় করিয়ে নিয়াজের হাতে চাবুকটা ধরিয়ে দিল, তারপর বাঁ দিকের প্রেশার রিজে ওঠার জন্যে খামচাখামচি শুরু করল। যেখানেই পা রাখে, ভেঙে যায় বরফ। দস্তানা পরা হাত পিছলে নেমে আসে। এতই ক্লান্ত, মনে হলো কয়েক সেকেন্ড নয়, কয়েক বছর ধরে পাহাড়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ও। দূর থেকে ভেসে আসা এঞ্জিনের আওয়াজ জোর তাগাদা দিচ্ছে—তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! আওয়াজটা অন্য রকম, সোভিয়েত হেলিকপ্টারের ভোঁতা ভট ভট নয়। একরোখা চেষ্টায় অবশেষে পাঁচিলের মাথা নাগালের মধ্যে চলে এল। তারপর খুব সহজেই উঠতে পারল রানা। নাইট-গ্লাস চোয়াল আর বুকের মাঝখানে আটকে গিয়েছিল, ব্যথাটা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না। গ্লাস জোড়া চোখে তুলে দূরে তাকাল।

স্থির হয়ে থাকা ঢেউ আকৃতির প্রেশার রিজের প্রায় শেষ সীমানায় চলে এসেছে ওরা, খানিক সামনে থেকে শুরু হয়েছে জমাট সাগরের সমতল বিস্তার। দু'হাজার ফিট ওপরে রয়েছে প্লেনটা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যাচ্ছে, একটু পর ওদের আধ মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। ফোকাসিং মেকানিজম হাতড়াতে শুরু করল রানা—আমেরিকান, না রাশিয়ান? কাঠামোটা ঝাপসা দেখাল, ভাবল ফোকাস অ্যাডজাস্ট হয়নি। তারপর বুঝল, তা না, আসলে ক্লান্ত চোখ অসহযোগিতা করেছে। হাত দিয়ে রগড়ে আবার গ্লাসে চোখ রাখল, লেন্সে পরিষ্কার ধরা পড়ল প্লেন, ফিউজিলাজে সাদা তারকা-চিহ্ন আঁকা। মার্কিন!

‘নিয়াজ! স্মোক ফ্ল্যায়ার! জলদি! আমেরিকান...’

নালায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আনন্দ আর বিস্ময়ের ধাক্কায় এক

সেকেন্ড কেউ নড়তে পারল না। ইতিমধ্যে প্রথম ডগ-টীমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইভেনকো রশ্মিভ, তার হাতে হ্যান্ডেলবার আর চাবুক ধরিয়ে দিয়ে স্মোক ফ্ল্যায়ার খুঁজতে শুরু করল নিয়াজ।

‘জলদি!’ তাগাদা দিল রানা।

ফ্ল্যায়ার নিয়ে পাঁচিলে উঠতে চেষ্টা করল নিয়াজ। অর্ধেকটা উঠল, রানার বাড়ানো হাতে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে পা পিছলে নেমে এল নালায়। দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ভাগ্য আর প্রকৃতি নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে ওদের নিয়ে।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠতে পারল নিয়াজ, আগেই তার কাছ থেকে স্মোক ফ্ল্যায়ার নিয়ে নিয়েছে রানা। কিন্তু হাত দুটো ঠাণ্ডায় অসাড়া হয়ে আছে, বারবার পড়ে গেল ফ্ল্যায়ারটা। বার কয়েক চেষ্টা করার পরও জ্বলল না। টেঁচিয়ে উঠল রানা, ‘এটা নষ্ট, আরেকটা দাও!’

ছুটে রানার স্নেজের কাছে চলে এল বিনয়, নিয়াজও খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এল নালায়। ওরা যখন ফ্ল্যায়ার খুঁজছে, প্লেনের ডানায় লাল আর সবুজ আলো ঘুরতে শুরু করেছে। নতুন কোর্স ধরে দক্ষিণ দিকে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে প্লেন। ‘জলদি করো, ফর গডস সেক!’ গর্জে উঠল রানা। বিনয়ের হাতে একটা ফ্ল্যায়ার দেখল ও। ‘ওখান থেকেই, ওখান থেকেই—তাড়াতাড়ি!’

জ্বলে উঠল ফ্ল্যায়ার, গাঢ় ধোঁয়া ছাড়ল, শান্ত বাতাস ভেদ করে হুস করে উঠে গেল আকাশে। লাল আর নীল আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। প্রতিমুহূর্তে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সাথে আরও দূরে সরে যাচ্ছে প্লেনটাও। প্রতি মুহূর্তে ছোট হয়ে আসছে সেটা। চাঁদের আলোয় এক সময় খুদে একটা বিন্দুর মত

দেখাল ওটাকে। বরফের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচিলের মাথায়, রানার পাশে উঠে এল বিনয় আর নিয়াজ।

‘এখনও চলে যায়নি...’ যেন নিজেকে আশ্বাস দিল নিয়াজ। ‘পিছন দিকে তাকাও, ভাই,’ পাইলটের উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করছে সে। ‘চোদ্দপুরুষের দোহাই লাগে, একবার পেছন ফেরো!’ ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল রূপালি বিন্দুটা। শুধু এঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল আরও কিছুক্ষণ, তারপর সেটাও মিলিয়ে গেল দূরে।

‘রুটিন ওয়েদার ফ্লাইট,’ বলল রানা। ‘আমাদের খোঁজে আসেনি।’

‘অবজারভার লোকটাকে ধরতে পারলে চড় লাগাব,’ রাগে ফুঁসে উঠল বিনয়। ‘আমাদের বোধহয় রেডিও ব্যবহার করা উচিত ছিল।’

‘পাগল নাকি!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। ‘রেঞ্জের মধ্যে কিউট না এলে রেডিও ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। সামনে সেট নিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত অপারেটর, রেডিও অন করলেই লোকেশন জেনে ফেলবে। গेट রেডি!’

নিঃশব্দে রওনা হলো ওরা, মাথার ওপর এখনও জ্বলজ্বল করছে লাল নীল আলোকমালা। সবাই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে, এমনকি কুকুরগুলোকেও বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। দুর্গম পথ পিছনে ফেলে সমতল জমি সাগরে নেমে এল স্লেজ, এখন থেকে খুব দ্রুত আর সহজে এগোনো যাবে, তবু মন খারাপ সবার।

আসলে হতাশা আর ক্লান্তিতে রানার বুদ্ধিশুদ্ধি খানিকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। হাড়ের প্রতিটি জয়েন্টে টনটনে ব্যথা, অসাড় পেশী,

চোখ জোড়া এমন জ্বালা করছে যেন লংকাগুঁড়ো ঘষে দিয়েছে কেউ। হ্যান্ডেলবার ধরে আছে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে মুঠো থেকে ছুটে যেতে পারে। ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। শুধু বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহে ছুটে চলেছে ও সামনে। শরীরের শেষ শক্তিতুকু থাকতে থামা চলবে না ওদের। শুধু নিজের কথা নয়, সবার কথাই ভাবতে হবে ওকে।

‘লুক আউট!’ গলা ফাটল নিয়াজ।

‘কেউ নড়বে না!’ বিস্ফোরিত হলো রানা।

অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল স্লেজ দুটো। ওদের পিছনে আর্কটিক রাতের নিস্তব্ধতা এঞ্জিনের ভোঁতা ভট ভট আওয়াজে ভেঙে খান খান হলো। তারপর ছায়াটা দেখা গেল। স্থূল আকৃতির কালো ছায়া। জোড়া রোটর, একটার ওপর আরেকটা। লেজের দিকে একজোড়া ফিন। ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপর দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। টুইন জেট সাবমেরিন কিলার। রাশিয়ানদের লেটেস্ট হেলিকপ্টার।

‘খোদার দোহাই, নোড়ো না কেউ!’ আবার সাবধান করল রানা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, সেই সাথে বাঁক নিতে শুরু করে আরও ওপরে উঠছে। রুশ আরোহীরা ওদেরকে নাও দেখে থাকতে পারে। আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল গতিতে উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে, আচমকা প্রেশার রিজের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসেছিল খোলা প্রান্তরে-ওদেরকে দেখতে পাবার জন্যে রুশ অবজারভারের তীক্ষ্ণ চোখ থাকতে হবে। কয়েক সেকেন্ড পর জানা গেল, তাই আছে। ফিরে আসছে হেলিকপ্টার।

সর্বনাশ ঘটিয়েছে স্মোক ফ্লয়ার। আমেরিকান পাইলটের

চোখে ধরা না পড়লেও, কাছাকাছি কোথাও থেকে রুশ হেলিকপ্টারকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ফিরে আসছে। আগের চেয়ে ধীর গতিতে আসছে, অনেক উঁচু দিয়ে। তারমানে শুধু যে স্লেজগুলো দেখেছে তাই নয়, কাঁধে ঝোলানো রাইফেলগুলোও দৃষ্টি এড়ায়নি। তা না হলে পঞ্চাশ ফিট থেকে দুশো ফিটে উঠে যেত না।

‘কি করবে ওটা?’ জিজ্ঞেস করল বিনয়।

‘কতজন লোক আছে তার ওপর নির্ভর করে,’ বিড়বিড় করল রানা।

দলের দায়িত্ব নিয়াজকে দিয়ে খানিক দূরে সরে দাঁড়াল ও, একা। রাইফেলটা হাতেই থাকল। আজরাইলের মত এগিয়ে এল স্থলকায় সাবমেরিন কিলার। মাথার ওপর চলে আসার পর মনে হলো, রোটরের আওয়াজে পায়ের নিচে বরফ কাঁপছে। রাইফেল তুলল রানা, মাজল্ অনুসরণ করল কিলারকে।

শূন্যে স্থির হতে যাচ্ছিল কিলার, রানার ভাবগতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে একদিকে কাত হয়ে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল, পিছনে রেখে গেল সাদাটে ধোঁয়া।

কিন্তু না, এত সহজে বিদায় নিতে ফিরে আসেনি পাইলট। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঘুরতে লাগল কিলার। ওটার ওপর চোখ রাখার জন্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরতে হলো ওদেরকেও। হঠাৎ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘সাবধান! ওরা টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে দেখছে আমাদের...!’

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে চোখে নাইট-গ্লাস তুলল রানা। ‘রাইফেল নামাও!’ নিয়াজকে নির্দেশ দিল ও। নিজের জায়গায়

দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখল, হেলিকপ্টারের দরজার গায়ে বসানো জানালা খুলে গেছে, চাঁদের আলোয় ভেতরে দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে একটা মাজল্। ‘সিনে-ক্যামেরা,’ আবার বলল রানা। ‘আমাদের ছবি তুলছে—ভয় পাবার কিছু নেই। ক্যামেরায় ওটা টেলি-ফটো লেন্স ব্যবহার করছে ওরা।’

‘নিয়মও তো তাই,’ মন্তব্য করল নিয়াজ, ‘ছবি শুধু হিরো আর ভিলেনদের তোলা হয়!’

রুশ সাবমেরিন কিলার কোর্স বদলে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব দিকে। এঞ্জিনের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল। স্লেজের কাছে ফিরে এসে নিয়াজের কাছ থেকে হ্যান্ডেলবার নিল রানা।

‘আমি জানি কেন ল্যান্ড করেনি,’ বলল নিয়াজ।

‘লোকজন কম বলে।’ দূরে তাকাল রানা, সমতল বরফের পর, বহু দূরে, আবার শুরু হয়েছে প্রেশার রিজ। ‘ফিরে এসে আবার যদি খোলা জায়গায় পায় আমাদের, একজনও বাঁচব না।’

ফিরে যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার শুধু লোকবল নয়, সাথে অস্ত্রবলও থাকবে।

## চার

বন্ধ ঘরের ভেতর ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধ। প্রজেক্টরের মৃদু গুঞ্জন। অকস্মাৎ টেঁচিয়ে উঠল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, ‘ফ্রেমটা ধরে রাখো!’

প্রজেক্টর থামাল অপারেটর, পর্দায় স্থির হয়ে গেল ছবি।



চারজন লোক, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। একজন লোকের হাতে রাইফেল, অপরজনের চোখে নাইট-গ্লাস। পর্দার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একটা ছায়ামূর্তি-বলটুয়েভ। ছায়ামূর্তির একটা হাত লম্বা হলো, আঙুল দিয়ে পর্দার একজন লোককে দেখাল। লোকটা একটা স্লেজের হ্যান্ডেলবার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘সেই শালা, আমার পেনশন বাজি রেখে বলতে পারি,’ নিস্তব্ধ কামরায় গমগম করে উঠল তার ভারী গলা। ‘ইভেনকো রস্তুভ! বেঙ্গমান!’

অস্বকার থেকে মৃদু প্রতিবাদ জানাল নিকিতা জুনায়েভ, ‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, ওদের কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না...’

‘মুখে পেছাব করি!’ মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ‘কুভাটার প্রতিটি নড়াচড়া আমার মুখস্থ। দেখছ না একপাশে কেমন কাত করে রেখেছে মাথাটা, বানচোতের এই ভঙ্গিটা আমার চেনা আছে।’ চোখে নাইট-গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার ওপর মোটা একটা আঙুল রাখল সে। ‘আর এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু। মাতৃভূমির মুখে কলঙ্ক মাখিয়েছে। মিগ একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে গোটা রাশিয়াকে। মাসুদ রানা। বাকি দু’জন ওর চেলা, আমেরিকানদের আর্কটিক রিসার্চ বেসে গবেষণা করে-বিনয় মুখার্জি আর নিয়াজ মাহমুদ।’

‘আমরা তাহলে উত্তর আর পশ্চিম থেকে প্লেনগুলোকে ফিরিয়ে আনব, কর্নেল কমরেড?’ জিঙ্গেস করল জুনায়েভ।

‘ব্যটাচ্ছেলে, আগে তুমি ঘরের আলো জ্বালো,’ নির্দেশ দিল কর্নেল। আলো জ্বলে উঠতেই চোখে হাতচাপা দিল সে, তারপর পিছনে বসা একজন লোকের দিকে তাকাল। ‘খুস্কায়েভ, আবার

তুমি ওদের খুঁজে বের করতে পারবে?’

খুস্কায়েভ, আটাশ, মারমানস্ক থেকে নিয়ে আসা ডিটাচমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছে। চেহারায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। কয়েক পা এগিয়ে ওয়াল-ম্যাপের সামনে চলে এল, আঁক কাটা একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল, ‘এখানে, কর্নেল। স্টার-ফিক্স নির্ভুল হলো...’

‘তারমানে পারবে?’ অধৈর্য হয়ে আবার জানতে চাইল কর্নেল।

‘একবার যখন পেরেছি...,’ কর্নেলের চেহারা দেখে চুপ করে গেল খুস্কায়েভ।

‘সে কৃতিত্ব তোমার নয়,’ কঠিন সুরে বলল কর্নেল। ‘পাঁচ মাইল দূরে থেকে স্মোক ফ্ল্যার দেখে ওদিকে গিয়েছিলে।’ আপন মনে মাথা নাড়ল সে। ‘কে জানে কেন স্মোক ফ্ল্যার ছাড়ল ওরা-হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট।’

‘হ্যাঁ, কর্নেল কমরেড,’ আমতা আমতা করে বলল খুস্কায়েভ, ‘বলা যায় ভাগ্যই আমাদেরকে সাহায্য করেছিল...’

‘ভাগ্যের সাহায্য আবার কিভাবে পেতে পারো, আমার কাছ থেকে জেনে নাও!’ খুস্কায়েভের হাত থেকে পেন্সিলটা কেড়ে নিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল কর্নেল। ‘ওরা আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটে চড়বে বলে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। কিউট রয়েছে এখানে,’ ম্যাপের গায়ে একটা আঁক কাটল সে। ‘আই.আই. ফাইভ আর কিউটের মাঝখানে একটা সরল রেখা আঁকো,’ নিজেই আঁকল সে। ‘কি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, টেঙ্ক মেরিডিয়ান ধরে এগোচ্ছে ওরা।’

খুস্কায়েভের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘তাহলে তো পানির

মত সহজ হয়ে গেল কাজটা। টেবু মেরিডিয়ান ধরে গেলেই...'

'চোপ!' মেঝেতে পা ঠুকে গর্জে উঠল কর্নেল। 'ফের যখন আমি কোন কাজে ডাকব, আসার আগে মাথাটা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে নেবে। বুদ্ধিশুদ্ধি যাও একটু আছে, তাও শুষে নিচ্ছে চুলগুলো। আমাদের বোকা বানাবার জন্যে কোর্স বদল করবে ওরা, বুঝলে হাঁদারাম? হয় ওরা দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূবে নাহয় দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাবে।' রানার দলকে যেখানে দেখা গেছে সেখান থেকে দুটো আলাদা রেখা আঁকল সে। 'পরে আবার ওরা ফিরে আসবে দক্ষিণে। স্টার-ফিক্সে ভুল থাকবে ধরে নিয়ে, আইসফিল্ড ভেসে চলেছে মনে রেখে, ত্রিভুজ আঁকলাম, এর ভেতরই ওদের তুমি দেখতে পাবে।'

'জী, কর্নেল কমরেড,' খুস্কায়েভ ঢোক গিলে বলল। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে...'

'আমার সব কথাতেই যুক্তি থাকে,' পিছন ফিরে জুনায়েভের দিকে তাকাল কর্নেল। 'এবার প্রত্যেক হেলিকপ্টারে সশস্ত্র লোক থাকবে।'

'কিন্তু সবগুলো হেলিকপ্টারে দেব কিভাবে? অত লোক...'

'আমি বলেছি সবগুলো হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনতে হবে?'' মেঝেতে আবার পা ঠুকল কর্নেল। 'তা করলে জেনালের ফচ বুঝে নেবে তার ডিসেপশন অপারেশন ফেল করেছে। আই.আই.ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম থেকে কয়েকটা রিফুয়েলের জন্যে ফিরে আসুক। দেরি না করে আবার ওগুলো টেক-অফ করবে, চলে যাবে আমার ত্রিভুজে নজর রাখার জন্যে।'

কর্নেল আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই তাড়াহুড়ো করে

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। পাইপ কামড়ে ধরে ওয়াল-ম্যাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এবার কোথায় যাবে, মি. মাসুদ রানা? ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখোনি!' ঠোঁটে নির্দয় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল তার।

\*

যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে ওরা। সারাক্ষণ রাশিয়ান হেলিকপ্টারের আওয়াজ আসছে কানে। কখনও একেবারে কাছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে মাথার ওপর চলে আসবে। কখনও অনেক দূরে, মৌমাছির গুঞ্জনের মত অস্পষ্ট। ক্লান্ত শরীর নিয়ে একের পর এক নালা ধরে এগোচ্ছে দলটা, পাশে প্রেশার রিজের আড়াল। এঞ্জিনের আওয়াজ যখন বহুদূরে, স্নায়ুর ওপর তখন যেন বেশি চাপ পড়ে-গভীর মনোযোগের সাথে, কান খাড়া করে শুনতে হয়। মনে হয়, না জানি কখন বাড়তে শুরু করে শব্দটা। কে জানে এদিকেই আসছে কিনা।

ওগুলো যখন কাছাকাছি চলে আসে, বিরতিহীন একঘেয়ে হয়ে ওঠে এঞ্জিনের আওয়াজ, কাঁপতে শুরু করে বরফ-পাঁচিল, নাড়া খায় পায়ের তলায় নালার বরফ। শুধু সময়ের ব্যাপার, জানে রানা, আগে হোক বা পরে রাশিয়ানদের চোখে ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে। বিনয় আর নিয়াজের যুক্তি মেনে নিয়ে দলটাকে যদি দাঁড় করিয়ে রাখে ও, নালার ভেতর রাশিয়ানরা ওদেরকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাতে পিছিয়ে থাকতে হবে, কিউটের সাথে যোগাযোগের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

কিউটে পৌঁছতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

কিন্তু সচল বস্তু আকাশ থেকে সহজে চোখে পড়ে।

পিছিয়ে পড়ার চেয়ে রাশিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকিটাই নিচ্ছে রানা।

কিন্তু ক্লাস্তি ওদেরকে ক্ষমা করছে না। সন্ধ্যা দশটার দিকে চারজনেরই ভেঙে পড়ার মত অবস্থা দাঁড়াল। হাত-পা আর চলে না, চোখ আধবোজা হয়ে আছে, শিরায় শিরায় অচল হয়ে পড়ছে রক্ত। এরই মধ্যে দু'বার কেঁদে ফেলেছে ইভেনকো রক্তভ, রানার কাছে করুণা আবেদন জানিয়ে বলেছে, আর পারছে না।

কিন্তু রানা নির্মম। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'হয় সাথে থাকুন, না হয় পথ হারিয়ে পটল তুলুন।'

জবাব শুনে চটে উঠল বিজ্ঞানী। স্নেজের সাথে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো পাঠানোই হয়েছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

মনে মনে বলল রানা, কিন্তু কথা ছিল কে.জি.বি. গোপনে সহযোগিতা করবে। অথচ তাদের টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। স্পেশাল সিকিউরিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও তারা দেয়নি, দিলে বলটুয়েভ গং এভাবে ওদের প্রাণের শত্রু হয়ে উঠত না। 'পরিস্থিতি বদলে গেছে, মি. ইভেনকো। প্রশ্ন এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার। কাজেই ইচ্ছে হলে আসুন, না হয় থেকে যান-কোনটাতেই আমাদের আপত্তি নেই।'

ইভেনকো পিছিয়ে পড়ল, চট করে একবার পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখে নিল রানা। বিনয়ের স্নেজের পাশে রয়েছে ইভেনকো, আগের মতই ছুটছে। ওদের পিছনে রয়েছে নিয়াজ, সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তারাগুলোর অবস্থান জানার চেষ্টা করছে। ইভেনকোকে ফেলে রেখে যাবার কোন ইচ্ছেই নেই রানার, ভদ্রলোক অচল হয়ে

পড়লে বাধ্য হয়ে তখন স্নেজে তুলে নিতে হবে। তবে আশ্চর্য বটে, বরফে একাকী মরার ভয় দেখানোয় তার সমস্ত ক্লাস্তি কোথায় যেন উবে গেল, স্নেজের সাথে দৌড়াতে আর কোন আপত্তি করল না।

কিন্তু স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দিল, কেউ তার মেজাজকে বশে রাখতে পারছে না। মুখ খোলার উপায় নেই, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ওঠে। রাত ঠিক দশটার পরপরই নিয়াজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এবার তাদের থামতেই হবে। তার স্থির বিশ্বাস, রানার কথামত চললে নির্ঘাত মরতে হবে সবাইকে। যেভাবে হোক বোঝাতে হবে ওকে, ভাগ্য ওদের সাথে বেঈমানী করেছে, সামনে এগিয়ে আর কোন লাভ নেই। ব্যাগে সেক্সট্যান্ট ভরে বিনয়ের স্নেজ থেকে নামল সে, ছুটে চলে এল রানার স্নেজের পাশে। 'আরেকটা প্লেন আসছে, রানা,' বলল সে। 'থামো। রিজের মাথায় চড়ে দেখে আসি...'

'শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট,' উত্তরে বলল রানা। 'প্লেনটা অনেক দূরে...'

'কিন্তু এদিকেই আসছে! আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছ না, আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে? মাথার ওপর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ফর গডস সেক, কেন?'

হ্যান্ডেলবারটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল রানা, বাঁঝের সাথে জবাব দিল, 'কারণ বলটুর খেলার ঘুঁটি হতে চাই না। কি ঘটছে বুঝতে পারছ না? এলোপাতাড়ি আসা-যাওয়া করছে ওরা, আন্দাজের ওপর। আমরা কোথায় ওরা জানে না।'

‘এভাবে আসা-যাওয়া করতে করতেই দেখে ফেলবে...’

‘ভাগ্য যদি খুব ভাল হয়। নালার ভেতর রয়েছে আমরা, কোন প্লেন কাছাকাছি চলে এলে পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াব। মাথার ওপর দিয়ে উঠে গেলেও দেখতে পাওয়া সহজ হবে না।’

‘আর যদি দেখে ফেলে?’

‘তখন ভাবব কি করা যায়।’

‘ভাবলেও তখন কোন উপায় বেরবে না।’

‘বোকার মত কথা বলছ,’ বলল রানা। ‘বিপদ যত গুরুতরই হোক, উদ্ধার পাবার উপায় একটা না একটা থাকেই, তুমি সেটা দেখতে পাবে কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন।’

রানার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে কেমন যেন খতমত খেয়ে গেল নিয়াজ, মনে হলো রানার এই গুণটা তার নিজের ভেতর থাকলে ভাল হত।

গভীর করে শ্বাস টানল রানা, নিয়াজের দিকে তাকাল। মুহূর্তের অন্যমনস্কতার জন্যে কাত হয়ে গেল স্লেজ, দু’হাতে হ্যাভেলবার টেনে ধরে কোন রকমে শেষরক্ষা করল। সামনের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, ‘আরও অনেক দূর এগোতে হবে আমাদের, কর্নেল বলটু যাতে মনে করে অত দক্ষিণে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার আগে বিশ্রামের কথা ভুলে যাও। জানি, হেলিকপ্টারগুলো আমাদের খুঁজছে। আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করাও ওদের একটা উদ্দেশ্য, এঞ্জিনের আওয়াজ কানে ঢুকলেই আমরা যাতে অস্থির হয়ে উঠি। প্রতিবার শুধু শুনলেই আমরা যদি থামি, পিছিয়ে পড়ব না? ওরা চাইছেও ঠিক তাই। আমরা যাতে কিউটে পৌঁছুতে না পারি...’ হেলিকপ্টারের আওয়াজ

হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল রানা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল, ‘আড়াল নাও!’

কুকুরগুলোকে দাঁড় করানো হলো, লম্বা হয়ে পাশে শুয়ে পড়ে বিনয় শান্ত করার চেষ্টা করল ওগুলোকে। কয়েক সেকেন্ড পরই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা হেলিকপ্টার, এঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড় হলো। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, নালার দুশো ফিট ওপর দিয়ে কালো ছায়ার মত সঁাৎ করে বেরিয়ে গেল। তারপরও স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ওরা, জানে না শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে কিনা। ওদের দেখে থাকলে আবার ফিরে আসবে ওটা।

নড়াচড়া নেই, হিম শরীরের ভেতর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে অবশ, উঠে দাঁড়াবার শক্তি আছে কিনা সন্দেহ। হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে সরে যেতে আবার অস্থির হয়ে উঠল কুকুরগুলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, হেলিকপ্টার ফিরে আসল না দেখে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা। রানাকে আরেকবার বোঝাবার চেষ্টা করল নিয়াজ। ‘রানা, ভেবে দেখো। পেটে কিছু না পড়লে...’

রানা অন্যমনস্ক, চুপচাপ শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। কোন আওয়াজ পেল না ও। ক্লান্ত পা ফেলে বরফ-পাঁচিলের দিকে এগোল। পাঁচিলে ওঠার জন্যে বারবার চেষ্টা করল, প্রতিবার পা পিছলে নেমে এল নিচে। আপনমনে কাঁধ বাঁকিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল নিয়াজ। পাঁচিলের মাথায় উঠল রানা। নাইট-গ্লাস পরিস্কার করে চোখে তুলল। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল ও। ঝাপসা দিগন্তরেখার ওপর চোখ বুলাল, তারপর একটু

নিচু করল গ্লাস। ঝাড়া এক মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে নালার দিকে তাকাল। ‘উঠে এসো, নিয়াজ। দেখো।’

‘খবর?’ কর্নেল বলটুয়েভ জানতে চাইল।

‘নেই।’ খুস্কায়েভ ঘরের দরজা বন্ধ করল। ‘এইমাত্র ফিরে এলাম—ওদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।’

‘আশা ছেড়ে দেব, বলছ?’ মেঝেতে পা ঠুকে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। জুনায়েভ তাকে চেনে, নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সে। ‘তুমি একটা কাপুরুষ, খুস্কায়েভ। একটা ডিটাচমেন্টের লীডার হবার যোগ্যতা তোমার নেই। এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে পারে সে—ই জেতে। ঝামেলা শেষ হলে তোমার চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাব আমি। নিশ্চয়ই খেতে যাচ্ছ? ভুলে যাও, খুস্কায়েভ। পরবর্তী যে হেলিকপ্টার টেক-অফ করছে ওটায় থাকছ তুমি।’ খুস্কায়েভ ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। ‘ওরা কিউটে পৌঁছে গেলে ব্যাপারটা সত্যি জটিল হয়ে উঠবে, জুনায়েভ।’

খতমত খেয়ে গেল জুনায়েভ। এই প্রথম কর্নেল কমরেড আশঙ্কা প্রকাশ করল, জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছানো রানার পক্ষে অসম্ভব নয়। ‘জটিল, কমরেড কর্নেল?’ জিজ্ঞেস করল সে, তারপর বলল, ‘ইভেনকো যদি কোন আমেরিকান জাহাজে একবার চড়তে পারে, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।’

‘অসম্ভব?’ ঠাণ্ডা গলায় বলল কর্নেল, মাথা নাড়ল। ‘আমি তা মনে করি না। ঝামেলা হবে, কিন্তু অসম্ভব নয়।’

সরাসরি তর্কে না গিয়ে মিনমিন করে জুনায়েভ বলল, ‘ভাগ্য যদি আমাদের সাহায্য করে...’

‘ভাগ্যের আমি নিকুচি করি!’ গর্জে উঠল কর্নেল। ‘তুমি জানো না, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি আমি?’ টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মারল সে। ‘কৌশল বদল করছি। এখন থেকে কিউটের উত্তর দিকটায় চোখ রাখব। যে-পথ দিয়ে কিউটের দিকে আসবে ওরা। টার্গেটকে দেখামাত্র কাছাকাছি, নিরাপদ দূরত্বে ল্যান্ড করবে আমাদের হেলিকপ্টার। নিচে বরফ নরম কি শক্ত জানতে চাই না আমি। যেভাবে পারে ল্যান্ড করতে হবে।’

‘ইভেনকোর সাথে যারা আছে তারা যদি বাধা দেয়?’

‘সেজন্যেই আমার দ্বিতীয় নির্দেশটা এখুনি সবাইকে জানিয়ে দেবে তুমি। সশস্ত্র প্রতিটি দলের লীডারকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবে। খবরদার, পাইলট যেন শুনতে না পায়। ইভেনকোর সাথে যারা আছে তাদের আমরা চাই না। তারা ঝামেলা, কাজেই হারিয়ে গেলে আমরা খুশি হব। সহজ সমাধান, বরফের নিচে পুঁতে ফেলা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গভীর কোন ফাটল পাওয়া যায়—লাশগুলো নিচে ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কুকুরগুলোকেও মারতে হবে, বিষ মেশানো খাবার দিয়ে। স্নেজ দুটোরও কোন অস্তিত্ব রাখা চলবে না। মাঝরাতের মধ্যে, জুনায়েভ! যদি সম্ভব হয় তারও আগে...’

নিশ্চয়ই মরীচিকা, প্রথমবার দেখে ভাবল রানা। আকৃতিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর আর দেখা গেল না। লেস অ্যাডজাস্ট করতে আবার ফিরে এল। না, দৃষ্টিভ্রম নয়। নিয়াজকে পাঁচিলের ওপর

উঠতে বলল ও।

রানার শান্ত গলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, বরফের পিছলা ঢাল বেয়ে কিভাবে যে মাত্র একবারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠে এল, বলতে পারবে না নিয়াজ। চোখে গ্লাস তোলার জন্যে হুড নামাল মুখ থেকে।

‘ওদিকে! দেখে বলো, ভৌতিক কিছু না তো?’

নাইট-গ্লাস ধরা আঙুলগুলো কাঁপছে নিয়াজের। সামনে আরও তিন মাইল প্রেশার রিজ ঢেউ খেলে রয়েছে, যেন ঝড়ের ছোবল খেয়ে ফুঁসে ওঠা সাগর আচমকা মাঝপথে জমাট বরফ হয়ে গেছে। আরও সামনে সমতল বরফের বিস্তার, তারই মাঝখানে গৈঁথে রয়েছে মরীচিকা-চাঁদের আলোয় এমন একটা দৃশ্য, ফটো তোলা হলে অবাস্তব দেখাবে। ‘গুড গড!’ স্তম্ভিত নিয়াজ ফিসফিস করে উঠল।

উঁচু মাস্তুল আর উঁচু ব্রিজ নিয়ে একটা জাহাজ বরফ আর তুষারে তৈরি। দেখতে অনেকটা জন্মদিনের কেকের মত, নাইট-গ্লাসে নিয়াজ দেখল, জাহাজের বো ওর দিকে তাক করা রয়েছে। গোটা জাহাজ চকচক করছে, যেন সাদা কাঁচে মোড়া। মাস্তুল থেকে বরফের ঝুরি ডেক পর্যন্ত নেমে এসেছে। বো-টা অস্বাভাবিক উঁচু, যেন বিশাল কোন ঢেউয়ের মাথায় চড়ে রয়েছে। কিন্তু জাহাজটা সম্পূর্ণ স্থির, পোলার প্যাকে শক্তভাবে গাঁথা। ওটা যে পরিত্যক্ত নয় তার একমাত্র প্রমাণ, মাস্তুলের ডগায় আলো জ্বলছে। মরীচিকা হতেই পারে না। আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট ওটা, সবচেয়ে কাছের সাগর থেকে দশ মাইল দূরে চলে এসেছে, আটকা পড়েছে পোলার প্যাকে।

‘গুড গড!’ আবার বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘রিপিট করছ কেন, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ নাকি?’

এক পাক নেচে উল্টোটা প্রমাণ করল নিয়াজ।

‘সবিনয়ে জানতে চাইছ,’ নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল বিনয়, ‘...’

‘আবে হালা অহনও বুঝবার পারো নাই? হালায় কিউট বরফের মইদ্যে...’

কুকুরগুলোর কাছে ইভেনকো রস্তুভকে রেখে পাঁচিলে উঠল বিনয়। ‘যদি ঠাটা হয় রে!’

নাইট-গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিয়াজ বলল, ‘নিজের চোখেই দেখ।’

গ্লাস চোখে তুলল বিনয়, এক সেকেন্ড পর সবিস্ময়ে বলল, ‘এত ভেতরে ওটা ঢুকল কিভাবে?’

‘টোকেনি, টোকানো হয়েছে,’ বলল রানা। ‘শক্তির নাম সাহস। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবে শুনেছি তাঁর সাহসের তুলনা হয় না। আমাদের কাছাকাছি আসার জন্যে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বরফ ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি বলো তো? জাহাজের রাডার দেখা যাচ্ছে না।’

‘লোকটা যে বেপরোয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল নিয়াজ। ‘কত দূরে, আন্দাজ করতে পারো?’

‘সাত মাইলের কম নয়,’ বলল রানা। ‘এগোনের ব্যাপারে আর কোন আপত্তি আছে?’

প্রথম দু’মাইল ঝড়ের বেগে এগোল ওরা, গত কয়েক ঘণ্টায়

এই গতি একবারও তুলতে পারেনি। সামনে আর এক মাইল দুর্গম পথ, তারপরই খোলা, সমতল বরফের বিস্তার। মাথার ওপর রাশিয়ানদের হেলিকপ্টার নেই, কাজেই রানা সিদ্ধান্ত নিল ইলিয়ট হোমিং বীকন অন করে সিগন্যাল পাঠানো যেতে পারে। সিগন্যাল পেলেই হেলিকপ্টার পাঠাবে কিউট।

পরিশ্রান্ত বলেই কনকনে ঠাণ্ডা অসহ্য হয়ে উঠল। চারদিক এখনও পরিষ্কার, শুধু স্লেজ-টীমের মাথার ওপর ঝুলে আছে হালকা কুয়াশা, ঝোঁয়াটে বাস্পের মত। জনপ্রিয় ধারণা, আর্কটিকে চব্বিশ ঘণ্টা ঝড়-ঝঞ্ঝা লেগে আছে, এই অক্ষাংশে তা সত্যি নয়। এ শুধু পৃথিবীর শীতলতম জায়গার একটা।

একটা নালার ভেতর থামল ওরা। বিনয় সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এই গোলকধাঁধায় হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। তবু নিয়াজকে ট্রান্সমিটার বের করার নির্দেশ দিল রানা। ‘ওরা একজন একজন করে আমাদের তুলে নেবে, বিনয়,’ ব্যাখ্যা করল ও। ‘তারপর কুকুরগুলোকে খোলা বরফে নিয়ে যাব আমি।’ ক্যানভাসের ভেতর থেকে ট্রান্সমিটার বের করছে নিয়াজ, নালার ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটে ছুটে নেমে এল ইভেনকো। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ইভেনকো হাঁপাচ্ছে। রানার মুখের কাছে হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ‘আর যখন বিপদের কোন ভয় নেই, এবার আমার সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন!’

‘মানে?’ চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা, ডান বুটের ডগা দিয়ে বরফে খোঁচা মারছে। তেমন শক্ত মনে হলো না। বোধহয় ওর সন্দেহই ঠিক, নালার দু’পাশে প্রেশার রিজ খুব বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। এখানে মস্ত একটা ফাটল ছিল,

সেটা বন্ধ করে মাথাচাড়া দিয়েছে বরফ-পাঁচিল।

‘আমার টিউব! তোমরা আমার টিউব চুরি করেছ!’ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ল ইভেনকো, পারকার পকেট থেকে ভারী একটা টিউব বের করে রানার মুখের সামনে নাড়ল।

‘আপনার হাতেই তো রয়েছে ওটা,’ বলল রানা, বুটের ডগা হঠাৎ করে বরফের ভেতর সঁধিয়ে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠল। গর্ত থেকে বুট তোলার পর দেখা গেল ডগা থেকে কালচে পানি বরছে। নরম বরফ এখানে। ইভেনকো এতই উত্তেজিত যে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না।

‘এটা সেই টিউব নয়...!’

‘আরেকটার কথা বলছেন, যেটার ভেতরে মেরিলিন চার্ট ছিল?’ সরাসরি ইভেনকোর দিকে তাকাল রানা। ‘ওটা আমাদের কাছে থাকাই নিরাপদ। শুধু শুধু টেঁচামেচি করবেন না।’

‘তারমানে? আমার জিনিস...’

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, ‘কথা না বাড়িয়ে নিয়াজকে একটু সাহায্য করবেন, প্লিজ?’

ট্রান্সমিটার কাঁধে নিয়ে নালা ধরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে নিয়াজ, সমতল কোন জায়গার খোঁজে। এরইমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে সে। জিনিসটা ভারী, বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। সাবধানে পা ফেলছে সে, পিছলা ঢালে পা হড়কালে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আরও খানিকদূর এগোবার পর একদিকের পাঁচিলের গায়ে একটা ফাঁক দেখল সে, মেঝেটা সমতল। ধীরে ধীরে ফাঁকের মাঝখানে ট্রান্সমিটার নামাল। রানার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছে ইভেনকো।

‘এরকম একটা অন্যায় আমি মেনে নেব কেন? আমার জিনিস আপনারা কেন লুকাবেন? ওটার জন্যেই ওয়াশিংটনে আমার দাম...’

রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছে ইভেনকো, বিনয়ের সহ্য হলো না। হেঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল সে, বলল, ‘দাম? কিউটে না ওঠা পর্যন্ত কারও এক কানাকড়ি দাম নেই। রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছেন, এর মানে কি? স্বাভাবিক ভদ্রতা কাকে বলে তাও ভুলে গেছেন? যান, নিয়াজের সাথে ধরাধরি করে ট্রান্সমিটারটা নিয়ে আসুন।’

‘তোমরা আমেরিকান নও, অথচ...,’ গজগজ করতে করতে চলে গেল ইভেনকো।

নিচু গলায় রানা বলল, ‘বিনয়, পায়ের নিচে নরম বরফ। সাবধানে থাকতে হবে।’

‘নরমই তো হবার কথা,’ বলল বিনয়। ‘সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছি না!’

হঠাৎ আত্ননাদ করে উঠল ইভেনকো। দু’জনেই ওরা ঝট করে সেদিকে তাকাল। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল ইভেনকো। প্রায় সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। ‘সেরেছে!’ অসহায় বোধ করল রানা। ‘ভদ্রলোকের গোড়ালি ভেঙে গেছে।’

সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে তৈরি হয়েছে নিয়াজ, ইভেনকোর চিৎকার শুনে সেট ফেলে ছুটে এল।

হাড় না ভাঙলেও, মারাত্মক চোট পেয়েছে ইভেনকো-গোড়ালিতেই। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা, ফোঁপাচ্ছে। নিয়াজ তার বগলের নিচে হাত গলিয়ে বসার ভঙ্গিতে

খানিকটা তুলল, তারপর টেনে নিয়ে এল পাঁচিলের কাছে। পাঁচিলে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল ইভেনকো। একটা গর্তে পা দেবে গিয়েছিল, বুট থেকে কালচে পানি বরছে। মুখ তুলে রানা আর বিনয়ের দিকে তাকাল নিয়াজ। ‘রানা! এদিকে নরম বরফ! মি. ইভেনকোর গোড়ালি মচকে গেছে, হাঁটতে পারবেন না!’

ছুটল বিনয়। ধরাধরি করে একটা স্লেজে তোলা হলো ইভেনকোকে। রানাও পৌঁছল। চেহারা ব্যথা আর অভিমানের ছাপ নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল ইভেনকো, রানার দিকে তাকাবে না।

‘সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী,’ মনে করিয়ে দিল রানা।

ঢাল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল নিয়াজ, সাথে বিনয়। দেখে শুনে পা ফেলছে ওরা, বরফের পাতলা আবরণে পা পড়লে চিরকালের জন্যে সাগরের অতলতলে তলিয়ে যেতে পারে। পাঁচিলের ফাঁকটার কাছে পৌঁছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নিয়াজ। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? পরমুহূর্তে গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। পিছিয়ে পড়েছিল বিনয়, ছুটল সে। রেডিফন সেট নরম বরফে ডুবে গেছে। ট্রান্সমিটারের প্রায় সবটুকু অদৃশ্য হয়েছে, ওপরে খাড়া হয়ে রয়েছে শুধু এরিয়াল। বরফে হাঁটু গেড়ে বসল নিয়াজ, পাগলের মত হাত দিয়ে বরফ খুঁড়তে শুরু করল। ট্রান্সমিটার বেরুল না, গাদা গাদা বুদ্ধদের সাথে উঠে এল কালচে পানি। ভেতরে দস্তানা পরা হাত গলিয়ে দিয়েও ট্রান্সমিটারের স্পর্শ পেল না সে। মরিয়া হয়ে এরিয়াল ধরে টান দিল, মট করে ভেঙে গেল সেটা। চারপাশ থেকে কাদাটে বরফ এসে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা।



একমাত্র ট্রান্সমিটারটা গ্রাস করল প্রকৃতি। কিউটের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় থাকল না।

‘মৌচাকের ব্যবস্থা করেছ?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। পোলার প্যাক থেকে হাজার ফিট ওপরে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছে সে। সাবমেরিন কিলার দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। খুস্কায়েভের হেলিকপ্টার রয়েছে আরও দক্ষিণে, রেডিও-টেলিফোনে তার সাথে সরাসরি কথা হচ্ছে বলে কিউটের ছদ্মনাম মৌচাক ব্যবহার করছে ওরা।

‘মৌচাককে স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে,’ জবাব দিল খুস্কায়েভ।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কর্নেলের গলা থেকে, সেট অফ করে দিয়ে নিচে বরফের দিকে তাকাল সে। তার ধারণা, ঘটনা প্রবাহ নাটকীয় মোড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত, ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকার একটা তাগাদা অনুভব করছে সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে আমরা মুঠোয় পাব ওদের,’ আপনমনে বিড়বিড় করল।

জুনায়েভের স্বভাবই হলো খারাপ দিকগুলো আগে চিন্তা করা। ‘কিন্তু এখনও ওদের দেখতে পাইনি আমরা।’

জুনায়েভকে থামাবার জন্যে চোখ গরম করে তাকাল কর্নেল। শব্দজটে কান ঝালাপালা হলো তার। চেহারা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মেসেজটা রিসিভ করল সে। তারপর পাইলটের দিকে তাকাল। ‘আরও জোরে চালাতে পারো না, নাকি বরফে নোঙর ফেলে আছ?’ ঝট করে জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে,

বলিনি? এইমাত্র টার্গেট দেখতে পেয়েছে ওরা।’

‘রানা! শকুনটা ল্যান্ড করতে আসছে!’

‘জানতাম।’ বরফ-পাঁচিলের ওপর থেকে চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, পরিষ্কার দেখল সাবমেরিন কিলার নিচে নামছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে, সমতল বরফের ওপর ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ওটা।

শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে ওরা। এর আগে হেলিকপ্টারটা দু’বার উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। নামার জন্যে ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রুশ পাইলট, কিউট আর ওদের মাঝখানে। চোখ থেকে গ্লাস নামাল রানা। ঘুঁটি আরও একটা চেলেছে কর্নেল বলটুয়েভ-বরফ মোড়া জাহাজের মাস্তুলের কাছাকাছি ঝুলে রয়েছে দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার, কিউট থেকে যাতে কোন হেলিকপ্টার টেক-অফ করতে না পারে।

‘প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম,’ রানার একপাশ থেকে তিক্ত গলায় বলল বিনয়। ‘আর ঘণ্টা দুই সময় পেলেই...’

রানার আরেক পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে নিয়াজ। থমথম করছে তার চেহারা।

‘দুঃখে কাতর হয়ে কোন লাভ নেই,’ বলল রানা। ‘কি করতে হবে আমি জানি।’

কুকুরগুলো হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠায় তাড়াহুড়ো করে নালায় নেমে গেল বিনয়। প্রথম সাবমেরিন কিলার এখনও নামছে, এঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজ প্রেশার রিজে বাড়ি খেয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি শুরু করল। ধীরে ধীরে বরফে নামল সেটা, রোটর

ঘুরছে। দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নিচের বরফে নামল লোকজন, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। পারকা পরা বেচপ আকৃতি নিয়ে, চাঁদের আলোয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তারা, এগিয়ে আসছে প্রেশার রিজগুলোর দিকে। অপারেশনের দ্রুতগতি আর সুশৃঙ্খল ভাব লক্ষ করে আবার মুগ্ধ হলো রানা।

‘এত লোক!’ নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলে বলল নিয়াজ। ‘আমার ধারণাই ছিল না সাবমেরিন কিলারে এত লোক ধরে।’

‘কি করতে হবে তুমি জানো,’ নিয়াজকে মনে করিয়ে দিল রানা। ‘ইভেনকোর ওপর কড়া নজর রাখবে। এখন যদি ভদ্রলোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, মাথায় বাড়ি।’

‘রানা, আরেকবার ভেবে দেখো। তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো!’

‘ওদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকলে সবাইকে মরতে হবে,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘ওরা শুধু ইভেনকোকে নিতে এসেছে, আমাদের নাম খরচের খাতায় টুকে রাখবে।’

বরফ-পাঁচিল থেকে পিছলে নেমে এল রানা, হাতে রাইফেল নিয়ে নালা ধরে ছুটল। পিছন থেকে সবাই তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় আর ইভেনকোকে নির্দেশ দিল নিয়াজ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে-যার কাজে মন দিল ওরা।

দু’পাশে বরফ-পাঁচিল উঁচু হয়ে থাকলেও মাথা নিচু আর শিরদাঁড়া বাঁকা করে ছুটছে রানা। সামনে নরম বরফ থাকলে বিপদ হবে, জানে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। জরুরী অবস্থায় সমস্ত ক্লাস্তি কোথায় যেন উবে গেছে, নিজেকে সতেজ আর প্রাণবন্ত

লাগছে ওর। ভাবনা-চিন্তায় কোন জড়তা নেই, হাত-পায়ের ওপর রয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ‘আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো,’ কথাটা মিথ্যে বলেনি নিয়াজ-সোজা রাশিয়ানদের দিকে ছুটছে রানা।

ঝুঁকি নিচ্ছে রানা, কিন্তু বোকাম মত নয়। এ-ধরনের সঙ্কটে অনেকের বুদ্ধি খোলে, কিন্তু সাহসের অভাব দেখা দেয়। রানা সাহসী যুবক, ওর রক্তে রয়েছে ঝুঁকির নেশা। একা নিজের কথা ভাবতে অভ্যস্ত নয়, সেজন্যেই কঠিন যে-কোন অভিযানে ওকেই নেতৃত্ব দেয় মানুষ। ইভেনকো সহ সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচাবার দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে। কাজেই শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্যে সহজ বুদ্ধিটা কাজে লাগাচ্ছে ও। নালা এদিকে একটা নয়, অসংখ্য। রাশিয়ানরা একটা ধরে আসবেও না। সাবমেরিন কিলার থেকে বিশজনকে নামতে দেখেছে ও, তাদের সবার সামনে একা ওকে দাঁড়াতে হবে না। বিস্ময়ের ধাক্কায় শত্রুপক্ষ ঘাবড়ে যাবে, এই ভরসায় ছুটছে রানা। রাশিয়ানরা জানে সংখ্যায় ওরা মাত্র চারজন, জানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ছোট্ট দলটা। এই পরিস্থিতিতে ওদের একজন তাদের দিকে ছুটে আসবে কল্পনা করা যায় না।

এঁকেবেঁকে, ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে নালা। খানিক পরপরই বাঁক নিতে হলো, কিন্তু ছোট্টা গতি কমল না। পাঁচিলের মাথা থেকে নালাগুলো দেখে নেয়া আছে, রানা জানে সবগুলোই গিয়ে মিশেছে বরফের সমতল বিস্তারে। কোথাও কোথাও হিম করিডর গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, কোথাও বাঁক নিলেই গায়ে জড়াচ্ছে চাঁদের কোমল আলো। একটু পরই গতি মত্তর করতে হবে ওকে, কারণ এগিয়ে আসা রাশিয়ানদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ও। ছুটছে,

সেই সাথে হেলিকপ্টার এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ শুনছে। পাইলট কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, আবার চালু নাও হতে পারে ভেবে এঞ্জিন বন্ধই করেনি সে।

খামল রানা, তারপর সাবধানে, এক পা এক পা করে এগোল। রাশিয়ানদের সাথে দেখা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও, ফাঁক-ফোকরগুলো ভাল করে দেখে রাখছে—গা ঢাকা দেয়ার দরকার হলে কাজে লাগবে। অবশ্য আগেভাগে যদি পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় তবেই লুকোবার সুযোগ মিলবে। ওরা যে অ্যামেচার, কোন সন্দেহ নেই। সোভিয়েত স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টগুলোকে আর্কটিকে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হলেও, পোলার প্যাকে পায়ের হেঁটে অভিযানে বেরবার ট্রেনিং দেয়া হয়নি। দু’হাতে রাইফেলটা ধরে আছে রানা, বাঁক নিয়ে সামনে বেরিয়ে এল রুশ সৈনিক।

দু’জনেই চমকাল। কিন্তু রাশিয়ান লোকটা হেলিকপ্টারের এত কাছাকাছি কাউকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি। সে তার অটোমেটিক রাইফেল কাঁধে রেখেছে। কাঁধ থেকে সেটা নামাতে যাওয়াই তার ভুল হলো। রানার মাথায় কোন চিন্তা খেলে যাওয়ার আগেই শরীরে খেলে গেল বিদ্যুৎ। রাইফেলটা হাতে ঘুরে গেল, ভারী বাট-পেট রুশ সৈনিকের মুখের দিকে তাক করে ধরল ও। চ্যাপ্টা বাঁটটাকে আসতে দেখল লোকটা, ঠিক মাথা বরাবর। শেষ মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, মাথা বাঁচলেও, মুখ বাঁচল না। নাকের পাশে আর চোয়ালে রাইফেলের বাঁট পড়ল, ধাক্কা খেয়ে বরফের ওপর আছাড় খেলো সে। সামনে বাড়ল রানা।

চিৎ হয়ে পড়েছে লোকটা, বরফে ঠুকে গেছে মাথার পিছনটা।

তবে ফার হুড়ে মাথা ঢাকা থাকায় মোটেও ব্যথা পায়নি। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল, হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে দূরে। রানার বুট পরা পা তার মুখের সামনে থামতেই দু’হাত দিয়ে একটা পা জড়িয়ে ধরল সে। তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিল একপাশে।

রাইফেলের বাঁটটা খাড়াভাবে সজোরে নামাল রানা। শক্ত কপালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বাঁট। রানার পা জড়িয়ে ধরা হাত দুটো নিখর হয়ে গেল। অজ্ঞান লোকটাকে পরীক্ষা করল রানা। মারা যাবার সম্ভাবনা কম। তবে জ্ঞান ফিরে পেতে সময় নেবে। ওর সঙ্গীরা আঘাতগুলো দেখে ধরে নেবে পা পিছলে শক্ত বরফে আছাড় খেয়েছে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। বুটের ধাক্কা লোকটাকে উপুড় করল রানা।

এরপর আরও বড় ঝুঁকি নিল ও, আবার ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে। শত্রুপক্ষের কৌশলটা আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। বিশজন সশস্ত্র লোক ছড়িয়ে পড়েছে খোলা বরফ প্রান্তরে, দশ-বারোটা নালা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে তারা। কেউ যদি ফেরারীদের দেখতে পায়, ফাঁকা গুলি করে বাকি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সাথে সাথে আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে এসে ছোট্ট দলটাকে ঘিরে ফেলবে তারা। সামনে বাঁক দেখেও ছোট্টার গতি কমালো না রানা, বাঁক নেয়ার সাথে সাথে এক ফালি আলো দেখতে পেল সামনে। নালা থেকে বেরবার পথ পেয়ে গেছে ও, সামনে খোলা বরফের বিস্তার।

মাত্র একশো গজ দূরে সাবমেরিন কিলার, জোড়া ফিন রানার দিকে মুখ করা। পাইলটের কেবিন রয়েছে উল্টোদিকে। রোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা। নালা থেকে উঁকি দিয়ে বাইরেটা

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। খোলা জায়গায় কোন পাহারাদার নেই। বিশজনের একটা দল চারজনকে ধরতে যাচ্ছে, কল্লনাতেও ঠাঁই পায়নি চারজনের একজন বিপদ হয়ে এগিয়ে আসতে পারে। সরাসরি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরল রানা।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ও, দৃঢ় কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে সাবমেরিন কিলারের পিছনটা। কাজটা এক ধরনের পাগলামি হয়ে যাচ্ছে, জানে রানা। পাইলট পিছন দিকে তাকাবে না এটা ধরে নিয়ে জুয়া খেলছে ও। পাইলট যদি তাকায়ও, ওকে হাঁটতে দেখে ততটা সতর্ক হবে না যতটা সতর্ক হবে ওকে ছুটতে দেখলে। শুধু একটা লিভার টানার অপেক্ষা, সাথে সাথে খাড়াভাবে আকাশে উঠে যাবে হেলিকপ্টার। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার। হাঁটার গতি আরও কমিয়ে দিল রানা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানার মনে হলো, ভাগ্য আজ প্রসন্ন। ওর প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে। ফার হুড আর পারকা হুবহু রাশিয়ানদের মত দেখতে না হলেও, মিল আছে। অমিল যে-টুকু আছে, চাঁদের আবছা আলোয় পাইলটের চোখে পড়ার কথা নয়। যত কাছে চলে এল ততই বাড়তে লাগল রোটরের আওয়াজ, ততই দৌড়ের ঝাঁক চাপল শিরায় শিরায়। আর বিশ গজ বাকি। রানার প্রতিটি পেশী, প্রতিটি লোমকূপ নিঃশব্দে চিৎকার করছে। কিন্তু তবু রানা শান্ত, খানিকটা অলস ভঙ্গিতে হাঁটতেই লাগল। সাবমেরিন কিলারের লেজটা পুরানো ধাঁচের, আগেকার দিনে বাইপ্লেনে যেমন থাকত। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে লেজটাকে পাশ কাটাল রানা। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ধাপ বেয়ে

উঠল। দম বন্ধ। বিপজ্জনক কিছু ঘটলে এখনই ঘটবে। বরফের পাতলা আবরণে মোড়া রয়েছে কেবিনের জানালা। দস্তানা পরা হাত মুঠো করে জানালায় আঘাত করল ও।

হেলিকপ্টারের সাথে রানাও কাঁপছে। জানালায় ঘুসি মারায় কোন লাভ হলো না। দ্বিতীয়বার আঘাত করল রানা। মাথা নিচু করে আছে ও, জানে ভেতর থেকে কাঁচের ওপর নাক ঠেকিয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করবে পাইলট। নিজেদের লোক নয় বুঝতে পারলে খুন করার জন্যে খেপে উঠবে।

সাঁধ্য করে একপাশে সরে গেল জানালা, অমনি রাইফেলের নলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা। গরম বাতাস লাগল মুখে। হেলমেট পরা একটা ফার মোড়া মূর্তি সীটের ওপর পিছিয়ে গেল। ‘বেরোও!’ রুশ ভাষায় বলল রানা, রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার। ‘তা না হলে গুলি খেয়ে মরো! জলদি!’ শুধু মুখে নয়, ইঙ্গিতেও লোকটাকে কন্ট্রোল কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার তাগাদা দিল রানা। জানালার ফ্রেমে হেলান দিল ও, রাইফেলের মাজল্ ঠেকাল লোকটার পাজরে। রুশ পাইলট গগলস পরে আছে, তবু চোখ দেখে তাকে যুবক বলেই মনে হলো। পঁচিশ, তার বেশি বয়স হবে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এই বয়সেই বীরত্ব দেখাবার ঝাঁক থাকে। একটা লিভারের দিকে হাত বাড়াল পাইলট।

লিভারে টান পড়লেই বরফ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়বে সাবমেরিন কিলার। ঝুলে থাকতে হবে রানাকে। কিংবা ঝাঁকি খেয়ে নিচের বরফে পড়ে যাবে, সেই সাথে সান্ধ হবে ভবলীলা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে গর্জে উঠল ও, ‘গুলি করলাম!’

মৃত্যু ভয় বড় ভয়। পাইলটের হাত স্থির হয়ে গেল। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি সে। লোকটা কি ভাবছে পরিষ্কার ধরতে পারল রানা। আড়চোখে পাশে তাকাল সে, মাজল্টা দেখে নিল। ভাবছে, গুলি খেয়েও বাঁচার আশা আছে কিনা। ক্যালিবার দেখে ভয় পেল সে, লিভার থেকে সরিয়ে আনল হাত। ‘দাঁড়াও! বেরোও!’ হিংস্র হয়ে উঠেছে রানা। নালা থেকে ওদের কেউ বেরিয়ে এলেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। হেলিকপ্টারের জানালায় বুলে থাকা একজন লোককে গুলি করে মারা ডালে বসে থাকা পাখি শিকারের চেয়েও সহজ।

যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েই হেডসেট খুলে ধীরে ধীরে সীট ছাড়ল পাইলট। তার শান্ত ভঙ্গি সতর্ক করে দিল রানাকে।

সীট থেকে খানিকটা উঠে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল পাইলট, গগলসে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো পড়ায় চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। ‘বেরিয়ে এসো,’ কর্কশ গলায় বলল রানা। ‘তাড়াতাড়ি করো!’ পাইলট কাছে সরে এল, সেই সাথে রাইফেলটা একটু একটু করে নিজের দিকে টেনে নিল রানা, বাঁটটা ঢুকে যাচ্ছে বগলের তলায়। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে দরজার হাতল ধরে আছে ও। ট্রিগার গার্ডে আঙুল। হাতলে ঠেলা দিতেই দরজা একপাশে সরে যেতে শুরু করল। ধীর, অলস ভাবে হাত দুটো দু’পাশে মেলে দিল পাইলট, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

আস্তে আস্তে রানা আর দরজার দিকে এগিয়ে এল পাইলট। একটু পাশ ফিরল, যেন রানার ইঙ্গিতে লাফ দিয়ে বরফে নামতে যাচ্ছে। তারপর, ঘুরন্ত রোটরের তলা থেকে লাফ দিল সে। লাফ দিল বরফের দিকে নয়, রানার রাইফেল লক্ষ্য করে।

তৈরি ছিল রানা, কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। এরকম একটা ব্যাপার ঘটে যাবে, ঘুণাঙ্করেও টের পায়নি। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে, দরজার হাতল ধরে বুলে পড়ল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পাইলট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেলল। দরজা দিয়ে বেরুল সে খাড়া ভাবে, পুরোপুরি সিধে অবস্থায়। নিজের রোটরে গলা পেতে দিল লোকটা। ইস্পাতের ঘুরন্ত পাত জবাই করল তাকে।

বুলন্ত অবস্থায় নিচের দিকে তাকিয়ে বমি পেল রানার। পেট, গলা, আর গালের পেশীগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। পরপর কয়েকটা জোরাল ঢোক গিলে বমি ভাবটাকে ঠেকাল বটে, কিন্তু মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ধড়টা নিচে বরফে পড়ে আছে। সাদা বরফে লাল রক্তের স্রোত। রোটরের ধাক্কা খেয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছে মাথাটা আল্লাই মালুম। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের রোটরে মুণ্ডুহীন হলো পাইলট। তবে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘরের ভেতরই ঘটে, পাইলটের ঘর বলতে তো হেলিকপ্টারকেই বোঝায়। রানা কাঁপছে, ভাইব্রেশনই একমাত্র কারণ নয়। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। পাইলটের সীটে বসে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল।

সিকোরস্কির কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে অনেক মিল আছে। বেশিরভাগ ডায়াল আর লিভার চিনতে পারল রানা। অলটিচ্যুড রীডিংগুলো মিটারে লেখা রয়েছে। কিন্তু দুটো সুইচ আর একটা লিভার সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগল। পাইলট যে লিভারে হাত দিয়েছিল সেটা ধরল রানা। কিছুই ঘটল না। আরও একটা চাপ দিল। সাথে সাথে বরফ থেকে শূন্যে উঠে পড়ল সাবমেরিন

কিলার। লিভারটা নিজের দিকে টানল ও। ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার, আবার নামল বরফে। হুক থেকে স্পায়ার হেলমেটটা নামিয়ে দ্রুত হাতে পরে নিল। একটু ঢিলে হলো হেলমেট। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো মাঝে মধ্যে ঝাঁপিয়ে দিচ্ছে চোখ, কেমন যেন ঝাপসা লাগছে সব কিছু। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। অনিদ্রা আর ক্লান্তি। বিশ্রাম না পাওয়ায় গোলমাল করছে চোখ দুটো।

কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিল রানা। অলসভঙ্গিতে কয়েকটা সুইচ অন করল, সামনে ঠেলল কয়েকটা লিভার। মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি, যে-কোন মুহূর্তে রাশিয়ানরা ওদের স্নেজ-টীমের কাছে পৌঁছে যাবে। থ্রটল খুলে দিল রানা। জোড়া এঞ্জিন গর্জে উঠল। বড় করে শ্বাস নিল ও, তারপর ঠেলে দিল ওপরে ওঠার লিভারটা।

## পাঁচ

সগর্জনে, খাড়াভাবে ওপরে উঠল সাবমেরিন কিলার। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, মেশিনটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এত দ্রুত উঠবে ভাবতে পারেনি। অলটিমিটারে একশো মিটার রীডিং দেখে শূন্যে থামাল হেলিকপ্টার। তারপর সামনে খানিকদূর এগিয়ে দিক বদল করল। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দূরে তাকাল, আইসব্রেকার কিউটকে বিস্তীর্ণ বরফের মাঝখানে খেলনার মত লাগছে দেখতে। দিক বদল সম্পূর্ণ হবার আগেই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। ছোট্ট একটা লিভার, অচেনা, স্পর্শ করা

মাত্র তীব্র ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার। রানা অনুভব করল, প্যানেলের পিছনে ভয়ঙ্কর শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, লিভারটা ছুঁতে যা দেরি, অমনি তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।

প্রেশার রিজের অনেক ওপরে রয়েছে রানা, একটা করিডরে দু'জন লোককে দেখতে পেল। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে স্নেজ-টীমের খোঁজে আরও সামনে তাকাল ও। নিয়াজকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, পিছিয়ে গিয়ে নিরাপদ একটা জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ওরা। শুধু ওখানেই ল্যান্ড করতে পারবে হেলিকপ্টার। প্রেশার রিজের গোলকধাঁধার মাঝখানে সমতল বরফের খুদে একটা প্ল্যাটফর্ম।

আরও কয়েকজন রাশিয়ানকে দেখল রানা। উড়ে এল তাদের মাথার ওপর দিয়ে। মুখ তুলে তাকাল তারা। আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে ভুলটা ধরতে পারল ও। প্ল্যাটফর্ম ফেলে এসেছে পিছনে। দিক বদলে আবার ফিরে চলল সাবমেরিন কিলার।

ভয় ভয় করছে। প্ল্যাটফর্মে রাশিয়ানদের চেয়ে আগে পৌঁছুতে হবে ওকে। নাকি এরই মধ্যে রাশিয়ানদের একটা দল পৌঁছে গেছে সেখানে? ফার মোড়া আরও কয়েকজন লোককে দেখা গেল। ছুটছে তারা, মুখ তুলে ওপরে তাকাল। মনে হলো, নালাগুলোর ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে লোকগুলো। সবাই একই দিকে ছুটছে না।

ছায়ার ভেতর সাদা বৃত্তটা অবশেষে চোখে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে মূর্তি, একজোড়া স্নেজ-টীম, এক পাল কুকুর। একটা মূর্তি ঘন ঘন হাত নাড়ছে।

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে বরফের ঢাল, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে

গেছে। সেই ঢালের মাথায় আচমকা পাঁচজন রাশিয়ানকে দেখা গেল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, তাকিয়ে আছে নিচের প্ল্যাটফর্মের দিকে।

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। অনেক দেরি করে পৌঁচেছে ও।

নিচে নামছে হেলিকপ্টার। প্রায় খাড়াভাবে। তারপর হঠাৎ রাশিয়ানদের দিকে ছুটল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো। কি ভাবছে ওরা কে জানে। পাইলটকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু হেলমেট আর গগলস পরে থাকায় চেনার উপায় নেই। তবে মেশিনটা নিজেদের। পাইলটের কি মাথা খারাপ হলো? সরাসরি এভাবে ছুটে আসার মানে কি?

আরও নিচে নামল রানা। স্কিডগুলো ঢালের মাথা প্রায় ছুঁয়ে যাবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচানো ফরজ মনে করল লোকগুলো। রানাও স্বস্তিরোধ করল। প্রয়োজন ছাড়া, একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই। পাইলটের উদ্দেশ্য ভাল নয় বুঝতে পেরে ঝেঁড়ে দৌড় দিল লোকগুলো।

আবার ওপরে উঠল রানা, ঘুরল। পাঁচজনের দলটা চওড়া একটা করিডর ধরে ছুটছে। ডাইভ দিল সাবমেরিন কিলার, করিডরের ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ছুটল। হেলিকপ্টার ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো, যে যেদিকে পারে বাঁক নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ওদেরকে পিছনে ফেলে এসে ঘাড় ফেরাল রানা। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছুটছে সবাই। পালিয়ে বাঁচছে।

একটা কথা ভেবে মজাই লাগল রানার। গুলি করা তো দূরের

কথা, কেউ ওর দিকে রাইফেল পর্যন্ত তোলেনি। নিজেদের সম্পদ, কার না দরদ থাকে। লোকগুলোকে আরও দু'বার ধাওয়া করল ও। বরফ মোড়া খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে অনেক দূর চলে গেল গোটা দল। এরপর প্ল্যাটফর্মে নামল হেলিকপ্টার।

তাড়াছড়ো করে নামতে গিয়ে বরফে আছাড় খেলো রানা। সময়ের ব্যাপার মাত্র, একজোট হয়ে আবার ফিরে আসবে রাশিয়ানরা। 'কুকুরগুলোকে আগে তোলো,' ছুটে আসছিল বিনয়, নির্দেশ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'সাবধান, রোটরের কথা ভুলে যেয়ো না।' কুকুরগুলোর বাঁধন আগেই খুলে দেয়া হয়েছে, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ওগুলোকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। একটু দূরে সরে গেছে রানা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকের ঢালের মাথায় লক্ষ রাখছে। রাইফেলটা দু'হাতে ধরা। স্নেজ দুটো তোলার পর দরজা থেকে হাঁক ছাড়ল নিয়াজ, 'আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু পাইলট না থাকায় আমরা অচল।'

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে কপ্টারের দিকে ছুটল রানা।

সোজা এক হাজার ফিট উঠে এল রানা, রাইফেল রেঞ্জের বাইরে। ট্র্যাপপারেন্ট, গম্বুজ আকৃতির কন্ট্রোল কেবিনের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে নিয়াজ, কুকুরগুলোর মাঝখানে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বিনয়। ইভেনকো রশ্মিভ সবার পিছনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে।

'এবার আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'কিউটে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, টিউবটা এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।'

‘আপনার জিনিস মানে?’ রানা নয়, জবাব দিল নিয়াজ। ‘আপনি নিজেও তো এখন আর আপনার নন। আপনি তো বিক্রি হয়ে গেছেন। ভুলে যাবেন না, আমেরিকানদের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম বা আপনি, আমাদের কাছে পণ্য ছাড়া কিছু নয়। এই দুটো জিনিস আমেরিকানদের হাতে তুলে দিতে পারলে ওরা আমাদেরকে এক বিলিয়ন ডলার ফি দেবে। কাজেই মাইক্রোফিল্মটা আমাদের কাছে আছে, থাকবেও।’

ইভেনকো রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রানা, ‘আর মেরিলিন চার্টের যে মাইক্রোফিল্ম আপনি নিয়ে এসেছেন সেটা যদি নকল বা অসম্পূর্ণ হয়, আমেরিকানরা শুধু যে আপনাকে কান ধরে ওঠ-বোস করাবে তাই নয়, আমাদের ফি-ও অর্ধেক কমিয়ে দেবে।’ রানা আর নিয়াজ, দু’জনেই বাড়িয়ে বলছে। অভিযান সফল হোক বা না হোক, ওদের ফি ওরা পাবেই।

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হবার কথা, কিন্তু না-সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ইভেনকো রস্তুভ ক্ষীণ হাসল। ‘কি বললেন? নকল মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসেছি? হাহ্-হা! তাহলে গুনুন বলি কি ঘটেছিল। লেনিনগ্রাদ থেকে চার্টের দুটো মাইক্রোফিল্ম নিয়ে আসি আমি। একটা রাখি এন.পি. সেভেনটিনে আমার ঘরে, অপরটা থাকে টেপ দিয়ে আমার উরুর সাথে আটকানো। এন.পি. সেভেনটিনে এক লোককে আমি কে.জি.বি-র এজেন্ট বলে সন্দেহ করতাম। জানতাম, আমি না থাকলে মাঝে মধ্যে আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালায়। একদিন টের পেলাম, ঘরে রাখা মাইক্রোফিল্মটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে। ভাল করে পরীক্ষা করে আমার সন্দেহ

হলো, ওটা আমার রাখা জিনিসই নয়। সম্ভবত আমারটার বদলে নকল একটা চার্টের মাইক্রোফিল্ম রেখে গেছে। কে.জি.বি-র এজেন্ট হঠাৎ করে ফিনল্যান্ডে চলে যাওয়ায় আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।’

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, ‘চার্টটা আপনার তৈরি, অথচ আসল না নকল চিনতে পারেন না?’

‘কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে নকলগুলো এমনভাবে তৈরি করেছে, চিনতে পারা সত্যি কঠিন।’

‘তারপর? নকল চার্টের মাইক্রোফিল্মটা কি করলেন?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘নষ্ট করে ফেললাম,’ সাথে সাথে জবাব দিল ইভেনকো। ‘কাজেই, যা বলছিলাম, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মই নিয়ে এসেছি আমি।’

কিউটের দিকে রওনা হবার আগে রশ শিকিউরিটি এজেন্টদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে দখল করা সাবমেরিন কিলার। তবে ইভেনকো রস্তুভের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে রানা। কে.জি.বি. আর স্পেশাল শিকিউরিটির মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়, জানা আছে ওর। ইভেনকোর ওপর নজর রাখার জন্যে কে.জি.বি. লোক পাঠিয়েছিল, লোকটা ইভেনকোর ঘরে ঢুকে আসল চার্টের জায়গায় নকল চার্ট রেখে ফিরে গেছে ফিনল্যান্ডে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। ইভেনকোর কাছে আসল চার্ট আরও একটা ছিল। সেটাই নিয়ে এসেছে সে।

ইভেনকোকে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে কে.জি.বি. এজেন্ট জন মিলার রানাকে অনুরোধ করেছিল। কে.জি.বি.



ইভেনকোকে নকল চার্ট গছিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছে। রানা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল, ইভেনকো রওনা হলে রাশিয়ানরা বাধা দেয়ার ভান করবে, সত্যিসত্যি বাধা দেবে না। কিন্তু ঘটছে ঠিক উল্টোটা। কেন? রহস্যটা কোথায়?

তবে কি কে.জি.বি. স্পেশাল সিকিউরিটিকে তাদের প্ল্যানের কথা জানায়নি? বা জানাবার সুযোগ পায়নি? রহস্যের চাবি সম্ভবত ফিনল্যান্ডে রয়েছে। কিংবা জন মিলার বলতে পারবে কেন কিভাবে কি ঘটল।

নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করল রানা। আসল মেরিলিন চার্ট আমেরিকানদের হাতে পড়লে রাশিয়ানদের যে শুধু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে তাই নয়, দুই পরাশক্তির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যও নষ্ট হবে। এ-ধরনের একটা চার্ট আমেরিকানদেরও আছে, সেটা যদি রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ থাকত তাহলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু সে সুযোগ যখন নেই, মেরিলিন চার্ট আমেরিকানরা পেতে পারে না।

‘ঠিক আছে,’ হঠাৎ আবার মুখ খুলল ইভেনকো, ‘মাইক্রোফিল্মটা আপনাদের কাছেই থাকুক। কিন্তু দয়া করে টিউবটা আমাকে ফেরত দিন। ওতে মূল্যবান কোর রয়েছে...’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো। মাইক্রোফিল্ম নয়, টিউবটা ফেরত চাইছে ইভেনকো!

‘বাক্স থেকে বের করতে হবে,’ বলল নিয়াজ। ‘কিউটে পৌঁছে নিই, আপনার টিউব আপনি পেয়ে যাবেন।’

জবাব শুনে ভারি সম্বুস্ত দেখাল ইভেনকোকে। নিয়াজের চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তার আর রানার

মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন করছে ইভেনকো।

এক হাজার ফিট ওপর থেকে ভৌতিক জাহাজ বলে মনে হলো কিউটকে। কিংবদন্তীর সেই পরিত্যক্ত জাহাজের মত, কোন নাবিক ছাড়াই মহাসাগরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিউট অবশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে না, নিরেট বরফে আটকা পড়ে আছে। আরও কাছে পৌঁছে রানা দেখল, জাহাজের পিছনে সাগরের গাঢ় খানিকটা পানি টলটল করছে, ওই পথেই পোলার প্যাক ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে কিউট। কিন্তু টলটলে পানির সামনে আবার নিরেট বরফের বিস্তার দেখা গেল। বরফ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর আইসফিল্ড জাহাজের পিছনে আবার জোড়া লেগে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে পিছু হটার পথ।

হঠাৎই কথাটা মনে করিয়ে দিল নিয়াজ, ‘দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার এখনও জাহাজের ওপর ঝুলছে।’

‘জানি,’ বলল রানা। ‘ওটাকে ভাগাতে হবে।’

স্টিক টানল রানা, জাহাজের দিকে খানিকটা নামল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেক দেখা গেল, আরেকটা রুশ কপ্টারকে আসতে দেখে ত্রুঁরা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। দু’একজন নাবিকের হাতে রাইফেলও দেখা গেল। উঁচু ব্রিজের সামনের দিকে, জাহাজের প্রায় পিছনের অংশে, লম্বিং প্যাডে বসে রয়েছে মার্কিন হেলিকপ্টার, একটা সিকোরস্কি। সিকোরস্কির ঠিক মাথার ওপর শূন্যে ঝুলছে রুশ সাবমেরিন কিলার। যতক্ষণ ওখানে থাকবে ওটা, প্যাড থেকে উঠতে পারবে না সিকোরস্কি। উঠতে গেলেই একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লাগবে। কুকুরগুলোর

গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বিনয় মন্তব্য করল, ‘দ্বিতীয় সাব-কিলারের পাইলট ভাবছে আমরা তার বন্ধু আসছি।’

‘বাঁশ নিয়ে!’ বলল নিয়াজ।

‘ওরা কিন্তু আমাদের ক্র্যাশ করাবার চেষ্টা করতে পারে...’, ফোল্ডিং চেয়ার থেকে আঁতকে উঠল ইভেনকো। যেন হঠাৎ করে বিপদটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিচলিত হয়ে পড়েছে। ভাল করে দেখার জন্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, আহত গোড়ালির ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্যে ভর দিল একটা রেইলে।

‘আপনি বসুন, ইভেনকো!’ ধমকের সুরে বলল রানা। ‘বিনয় কি বলল শুনতে পাননি? পাইলট ভাবছে আমরা রাশিয়ান। আপনাকে দেখতে পেলে...’

‘খুব সাবধানে, রানা,’ সতর্ক করে দিল নিয়াজ। ‘দু’জোড়া রোটর কাছাকাছি ঘুরবে। বাতাসের ঘূর্ণি পরস্পরকে কাছে টানতে পারে।’

‘ঝুঁকি না নিয়ে উপায় আছে, বলো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘ল্যান্ড করার আগে ওটাকে ওখান থেকে সরাতে হবে।’ প্রায় জাহাজের ওপর পৌঁছে গেছে ওরা। ধীরগতিতে এগোচ্ছে সাবমেরিন কিলার, ডেক থেকে পাঁচশো ফিট ওপরে রয়েছে। চারশো ফিট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে দ্বিতীয়টা।

বরফ মোড়া রেইলের পাশে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে নাবিকরা, মুখ তুলে আগন্তুক সাবমেরিন কিলারকে দেখছে। কি না কি ঘটবে ভেবে সবাই উদ্ভিন্ন। কন্ট্রোল কেবিনের কাঁচ মোড়া ছাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সরাসরি নিচে তাকিয়ে আছে নিয়াজ, দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরতে দেখছে। হিম বাতাসে তুমুল

আলোড়ন তুলে ঘুরছে রোটরের পাতগুলো। ‘রানা,’ যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার। ‘আন্তে-ধীরে গাড়নটার পাশে নামতে পারবে?’

‘পারব। কেন?’

ভাঁজ করা টুল-কিট পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল নিয়াজ, ভেতর থেকে বের করল বড়সড় ইস্পাতের মাক্সি রেশ্ম। ‘এটা দিয়ে শালার গম্বুজে একটা খোঁচা মারব।’

‘যা করে আল্লা,’ উৎসাহ দেখাল রানা। ‘চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু জানালা খুলতে হবে। সাবধান, নিউটনের থিওরিটা প্রমাণ করতে যেয়ো না।’

‘আমি রেডি,’ বলল নিয়াজ। ‘ওটার খুব কাছে নেমো না।’ একজোড়া কুকুরকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। শক্ত হাতে মাক্সি রেশ্ম ধরে জানালা খুলে ফেলল। গরম কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়ে চোখে মুখে ছাঁকা দিল ঠাণ্ডা বাতাস, কপ্টার নিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে রানা। হুটুটা মাথার পিছনে সরিয়ে দিতেই নিয়াজের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল বাতাসে উড়তে শুরু করল। জানালার বাইরে ঝুঁকে পড়ল সে। কেবিনের ভেতর কথা নেই কারও মুখে। রুদ্ধস্থানে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে। ফোল্ডিং সীটের কিনারায় ঝুলে রয়েছে ইভেনকো। প্রায় অচেনা একটা মেশিন, নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিল রানা। সমগ্র অস্তিত্ব টান টান হয়ে আছে ওর। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, এক চুল এদিক ওদিক হয়ে গেলে সবাইকে নিয়ে পটল তুলতে হবে।

নামছে তো নামছেই, এই নামার যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে নিয়াজ দেখতে পেল, কিউটের ডেক উঠে আসছে ওপরে।

সার সার কালো মাথা পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে। ব্রিজের জানালা থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ পরা একটা মাথা, সম্ভবত ক্যাপটেন, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল নিয়াজ, আবার তাকাল রোটরের দিকে। দ্বিতীয় সাব-কিলারের রোটরও উঠে আসছে ওর দিকে।

প্রতিটি মুহূর্ত মাপজোকের মধ্যে রয়েছে রানা। দ্বিতীয় সাব-কিলারের যতটা সম্ভব কাছে নামতে হবে, অথচ রোটরের সাথে রোটরের ধাক্কা লাগা চলবে না। মাঝখানে ফাঁকটা থাকবে নেহাতই নগণ্য, তা না হলে মাক্সি রেক্স নাগাল পাবে না গম্বুজের।

হিম বাতাস নিয়াজের চোখে-মুখে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে, এরইমধ্যে অসাড় হয়ে গেছে পেশী আর চামড়া। সীসার মত ভারী লাগল চোখের পাতা, আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসছে। জানালার ফ্রেম ধরে আরও একটু বাইরের দিকে ঝুঁকল সে। নিঃশব্দে চিৎকার করছে বিনয়, আর নয়, আর নয়! নিচে গম্বুজ, তার ভেতরে হেলমেট পরা পাইলটের বাপসা মূর্তি দেখতে পেল নিয়াজ। গম্বুজের কিনারায় বরফ জমেছে। হেলমেট নড়ে উঠল, স্লান মুখ তুলে ওপরে তাকাল রুশ পাইলট। লোকটার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারল নিয়াজ। বন্ধু বেশে শত্রু, এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে পাইলট। তা না হলে এভাবে ঠিক গায়ের ওপর নেমে আসছে কেন! জায়গা ছেড়ে সরে যাবার কোন নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি। এখন আর নড়াচড়ার সময় নেই।

পরিস্থিতি এখন ঠিক উল্টো। রুশ পাইলট এতক্ষণ অচল করে রেখেছিল আমেরিকান হেলিকপ্টারটাকে, প্যাড থেকে উঠতে দেয়নি। কিন্তু এখন সে নিজেই ফাটা বাঁশে আটকা পড়েছে। না

পারছে নিচে নামতে, না পারছে ওপরে উঠতে। ওপর থেকে একটু একটু করে এখনও নামছে বেদখল সাব-কিলার।

রানা ভেবেছিল ধীরে ধীরে ওদেরকে নামতে দেখলে পাইলটের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে, সময় থাকতে ভয়ে পালিয়ে যাবে সে। মাঝখানের ব্যবধান যখন পঞ্চাশ ফিট ছিল, ইচ্ছে করলে সরে যেতে পারত লোকটা। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ে রুশ পাইলটের স্নায়ু ভাঙেনি, অসাড় হয়ে গেছে। কি করলে ভাল হবে বুঝতে না পেরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল সে, কিছুই করল না। হেলিকপ্টার নিয়ে নামতে থাকল রানা, দূরত্ব কমতে থাকল। ওর মেশিনের স্কিডগুলো রুশ পাইলটের মাথার ওপর ঝুলছে। স্কিডগুলো ট্রান্সপারেন্ট গম্বুজ থেকে মাত্র কয়েক ফিট ওপরে।

বাতাসে এখন তুমুল আলোড়ন। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান অনুভব করছে নিয়াজ, জানালার ফ্রেম থেকে হাত ফসকালেই ঝপ করে নিচের রোটরের গায়ে পড়বে। স্রেফ কুচিকুচি হয়ে যাবে গোটা শরীর। ভয় পেয়ে কেবিনের ভেতর ফিরে এল সে, বন্ধ করে দিল জানালা। বাতাসের ঘূর্ণি এখন আরও একটা সমস্যার সৃষ্টি করল। কপ্টার এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে। বাতাসের টানে দুটো কপ্টার পরস্পরের দিকে এগোলে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।

হঠাৎ করেই কপ্টার দুটোকে পাশাপাশি দেখা গেল। আবার জানালা খুলল নিয়াজ।

শুধু পাইলট নয়, পাশে একজন অবজারভারও রয়েছে। হেডসেট অপারেট করছে লোকটা, ওদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে, সেই সাথে অনবরত খই ফুটছে মুখে। কোথাও

সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সে। ঠিক এই সময় বাট করে উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করতে গেল ইভেনকো রুস্তভ।

‘বসুন!’ গর্জে উঠল রানা। রুশ পাইলট আত্মহত্যার ঝুঁকি নেবে কিনা জানা নেই, কিন্তু ইভেনকোকে দেখতে পেলে কি করে বসে বলা কঠিন। হয়তো নির্দেশ দেয়া আছে, ইভেনকোকে দেখামাত্র প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে খুন করতে হবে।

দুটো কপ্টার পাশাপাশি স্থির হয়ে আছে। রানা সামনের দিকে ছুটে যাবার জন্যে তৈরি, ওর সমস্ত মনোযোগ সামনে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা মাস্তুলের দিকে। যাই ঘটুক, ওটাকে এড়িয়ে যেতে হবে। ‘গো অ্যাহেড, নিয়াজ,’ চিৎকার করল ও। ‘কাজটা শেষ করো।’

হঠাৎ করেই ওদের নিচে পরিষ্কার হয়ে গেল কিউটের ডেক। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতেই হোক, বা কমান্ডারের নির্দেশেই হোক, হঠাৎ আমেরিকান নাবিকরা দৌড় দিল। চোখের নিমেষে আড়ালে গা ঢাকা দিল তারা। নিয়াজের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হাত রয়েছে লিভারে-ঠেলে দিলেই সামনের দিকে ছুটবে হেলিকপ্টার। কেবিনের ভেতর যান্ত্রিক আওয়াজ অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ওদেরটা নয়, পাশের কপ্টারও বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরও ভাল করে দেখার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকাল নিয়াজ। পাশের কপ্টারের গম্বুজ মাত্র কয়েক গজ দূরে। রেঞ্চ যাতে নাগাল পায়, জানালার ফ্রেম ধরে আরও খানিকটা বাইরে ঝুলে পড়ল সে। ডান হাতে রয়েছে রেঞ্চ। হাতটা লম্বা করে দিল মাথার ওপর। তারপর বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে গম্বুজ লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল

প্রাণপণ শক্তিতে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে রেঞ্চটা ছুঁড়ে দিল নিয়াজ। মনে হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, গম্বুজের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কাঁচ, কিন্তু এ-কাঁচ ভাঙে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, গম্বুজেই আঘাত করেছে রেঞ্চ, কিন্তু ভাঙল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নিয়াজ। কাজ হয়েছে। প্রচণ্ড আঘাতে শত সহস্র চিড় ধরেছে কাঁচের গায়ে। গম্বুজ এখন আর ট্রান্সপারেন্ট নয়, দুধের মত সাদাটে হয়ে গেছে-সম্পূর্ণ ঝাপসা। পাইলট আর অবজারভারকে এখন অন্ধই বলা চলে, চোখ থাকতেও। গম্বুজের বাইরে কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না। লিভার ঠেলে দিল রানা, অকস্মাৎ গতি পেয়ে সামনের দিকে ছুটল হেলিকপ্টার। খাড়া পাইপের মত মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এল। নিচে এখন বরফের আদিগন্ত বিস্তার।

প্রতিটি হেলিকপ্টারের পিছনে একটা ছোট রোটর থাকে, টেইল রোটর ছাড়া কোন হেলিকপ্টার উড়তে পারে না। রুশ পাইলট তার টেইল রোটরের কথা কয়েক সেকেন্ড ভুলে ছিল, আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হলো।

রানাও ধারণা করেছিল, রুশ পাইলট ভুল করবে। ভুল করা স্বাভাবিক। চারদিকের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, আচমকা ঝাপসা হয়ে গেল সব। দৃশ্যমান জগৎ বলতে কেবিনের ভেতরটা, বাকি সব দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাইলট আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

মাস্তুলকে এড়িয়ে জাহাজের ওপর থেকে সরে যেতে হবে তাকে, ফিরে যেতে হবে বরফের ওপর। লিভার ঠেলে সে, কাঁপা

হাতে। দিক হারিয়ে ফেলেছে, মাস্তুলটা ঠিক কোথায় জানে না। তবু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে জাহাজের ওপর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। চিড় ধরা গম্বুজের ভেতর থেকে মাস্তুলটাকে দেখতে পেল সে, আবছা, একেবারে শেষ মুহূর্তে। দক্ষ পাইলট, রোটরের সাথে মাস্তুলের ধাক্কা লাগতে লাগতেও লাগল না। মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল সে, ভুলটা হলো সেখানেই। টেইল রোটরের কথা মনে থাকলে এত তীক্ষ্ণ বাঁক নিত না। টেইল রোটর চুমো খেলো মাস্তুলটাকে, সাথে সাথে গোটা মেকানিজম খসে পড়ল হেলিকপ্টার থেকে।

তাল হারিয়ে লাটুর মত ঘুরতে লাগল সাবমেরিন কিলার। কেবিনের ভেতর সেই সাথে ঘুরছে পাইলট আর অবজারভার। শুধু ঘুরছে যে তাই নয়, প্রতি মুহূর্তে ঘোরার গতি বাড়তে লাগল। ভাল চক্করে পড়েছে দু'জন, স্ট্র্যাপ দিয়ে সীটের সাথে আটকানো শরীরের ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই গতিতে ঘোরার মেয়াদ লম্বা হলে যে-কোন মানুষ পাগল হয়ে যাবে। এক অর্থে ওদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে, বেশিক্ষণ ঘুরতে হলো না। যে ছন্দে, যে তালে ঘুরছিল সাব-কিলার সেটা অলক্ষণ টিকল, তারপরই কাত হয়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। গোপ্তা দিয়ে নেমে এল বরফে। সংঘর্ষের সময়ও রোটর ঘুরছিল। কিউট থেকে তিনশো গজ দূরে আছাড় খেলো ফিউজিলাজ। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। কাগজের মত ছিঁড়ে চারদিকে উড়ে গেল রোটরের পাত। বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাংক। আগুনের শিখা লাল চাদরের মত লকলকিয়ে উঠল। তারপর কালো ধোঁয়া; উত্তুরে বাতাস পেয়ে সাদা বরফের ওপর নাচতে লাগল কোমর দুলিয়ে।

রুশ হেলিকপ্টারের বিনাশ আরও একজন চাক্ষুষ করল। দু'মাইল দূরে, তিন হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে আরেকটা সাব-কিলার। পাইলটের পাশে বসে রয়েছে কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ধীরে ধীরে চোখ থেকে নাইট-গ্লাসটা নামাল সে। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট।

‘কি ঘটল?’ পিছন থেকে জানতে চাইল জুনায়েভ। ‘ওদিকে আগুন কিসের?’

‘চোপ!’ বাঘের মত গর্জে উঠল কর্নেল। ‘আমাকে ভাবতে দাও!’

শোকে কাতর হয়ে পড়েছে কর্নেল। কি ঘটছে দেখার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা আগে কিউটের দিকে রওনা দিয়েছিল সে। আসার পথে একটা মেসেজ পায়, তাতে বলা হয়-মাসুদ রানার টীমকে খুঁজে বের করা হয়েছে, সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টের লোকেরা ল্যান্ড করেছে বরফে, মাসুদ রানা যাতে কিউটে পৌঁছুতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেসেজ পেয়ে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছিল সে।

কিউটের কাছাকাছি পৌঁছে কর্নেল দেখে, জাহাজের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের একটা সাব-কিলার। রেডিও-টেলিফোনে পাইলটকে নির্দেশ দেয় সে, নট নডনচডন, গ্যাট হয়ে বসে থাকো ওখানে। তারপরই দ্বিতীয় সাব-কিলার এল। কি ঘটছে কিছুই বুঝল না কর্নেল। রুশ পাইলট রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করল। প্রথম দিকে চুপচাপ শুনে গেল সে, বাধা দিল না। ‘ওটা আমাদেরই সাব-কিলার, অথচ হুমকির মত মাথার ওপর নেমে

আসছে...ভেতরে কয়েকজন মানুষ...জানালা খুলে রেখেছে...ইভেনকো, ইভেনকো! পরিষ্কার দেখলাম...অনেক কুকুর...তিনজন লোক, চিনি না...।’ এরপর মেসেজ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। কারণটা কি জানার জন্যে চোখে নাইট-গ্লাস তুলেছিল কর্নেল। পরিষ্কার না হলেও, হেলিকপ্টারটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে সে।

তার পিছন থেকে জুনায়েভ লক্ষ করল, কর্নেলের কাঁধ শক্ত হয়ে গেল। বাট্ করে ঘুরল কর্নেল, ভয় পেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল জুনায়েভ। ‘রিসার্চ শিপ রিগায় সিগন্যাল পাঠাও। বলো আমি আসছি। ফুল পাওয়ার দিয়ে রেডিও-জ্যামিং শুরু করতে বলো। সমস্ত জাহাজ তাই করবে। রিগা হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। কিউটই আমাদের কাছে আসবে।’

‘টেকনিকালার...পেলিকান, টেকনিকালার...পেলিকান...’

কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে মাঝরাতে রানার দুটো মেসেজ পেলেন জেনারেল ফচ। প্রথম মেসেজটা পেয়ে উল্লাসে অধীর হলেন তিনি, মুখের ভেতর রসুনের যে কোয়াটা ছিল আরেকটু হলে গলায় আটকে যাচ্ছিল। ঢোক গিলে সেটাকে পেটে চালান করে দিয়ে টমাসকে বললেন, ‘ইভেনকো এখন আমাদের হাতে, টীম নিয়ে রানা কিউটে পৌঁছে গেছে!’ অপারেটরকে বললেন, ‘ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলব, লাইন লাগাও।’ আইসক্যাপে রয়েছে রিমোট ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং স্টেশন, তার সাহায্যে হট লাইন জ্যাক্ত হয়ে উঠল। ওয়াশিংটন, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে এক মিনিট কথা বললেন জেনারেল ফচ। তিনি চান, কিউটকে

বন্দরে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা শিপের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, ‘ইভেনকোকে নিয়ে রানা যখন কিউটে উঠতে পেরেছে, এরপর আর কিছু ঘটতে পারে না। রাশিয়ানদের এত সাহস নেই যে মার্কিন জাহাজের গায়ে টোকা দেবে।’

হট লাইন অফ হয়ে যেতে পাঁচচারি শুরু করলেন জেনারেল ফচ। বারবার মুখ তুলে ওয়াল-ম্যাপের দিকে তাকালেন। আই.আই. ফাইভের আশপাশে যতগুলো জাহাজ রয়েছে সবগুলোর পজিশন লক্ষ করছেন।

নিম্নত্বতা ভাঙল টমাস। ‘আপনি যে সিগার ধরালেন, স্যার, তারমানে কি রানার মেসেজ পেয়ে সেলিব্রেট করছেন...?’

‘তুমি একটা ইমপসিবল ক্যারেঙ্টার হয়ে উঠছ,’ খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল।

টমাস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরও পাঁচচারি থামালেন না। নিজের অজান্তেই বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ম্যাপের দিকে। অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি, জানেন বিছানায় গিয়েও ঘুমাতে পারবেন না। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত। ওদের ধারণা, আর কিছু ঘটতে পারে না। কিন্তু, আসলে, ঘটনা এই তো মাত্র ঘটতে শুরু করেছে। ওয়াশিংটনকে বোঝাবার সাধ্য তার নেই। প্রেসিডেন্ট চীন সফরে রয়েছেন, তাই নিয়ে সবাই ওরা ব্যস্ত।

দ্বিতীয় মেসেজটা কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে নয়, সরাসরি রানার কাছ থেকে এল। আবার জ্যাক্ত হয়ে উঠল হট লাইন, এবার সুইটজারল্যান্ড থেকে সোহানা কথা বলল রানার সাথে। হ্যাঁ, রানা

এজেন্সির অ্যাকাউন্টে মার্কিন সরকারের দেয়া এক বিলিয়ন ডলারের চেক জমা হয়েছে। পুরো টাকাটা ইতিমধ্যে ঢাকায় ট্রান্সফারও করেছে সোহানা। রানার কয়েকটা নির্দেশ দ্রুত হাতে লিখে নিল সে। ফিনল্যান্ডে নতুন কে.জি.বি. এজেন্ট গেছে, জন মিলারের কাছ থেকে তার পরিচয় জানতে হবে, ইত্যাদি।

হটলাইনে চুমোর শব্দ হলো, দুই প্রান্ত থেকেই, তারপর ক্লিক শব্দের সাথে কেটে গেল যোগাযোগ।

## ছয়

ঘুসি তুলে পাইলটকে মারতে গেল কর্নেল বলটু। ‘ল্যান্ড করো। বলছি, ল্যান্ড করো! একদিন তো ওটায় নামতে হবে!’ গলা নয়, যেন বজ্রপাতের আওয়াজ, হেলিকপ্টারের গর্জন সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ রিগার ওপর ঝুলে রয়েছে সাবমেরিন কিলার, ঘুসি খাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না পাইলট। বেয়াদপ বাতাসের ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে পড়ল কপ্টার, ছিটকে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে সীটের পিঠ আঁকড়ে ধরল কর্নেল। ব্লাডি অ্যামেচার, মনে মনে ইংরেজিতে গাল পাড়ল সে। ফ্লাইং স্কুল থেকে পাইলট হয়ে আজকাল যারা বেরোচ্ছে, বিপদের সময় দেশটাকে নির্ঘাত ডোবাবে। তার পিছনে সীটের ওপর কুঁকড়ে বসে রয়েছে জুনায়েভ। এমনিতেই আকাশে উঠলে বমি পায় বেচারির, তার

ওপর উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া ওদের নিয়ে তামাশা করছে।

কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল পাইলট, কর্নেলের দিকে না তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, ‘বসাটাই নিরাপদ, কমরেড কর্নেল...’

‘কাপুরুষ! অযোগ্য!’ পা ঠুকল কর্নেল, মনে হলো ঝাঁকি খেলো সাব-কিলার। ‘নিরাপত্তা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো? বুদ্ধি কাঁহিকে, এতক্ষণ ধরে কি বলছি?’ তেড়ে মারতে গেল আবার। ‘নামো জাহাজে!’

‘কর্নেল কমরেড,’ গৌ ধরে বসল পাইলট, ‘ল্যান্ডিং কন্ডিশন অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব। যথেষ্ট ফ্যুয়েল আছে, যতক্ষণ খুশি আকাশে থাকতে পারব...’

অবজারভারের সীটে বসল কর্নেল, পাইলটের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একের পর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল, ‘আমি তোমাকে আদেশ করছি, জাহাজে ল্যান্ড করো। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বুঝেছ? নামো!’

অসহায় দেখাল পাইলটকে, ভাবটা-হায়, এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম!

মুখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল কর্নেল। ভীতিকর দৃশ্য, সন্দেহ নেই। বিশাল রিসার্চ শিপের প্রকাণ্ড রাডার টাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, ব্রিজের সামনে কিম্বৃত আকারের মসজিদ যেন, জাহাজের সাথে মাতালের মত দুলছে। বিরাট আকৃতির ঢেউ, একের পর এক আসছে, প্রতিটির মাথায় চড়ে নাচছে জাহাজ। যখন কাত হয়ে পড়ে, মনে হয় গম্বুজ আকৃতির রাডার মাস্ট সাগর ছুঁতে চাইছে। আইসফিল্ডের কাছাকাছি বলে, ঢেউ আর স্রোতের সাথে জাহাজের দু’পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বরফের

চাঁই।

তিনশো ফিট ওপরে রয়েছে কপ্টার। নামতে শুরু করল।

রাডার মেকানিজম লক্ষ্য করে নামছে পাইলট। ওটার ঠিক সামনেই ল্যান্ডিং প্যাড। জাহাজের ডেক যখন কোন দিকে কাত হয়ে নেই, ঠিক সেই সময় প্যাডে ল্যান্ড করতে হবে। তা না হলে প্যাডে নামার সাথে সাথে উল্টে যাবে কপ্টার, ডিগবাজি খেয়ে রেইল ভেঙে পড়বে গিয়ে সাগরে। পানি থেকে হিম বাষ্প উঠছে, ঝাপসা হয়ে গেল উইন্ডস্ক্রীন। গায়ে কর্নেলের দৃষ্টি অনুভব করল সে, গরম আঁচের মত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামছে সে। উইন্ডস্ক্রীনের সামনে বিশাল পেডুলামের মত কি যেন ঝুলে রয়েছে। মাস্টহেড, ডগায় রাডার উইং সহ। গোটা মাস্তুলের গায়ে গিজগিজ করছে ইলেকট্রনিক গিয়ার। রুশ কর্মকর্তারা রিগাকে রিসার্চ শিপ বললেও, আসলে ওটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা জাহাজ।

কপ্টার আরও নিচে নেমে এল। দৃষ্টিপথের প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকল রাডার ডোম, জাহাজের সাথে দুলছে। পাইলট তাকিয়ে আছে আরও সামনে, মাস্টহেডের দিকে। মাস্টহেড কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে। পুরোপুরি সিধে হলে বুঝতে হবে অদৃশ্য ল্যান্ডিং প্যাড কোন দিকে ঢালু হয়ে নেই। অবস্থাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে টিকবে, তারপর মাস্টহেড কাত হতে শুরু করবে আরেক দিকে, সেই সাথে কাত হবে প্যাডও। আভারকারিজের নিচে ঝুলে থাকা ফিডগুলো প্যাড স্পর্শ করল। ছুটে এল অপেক্ষারত টেকনিশিয়ানরা। অ্যাংকর রিঙগুলো ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দেয়া হলো দ্রুত হাতে। রোটর ঘুরছে, দরজা খুলে

ফেলল কর্নেল। কাঁধের ওপর দিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল সে। ‘দেখলে তো! চেষ্টা না করলে জানাও যায় না নিজের ক্ষমতা!’ রোটরের তলায় মাথা নিচু করে দাঁড়াল সে, লাফ দিয়ে পড়ল জাহাজের ডেকে। জাহাজ আবার কাত হতে শুরু করেছে, রেইল ধরে হাঁচট খেতে খেতে এগোল। রেইল উপকে থাবা মারল লোনা পানি, দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পানি সরে যেতে পারকার ভাঁজ থেকে বরফের টুকরো ঝাড়ল। মই বেয়ে ব্রিজে ওঠার সময় যোঁৎ করে আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, যেন বিরূপ প্রকৃতির ওপর ঝাল ঝাড়ল। দরজা খুলে গেল, ভেতরে দেখা গেল ক্যাপটেন লিউনিদ ট্রাভকিনকে।

‘কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ!’ গা থেকে পানি ঝরছে, ভিজে পারকা খুলে মেঝেতে ফেলে নিজের পরিচয় দিল কর্নেল। ‘আপনি ট্রাভকিন? ভাল। নতুন কাপড়, প্লিজ। কচ্ছপের মত একটু একটু করে উত্তর যাবার মানে কি?’

ক্যাপটেন ট্রাভকিন রোগা-পাতলা, চোখ জোড়া বুদ্ধি-দীপ্ত। জাহাজের ওপর দিয়ে কি রকম ধকল যাচ্ছে ভাল করেই জানে। কোন ব্যাপারেই অস্থির হবার লোক নয় সে। নতুন কাপড়-চোপড় আনার নির্দেশ দিয়ে, কর্নেলকে নিয়ে ব্রিজের পিছনে চার্টরুমে ঢুকল। চার্টের ওপর ঝুঁকে কাজ করছিল এক লোক, তাকে বিদায় করে দিল সে। দরজা বন্ধ করল। তারপর শান্ত গলায় বলল, ‘আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই...’

‘প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হলো!’

‘কি নিয়ে প্রতিবাদ তাই এখনও বলিনি...!’ বিস্মিত দেখাল ট্রাভকিনকে।



‘শুনতে চাই না!’

‘কিন্তু কমরেড কর্নেল, এদিকের সাগর বিপজ্জনক! এই আকারের জাহাজ নিয়ে...!’

‘নতুন কিছু বলার আছে?’ আবার বাধা দিল কর্নেল। দস্তানা খুলে সাইড টেবিলে রাখল। জ্যাকেটের পকেট থেকে স্টীল-রিম চশমা বের করে পরল, বাঁকল চার্ট টেবিলের দিকে। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আঁক কাটল চার্টে। ‘শেষবার যখন দেখেছি, এখানে ছিল আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট। এই মুহূর্তে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে...’ চার্টের গায়ে মোটা একটা রেখা আঁকল সে। ‘আমরা উত্তর দিকে যাব।’ রেখাটা ধরে আবার উঠতে লাগল পেন্সিল। ‘কাজেই নতুন কোর্সে জাহাজ চালান। ফুল স্পীডে।’

ক্যাপ খুলে চার্টের ওপর ফেলল ট্রাভকিন, কর্নেল যাতে আর কোন আঁক কাটতে না পারে। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে কর্নেলের দিকে তাকাল সে। ‘এই জাহাজ আমার নির্দেশে চলে, কমরেড কর্নেল। জাহাজে আপনাকে জায়গা দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর। নির্দেশ আছে আপনাকে সাহায্য করার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনার কথা মত জাহাজ চালাতে হবে আমাকে...’

‘অবোধ, অবোধ শিশু!’ কৃত্রিম হতাশায় ম্লান দেখাল কর্নেলকে। ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল সে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে পায়ের বুট খুলল। ‘কার স্বার্থ দেখেন আপনি, ক্যাপটেন? নিশ্চয়ই দেশের?’

‘অবশ্যই!’

‘আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের

জন্যে আর্কটিকে এসেছি?’

‘কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না,’ বলল ট্রাভকিন। ‘জাহাজ নিয়ে উত্তরে যাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রিগা আমাদের অত্যাধুনিক রিসার্চ শিপ। তৈরি করতে কয়েক মিলিয়ন রুবল খরচ হয়েছে। জাহাজের নিরাপত্তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে। উত্তরে আইসবার্গের হুড়াহুড়ি...’

‘কিউট গেল কিভাবে? শেষ দিকে তার রাডার পর্যন্ত ছিল না! তোমার মাস্টহেডের মাথায় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট রয়েছে, ওগুলো ব্যবহার করো।’ পায়ে শুধু মোজা, উঠে দাঁড়িয়ে চার্টরুমের এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করতে লাগল। ‘রেডিও-জ্যামিং অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। খানিকক্ষণ জ্যামিং বন্ধ রেখে ক্যারিয়ার নার্ভায় জরুরী একটা সিগন্যাল পাঠাতে হবে-সমস্ত হেলিকপ্টারের এখন একটাই কাজ, কিউটের বর্তমান পজিশন জানা। যে পাইলট প্রথম দেখতে পাবে, রিপোর্ট করার জন্যে সোজা এখানে চলে আসবে সে।’

‘কেন?’ শান্ত প্রকৃতির ক্যাপটেনকে অশান্ত দেখাল। ‘এ-ধরনের পাগলামির মানে কি? আপনি যখন আমার কথা শুনবেনই না, আমার প্রতিবাদ এখন আমি মস্কোয় জানাব...’

কর্নেলকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ক্যাপটেন।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল কর্নেল। ‘রেডিও অন করার সুযোগ কাউকে আমি দিচ্ছি না। জ্যামিং বন্ধ রাখা হবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, কারণ হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে আমার সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী। কিউট দক্ষিণে যাচ্ছে, ওখানে গিজগিজ করছে আইসবার্গ। রাডার নেই, অন্ধের মত হাতড়ে

এগোতে হবে কিউটকে। বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। রেডিও-জ্যামিং বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ওদেরকে। আমার জন্যে চা আনতে বলুন, ট্রাভকিন। গোটা ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে শুনবেন তারপর।’ নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু থেমে শেষ কথাটা উচ্চারণ করল সে, ‘কি হবে না হবে সে পরে দেখা যাবে, কিন্তু আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। কিউটকে আমরা বাধা দেব। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে? আমার তা মনে হয় না। ক’জন বাংলাদেশীর জন্যে আমেরিকা অত বড় ঝুঁকি নেবে এ আমি বিশ্বাস করি না।’

নিরেট বরফের সাথে ইম্পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘুম ভেঙে গেল রানার। শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পও বুঝি এরকম ঝাঁকি খাওয়াতে পারবে না, বুঝি বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরিরও সাধ্য নেই এরকম আওয়াজের সাথে পাল্লা দেয়। পোলার প্যাক ভেঙে এগোবার চেষ্টা করছে কিউটের বো। আর একা শুধু রানাই প্রলয়কাণ্ডের সম্পূর্ণ ধাক্কা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওর কেবিনটা বো-র ঠিক নিচেই। জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় আরেকটা কেবিন খালি ছিল, নিয়াজ আর বিনয় ঠাঁই নিয়েছে সেখানে। ইভেনকো রুস্তভ অসুস্থ, সিক-বেতে চিকিৎসা চলছে তার।

দুই হাতে চোখ রগড়ে ইম্পাতের দেয়ালের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেল-মোটা পাত ভেঙে বরফের পাহাড় চাপা দেবে ওকে, তা সম্ভব নয়। কিউট আইসব্রেকার, বরফ ভাঙাই তার কাজ। হাতঘড়ি দেখল ও। ভোর চারটে। তারমানে জাহাজে ওঠার পর মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

একসাথে একশো বজ্রপাতের সমান আওয়াজ ছিল সেটা, ঘুমটা তাতেই ভেঙেছে। এই মুহূর্তে অমন জোরাল শব্দ নেই, তবে বরফের সাথে ইম্পাতের সংঘর্ষ অবিরাম চলছেই। ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি ফিরে আসছে, এই সময় দরজা খুলে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল অ্যাকটিং মেট বেন কাফম্যান। তার হাতে এক মগ ধূমায়িত কফি।

‘এই আওয়াজের মধ্যে আপনি ঘুমাচ্ছেন দেখে দু’বার আপনার পালস পরীক্ষা করে গেছি,’ মৃদু হেসে বলল সে। ‘মানুষ এতটা ক্লান্ত হতে পারে, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না।’ তাল সামলাবার জন্যে দু’পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, খালি হাতটা বান্ধহেডের কিনারা আঁকড়ে ধরে আছে। ‘পরবর্তী ধাক্কা লাগার আগে একটু গিলে ফেলুন।’

‘ধন্যবাদ।’ মগটা নিয়ে সাবধানে চুমুক দিল রানা, মনে হলো জিভের ছাল তুলে নিয়ে গলা দিয়ে নেমে গেল তরল আগুন। ‘আমার বন্ধুদের খবর কি? কমরেড রুস্তভ কেমন আছেন?’

‘হয় জেগে আছেন নাহয় মারা গেছেন,’ সকৌতুকে বলল কাফম্যান। ‘ওঁদের পালস পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়নি। ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছেন দরজা।’ রানা অনুমান করল গোপন একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছে নিয়াজ, তাকে সাহায্য করছে বিনয়। ‘আর ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জার কমরেড রুস্তভের জ্ঞান নেই।’ রানার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে হাসল সে। ‘না-না, ভয়ের কিছু নেই। উনি প্রলাপ বকছিলেন, বামেলা এড়াবার জন্যে ক্যাপটেনের নির্দেশে আমাদের ডাক্তার তাঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।’

‘প্রলাপ বকছিলেন মানে?’

‘আমার টিউব, আমার টিউব করছিলেন, কি ছাই বলতে চান বোঝাতে পারছিলেন না...’

‘আমি বুঝেছি,’ বিড়বিড় করে বলল রানা, অ্যাকটিং মেট শুনতে পেল না।

কাফম্যান বেশ লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বয়স হবে চল্লিশের মত। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে কঠোর প্রকৃতির মনে হলেও, ভাল করে তাকালে তার কালো চোখে কৌতুকের ঝিলিক লক্ষ করা যায়। লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখার ফাঁকে আরেকবার মগে চুমুক দিল রানা। আমেরিকান কফি, ভারি কড়া।

দরজার কাছে ফিরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফম্যান, ঘুরল। ‘সাবধান! ধাক্কা আসছে আবার!’ দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরল সে। সামনে এগোচ্ছে আইসব্রেকার, এঞ্জিনগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে গজরাচ্ছে। কেবিন দেয়ালের সামনেই বো। বো-র ঠিক সামনে কোথাও রয়েছে নিরেট বরফ। কালো পানি কেটে ইম্পাতের বো এগোচ্ছে। শূন্যে, সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, মগটা অর্ধেক খালি; অপর হাতটা বাল্কের কিনারায়।

ধাক্কা দিল জাহাজ।

প্রবল ঝাঁকিতে মনে হলো ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে কেবিন। দরজার ফ্রেম থেকে হ্যাঁচকা টান খেয়ে কাফম্যানের হাত ছুটে গেল, কেবিনের ভেতর ছিটকে পড়ল সে। দেয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল, কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে নিজের দিকে টানল রানা। দু’জনেই উপলব্ধি করল, নতুন জীবন পেল অ্যাকটিং মেট। রানার

মনে হলো, বো ভেঙে যাচ্ছে, বোঁকে যাচ্ছে ইম্পাতের পাত, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত দেয়াল দিয়ে ছড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে জ্যাস্ট বরফের সচল পাহাড়। যদিও মনে মনে জানে, সে-ধরনের কিছু ঘটতে পারে না। জাহাজ থামল, এঞ্জিনগুলো এখনও আক্রোশে গজরাচ্ছে। উল্টোদিকের বাল্কহেডে ছড়িয়ে পড়েছে কফি, সেদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও, ‘আমরা কি আদৌ কোথাও যাচ্ছি?’

‘এমন গতিতে, যাওয়া বলা হাস্যকর,’ দু’হাতে বাল্কহেড জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে কাফম্যান। ‘ধন্যবাদ, মি. রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা চাপা দিল রানা।

‘প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই কাণ্ড চলছে,’ বলল কাফম্যান। ‘ঈশ্বর জানেন এই অবস্থায় কিভাবে আপনার ঘুম হলো। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান? নিরেট বরফের মাঝখানে আটকা পড়েছি আমরা। মুশকিল হলো, আমরা যে শুধু রাডার হারিয়েছি তাই নয়, ওটার সাথে অবজারভেশন কেজটাও হারিয়েছে। খাঁচার ভেতর মেট ছিল, সে-ও মারা গেছে—সেজন্যেই তো আমি অ্যাকটিং মেট। কেন্ রাসেল, বেচারী! আসলে অনেক উঁচুতে একজন লোক থাকা দরকার, ঠিক কোন্ দিক থেকে বরফে ধাক্কা দেয়া উচিত হবে দেখার জন্যে। কিন্তু খাঁচাই নেই, কোথায় লোক পাঠাব!’

কাপড় পরছে রানা। বরফ থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে জাহাজ। বুট আর পারকা পরে সিধে হলো ও। আবার কাঁপতে শুরু করল কেবিন। বরফের বজ্র-আঁটুনি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। টন টন নিরেট বরফ প্রতি মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ছে বো-র সামনে। ‘ব্রিজে গিয়ে দেখি আমার কিছু করার আছে কিনা,’ বলল রানা। কাফম্যানের দিকে সরাসরি তাকাল ও। ‘ব্যাপারটা কি আমার কল্পনা? নাকি সত্যি আমাদের আসতে দেখে খুশি হয়নি জুরা?’

কাফম্যানের চেহারা একটু স্নান হলো। অস্বস্তি বোধ করল সে। ‘ও-সব আপনি গ্রাহ্য করবেন না,’ গলার সুরে ইতস্তত ভাব। ‘আসল কথা, ফেব্রুয়ারিতে এত উত্তরে আসতে চাননি ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। গুজব, তাকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে।’ হঠাৎ কৌতুকে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখ। ‘আপনারা যদি বরফের ওপর মারা যেতেন, আমাদের তাহলে এত ভেতরে ঢুকতে হত না-রাইট?’

‘আপনারা তাহলে সেটাই কামনা করেছিলেন?’

‘সবাই কি আর, দু’একজন করে থাকতে পারে,’ বলল কাফম্যান। ‘ও কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেল না। ব্রিজের দিকে যাবার সময় নিজের চারপাশে বৈরী পরিবেশের আঁচ অনুভব করল রানা। শুধু অন্ধ একজন লোক এই শত্রুতা অনুভব করবে না। যে ক’জন নাবিককে পাশ কাটিয়ে এল, কেউ ওকে আসতে দেখেছে বলে মনে হলো না। তাগড়া এক যোয়ান, দৈত্যাকৃতি, হাঁটু গেড়ে বসে কম্প্যানিয়নওয়ারের মেঝে পরিষ্কার করছে, আচমকা রানার পায়ের সামনে ঠক করে বসিয়ে দিল বালতিটা।

‘সরাও ওটা, হিগিন!’ অ্যাকটিং মেট ধমকে উঠল।

মুখ তুলে তাকাল দৈত্য। ‘তোমাকে দেখতে পাইনি,

কাফম্যান...’, তাড়াতাড়ি বালতিটা সরিয়ে নিল সে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রানা ভাবল, আইসবার্গ অ্যালিতে পাঠানো হয়েছে ওদেরকে, সেটাই ওদের রাগের একমাত্র কারণ হতে পারে না। এর পিছনে আরও কোন কারণ আছে। কাফম্যান তাকে সবকথা বলেনি। কেন্ রাসেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করা হচ্ছে ওকে-টীম লীডার মাসুদ রানাকে।

মর্মান্তিক কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, নিজেকে সাবধান করে দিল রানা। আইসব্রেকারে যারা চাকরি করতে আসে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ক্রাইম রেকর্ড থাকে। হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছাড়া এই পেশায় কেউ আসে না। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের মন্তব্যও উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

‘আপনার জায়গায় আমি হলে, কেবিন থেকে বেরুতাম না, মি. রানা। আপনার বিশ্রাম দরকার।’

উঁচু ব্রিজ থেকে সামনের বরফ ভাল দেখা যায়। আরেকটা ধাক্কা দেয়ার জন্যে চ্যানেল ধরে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। চ্যানেলের যেটুকু অংশ বরফ-মুক্ত, তা যথেষ্ট চওড়া ছিল, পোলার প্যাকে আঘাত করার জন্যে জাহাজ ঘোরাতে অসুবিধে হয়নি। বরফ ভেঙে দক্ষিণ দিকে যেতে পারলে তবেই উদ্ধার। চ্যানেলের শেষ মাথাটা এবড়োখেবড়ো, খেঁতলে আছে বরফ, কিন্তু এখনও অটুট-কিউটের বো আবার আঘাত করতেও সেখানে কোন ফাটলের সৃষ্টি হলো না।

রেইল থেকে দস্তানা পরা হাত তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা। ‘বছরের এই সময়ে বরফ বাড়তেই থাকবে। তাড়াতাড়ি বেরুতে না পারলে বসন্ত পর্যন্ত আটকা পড়ে থাকব...’

‘আপনি আমাকে জ্ঞানদান করছেন?’ ক্যাপের নিচে ক্যাপটেনের কাঁচাপাকা ভুরু প্রজাপতির ডানার মত নেচে উঠল। ‘জাহাজ আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে শুধু আপনাদের জন্যে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। দয়া করে কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না।’

পাল্টা ঝাঁঝ দেখাতে পারে রানা, বলতে পারে আপনাদেরই একটা উপকার করে দিচ্ছি আমরা, কিন্তু তাতে শুধু সময়েরই অপচয় ঘটবে। সম্পূর্ণ শান্ত থাকল ও, কিন্তু কণ্ঠস্বরে দৃঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল, ‘ওপরে কোথাও একজন লোক রাখা দরকার আপনার, ক্যাপটেন। অন্তত আশি ফিট উঁচুতে। সে আপনাকে গাইড করবে, বলে দেবে বরফের কোথায় আপনি আঘাত করবেন। ধাক্কা দেয়ার পর কোথাও যদি সামান্য চিড় ধরে, একমাত্র সে-ই দেখতে পাবে...’

‘আসুন আমার সাথে!’ রানার কথা শুনে ক্যাপটেনের রাগ যেন আরও এক ডিগ্রী বাড়ল। জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে ব্রিজের পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনি। পিচ্ছিল মই, ধাপগুলো থেকে খানিক আগে বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। ডেকে অনেক মানুষ, কোদাল দিয়ে বরফ তুলে জাহাজের বাইরে ফেলছে। রানা দেখল, কিউটের সিকোরস্কি ল্যান্ড করার জন্যে ফিরছে। ‘রুশদের ওপর চোখ বুলিয়ে এল,’ ক্যাপটেন বললেন। ‘আপনি যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টা আগে একটা সাব-কিলার ওদেরকে তুলে নিয়েছে।’ বিশাল মাস্তুলের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। ‘নজর ফেলে দেখুন,’ বাঘের মত গরগর করে উঠলেন ক্যাপটেন।

বিশাল কাঠামোটা খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে, চাঁদের

আলোয় সবটুকু দেখা গেল। থামের ডগা এবড়োখেবড়ো আর ভাঙা, কিন্তু ক্রস-ট্রী অক্ষত রয়েছে। এত নিচে থেকেও বোঝা গেল, ক্রস-ট্রীর গায়ে বরফের আবরণ জমেছে। দু’জন নাবিক বরফের প্রকাণ্ড একটা চাঁই ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ সেটা ফেলে দিল। সময় মত সরিয়ে না নিলে রানার ডান পা ছাতু হয়ে যেত। ‘ফের করো,’ গর্জে উঠলেন হ্যারি গোল্ডম্যান, ‘তোমাদের আমি কয়েদ করব। যাও, পোর্ট সাইডে নিয়ে গিয়ে ফেলো ওটাকে।’ ক্রুরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, ‘রাসেলকে ওরা সবাই ভালবাসত।’

‘আর, তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছে ওরা।’

‘তা আমি বলিনি! এবার, ফর গডস সেক, মাস্তুলটা দেখুন! আপনি তো বলেই খালাস, কোন মানুষকে ওখানে উঠতে বলা যায়?’

মাস্তুলের গা ঘেষে একটা ধাতব মই ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রতিটি ধাপ বরফে মোড়া, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মাস্তুলের গোটা কাঠামো থেকে বরফের ঝুরি নেমে এসেছে, সবচেয়ে লম্বা ঝুরিটা নেমে এসেছে ক্রস-ট্রীর ডগা থেকে। ডেক থেকে মাস্তুলটাকে বরফের তৈরি একটা থামের মত লাগল। এটা বেয়ে কারও পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

‘বলেছি ওপরে একজন লোক থাকা দরকার, কাউকে পাঠাতে বলিনি,’ জবাব দিল রানা। ‘আমি নিজেই ওখানে উঠতে পারি। আমাকে আটকে রাখার জন্যে লেদার স্ট্র্যাপ দরকার, মাস্তুলকে ঘিরে থাকবে ক্যানভাস প্যাড, আর ব্রিজের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা টেলিফোন সেট...’

‘আর আপনার লাশ দেশে পাঠাবার জন্যে একটা কফিন,’  
রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কে যেন বলল পিছন থেকে।

‘ও শেরম্যান, কপ্টারের পাইলট,’ একটু ভারী গলায় বললেন  
ক্যাপটেন।

রানা জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম একজন লোক সৌজন্য  
দেখিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল। একহারা চেহারা, শেরম্যানের বয়স  
হবে রানারই মত। কথার খেঁই ধরে আবার বলল সে, ‘আপনার  
তো বরফে থাকতেই মরে যাওয়ার কথা ছিল, মি. রানা। দৈবাৎ  
যখন বেঁচেই গেছেন, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছানো পর্যন্ত  
কেবিনেই বন্দী থাকুনগে। একদিন না একদিন সেখানে আমরা  
পৌঁছুবোই।’

চেহারায় অকারণ আক্রোশ নিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকিয়ে  
আছেন ক্যাপটেন। ‘মানলাম ওখানে একজনের থাকা দরকার,  
কিন্তু থুথু ফেলা ছাড়া আপনি ওখানে কি কাজে আসবেন?’

‘কিউটের সিসটার শিপ ফ্র্যাংকেনস্টাইনে এই কাজই  
করেছিলাম,’ জবাবে বলল রানা। ‘বাফিন বে-র উত্তরে, বছর  
তিনেক আগে। স্মিথ সাউন্ডে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, এই একই  
সমস্যায় পড়ে যায়-সামনে নিরেট বরফ। এলাকাটা আমি চিনি,  
কাজেই গাইড করে এগিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি।’

‘বব হাডসনের জাহাজ ওটা।’ নতুন দৃষ্টিতে রানার দিকে  
তাকালেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। মাত্র এক সেকেন্ড,  
তারপরই চোখ ফিরিয়ে মাস্তুলে চোখ তুললেন। ‘মাস্তুলে আগেই  
প্যাড জড়ানো হয়েছে, টেলিফোন বক্সও তোলা  
হয়েছে-আইসফিল্ডে নজর বুলাবার জন্যে কাফম্যান একবার

উঠেছিল। কিন্তু প্যাকে ধাক্কা দেয়ার আগে ওকে নামিয়ে আনি।’

‘হ্যাঁ, বব হাডসনই তখন ফ্র্যাংকেনস্টাইনের ক্যাপটেন  
ছিলেন,’ শুকনো গলায় বলল রানা। ‘পরে তিনি আমাকে একটা  
সার্টিফিকেট দেন, লোকে যাতে বিশ্বাস করে স্মিথ সাউন্ডে আমার  
চেয়ে ভাল গাইড আর কেউ নেই। রেডিও জ্যামিঙের ব্যাপারটা  
আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে  
যাওয়া দরকার আমাদের।’

‘কমরেডদের মেজাজ খারাপ থাকলে এই-ই করে। জাহাজ  
যখন বরফে ধাক্কা দেবে, মাস্তুলের ডগায় কেউ থাকলে কি অবস্থা  
হবে তার, আপনি জানেন? জেনে শুনে আপনাকে আমি মরতে  
পাঠাব?’

ডেকের চারদিকে তাকাল রানা। তুরা শাবল দিয়ে বরফ  
ভাঙছে, কোদাল দিয়ে সেই বরফ ফেলছে জাহাজের বাইরে। যার  
সাথেই চোখাচোখি হলো, বাট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল সে। থো  
করে থুথু ফেলল এক লোক, ক্যাপটেন তার দিকে কটমট করে  
তাকাতেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। ‘মরলে,’ ক্ষীণ একটু  
হেসে বলল রানা, ‘অন্তত আপনার লোকেরা কেউ দুঃখ পাবে না।’

তিন ঘণ্টার ঘুমে ক্লান্তি দূর হয়নি, সারা শরীর ব্যথা করছে রানার।  
বরফ মোড়া মই বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠতে শুরু করল ও। উঠে  
যাচ্ছে মানুষ নয়, যেন কাপড়ের একটা বস্তা, লেদার চেস্ট-স্ট্র্যাপ  
পেঁচিয়ে রেখেছে শরীরটাকে। দ্বিতীয় স্ল্যাপ-ক্লিপ স্ট্র্যাপ দিয়ে  
মাস্তুলকে জড়িয়ে বাঁধা হবে, সেটা ঝুলছে। ফার হুডের নিচে ঠিক  
জায়গামত বসিয়ে নেয়া হয়েছে টেলিফোন হেডসেট। ওর নিচে,

ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দশ মিনিট আগের শত্রুতার পরিবেশ একটু যেন বদলে গেছে। কাজ থামিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, বিপজ্জনক মই বেয়ে উঠে যেতে দেখছে রানাকে। দ্বিতীয়বার ডেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল রানা, অবজ্ঞার সাথে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।—যা খুশি ভাবুক শালারা।

ডেক থেকে বিশ ফুট উঠে থামল ও, বুটের আঘাতে বরফ ভাঙতে গেল। পিছলে গেল পা, দস্তানা পরা হাত একটা ধাপ শক্ত করে ধরে আছে। বুটের প্রচণ্ড লাথি খেয়েও বরফ ভাঙল না। শক্ত বরফের তৈরি মই বেয়ে উঠছে ও। আবার উঠতে শুরু করে অনুভব করল, সাব-জিরো টেমপারেচার দু'জোড়া দস্তানা ভেদ করে আঙুলে কামড় বসাচ্ছে। মুখে হিম বাতাসের হাঁচকা খাওয়া বন্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডায় অসাড়া হয়ে গেছে চামড়া আর পেশী। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, পানি গড়াচ্ছে দুই কোণ থেকে। মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। গলায় এমন ঠাণ্ডা লাগছে, যেন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

যত ওপরে উঠল রানা নির্দয় শীত ততই ওর স্বাভাবিক শক্তি কেড়ে নিতে থাকল। জ্যান্ত, কিন্তু থেমে থাকা এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ কখনও শুনছে কখনও শুনছে না। বো-র ওপর ফিট করা সার্চলাইটের আলো কখনও দেখছে কখনও দেখছে না। দক্ষিণে বরফের বিস্তারকে এই মনে হলো চুনকাম করা দেয়াল, তারপরই মনে হলো গুলি খাওয়া পাখির সাদা পালক।

চল্লিশ ফিট উঠেছে, চেস্ট-স্ট্রাপ থেকে ঝুলে পড়া স্ল্যাপ-ক্রিপ একটা ধাপে আটকে গেল। উঠে যাচ্ছে রানা, জানে না কি ঘটছে।

নিচের ধাপে এক পা, আরেক পা ওপরের ধাপে উঠছে, আচমকা শূন্য ঝাঁকি খেলো শরীর। ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হলো, তাল হারিয়ে ফেলল রানা। ওপরের ধাপে পৌঁছল না পা, নিচের দিকে হাঁচকা টান খেলো শরীর। নেমে এল বুট, নিচের একটা ধাপ ছুঁই ছুঁই করল, কিন্তু ছুঁলো না। আরেক ধাপ থেকে হড়কে গেল দ্বিতীয় পা। খসে পড়ল শরীর।

ডেক থেকে চল্লিশ ফিট ওপরে ঝুলে থাকল রানা, শুধু হাত দিয়ে ধরে আছে বরফ মোড়া মই। পিচ্ছিল, মসৃণ বরফ, দস্তানা পরা হাত স্থির হতে পারল না। পা দুটো শূন্য এলোপাতাড়ি ঝাঁকি খেলো, চোখে না দেখে ধাপের স্পর্শ পেতে চাইল ও। মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ। আতঙ্কের হিম শীতল ঢেউ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মই থেকে একটা হাত খসে গেল। পলকের জন্যে নিচের ডেক দেখতে পেল রানা। খুদে শরীরগুলো পাথর বলে ভুল হয়। দ্বিতীয় হাতটাও খসল, তবে শরীরটা নিচে নামতে শুরু করার আগেই একটা ধাপে ডান পা ঠেকল। দ্বিতীয় হাত আবার আঁকড়ে ধরল মই। ডান পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে বাঁ পা-টাকেও আরেক ধাপে তুলল ও। দম নেয়ার জন্যে থেমে আছে। নিচের দিকে আরেকবার তাকাল। মূর্তিগুলো এক চুল নড়ছে না এখনও। ডেকের প্রতিটি মানুষ মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আবার উঠতে শুরু করল ও।

ডেক থেকে আশি ফিট উঠে আবার থামল রানা। ইস্পাতের মই ক্রস-ট্রার ঠিক নিচেই শেষ হয়েছে। ক্রস-ট্রা পেরিয়ে যেতে হবে ওকে, পেরিয়ে গিয়ে ওটার দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসতে হবে,

তারপর আরও ওপরে উঠে যাওয়া মাস্তুলের গায়ে বাঁধতে হবে চেস্ট-স্ট্র্যাপ। কোন ট্র্যাপ-ডোর নেই, কাজেই ক্রস-ট্রীকে পাশ কাটিয়ে উঠতে হবে ওকে। ঝুঁকিটা নেয়ার আগে হাত উঁচু করল রানা, ক্রস-ট্রীর ওপর দিকটা মুড়ে থাকা ক্যানভাস প্যাড পরীক্ষা করল। হাতের ছোঁয়ায় প্যাড ঘুরে গেল, তারমানে স্থির হয়ে বসার সুযোগ মিলবে না।

ক্রস-ট্রী পেরোতে দশ মিনিট লেগে গেল। দুই উরুর মাঝখানে থাকল মাস্তুল, দ্বিতীয় স্ট্র্যাপটা মাস্তুলের চারদিকে জড়িয়ে বাঁধা হলো। টেলিফোন বক্স আগেই তোলা হয়েছে, বক্সে টারমিনালগুলো জোড়া লাগানো হলো। হঠাৎ অনুভব করল রানা, কাপড়ের ভেতর ঘামের ধারাগুলো সড় সড় করে নামছে। গালে হাত দিতেই বরফের কুচি ঠেকল আঙুলে, হিম বাতাসে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমাট বেঁধে গেছে। ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করার আগে চারদিকে তাকাল রানা।

হুড খানিক তুলে কান দুটো বের করল ও। না, কল্পনা নয়। চারপাশের বরফে ভৌতিক তর্জন-গর্জনের আওয়াজ। যেন রাগে অন্ধ দানবকুল দাঁত কিড়মিড় করছে। তার সাথে শোনা গেল গুরুগম্ভীর ভরাট শব্দ, যেন আগ্নেয়গিরি থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে জ্যাস্ত লাভা। কিউটের আধ মাইল দূরে ব্যাপক আলোড়ন চোখে পড়ল। এত উঁচু আর দূর থেকে পাঁচিলগুলোকে নিচু দেখাচ্ছে-সচল পাঁচিল, একটার মাথায় চড়ছে আরেকটা, আরও উঁচু হয়ে চেউয়ের মত সরে যাচ্ছে কিউটের কাছ থেকে দূরে, দক্ষিণ দিকে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো ফিতের মত সরু জলরেখা টলটল করে উঠল, চওড়া হয়ে সরে যাচ্ছে দূরে।

বরফের তুমুল আলোড়ন মুহূর্তের জন্যে থামছে না। ঠোকাঠুকি, ফাটাফাটি, ধাক্কাধাক্কি, ছুটোছুটি চলছে তো চলছেই। সেইসাথে চওড়া হতে হতে এগিয়ে চলেছে সরু ফাটলটা। মস্তুরগতি, কিন্তু থেমে নেই। দূর অন্ধকার একটা রেখা, সাগর বলে চেনার উপায় নেই, সেদিকেই যাচ্ছে ওটা। বরফ ভেঙে ওই ফাটলে পৌঁছুতে হবে কিউটকে।

শরীরটা ঘোরাল রানা, মাস্তুলের সাথে আটকানো চেস্ট-স্ট্র্যাপ ওকে খসে পড়তে দিল না। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। পিছনে আধ মাইল চওড়া খোলা চ্যানেল। চ্যানেলের শেষ মাথায় রুশ হেলিকপ্টারের ধবংসাবশেষ দেখা গেল। ওটাতে চড়েই দলবল নিয়ে কিউটে পৌঁচেছে রানা। ইচ্ছে করেই কিউটের বো-র নিচে ল্যান্ড করেছিল ও, বাকি কাজটা ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সারেন। জাহাজ খানিকটা পিছিয়ে আসে, তারপর ছুটে গিয়ে ধাক্কা দেয় বরফের উঁচু প্ল্যাটফর্মে। কিনারায় ছিল সাব-কিলার, একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায় সেটা।

কিন্তু রুশ হেলিকপ্টারের ধবংসাবশেষ নয়, রানা তাকিয়ে আছে আরও দূরে। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

উত্তরে প্রবাহিত হতে শুরু করা বাতাসে ভর দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে কালো একটা পর্দা। ভাল করে তাকালে বোঝা যায়, গাঢ় বাষ্প। আই.আই. ফাইভ যে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল, তার সাথে এর কোন মিল নেই। নিশ্চিহ্ন কালো পাঁচিল, কয়েকশো ফিট উঁচু, জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। আর্কটিকের ভয়াবহ যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর্কটিকে বার কয়েক এলেও, এই বিপদের মধ্যে



আগে রানাকে পড়তে হয়নি। এ-ও কুয়াশা, তবে হিমেল আবহাওয়ায় জমাট বেঁধে গেছে। আবহাওয়ার এই বিপজ্জনক রূপ আর্কটিকে কদাচ দেখা যায়, আক্রান্ত মানুষ ফ্রস্ট বাইটের শিকার হতে পারে। মাস্তুলের মাথা থেকে নামার আগেই যদি এসে পড়ে কুয়াশা, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবার ভয় আছে। এরই মধ্যে প্রেশার রিজ জোন ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

‘ক্যাপটেন! রিভার্স হার!’ চিবুরের কাছে ঝুলে থাকা মাইকে দ্রুত কথা বলল রানা।

ক্যানভাস প্যাডে মোড়া মাস্তুল আঁকড়ে ধরল ও। এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। ঝাঁকি খেলো জাহাজ, পিছনের গাড়ি পানি কেটে পিছু হটছে। যা ভয় করেছিল তা ঘটল না—কোন ঝাঁকি না, শুধু মৃদু একটা দোল অনুভব করল ও। দু’পাশ থেকে পিছিয়ে গেল আইসফিল্ড, গাড়ি পানি দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে মন্তর হলো কিউটের গতি, থামল। কি আসছে জানে রানা, তলপেটের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। তর তর করে নিচে নামার ঝাঁকটাকে দমন করে নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। নির্দেশ দিল, ‘হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!’

‘ও কে, মি. রানা, হিয়ার উই গো। হোল্ড অন টাইট।’

মাস্তুলটাকে আপন সন্তানের মত বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করল রানা, মাথাটা একপাশে সরিয়ে রেখেছে, ধাক্কা খাওয়ার জন্যে তৈরি। এঞ্জিনের পাওয়ার বাড়ল, কাঁপুনিটা উঠে এল মাস্তুল বেয়ে। সামনে এগোল কিউট। অনেক নিচে, উল্টোদিকে ছুটল আইসফিল্ড। জলরেখা ক্রমশ সরু হয়ে এল। সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, জানে, জলরেখা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে

নিরেট বরফে ধাক্কা খাবে জাহাজ।

সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কা একসাথে এল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো গোটা জাহাজ, শরীরে ঘন ঘন হাতুড়ির বাড়ি খেলো রানা। ক্যানভাস প্যাড ছিল বলে, তা না হলে রানার কাঁধ আর বুকের হাড় পাউডার হয়ে যেত। জাহাজের কাঁপুনির সাথে ধীরে ধীরে মাস্তুলের কাঁপুনিও কমে এল। ধাক্কা দিয়ে স্থির হয়ে গেল আইসব্রেকার। বরফে গুঁথে আছে।

পেশী টিল করল রানা, সামনে তাকাল। জাহাজের বো-র সামনে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু লম্বায় মাত্র কয়েক ফিট। ফাটলের দু’পাশে তাকাল রানা, আশা, আরও হয়তো কোথাও চিড় ধরেছে।

না।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ক্যাপটেন কিছু বলছেন। এক হাতে মাস্তুলটা আরও শক্ত করে ধরল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে আধ মাইল দূরে তাকাল। আগের সেই ফাটলটা আরও চওড়া হচ্ছে। গলায় উদ্বেগ নিয়ে আবার ওকে ডাকলেন ক্যাপটেন। ‘মি. রানা, শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?’

‘ঠিক আছি আমি। প্রথমবার তেমন কাজ হয়নি। পারলে একই জায়গায় আবার আঘাত করতে হবে।’

‘রিভার্স?’

‘হ্যাঁ।’

এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। মাস্তুলের ডগায় বসে অনুভব করল রানা, বরফ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে আইসব্রেকার। প্রচণ্ড ধাক্কা ফাঁক হয়ে গেছে বরফ, জাহাজের বো-কে ভেতরে

চুকিয়ে নিয়ে চারদিক থেকে চেপে বসে আটকে ফেলেছে ওটাকে। সব ক'টা এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিছু হটার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিউট। ধীরে ধীরে এঞ্জিনের গর্জন কমে এল। একটু পর দ্বিতীয়বার বাড়তে শুরু করল। রানার মনে হলো এবারও ব্যর্থ হয়েছেন ক্যাপটেন, এই সময় বরফের কঠিন থাবা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল জাহাজ। বো-র কাছে নিরেট বরফ বিস্তারিত হলো, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল বিস্ফোরণের শব্দ। পিছু হটছে জাহাজ, পোর্ট সাইডের বরফে গাঢ় রঙ লেগে রয়েছে।

পিছন দিকে তাকাল রানা। গোটা প্রেশার রিজ এলাকা ঢেকে ফেলার কাজ শেষ, সমতল বরফের বিস্তারকে গ্রাস করতে আসছে কুয়াশা। খুব বেশি দূরে নেই, জাহাজ ঢাকা পড়ে যাবে। কিউট না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর নির্দেশ দিল, 'হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!'

ক্যাপটেন এবার চ্যানেল ধরে আগের চেয়ে বেশি পিছিয়ে এসেছেন, বরফের গায়ে ধাক্কা দেয়ার সময় গতি যাতে বেশি পাওয়া যায়। প্যাড মোড়া মাস্তুলকে আলিঙ্গন করল রানা। আধবোজা হয়ে আছে চোখ, নিচের দিকে দৃষ্টি। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে জাহাজের দু'পাশে জলরেখা। রানা জানে না, ডেকে বেরিয়ে এসেছে নিয়াজ আর বিনয়, আতঙ্কে বিকৃত চেহারা নিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে রয়েছে দু'জনেই।

জলরেখা অদৃশ্য হলো। মাস্তুলের সাথে গাছের পাতার মত কেঁপে উঠল রানা। এবার আগের চেয়ে জোরে বরফের গায়ে হুমড়ি খেয়েছে জাহাজ।

এভাবে একের পর এক আঘাত হানা হলো। জায়গা বদল

করল রানা, বরফ ভাঙার জন্যে জাহাজটাকে ব্যক্তিগত হাতুড়ির মত ব্যবহার করল। আধ ঘণ্টা চলল এভাবে। তারপর মনে হলো, কিছু একটা ঘটছে। চিড় ধরতে শুরু করেছে বরফে, আঁকাবাঁকা গাঢ় রেখা ফুটছে গায়ে।

ঘটনা আরও ঘটছে। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এল রানার। এক দুই পল ভ্রান্তির ঘোরের মধ্যে থাকছে, ভুলে যাচ্ছে কোথায় সে, কি করছে এখানে। অসহ্য ঠাণ্ডাই আসল কারণ। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া, ক্যানভাস প্যাডে বারবার ঘষা খাওয়ার ফল। ওদিকে, কালো পর্দা দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই কুয়াশা ওকে মেরে ফেলার আগে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে ওদের। 'রিভার্স, ক্যাপটেন!' কর্কশ গলায় মাইকে চিৎকার করল রানা। 'এবার একেবারে চ্যানেলের শেষ মাথায় নিয়ে চলুন।'

পিছু হটল জাহাজ। খুব বেশি পিছনে চলে এল। কালো কুয়াশার একটা বাহু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, যেখানে রুশ সাব-কিলার চ্যাপ্টা হয়েছিল। বাহুটা ওপর দিকে উঠে এসে মাস্তুলের মাথা পেঁচাতে শুরু করল। দেখতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল নিয়াজের। রেইল ধরে কাঁপতে লাগল সে, ভয়ে নয়, রাগে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অভদ্র ভাষায় চিৎকার করে উঠল, 'ইউ স্টুপিড ইডিয়ট-গেট হার মুভিং! রানা কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে!' কোন আরোহী ক্যাপটেনের সাথে এভাবে কথা বলে না।

হঠাৎ করেই রানার চারপাশের জগৎ ছোট হয়ে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য হলো সব। আইসফিল্ড গায়েব হলো, নিখোঁজ হলো নিচের পানি, হারিয়ে গেল ডেক। জাহাজ সামনে এগোল, কিন্তু আগেই এগিয়ে গেছে কুয়াশা, ফলে বেরিয়ে আসা গেল না।

পেট আর বুকের সাথে মাস্তুল জড়িয়ে ধরল ও, শ্বাস টানল বড় করে। বাতাসের সাথে ভারী, নোংরা, হিম ঠাণ্ডা কুয়াশা ঢুকল ফুসফুসে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করল ও, মনে হলো ভেতরটা যেন তরল বরফে ভরাট হয়ে গেছে। বাতাসের জন্যে ছটফট করতে লাগল। মনে হলো, সারা শরীরে ভারী কি যেন চেপে বসছে, মাস্তুলের মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছে ও। এগিয়ে চলেছে জাহাজ, হঠাৎ করে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। নিজের অজান্তে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ দুটো খুলল ও। পারকার গায়ে রাশ রাশ বরফ কুচি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। বরফের আবরণ ঢেকে ফেলছে ওকে।

‘মি. রানা, আপনি কথা বলুন, মি. রানা আপনি...’, অস্থির ক্যাপটেন মুহূর্তের জন্যে থামছেন না।

‘শান্ত হোন। এবারের ধাক্কায় কাজ হবে।’ দম নেয়ার জন্যে থামল রানা। ‘যে ফাটলটা আমরা তৈরি করেছি তার পঞ্চাশ গজ এদিকে, পোর্ট সাইডের বরফে গুঁতো মারবেন। কি চাইছি বুঝতে পারছেন?’

‘ফাটলের পঞ্চাশ গজ এদিকে!’ ক্যাপটেনের মনে হলো রানার কথা ভুল শুনেছেন তিনি।

‘হ্যাঁ। পোর্ট সাইড! পঞ্চাশ গজ! জাহাজকে আমি ধাক্কা খাইয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইছি স্টারবোর্ডের একটা ফাটলের মুখে। ফুল পাওয়ার!’

‘ফুল পাওয়ার! আপনাকে আমি খুন করব...’

পাল্টা ধমক দিল রানা, ‘প্রলাপ বকবেন না। বজ্জাত জাহাজটাকে রেসের ঘোড়ার মত ছোটান। ফুল পাওয়ার!’

‘ও কে! এ আপনার...সিদ্ধান্ত!’ শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ক্যাপটেন, সিদ্ধান্তের জায়গায় মরণ ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন।

রেসের ঘোড়ার মত টগবগিয়ে সামনে ছুটল কিউট। এর আগে এঞ্জিনের এমন দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ শোনা যায়নি। গাঢ় পানি দু’পাশে সরিয়ে দিয়ে, বো-র ধাক্কায় পানিতে ঢেউ তুলে, পরবর্তী ধাক্কা মারতে যাচ্ছে ব্যারিয়ারে। অদ্ভুতই বলা যায় রানার প্ল্যান, এ-ধরনের কৌশল সাধারণত কেউ কাজে লাগায় না। দ্রুতগতি জাহাজ সমস্ত ওজন সহ পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে আঘাত হানবে, নিরেট বরফে ধাক্কা খেয়ে কিউটের নাক বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করবে। অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ হবার আগেই স্টারবোর্ড সাইডের নির্দিষ্ট একটা বরফ টুকরোর সাথে সংঘর্ষ হবে বো-র। এই কৌশল ছাড়া সরাসরি বা অন্য কোনভাবে টুকরোটোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। এই টুকরোর ওপরই রয়েছে আঁকাবাঁকা রেখা, বহুদূর লক্ষ্য হয়ে মিশেছে গিয়ে ক্রমশ চওড়া হতে থাকা ফাটলে।

মাস্তুলের ডগা থেকে ক্যাপটেনকে গাইড করছে রানা। পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে ধাক্কা না লাগলে সব ভেস্তে যাবে, কারণ তা না হলে স্টারবোর্ডের টুকরোটোর ঠিক জায়গায় বো-র গুঁতো লাগবে না। ডেকে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সমস্ত লোককে ডেক থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাপটেন। সর্বশক্তিতে ছুটে গিয়ে আঘাত খাবে আইসব্রেকার, খোলা ডেকে থাকা মানে ছিটকে পানিতে পড়া, নাহয় রেইলের সাথে বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটানো।

ব্রিজে উঠে এসেছে নিয়াজ, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রস-ট্রীর ওপর খুদে মূর্তিটাকে রানা বলে চেনা যায় না। ফুল পাওয়ার!—ক্ষমতা থাকলে ক্যাপটেনের নির্দেশ বাতিল করে দিত সে।

মাস্তুলের ডগা থেকে পোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বরফের শক্ত স্তর জমেছে ওর কাপড়চোপড়ে, স্তরটা আরও মোটা হচ্ছে। ক্যাপটেনকে শেষ নির্দেশ দিল ও, ‘যদি দেখেন জাহাজ থামছে না, থামবার দরকার নেই। চিড় ধরা বরফ গুঁড়িয়ে গিয়ে পথ করে দিতে পারে।’ প্রতি মুহূর্তে জাহাজের গতি বাড়ল। বরফের তর্জন-গর্জন চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের একটানা হুঙ্কারে। অসুস্থ বোধ করল রানা। বারবার শুধু নিজেকে মনে করিয়ে দিল, মাস্তুলটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। ধাক্কাটা এই সময় লাগল।

পোর্ট সাইড ব্যারিয়ারে তির্যকভাবে আঘাত করল কিউট। ব্যারিয়ার যেন পাল্টা ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিল জাহাজকে, প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে স্টারবোর্ড সাইডে বাড়ি খেলো বো। রানার নির্দেশে ক্যাপটেন তার জাহাজটাকে বিশাল একটা বিলিয়ার্ড বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন—মেরেছেন যেদিকে, তার ঠিক উল্টোদিকে যেন আঘাত করে বল, চিড়গুলোর কাছাকাছি। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে অন্য একটা আওয়াজ শোনা গেল, ভাঙচুরের পালা শুরু হয়েছে। পিছনের কয়েক হাজার টন শরীর নিয়ে বরফের ওপর চড়াও হয়েছে বো, সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে হেলেদুলে সামনে ছুটে চায়।

মাস্তুলের ওপর রানা ওদিকে মরতে বসেছে। চাবুকের মত

সপাং সপাং আওয়াজ তুলে এদিক ওদিক দুলছে মাস্তুল, যে-কোন মুহূর্তে গোড়া থেকে মট করে ভেঙে যাবে বলে মনে হলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সহ্য করতে পারল রানা, তারপর সমস্ত হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেল ওর। অবিশ্বাস্য গতিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাস্তুল, একবার এদিক, একবার ওদিক। রানার পেশীতে কোন জোর থাকল না, মনে হলো ঝাঁকি খেয়ে মাথার ভেতর মগজটুকু আকৃতি বদল করেছে। দাঁতগুলো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে আসতে চাইল মুখের বাইরে। হাত-পা খুলে আসতে চাইল শরীর থেকে।

প্রাণপণ চেষ্টা করার পর চোখ একটু খুলতে পারল রানা। হাত দুটো এখনও মাস্তুল জড়িয়ে রয়েছে। সব কিছু ঝাপসা দেখল ও। জাহাজ খেমে রয়েছে নাকি চলছে বোঝা গেল না। নিচের দিকে তাকিয়ে বিশাল একটা ফাটল দেখতে পেল। চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে, এই সময় বুকের কাছে ঝুলে থাকা মাইকটা চোখে পড়ল। নিজের অজান্তেই কথা বলে উঠল ও, ‘চালিয়ে যান, ক্যাপটেন, থামবেন না!’ মুখের ভেতর লোনা স্বাদ—রক্ত। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তীব্র ব্যথা। শিরদাঁড়া ভেঙে গেল নাকি? ‘ফুল স্পীড অ্যাহেড, ক্যাপটেন! ফুল স্পীড...!’

বরফের ভেতর জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে টের পেয়ে ক্যাপটেন আর নতুন কোন নির্দেশ দেননি, কাজেই যেদিকে খুশি এগিয়ে চলেছে কিউট। বো-র সামনে পড়ে বরফের বিশাল বিশাল চাঁই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, কোন কোনটা দু’টুকরো হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দু’পাশে। গায়ের জোরে ক্রমশ ভেতরে ঢুকছে আইসব্রেকার। বোর ধাক্কা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে ব্যারিয়ার, নিজের তৈরি পথ ধরে হেলেদুলে এগোচ্ছে কিউট। ডেকের নিচে চীফ এঞ্জিনিয়ার

তার গজের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, ডেঞ্জার পয়েন্ট ছাড়িয়ে গিয়ে খরখর করে কাঁপছে কাঁটা। ক্যাপটেন সাবধান না হলে বয়লারগুলো যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে।

ব্রিজ থেকে আগের নির্দেশই রিপিট করলেন ক্যাপটেন, ‘ফুল পাওয়ার!’ তাঁর এই নতুন নির্দেশে জাহাজ যেন এবার সত্যি অদম্য হয়ে উঠল। বো উঠে গেল বরফের ওপর, স্রেফ শক্তি আর ভার চাপিয়ে তছনছ করে দিল নিরেট বাধা। মাস্তুলের মাথা থেকে এতক্ষণে টের পেল রানা কি ঘটছে। সামনে ফাঁক হয়ে গেছে আইসফিল্ড, ফাঁকটা চওড়া ফাটলের দিকে ছুটছে। আর কোন চিন্তা নেই, পরম স্বস্তির সাথে উপলব্ধি করল ও। এভাবেই ফাটল ধরে সাগরে পৌঁছে যাবে জাহাজ। সেই সাথে জ্ঞান হারাল ও।

মাস্তুল থেকে খসে পড়ল হাত। ক্রস-ট্রী থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল শরীর। চেস্ট-স্ট্র্যাপের সাথে শূন্যে পেডুলামের মত ঝুলতে লাগল রানা।

রানাকে নামাবার জন্যে ওপরে উঠল দৈত্য হিগিন, এই লোকই রানার সামনে বালতি বসিয়ে দিয়েছিল। মাস্তুল বেয়ে কে আগে উঠবে তাই নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করেছে নিয়াজ আর বিনয়, এই সময় ওদের দু’জনকেই অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, ‘গরিলা থাকতে তোমরা কেন?’ সত্যি কথা বলতে কি, গোটা জাহাজে সে-ই বোধহয় এই কাজের জন্যে একমাত্র যোগ্য লোক। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু, কিন্তু চওড়ায় দ্বিগুণ। শুধুই পেশী, চর্বির ছিটেফোঁটাও নেই শরীরে। মাস্তুল দুলছে, অথচ প্রায় তরতর করে উঠে গেল হিগিন। জাহাজ থামেনি, আগের মতই

বরফ ভেঙে এগিয়ে চলেছে।

‘রানা কি মারা গেছে?’ নিয়াজের পাশ থেকে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল বিনয়, দু’জনেই ওরা মই ধরে স্থির হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় আশি ফিট ওপরে দুলছে রানা। দুলছে মাস্তুলের সাথে, শরীরে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই-অন্তত আছে কিনা ডেক থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

‘এত সহজে মারা যাবে?’ ফোঁস করে উঠল নিয়াজ। তার গলার স্বরে খানিকটা হলেও অভিমান ফুটে উঠল, যেন বলতে চায় এভাবে ওদেরকে একা ফেলে বিনা নোটিশে মারা যাবার কোন অধিকার রানার নেই। ‘আমি ভাবছি অন্য কথা,’ আবার বলল সে। ‘স্ট্র্যাপটা ওর ভার বেশিক্ষণ সহিতে পারবে না।’

হিগিনকে এখন ছোট দেখাচ্ছে। এখনও উঠে যাচ্ছে সে। ডেকে অনেক লোকের ভিড়, সবাই ওপর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোট নাড়ছে। কি হয় বলা কঠিন। মাস্তুল যেভাবে এদিক ওদিক দুলছে, হিগিন পড়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রত্নস্থাসে একবার রানার দিকে, একবার হিগিনের দিকে তাকাল নিয়াজ। হঠাৎ চোখ নামিয়ে দু’হাতে মুখ ঢাকল বিনয়।

ক্রস-ট্রীর কাছে পৌঁছে গেল হিগিন। ভুলের খেসারত মৃত্যু, অত ওপর থেকে কেউ পড়লে, পড়ার আগেই বলে দেয়া যায় লোকটা মারা গেছে।

ক্রস-ট্রীর নিচে পৌঁছে থামল হিগিন। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কিউটের বো অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে উঠল। উঁচু হলো ধীরে ধীরে, কিন্তু নামল সবগে। রেইল থেকে হাত ছুটে গিয়ে বরফ মোড়া ডেকে আছাড় খেলো নিয়াজ। পিছলে গেল

শরীরটা, দূরে একটা বাঁকহেডের গায়ে গিয়ে থামল। দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, দেখল সাহায্যের জন্যে ছুটে আসছে বিনয়। কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিল নিয়াজ। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে দু'জনেই মাস্তুল থেকে খসে পড়েছে। নিশ্চয়ই জাহাজে পড়েনি।

একটা হাত বাড়াল নিয়াজ। ‘আমাকে তোলো, বিনয়...’

বিনয়ের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াল সে, একটা রেইল ধরে সিধে হলো। ভয়ে ওপর দিকে তাকাচ্ছে না। হঠাৎ খেয়াল হলো, বিনয় কোন্ সাহসে তাকিয়ে রয়েছে?

চোখ তুলল নিয়াজ। মাস্তুলের ডগায় কেউ নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, দেখল, ডগা থেকে অনেক নিচে নেমে এসেছে হিগিন, তার চওড়া কাঁধে ঘুমন্ত শিশুর মত নেতিয়ে রয়েছে রানা। মাস্তুল থেকে খুলে চেস্ট-স্ট্র্যাপটা নিজের কাঁধে জড়িয়ে নিয়েছে হিগিন, পিঠ থেকে রানা যাতে পড়ে না যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছানাবড়া হয়ে উঠল নিয়াজের চোখ-লোকটা মানুষ, নাকি আর কিছু? মইটাকে ইম্পাতের বলে চেনার উপায় নেই, প্রতিটি ইঞ্চি বরফের পুরু স্তরে মোড়া। জাহাজের সাথে বিরতিহীন দুলছে আর কাঁপছে। পিঠে ওই ভার নিয়ে লোকটা নামছে কিভাবে?

পিঠে রানা থাকায় ধাপে জোরাল চাপ দিতে পারল হিগিন, বরফের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে এল ইম্পাত। ধাপে বরফ থাকা অবস্থায় রানাকে নিয়ে নামতে পারত না সে, পা পিছলে পড়ে যেত।

নিরাপদেই নেমে এল হিগিন। তার চেহারা গম্ভীর, থমথমে। রানা কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সাহস হারিয়ে ফেলল

নিয়াজ। তারপর হঠাৎ দেখল, সে বাদে বাকি সবাই রানা আর হিগিনকে সাহায্য করছে। বলতে গেলে জুদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

ফাটলে পড়ল কিউট। বো-তে পানি পেয়ে সাবলীল হলো জাহাজের গতি।

## সাত

‘মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে? কি ঘটবে?’

রিসার্চ শিপ রিগার ব্রিজে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে রাডারের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। পাশেই দৈত্যাকৃতি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ব্রিজটা বিশাল, হেলমসম্যানের সামনে ইম্পাতের মত শক্ত অভঙ্গুর কাঁচের প্রকাণ্ড দেয়াল। দেয়াল জুড়ে সাজানো রয়েছে নেভিগেশন সহজ করার জন্যে যাবতীয় জটিল যন্ত্রপাতি। রুশ রিসার্চ শিপের সাথে তুলনা করলে রাডারহীন সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউটকে মাস্কাতা আমলের বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

শক্তিশালী ডিজেল মটরগুলোর ভাইব্রেশন মৃদু গুঞ্জনের মত শোনায। ব্রিজের সামনে ফিট করা পাঁচ-সাতটা সার্চ-লাইট ঘন কুয়াশাকে আলোকিত করে রেখেছে।

আচমকা ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ। বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে ডেকের দিকে তাকাল ট্রাভকিন। না, হাতির পা ইম্পাত মোড়া ব্রিজের মেঝের কোন ক্ষতি করতে

পারেনি।

কয়েক হাত দূর থেকে হেলমসম্যান ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ কর্নেলের চোখ রাঙানি লক্ষ করে নিজের কাজে মন দিল সে। এবার ক্যাপটেনের দিকে ফিরল কর্নেল। ‘আমার কথা আপনি শুনতে পাননি?’ হুমকির মত শোনাল তার কর্ণস্বর।

ক্যাপটেন নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। বগড়ার মধ্যে না গিয়ে মৃদু স্বরে বলল সে, ‘বলুন।’

‘কি ঘটবে?’ প্রশ্নটা আবার করল বলটুয়েভ, ‘আমরা যদি কুয়াশা থেকে বেরিয়ে কিউটের পেটে একটা রামধাক্কা মারি বো দিয়ে?’

বিড়বিড় করে ট্রাভকিন বলল, ‘আপনি একটা বন্ধ উন্মাদ!’

সাগরে পৌঁছেছে কিউট। ডুবে যাচ্ছে।

চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, ঘনকালো কুয়াশার পর্দার ওপর কোথাও চাঁদ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। সার্চ-লাইটের আলোয় শুধু সামনের দিকটা খানিকদূর পরিষ্কার, উদ্ভাসিত হয়ে আছে ভীতিকর দৃশ্য।

ব্রিজ, মাস্তুল, রেইল, আর ডেক স্ফটিকের মত বরফের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। গোটা আবহাওয়া জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রা-৩৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট, অর্থাৎ ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে একান্তর ডিগ্রী নিচে। হিম-শীতল সাগরের চেয়ে বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা। বাতাস নয়, তরল বরফ কালো মেঘের মত ভেসে রয়েছে জাহাজের ওপর। ডেকে পাঁচশো টনের বেশি

বরফ জমেছে, স্তূপ হয়ে আছে পোর্ট সাইডে। সন্দেহ নেই উল্টে যাবে কিউট। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আইসব্রেকার ডুবছে।

ডেকে গুরু হয়েছো মরণগণ যুদ্ধ। আবহাওয়া আর তুষারের সাথে মানুষের লড়াই। একান্ত জরুরী কাজে যারা ব্যস্ত তারা বাদে বাকি সবাই উঠে এসেছে ওপরে। বাঁচার একটাই উপায়, সময় থাকতে জাহাজ থেকে ফেলতে হবে বরফ। যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছে ক্রুরা, বিপদের গুরুত্ব তাদের জানা আছে। প্রতি মুহূর্তে কয়েক মণ বরফ রেইলের ওপর দিয়ে সাগরে ফেলেছে তারা, কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশি নতুন বরফ জমেছে ডেকে। অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখছে না তারা। বান্ধহেড ল্যাম্পের আলো ঝাপসা হয়ে আছে, কারণ ল্যাম্পের কাঁচে জমাট বেঁধেছে বরফের স্তর। সিঁধে হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কেউ, বরফের ভারে পেটের দিকে বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। বাতাসের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, অথচ শ্বাস টানতে পারছে না-টানলেই গলার ভেতর তরল বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

বরফে তৈরি মানুষ ওরা, প্রত্যেকের কাপড়চোপড় ঢাকা পড়েছে শক্ত আবরণে। অতিরিক্ত বিশ থেকে পঁচিশ সের ওজন বহিতে হচ্ছে। শাবল, কোদাল, আর হাতুড়ি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ চলছে। বরফ ভাঙো, তোলো, ফেলো। ডেক জুড়ে দলে দলে কাজ করছে লোকজন। অবিরাম, বিরতিহীন। মত্তরগতি এঞ্জিনের আওয়াজ বরফ ভাঙার শব্দে চাপা পড়ছে। অশান্ত সাগর যেন লগি দিয়ে ঠেলে ওপরে তুলছে কিউটের সামনের দিক, পরমুহূর্তে লগি সরিয়ে নিতেই প্রচণ্ডবেগে আছাড় খাচ্ছে। তখন আর কাজ করার উপায় থাকছে না ক্রুদের, লাইফ-লাইন ধরে তাল

সামলাতে হয়, তা না হলে রেইল টপকে সাগরে পড়তে হবে।

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই।

টেকির মত ওঠা-নামা করছে জাহাজের বো, সার্চ-লাইটের আলোয় উথালপাথাল সাগর ফুঁসছে। উঁচু ব্রিজ থেকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান, মাঝ-আকাশ থেকে ডেকে বরফ পড়তে দেখছেন—কালো কুয়াশা স্ফটিক হয়ে নেমে আসছে নিচে। ‘আমরা হারছি, কাফম্যান,’ গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। ‘যতটা বরফ ফেলতে পারছি তারচেয়ে বেশি জমা হচ্ছে।’

পোর্ট উইন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকাটিং মেট কাফম্যান। ডেকে প্রায় রেইল সমান উঁচু হয়ে রয়েছে বরফ। আর্মার গ্লাসে মুখ চেপে ভাল করে তাকাতে গেল সে, ঠাণ্ডা ছঁাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল। খুব জোরে বরফে শাবল গাঁথতে গিয়ে বিপদে পড়ল একজন ত্রু। দূর থেকে ঠিক চেনা গেল না, সম্ভবত হিগিন। তার ডান হাতের দস্তানা খুলে গেল, বরফের ভাঁজে আটকা পড়ল কজি পর্যন্ত। দ্বিতীয় দস্তানাটা হাতে রয়েছে বটে, তবু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হবে বেচারী। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সে, কজিসহ আঙুলগুলো বগলের তলায় চেপে ধরেছে। সবচেয়ে কাছের সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাফম্যান ভাবল, হয়তো শেষ রক্ষা হবে না—হাতটা বরফে পরিণত হলে কেটে ফেলে দিতে হবে। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারল কিনা দেখা হলো না। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে ছড়িয়ে পড়ল ঝর্নার মত একরাশ পানি, মাঝপথে পরিণত হলো বরফে, ঝামঝাম করে শিলাবৃষ্টি হলো কাঁচে। ঝাপসা হয়ে গেল দৃশ্যটা।

‘শুনলাম মি. মাসুদ রানা ভাল আছেন,’ বললেন গোল্ডম্যান।

‘হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে উঠছেন,’ কাফম্যান বলল। ‘ভদ্রলোক এই কাঁচের মত, অভঙ্গুর!’

নিয়াজের কেবিনে একা বসে রয়েছে রানা। জাহাজের খোলার সাথে ঘষা খাচ্ছে ভাসমান বরফের চাঁই, তারই ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ শুনছে একমনে। কেবিন পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ও। জানে, বরফ সরাবার জন্যে অমানুষিক খাটছে ত্রুরা, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। জাহাজ উল্টে গেলে কেউ ওরা বাঁচবে না, তবু বিপদটার কথা ভুলে গিয়ে অন্য কথা ভাবছে রানা।

কর্নেল বলটুয়েভের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল। তিন ঘণ্টা আগে প্রথম যখন জ্ঞান ফিরল, ওকে দেখতে এসেছিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

‘আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ওরা, মি. রানা—সোভিয়েত ট্রলার।’ ক্যাপটেনের আঙুল ছিল ভাঁজ খোলা চার্টের ওপর। ‘আমাদের পথের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।’

‘রাডার নেই, জানলেন কিভাবে।’

‘নিজের চোখে দেখে এসেছে শেরম্যান। কুয়াশা তখনও আসেনি, সিকোরস্কি নিয়ে ফুয়েল লিমিটের শেষ মাথা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল ও। শুধু যে ট্রলারগুলোকে দেখেছে তাই নয়, ঠিক এখানটায় আরও বড় কি যেন একটা আছে।’

‘ত্রিশ মাইল দূরে। রিসার্চ শিপ রিগা?’

‘হতে পারে। ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি শেরম্যান, ও তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় জাহাজটা। তবে গম্বুজ আকৃতির রাডার ডোম মত কিছু একটা



দেখেছে। রিগায় এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে, আমাদের স্যাটেলাইটগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখন লক্ষ রাখতে হবে ওদের যখন আমরা পাশ কাটাতে কোন দুর্ঘটনা যেন না ঘটে...’

নড়েচড়ে বাক্ষে আরও আরাম করে বসল রানা। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম কথা হয়েছে জাহাজের ডাক্তারের সাথে। ওর কোন হাড় ভাঙেনি দেখে ডাক্তার নাকি নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরীক্ষা করেছিল, স্বপ্ন দেখছে না তো! হাড় না ভাঙার কারণ, পরে ডাক্তার উপলব্ধি করে, রানার পরনের গরম কাপড়চোপড় আর ক্যানভাস প্যাড। মাস্তুলের সাথে ধাক্কা না খেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়েছিল শরীরটা, সেটাও একটা কারণ। যাবার সময় ডাক্তার ওকে বলে গেছে, ‘তবু সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে আপনাকে, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছানো পর্যন্ত এই কেবিন থেকে বেরুতে পারবেন না।’

আপনমনে হাসল রানা। ডাক্তার জানে না, চার দেয়ালের ভেতর বন্দী থাকার মানুষ নয় সে। সত্যি, সারা শরীর খেঁতলে গেছে ওর; শুধু ব্যথা নয়, সেই সাথে অনুভব করছে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ধড়টা। তবু এই বিপদের সময় চুপ করে বসে থাকা যায় না। নিয়াজের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। জরুরী কথা আছে। তারপর ব্রিজে যাবে...

উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে কর্নেল বলটুয়েভের কথা ভাবল রানা। আই.আই. ফাইভের একটা ঘরে মিনিট কয়েক লোকটাকে দেখেছে ও। চোখের সামনে বিশাল একটা দেহ ভেসে উঠল, কামানো মাথা, অস্বাভাবিক চওড়া মুখ, চেহারায় মঙ্গোলীয়

ছাপ। নিষ্ঠুর, প্রতিশোধপরায়ণ একজন মানুষ।

কিউটের সামনে ছয়টা সোভিয়েত ট্রলার রয়েছে। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। কিউটে ইভেনকো রক্ষণভ রয়েছে। আর রয়েছে মেরিলিন চার্ট। এ-সব জানা আছে কর্নেল বলটুয়েভের। ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বললেন, দেখতে হবে যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। কিন্তু রানা ভাবছে সম্পূর্ণ অন্য কথা।

কর্নেল বলটুয়েভের নির্দেশে রিসার্চ শিপ রিগা আর ট্রলারগুলো কিউটের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, লোকটা কি পরিমাণ ঝুঁকি নেবে? মার্কিন পতাকাবাহী একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে কি? কিংবা জাহাজে চড়াও হবার স্পর্ধা দেখাবে?

লোকটার মানসিক গঠন কি রকম, তার ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। যদি উন্মাদ হয়, সবই সম্ভব। উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাবার চেষ্টা করল রানা।

আরও একটা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় মেরিলিন চার্ট। সত্যিই কি আসল চার্টটা নিয়ে এসেছে ইভেনকো রক্ষণভ? টিউবের ভেতর থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটাকেই আসল চার্ট বলে দাবি করছে সে, তার এই দাবি কতটুকু সত্যি? ওটাই যদি আসল চার্ট হবে, সেটা নিজের কাছে রাখার জন্যে আরও জেদ ধরেনি কেন?

চার্টটা নয়, টিউবটা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কেন?

শুরুতে রানা ধারণা করেছিল, আসল চার্টটা ইভেনকো নিয়ে আসবে না, বা নিয়ে আসতে পারবে না। ব্যক্তিগত ভাবে ও চায় না, আসল চার্টটা আমেরিকানদের হাতে পড়ুক। তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। এখন, ইভেনকোর দাবি যদি মিথ্যে না হয়,

নতুন একটা দায়িত্ব চাপল ওর কাঁধে। আসল মেরিলিন চার্ট ফিরিয়ে দিতে হবে রাশিয়াকে।

কিন্তু তাহলে আমেরিকানদের বুঝ দেবে কিভাবে?

তারও আগে জানতে হবে, আসল চার্টটা কোথায়।

চিন্তা করতে করতে নিজের অজান্তেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল রানা।

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বা বলা যেতে পারে বিপদের সমস্ত ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে হাফ স্পীডে ছুটছে কিউট। দুই টেউয়ের মাঝখানে সরু একটা ঢালে নাক ঢুকিয়ে দিল বো, সবচেয়ে পোর্ট রেইলের ওপর ভেঙে পড়ল মস্ত একটা টেউ, সম্পূর্ণ ডুবে গেল রেইল। আবার যখন মাথাচাড়া দিল বো, পানির অর্ধেকই বরফে পরিণত হয়ে রয়ে গেল ডেকে।

দশ মিনিট আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হ্যারি গোল্ডম্যান। ‘ঝুঁকিটা নিতেই হবে। স্পীড বাড়িয়ে দেখা যাক কুয়াশা থেকে বেরুতে পারি কিনা।’

‘জাহাজ উল্টে...’, ক্যাপটেন বাট করে তাকাতো কথাটা শেষ করতে পারেনি কাফম্যান। ডুবে তো ওরা এমনিতেও যাচ্ছে, কাজেই চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

বরফ মোড়া রিগিঙের ভেতর দিয়ে শৌ শৌ বাতাস বইছে। গতিবেগ বেড়েছে, পঁয়ত্রিশ নট-এর কম নয়। টেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে এনে ডেকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিপুল জল-ফোঁটা। শূন্যে বরফ হয়ে উঠছে ওগুলো, ক্রুদের কুঁজো শরীরে সীসার তৈরি বুলেটের মত আঘাত করছে। বেঁচে থাকার যুদ্ধে হারছে ওরা,

প্রতিটি রণক্ষেত্রে। আগের অবস্থা এখনও বদলায়নি, যত বরফ ফেলছে নতুন করে জমছে তারচেয়ে বেশি। পোর্ট সাইডে রেইল সমান নিরেট হয়ে উঠেছে সাদা স্তূপ।

বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় আরও অশান্ত হয়ে উঠল সাগর। মাঝে মধ্যেই এক আধটা টেউ আসছে চল্লিশ ফিট উঁচু। জাহাজের ডেকে আছাড় খেয়ে ভাঙছে সেগুলো, যেন পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়া মাস্তুলের ডগা ছুঁতে চায়। ডেকে দাঁড়ানো ক্রুরা লাইফলাইন ধরে ঝুলে পড়ে, পানির ফিরতি তোড়ের সাথে ভেসে যাবার আতঙ্ক গ্রাস করে সবাইকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রচুর বরফ ফেলেছে ওরা, টেউয়ের পানি নেমে যাবার পর দেখা গেল খালি জায়গাগুলো আবার ভরাট হয়ে গেছে বরফে।

টেউগুলোর সাথে শক্ত বরফও থাকে। কোনটা লম্বা, কংক্রিট পিলারের মত, কোনটা ঢোকো বাক্স আকৃতির। লাইফ-লাইন আঁকড়ে ধরা ক্রুরা খোদার নাম জপতে থাকে, কারণ ওগুলোর একটা ধাক্কা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। পানির তোড়ের সাথে উঠে আসা এই রকম একটা বরফের ধাক্কায় ওদের এক লোক মারাও গেল। লাইফ-লাইন ধরে ঝুলে পড়েছিল সে, পানির তোড় তাকে ঠেসে ধরল একটা বাক্সহেডের গায়ে। পরমুহূর্তে টর্পেডোর মত ছুটে এসে তার মুখ, মাথা, আর বুক চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দিল দেড় মণ ওজনের একটুকরো বরফ।

লাশটা ভেসে গেল সাগরে।

‘ডেক খালি করা উচিত, স্যার,’ পনেরো মিনিট পর মুখ খুলল কাফম্যান।

‘কেন?’ অ্যাকটিং মেটের পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন, পোর্ট উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাতাই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। পোর্ট রেইল ডুবে গেছে আবার। লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বরফের ওপর, কিন্তু বরফ দেখা যাচ্ছে না। পানিতে সবার কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে। রেইল নেই, বরফ নেই, ওপর থেকে মনে হলো ব্রিজ একা নিজ থেকেই ভেসে আছে। পানির ছিটে বরফকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচে, ঝাপসা হয়ে গেল নিচের দৃশ্য। সরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কাঁচে চোখ রাখলেন ক্যাপটেন।

খানিক পর বো-র দিকে চোখ রাখার জন্যে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন তিনি। ‘না। ডেকে ওরা যেমন কাজ করছে করুক।’

‘কিন্তু, স্যার কিভাবে কাজ করবে ওরা! কোমর পর্যন্ত পানি...?’

‘এখনও কি তাই?’ অ্যাকটিং মেটকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘না, তা নয়, কিন্তু পরবর্তী টেউ এলেই আবার...’

‘ওরা কাজ করুক,’ কাফম্যানকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপটেন।

মনের গভীরে কাফম্যান জানে, ক্যাপটেন ঠিকই করছেন। প্রতি পাউন্ড বরফ ফেলার সাথে জাহাজের ভেসে থাকার সম্ভাবনা আরেকটু বাড়বে। ভেসে থাকতে পারলে আশা করা যায় এগিয়ে গিয়ে সামনে কোথাও নিরাপদ পরিবেশ পাওয়া যাবে। এই কালো কুয়াশার ভেতর থেকে বেরতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত।

পরবর্তী ষোলো ঘণ্টা পালা করে কাজ করল জুন্স। প্রতিটি টীম কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম পেল, ডেকের নিচে নেমে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলে গরম কাপড় পরল তারা, আগুনের ধারে বসে ভাজা

ভাজা করে নিল শরীর। দশ মিনিট, তারপরই আবার ফিরে আসতে হলো হিম নরকে। একদল ডেকে উঠল, আরেক দল নামল। যারা উঠল তারা বিদায় চেয়ে নিল, আর হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।

অসহ্য শীত, তীব্র বাতাস, ঢেউ, ঢেউয়ের সাথে ছুটে আসা বরফের টাই, এ-সবের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লড়ে গেল লোকগুলো। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের ব্যক্তিত্বই এই অসম্ভবকে সম্ভব করল। দৃঢ়চেতা ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই। একটা টীমে স্বেচ্ছায় নাম লেখাল নিয়াজ আর বিনয়। ওদিকে ইভেনকো রস্তুভ, যার জন্যে ওদের সবার আজ এই অবস্থা, সিক-বেতে গুয়ে গুয়ে ফলের রস আর সুপ খাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে তার, সেই থেকে ‘আমার টিউব, আমার টিউব’ করে জান দিচ্ছে। অনেক কষ্টে তাকে বিছানায় আটকে রেখেছে জাহাজের ডাক্তার।

কুয়াশার গ্রাস থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল ওরা। কি ঘটছে প্রথম টের পেল কাফম্যান। ডেকে নেমে, বরফের একটা চওড়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। তারপর জুন্সের দিকে ফিরল। সবাই বরফ ভাঙছে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই কারও। হাতের শাবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মইয়ের দিকে ছুটল কাফম্যান। ব্রিজে ঢুকল হাঁপাতে হাঁপাতে। ‘অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে! আমরা বেরিয়ে আসছি।’

‘হ্যাঁ, জানি,’ বললেন ক্যাপটেন। তাঁর চেহারায় স্বস্তি বা সন্তোষের ছায়া পর্যন্ত নেই, রিয়ার উইন্ডো দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছেন। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ,

ডেকে বরফের পাহাড়। তবে আবহাওয়ার মধ্যে আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। শৌ শৌ আওয়াজ একটু যেন কমেছে বাতাসের। ডেকের ওপর আবছা একটা আলো পড়ল, পরিষ্কার নয়—কুয়াশা সরে যাবার সাথে সাথে উঁকি দিতে শুরু করেছে চাঁদ। কুয়াশার গাঢ় পর্দা এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে জাহাজের পিছনে সেটা, দ্রুত সরে যাচ্ছে আরও দূরে।

রাত এগারোটায় সিঁড়ি বেয়ে ফোরডেকে উঠে এল রানা। এত ছুটোছুটি কেন? কি ঘটছে? ধীরে ধীরে হাঁটছে রানা, এখনও ক্লান্ত। আরও দু'জন নাবিক ছুটে পাশ কাটিয়ে গেল ওকে, খোলা ডেকে বেরিয়ে বরফের ওপর দিয়ে দৌড় দিল। ভয়ঙ্কর কোন দুঃসংবাদ না হলে পিচ্ছিল ডেকের ওপর দিয়ে এভাবে কেউ দৌড়ায় না।

ব্রিজে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এই আবহাওয়াতেও একটা জানালা খুলে রেখেছেন ক্যাপটেন, নাইট-গ্লাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। হেলমসম্যান, তারপর কাফম্যানের দিকে তাকাল রানা। ওদের চেহারা দেখে বুঝল, এই মুহূর্তে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। দু'জনেই উদ্বেগ আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীর পায়ে খোলা জানালার দিকে এগোল রানা। জিজ্ঞেস করতে হলো না, বাইরের একটা লুকআউট পয়েন্ট থেকে ভেসে এল এক লোকের রোমহর্ষক চিৎকার, 'আইসবার্গ অন দি পোর্ট বো! আইসবার্গ অন দি স্টারবোর্ড বো! আইসবার্গ অ্যাহেড!'

## আট

প্রশ্নটা আবার করল কর্নেল বলটুয়েভ।

'না!' বিস্ফোরিত হলো ট্রাভকিন। 'আমাকে মাফ করুন। এ নির্দেশ আমি দিতে পারব না। তারচেয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইব...'

'কে আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছে?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল কর্নেল।

'রেডিও-জ্যামিং থামাবার নির্দেশ দেব আমি,' ঝাঁঝের সাথে বলল ট্রাভকিন, 'তারপর মস্কোয় সিগন্যাল পাঠাব...'

'কি করে?' হাসি হাসি মুখ করে তাকাল কর্নেল। 'কি করে আপনি রেডিও জ্যামিং বন্ধ করার নির্দেশ দেন? আপনার এই জাহাজে স্পেশাল সিকিউরিটির একটা ডিটাচমেন্ট আছে, ভুলে গেছেন? জ্যামিং সেকশনের নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে তারা।'

ব্রিজের পেছনে চার্টরুমে দাঁড়িয়ে দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল তর্ক করছে ওরা। হিটিং সিস্টেম পুরোদমে চালু, রীতিমত ঘামছে কর্নেল। পারকা আগেই খুলে ফেলেছে, কামানো মাথা থেকে টুপিটাও নামাল এবার। রিসার্চ শিপ রিগার ক্যাপটেন ট্রাভকিনকে পথে আনতে বেগ পেতে হবে, আগেই ধারণা করেছিল সে। কাজেই চোটপাট না দেখিয়ে কৌশলে এগোচ্ছে।

'এটা একটা রিসার্চ শিপ, আমার ওপর নির্দেশ আছে সামুদ্রিক

গবেষণা...’

‘আরে রাখুন, মাকে মামা বাড়ির গল্প শোনাবেন না। আপনারা আমেরিকান স্যাটেলাইটের ওপর নজর রাখছিলেন। রিসার্চ, তা ঠিক, কিন্তু মিলিটারি রিসার্চ।’

‘কেন, ওশেনিক রিসার্চ আমরা করছি না? ওয়াটার টেমপারেচার, স্যালিনিটি...’

‘এ-সব গবেষণা বা পরীক্ষার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগে?’ নিজের কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে ট্রাভিকিনের মাথার দিকে আঙুল তুলল কর্নেল। ঘন ঘন নেড়ে সচল কাঁচি বানাল একজোড়া আঙুলকে, বোঝাতে চাইল ক্যাপটেনের উচিত মাথার চুল ফেলে দেয়া। ‘সাবমেরিন চালাবার কাজে, ঠিক? সবাই জানে, আপনারদের যোগাড় করা সমস্ত ডাটা আমাদের ইন্টেলিজেন্স দফতরে চলে যায়...’

‘আপনি যাই বলুন, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়!’ উত্তেজিত ট্রাভিকিন চড়া গলায় কথা বলছে। ‘আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটকে আমি ডোবাতে পারব না। আপনি বন্ধ একটা উন্মাদ! কিউটকে ডোবালে কেউ আমরা বাঁচব না...’

‘কেন? বাঁচব না কেন? কে জানবে? কিভাবে?’ মাথায় আবার হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসল কর্নেল বলটুয়েভ। ‘কিউট দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তার রাডার নেই। এটা আমরা জেনেছি দু’ঘণ্টা আগে, আমাদের একটা হেলিকপ্টার ওটাকে দেখে এসেছে। কিউটের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই—রেডিও-জ্যামিংয়ের ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে ওরা, হারিয়ে গেছে। ওটা এখন যদি নিজে থেকে ডুবে যায়?’

‘আপনি ভুলে যাচ্ছেন কিউটে একটা হেলিকপ্টার আছে!’

‘না, ভুলিনি।’ মুখ ঘুরিয়ে চার্ট টেবিলের দিকে এগোল কর্নেল। চোখে ফুটে ওঠা দ্বিধার ভাবটুকু গোপন রাখতে চাইল। কয়েক ঘণ্টা ধরে চিন্তা করছে সে, কিন্তু কিউটের হেলিকপ্টারটাকে একেজো করার উপায় দেখছে না। ‘বজ্রাত ইভেনকো আর মেরিলিন চার্ট রয়েছে কিউটে। সেজন্যেই দুটোর একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাদের। হয় ওগুলো ফেরত পেতে হবে, নاهয় ধ্বংস করতে হবে।’

‘কিন্তু আপনি যা করতে বলছেন...’

‘কই? আপনাকে তো আমি কিছু করতে বলিনি! তবে, কে না জানে যে এদিকের পানিতে বিজবিজ করছে আইসবার্গ-দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। তাছাড়া, আপনাকে তো আপনার পরিবারের কথাও ভাবতে হবে।’ শেষ কথাটা বলটুয়েভ নরম সুরে বলল।

‘আমার পরিবার! এর সাথে আমার পরিবারের সম্পর্ক কি?’

‘বিশেষ করে আপনার স্ত্রীর কথা বলতে চাইছি।’ অকস্মাৎ কাঠের মূর্তিতে পরিণত হলো কর্নেল। ‘সে তো ইহুদি...’

‘অসম্ভব! ডাহা মিথ্যে!’

কাঠের মূর্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। ‘ঠিক আছে, পুরো নয়, অর্ধেক। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপান্ন। ভদ্রমহিলার মা ছিলেন ইহুদি। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, লেনিনগ্রাদে যারা ইহুদি, তাদের খোঁজ-খবর রাখা আমার অনেক দায়িত্বের একটা?’

‘আমার কাজের মধ্যে আমার স্ত্রীকে টানবেন না...’

‘কমরেড ট্রাভিকিন, চুপ করুন! জেনেগুনে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চান? সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতার জন্যে আপনার স্ত্রীকে

শ্রোফতার করা হবে, তখন কি করবেন? যে-কোন ইহুদির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে তাকে আমি ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিতে পারি। স্ত্রীকে চিরকালের জন্যে হারাতে চান?’

‘কর্নেল কমরেড, আপনার স্পর্ধা...’

‘তারপর কি ঘটবে? মহিলা আশা করবেন, রাশিয়া থেকে পালিয়ে আপনিও তার কাছে আসবেন। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে, আপনি পালাতে পারবেন না। তখন আপনার সুন্দরী স্ত্রী নিজের জীবনের কথা ভাববেন। ভাববেন, যাকে আর পাব না তার জন্যে অপেক্ষা করে নিজের জীবন নষ্ট করি কেন! নতুন কোন পুরুষের দিকে চোখ পড়বে...’

‘বদমাশ...’

‘হতেই হয়,’ শান্ত ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। ‘আমার এই পেশায় ওটা একটা যোগ্যতা।’

ক্যাপটেন ট্রাভকিন দরদর করে ঘামছে, বিধবস্ত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কর্নেলের দিকে। বুঝে গেছে, কোন উপায় নেই, এই লোকের কথায় নাচতে হবে তাকে। ‘নিশ্চয়ই কোন বিকল্প আছে...’

‘মাথায় এলে জানাবেন আমাকে।’

‘আপনার হেলিকপ্টার ফিরে আসছে, মি. রানা,’ ভারী গলায় বললেন হ্যারি গোল্ডম্যান।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, রানার দু’পাশে নিয়াজ আর বিনয়। আপনার হেলিকপ্টার বলার কারণ, প্রস্তাবটা রানার ছিল—হেলিকপ্টার নিয়ে সামনেটায় একবার চোখ বুলিয়ে আসুক

শেরম্যান, যদি সে যেতে চায়। বলার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল শেরম্যান, কুয়াশা সরে যাবার পর থেকে মেশিন নিয়ে আকাশে ওঠার জন্যে ছটফট করছিল সে।

কালো কুয়াশা সরে গেলেও, হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়া সাগরে পানি ছুঁয়ে রয়েছে সী মিস্ট-ভারী সাদাটে কুয়াশা। চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছে আইসবার্গ, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দু’ঘণ্টা আগে চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউ ভেঙে এগোতে হয়েছে কিউটকে, এখন গুটি গুটি সামনে এগোচ্ছে ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কেটে। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। তুরা কেউ বসে নেই, তবু এখনও প্রচুর বরফ রয়েছে ডেকে।

বড় একটা আইসবার্গ, একশো ফিট উঁচু, পোর্ট বো থেকে সিকি মাইল দূরে ভাসছে। বার্গের খাড়া প্যাঁচিল এবড়োখেবড়ো, গুহা আকৃতির কিছু ফাটল রয়েছে গায়ে। সাদাটে কুয়াশার একটা বেস্ট ওটার কোমর জড়িয়ে রয়েছে, আরেকটা প্যাঁচ খেয়েছে গোড়ার দিকে, তবে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ছুঁচাল চূড়া ঝুঁকে রয়েছে ওদের দিকে। ছোট আরেকটা বার্গ, শৃঙ্গের কাছাকাছি স্প্যানিশ দুর্গের মত খাঁজ কাটা, সার সার জানালা, ভাসছে স্টারবোর্ড সাইডে—প্রায় একই দূরত্বে। ব্রিজ থেকে ওগুলোকে পিঠ-উঁচু দ্বীপের মত লাগল দেখতে—এই দেখা যায়, এই যায় না।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল ইভেনকো রস্তুভ। ‘আমার টিউব কোথায়? দিন!’ রানার দিকে ছুটে এল সে।

‘মি. ইভেনকো রস্তুভ!’ বিস্মিত হলেন ক্যাপটেন। ‘আপনি অসুস্থ! ডাক্তার আপনাকে ছাড়ল কোন আক্কেলে! প্লিজ, আপনি

আপনার সিক-বেডে ফিরে যান...’

‘দাঁড়ান, আগে সম্পত্তির দখল পাই, তারপর অন্য কথা!’  
ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে রানার দিকে মারমুখো হয়ে এগোল  
রুস্তভ। ‘যখনই ওটা চেয়েছি, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছেন  
আমাকে। একা ছিলাম, মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু এখন?  
ক্যাপটেন একজন আমেরিকান, আমি আমেরিকানদের কাছে  
আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। কাজেই তিনি আমার দলে। ক্যাপটেন...’

‘আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না...!’  
গোল্ডম্যান একবার রানা, একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন।

‘উত্তেজিত হবেন না,’ শান্ত গলায়, ক্ষীণ একটু হেসে রুশ  
বিজ্ঞানীকে বলল রানা। ‘ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি, ক্যাপটেন।  
ইভেনকো রুস্তভ সাথে করে একটা মূল্যবান ডকুমেন্ট নিয়ে  
এসেছেন—অন্তত উনি তাই বিশ্বাস করেন। নিরাপত্তার কথা ভেবে  
সেটা নিজেদের কাছে রাখি আমরা।’

‘নিরাপত্তার দোহাই এখন আর কোন কাজে আসবে না!’ চড়া  
গলায় বলল ইভেনকো রুস্তভ। ‘আমেরিকান জাহাজে উঠে পড়েছি,  
কারও বাপের সাধ্যও নেই টিউবটা কেড়ে নিতে আসে। দিন,  
আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে!’

‘অবশ্যই, মি. রুস্তভ,’ বলল রানা, তাকাল নিয়াজের দিকে।  
‘নিয়াজ, টিউবটা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দাও।’

পারকার পকেট থেকে লম্বা টিউবটা বের করল নিয়াজ।  
চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বাড়িয়ে দিল রুশ বিজ্ঞানীর দিকে।  
প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল ইভেনকো রুস্তভ।

‘মাইক্রোফিল্টা ভেতরে আছে তো?’ কঠিন সুরে প্রশ্ন করল

সে।

‘আছে।’

‘চোখে দেখে তারপর বিশ্বাস করব,’ গজগজ করতে করতে  
টিউবটা উল্টো করে ধরে কয়েকটা ঝাঁকি দিল রুস্তভ। এক টুকরো  
কোর পড়ল তালুতে, তারপর বেরিয়ে এল খারটি ফাইভ  
মিলিমিটার ফিল্মের একটা অংশ।

‘আশা করি আপনার জিনিস আপনি বুঝে পেয়েছেন, মি.  
রুস্তভ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘মাইক্রোফিল্মের নিচে আরও কোর ছিল, সব ঠিক আছে তো?  
এই কোর মহামূল্যবান...’

‘ঝাঁকি দিন, না থাকলে বেরাবে না,’ নরম সুরে বলল রানা।

রানার দিকে কটমট করে তাকালেন রুশ ওশেনোগ্রাফার।  
‘কেউ আপনার পরামর্শ চেয়েছে?’ ক্যাপটেনের দিকে ফিরলেন  
তিনি। ‘মি. গোল্ডম্যান, আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই  
আমি, প্লীজ। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। এই ভদ্রলোকদের  
দেখতে দিতে চাই না।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। ‘ব্যাপারটা কেমন  
হলো? মি. রানা আপনাকে এই আর্কটিক নরক থেকে উদ্ধার করে  
আনলেন, অথচ তাকেই আপনি অবিশ্বাস করছেন! ব্যাপারটা কি  
বলুন তো?’

ফোড়ন কাটল নিয়াজ, ‘আবার শর্ত দিয়েছিলেন, শুধু যদি  
মাসুদ রানাকে পাঠানো হয় তবেই তিনি আমেরিকায় পালিয়ে  
আসবেন। মাসুদ রানা নাকি ওনার হিরো...’

হঠাৎ খয়েরি দাঁত বের করে হাসল ইভেনকো রুস্তভ। ‘এখনও

আমি বিশ্বাস করি, মি. রানা অসমসাহসী যুবক। শক্ত, প্রায় অসম্ভব কাজ দিয়েও তার ওপর নির্ভর করা যায়। সেজন্যেই শর্ত দিয়েছিলাম, মি. রানাকে পাঠালে আমি আসব, নাহয় আসব না। কিন্তু তারমানে এই নয় যে উনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কি করে হন! মিগ-একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গেলেন উনি, সরাসরি আঘাত করলেন সি.আই.এ. ও জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে। ইসরায়েলের একজন শত্রু আমার বন্ধু বা শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না! ক্যাপটেন, দয়া করে আপনি ওদেরকে বলুন...’

‘তারচেয়ে আমরাই বরং চার্টরমে গিয়ে কথা বলি?’ রুস্তভকে নিয়ে চার্টরমে চলে গেলেন ক্যাপটেন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ছোট করে মাথা ঝাঁকাল নিয়াজ।

বিনয়, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ‘কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলে জাহাজে বিস্ফোরক আছে কিনা...’

‘পরে,’ বিড়বিড় করে বলল রানা। সিকোরস্কি আর তার পাইলট শেরম্যানকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে ও। এই শেষ ফ্লাইটে পাঠাবার প্রস্তাবটা ওর ছিল, ফিরে এসে জাহাজে ল্যান্ড না করা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। দু’মিনিট পর ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপটেন, আপদটাকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। রানার অনুরোধে বো-র কাছে শক্তিশালী একটা সার্চলাইট জ্বালার নির্দেশ দিলেন তিনি। চোখ ঝাঁখানো আলোর একটা স্তম্ভ প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেল আকাশের দিকে।

সিকোরস্কি এখনও অনেক দূরে, দক্ষিণের অন্ধকার আকাশে

খুদে একটা ব্লিপ মাত্র।

‘জাহাজগুলোকে দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে...’

‘এখনও যদি ওগুলো উত্তরের পথে থাকে, দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই,’ নিয়াজকে বলল রানা। ‘সাত সাতটা জাহাজ, তাই না?’

‘যেখানে খুশি থাক, আমি গ্রাহ্য করি না,’ ভারী গলায় বললেন গোম্বম্যান। ‘খোলা সাগরে রয়েছি আমরা, ওদের নাকের সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাব।’

ক্যাপটেনের অগোচরে কাফম্যানের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। দু’জনের চেহারাতেই সন্দেহের ছায়া। কাফম্যানও ভাবছে রাশিয়ানরা ঝামেলা করতে পারে।

চাঁদের আলোয় তেলের মত চকচক করছে সাগরে শান্ত পানি। এঞ্জিনের আওয়াজ ভারী, গমগমে; ধীরগতিতে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। কুয়াশা রয়েছে, তবে দূরে দূরে, আইসবার্গগুলোর চারদিকে। সিকোরস্কির ব্লিপ এক সময় কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল। একটু পর শোনা গেল এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন।

স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। একটা সার্চলাইটের আলো সবচেয়ে কাছের আইসবার্গের দিকে তাক করা। ভাসমান বরফের পাহাড় বলে মনে হলো না, বিশাল আকৃতি নিয়ে এ যেন একটা দুর্গ। দুর্গের কাঁধের কাছে লম্বা বারান্দা, বারান্দায় সার সার গরাদহীন জানালা। বারান্দার ওপরে আর নিচে বেশ কিছু সুড়ঙ্গ দেখা গেল, বরফ-পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিয়াজ তাকিয়ে আছে সেদিকে।



‘কি বিশাল, তাই না? গোস্ট বার্গ নয় তো?’

‘প্রার্থনা করো ভাই, তা যেন না হয়,’ আঁতকে ওঠার ভান করে বলল রানা। ‘গোস্ট বার্গ হলে তোমার একটা ধমকেই হুঁমুড় করে ভেঙে পড়বে।’

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাটা, ভাবল নিয়াজ, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস করানো কঠিন। কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, মানুষের গলার আওয়াজে ধসে পড়বে, সত্যি অবিশ্বাস্য। ব্যাপারটা এক্সিমোরা জানে, ভেলা নিয়ে গোস্ট বার্গকে পাশ কাটাবার সময় ঠোঁটে তালা দিয়ে রাখে তারা, জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলে না। গোস্ট বার্গ যত বিশালই হোক, তার ভিত আর কাঠামো যেমন ভঙ্গুর তেমনি দুর্বল। লক্ষ লক্ষ টন বরফ স্তূপ হয়ে আছে, ছুঁই ছুঁই করছে আকাশ, কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা-দমকা একটা বাতাসের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হতে পারে।

দুর্গের চূড়ায় আলোর খেলা দেখছে রানা। হঠাৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না।

আইসবার্গের চূড়া বিস্ফোরিত হলো।

এই ছিল, এই নেই-কাঁধ থেকে মাথাটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আইসবার্গের ওপরের অংশ সাদাটে বরফ-কণায় ঝাপসা হয়ে গেল। বিস্ফোরণের আওয়াজ চারপাশের আইসবার্গের ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। বরফের বড় বড় টুকরো আলোর স্তম্ভ থেকে খসে পড়ল সাগরে। চূড়ার অন্তত বিশ-পঁচিশ ফিট ধসে পড়েছে। গোল্ডম্যান দ্রুত নির্দেশ দিলেন, পোর্টের দিকে কয়েক ডিগ্রী ঘুরে গেল জাহাজ।

‘গোস্ট মনস্টার যাই হোক, মুণ্ডু বিস্ফোরিত হওয়ায় বার্গ মহাশয় আমাদের দেখতে পাবে না, আশা করি নিরাপদেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব।’

নিয়াজের কথা শেষ হতেই শেরম্যানের সিকোরস্কিকে দেখা গেল। চাঁদের আলোয় ঘুরন্ত রোটরের চাকতি আকৃতির ঝিলিক পরিষ্কার ধরা পড়ল চোখে। বোধহয় সিকি মাইলেরও কম দূরে, অনেক উঁচু থেকে দুশো ফিটে নামল, সোজাসুজি কিউটের দিকে এগিয়ে আসছে। পোর্ট সাইডে রয়েছে মুণ্ডুহীন আইসবার্গ, সেটার কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে হবে শেরম্যানকে।

সিকোরস্কি ল্যান্ড করার সময় এঞ্জিন মছুর করতে হবে, নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গের কোমর পেঁচিয়ে থাকা কুয়াশা ভেসে গেছে, ভিতের কাছ থেকে কুয়াশা ভেদ করে খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে বিশাল বরফের পাঁচিল।

ব্রিজে সবাই চুপচাপ, শুধু এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

মাঝখানে একবার নিম্নত্বতা ভাঙল নিয়াজ, ‘নিশ্চয়ই রিগাকে দেখতে পেয়েছে পাইলট।’ প্রকাণ্ড আইসবার্গ এক কথায় বোমার মত বিস্ফোরিত হলো। ভেতরের চাপ সহিতে না পেরে স্রেফ বেলুনের মত ফেটে গেল। কিন্তু এবার শুধু মাথার দিকটা নয়, গোটাটাই অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে জাহাজের প্রতিটি লোকের কানে তালা লাগল, শক ওয়েতে থরথর করে কেঁপে উঠল ব্রিজ। ওভারহেড কম্পাসের আবরণ ভেঙে গেল, হেলমসম্যানের মাথায় বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল কাঁচ। কোর্স ঠিক রাখার জন্যে ছুটে গিয়ে হুইল আঁকড়ে ধরলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিরে আসতে লাগল বিস্ফোরণের আওয়াজ, প্রতিটি প্রতিধ্বনি নাড়া দিয়ে গেল কিউটকে। বার্গটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে পাঁচশো ফিট ওপর দিকে শুধু ফেনা, বাষ্প আর বরফ কণা দেখা গেল। সব যখন সী লেভেলে নেমে এল, টগবগে ফুটন্ত পানি ছাড়া দেখার কিছু পাওয়া গেল না। আইসবার্গ অদৃশ্য হয়েছে, সেই সাথে অদৃশ্য হয়েছে শেরম্যানের সিকোরস্কি।

হেলমসম্যানকে হুইল দিয়ে জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। বিষণ্ণ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি। সাগরকে সাগর বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ছোট একটা লেক-সবগুলো দিকে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আইসবার্গ। কোনটা দূরে, কোনটা তত দূরে নয়।

‘বিস্ফোরণের সময় ঠিক মাথার ওপর ছিল শেরম্যান...’

রানাকে থামিয়ে দিয়ে গোল্ডম্যান বললেন, ‘জানি।’ অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছেন তিনি। ‘ডিয়ার গড...শেরম্যান!’ পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তিনি তাকালেন না। ‘চমৎকার! আর কোন ধারণা যদি মাথায় থাকে, মি. রানা, ঢোক গিলে নিচে পাঠিয়ে দিন।’

ক্যাপটেনের কথায় রানা যে দুঃখ পেল তা নয়। মনটা শুধু আরেকটু খারাপ হয়ে গেল। নিয়াজ আর বিনয়কে ইশারায় ডাকল ও, নেমে এল ব্রিজ থেকে।

শেরম্যানের আকস্মিক মৃত্যু হতভম্ব করে দিয়েছে রানাকে। কিন্তু তারচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছে ও সিকোরস্কি ধ্বংস হওয়ায়।  
রাডার নেই।

রেডিও থেকেও নেই। রেডিও-জ্যামিংয়ের ফলে একেজো হয়ে আছে সেট। কোন সিগন্যাল পাবে না, পাঠাতেও পারবে না।

বাইরের দুনিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল হেলিকপ্টারটা, গেল সেটাও।

দক্ষিণে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, তাকে বাদ দিলে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওরা।

এক ঘণ্টা পর আইসবার্গের সাথে ধাক্কা খেলো কিউট।

## নয়

‘একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, সাথে টাইমার মেকানিজম, আর কয়েকশো ফুট কেব্ল...’

‘কোথায় রাখে ওরা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘বললে বিশ্বাস করবে না-মেইন ডেকের একটা কেবিনে।’ নিঃশব্দে হাসল বিনয়। ‘সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ, কাফম্যান নিজেই স্বীকার করল। কিন্তু দরকারের সময় অতগুলো সিঁড়ি আর মই বেয়ে ওপরে তোলা ঝামেলার ব্যাপার, তাই...’

‘কাজের লোকদের ভাবনা-চিন্তাই আলদা,’ কাফম্যানের প্রশংসা করল রানা। ‘দফতরে বসে কর্তারা নিয়ম বেঁধে দেয় ঠিকই, কিন্তু অভিযানে স্টাফদের সাথে নিয়মগুলো সঙ্গী হয় না।’

রানার কেবিনে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে তিনজন। অফিসার্স মেসে ডেকে না পাঠিয়ে লাঞ্চ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তারমানে সম্ভবত কষ্টার্জিত জনপ্রিয়তা আবার হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

‘আমাদের বোধহয় একঘরে করা হয়েছে,’ কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বলল নিয়াজ। ‘শেরম্যান মারা যাওয়ায় তোমাকে দায়ী করছে ওরা, রানা।’

‘ক্যাপটেনকে অসম্ভব মনে হলো,’ বলল রানা। ‘আসলে দুশ্চিন্তায় মেজাজ বিগড়ে আছে তাঁর। রুশ জাহাজগুলোকে নিয়ে আমাদের চেয়ে উনি কম উদ্বিগ্ন নন।’

‘আমার ভয় রিগাকে,’ বলল নিয়াজ।

‘আমারও,’ সমর্থন করল রানা। ‘ষোলো হাজার টন, তাই না? ট্রলারগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু...কি ব্যাপার, বিনয়? তোমার হাতে কি ওটা?’

বিনয়ের তালুতে একটা চাবি। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের চাবি। খোলা সাগরে রয়েছে, কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না, ক্যাপটেনের এই ধারণার সাথে একমত নয় কাফম্যান। ওকে সাথে নিয়ে কেবিনটায় ঢুকেছিলাম আমি। একজোড়া শোল্ডার-প্যাকে তোলা হয়েছে জেলিগনাইট, যদি প্রয়োজন হয়...’

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো জাহাজ, মনে হলো বান্ধহেড বিস্ফোরিত হবে। পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়ল কেবিন, পরমুহূর্তে সিধে হলো, তারপরই আবার কাত হলো স্টারবোর্ডের দিকে। প্রতি মুহূর্তে খরখর করে কাঁপছে জাহাজ, সেই সাথে আইসবার্গের ওপর জাহাজের চাপে বিকট শব্দে ভাঙছে বরফ।

আবার জাহাজ সিধে হতে শুরু করল। দরজার দিকে ছুটল নিয়াজ। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলল। বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, চিৎকার। পোর্ট সাইড থেকে বোমা ফাটার মত আওয়াজ এল, বরফ ভাঙছে। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল

আইসব্রেকার। এঞ্জিন নামমাত্র সচল, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বালবগুলো স্তান হয়ে গেল, প্রায় নিভু নিভু-কয়েক সেকেন্ড পর আবার জ্বলে উঠল সবটুকু উজ্জ্বলতা নিয়ে।

‘বরফে আটকে গেছি,’ গুঙিয়ে উঠল বিনয়।

দরজার কাছ থেকে নিয়াজ বলল, ‘যদি না গুঁতো মেরে থাকে রিগা...’

‘সম্ভবত আইসবার্গে ধাক্কা খেয়েছি,’ গায়ে পারকা চড়াতে চড়াতে বলল রানা। ‘চলো ব্রিজে যাই।’

নির্জন কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটল রানা, পারকার বোতাম লাগাবার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় থামল। ওপরের ডেক থেকে লোকজনের শোরগোল ভেসে এল। আতঙ্কটা কি নিয়ে বোঝা গেল না। ধাপগুলো বেয়ে ওপরে উঠল ও, দরজা খুলতেই ওকে গ্রাস করল সাদাটে কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর কালো ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করছে। কি ঘটছে আন্দাজ করা অসম্ভব। পোর্ট রেইলের সামনে দৃষ্টি চলে না। এমনকি পোর্ট রেইলটা পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা। হোঁচট খেতে খেতে মইয়ের দিকে এগোল ও। কুয়াশার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি ছুটে এসে ধাক্কা খেলো গায়ে। হিগিন।

‘আমরা গঁথে গেছি!’ আতঙ্কে ককর্শ শোনা হিগিনের গলা।

‘ডুবছি?’ রানার জ্যাকেটের তলায়, বগলে, টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা খুদে প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর আছে নিয়াজের দেয়া মাইক্রোফিল্ম। পারকার গায়ে হাত বুলিয়ে প্যাকেটটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল, নিজের অজান্তেই।

‘গড নোজ...’

মই বেয়ে উঠছে রানা, প্রায় মাথায় পৌছে গেছে, এই সময় বো-র সামনে কুয়াশায় আলোড়ন উঠল। ছাঁৎ করে উঠল বুক। হিমালয়ের মত কি যেন একটা, চোখে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল আবার। মনে হলো মাত্র কয়েক গজ সামনে।

সাবধানে ব্রিজে ঢুকল রানা, পিছু পিছু মই বেয়ে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। ব্রিজের সামনের দিকে, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গোল্ডম্যান। এরইমধ্যে হিম হয়ে গেছে ভেতরটা। হেলমসম্যান হুইল ধরে রয়েছে, যদিও জাহাজ কোথাও যাচ্ছে না।

এতক্ষণে খেয়াল হলো রানার, ডানে বা বামে নয়, জাহাজ ঢালু হয়ে রয়েছে পিছন দিকে। আরেকটা জানালা খুলে পোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকটিং মেট। সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

‘এদিকে একবার আসুন, মি. রানা,’ ডাকলেন তিনি। নরম সুর। ‘এরচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে না—আমরা একটা বাগের ঢালে উঠে পড়েছি।’

অবস্থাটা বুঝতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। কুয়াশার ভেতর দিয়ে খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিল কিউট, সন্ন্যাসী একটা ফাঁক গলে বিশাল এক আইসবার্গের পেটের ভেতর, ছোট একটা বে-তে ঢুকে পড়েছে। ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে, বে-র এক মাথা থেকে আরেক মাথায় আসতে মিনিট খানেক লেগেছে জাহাজের। আইসবার্গের ঢাল ক্রমশ নিচু হয়ে বে-র পানির তলায় তলিয়ে গেছে। খোলার সাথে ডুবন্ত ঢালের প্রথম ঘষা লাগার পরপরই ক্যাপটেন সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে

জাহাজের সামনের অংশ পানি থেকে উঠে পড়েছে।

কিউটের সামনের অংশ পানির ওপর, পিছনের অংশ পানিতে। এঞ্জিন বন্ধ করেও কোন লাভ হয়নি, পিছলে নেমে আসেনি বো। শুধু বো নয়, খোলার এক তৃতীয়াংশ পানির ওপর জেগে থাকা ঢালে উঠে পড়েছে। ছোট বে-র চারদিকে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে কুয়াশা আলোড়িত হলে আকাশ-ছোঁয়া আইসবার্গের খাড়া, মসৃণ পাঁচিল দেখা যায়।

‘যীশাস!’ ব্রিজের পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল কাফম্যান। ‘এর ভেতর আমরা ঢুকলাম কিভাবে!’

হুড়োহুড়ি করে পিছনের জানালার সামনে চলে এল সবাই। চোখ পিট পিট করলেন গোল্ডম্যান। আপাতত সামান্য একটু সরে গেছে কুয়াশা, জাহাজের পিছনে ছোট বে-র ফাঁকটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই ফাঁক গলেই আইসবার্গের পেটের ভেতর সঁধিয়েছে কিউট। ফাঁকের দু’দিকে আইসবার্গের উঁচু, চওড়া পাঁচিল। তাজ্জব ব্যাপার, এরকম সন্ন্যাসী একটা ফাঁক গলে কিভাবে ভেতরে ঢুকল জাহাজ! এক মুহূর্ত পরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল ফাঁকটা।

‘মাপজোকে যদি ভুল না হয়, আর ভাগ্য যদি বেঈমানী না করে,’ চিন্তিতভাবে বললেন ক্যাপটেন, ‘আবার সাগরে বেরোতে পারব আমরা। জাহাজের বেশিরভাগ অংশ এখনও পানিতে, প্রপেলার উল্টোদিকে ঘোরাতে ঢাল থেকে নেমে আসবে।’ বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ‘এমন উৎকট বিপদে কেউ কখনও পড়েছে!’

‘বরফ নেই, আপনি জানেন?’ রানাকে জিজ্ঞেস করল

কাফম্যান। ‘ঢালের সাথে খোলের ধাক্কা লাগতেই বাঁকি খেয়ে খসে পড়েছে সব। এদিকে আসুন, দেখে যান।’

পোর্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ঢাল থেকে সরে গেছে কুয়াশা। ডেকে ওঠার সময় পোর্ট রেইল দেখতে পায়নি ও, কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। নেই, দেখবে কোথেকে? সংঘর্ষের ধাক্কায় পোর্ট সাইডের রেইল সহ কয়েকশো মণ বরফ ঢালের ওপর ছিটকে পড়েছে। রেইলের ভাঙা টুকরো-টাকরা ঢালের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল। ঢালে কয়েকজন ফার মোড়া লোককেও দেখল রানা। রশির মই বেয়ে নেমেছে ওরা। কুয়াশার ভেতর ভূতের মত দেখাল ওদেরকে। ক্যাপটেনের নির্দেশে ঘুরেফিরে দেখছে ওরা, আইসবার্গটা কি ধরনের জানতে হবে।

মই বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি জাহাজে উঠে এল। চিনতে পারল রানা। নিয়াজ।

ব্রিজে ফিরে এসে নিয়াজ বলল, ‘না, গোস্ট বার্গ নয়...’

‘ঠিক জানো?’

‘অবশ্যই। বিনয় আর আমি যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠে দেখেছি—কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই, একেবারে নিরেট বরফ...’

‘সামনেটা এখন দেখা যাচ্ছে!’ ক্যাপটেনের উত্তেজিত গলা শুনে ব্রিজের সামনে ছুটে এল সবাই। বিরতিহীন মোচড় খেয়ে চলেছে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে দু’এক মুহূর্তের জন্যে ভেসে গিয়ে কোন কোন দিক উন্মোচিত করছে। বো-র সামনে থেকে কুয়াশা সরে যাওয়ায় আইসবার্গের বিশালত্ব ফুটে উঠল ওদের চোখের

সামনে। বো-র কাছ থেকে একশো গজ দূরে শেষ হয়েছে ঢাল, তারপর আইসবার্গের পাঁচিল খাড়া উঠে গেছে—কত উঁচু পর্যন্ত কে জানে! ওপর দিকের কুয়াশাও এবার অনেকটা সরে গেল, মনে হলো ওরা যেন বরফ ঢাকা হিমালয় দেখছে। চূড়া কত উঁচুতে বোঝার উপায় নেই, কারণ ওপরের দিকটা সাদাটে কুয়াশায় বাপসা হয়ে আছে।

নিখাদ, নিরেট বরফের প্রকাণ্ড দ্বীপে আটকা পড়েছে ওরা। লম্বায় দ্বীপটা আধ মাইল বা তারও বেশি হতে পারে।

‘লোকজনদের ডেকে নাও,’ কাফম্যানকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। ‘লাউডহেইলার ব্যবহার করো। চেষ্টা করে দেখব সাগরে বেরুনো যায় কিনা।’

‘এখনি বেরুতে চাইছেন?’ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...’, হঠাৎ থেমে গিয়ে ঝট করে রানার দিকে ফিরলেন গোল্ডম্যান। ‘চমৎকার কোন আইডিয়া, মি. রানা?’ তাঁর চেহারা ও কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল।

‘আইসবার্গের পেটে আটকা পড়ায় একদিক থেকে সুবিধেই হয়েছে,’ বলল রানা। ‘বুঝতে পারছেন না?’

‘আপনি যে অতি বুদ্ধিমান, সে আমি প্রথমেই টের পেয়েছি,’ গম্ভীর সুরে বললেন ক্যাপটেন। ‘কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।’

‘বলছিলাম কি,’ আরও নরম সুরে বলল রানা, ‘এখানে তো বেশ নিরাপদেই রয়েছে আমরা। সাগরে না বেরুলেও তো চলে...’

‘এভাবে আটকা পড়ে থাকব? কোথাও যাব না? আপনার বুঝি বাড়ি-ঘর নেই?’

‘কে বলল আমরা যাচ্ছি না?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। ‘আমরা থেমে নেই, যদিও কোথাও যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আইসবার্গটাকে দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিদিন বিশ মাইল গতিতে এগোচ্ছি আমরা...’

‘নটিক্যাল রেকর্ড ভাঙছি কি?’ ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘তার কি কোন দরকার আছে? ঘণ্টা কয়েক আগে শেরম্যান রিপোর্ট করেছিল, সোভিয়েত ট্রলারগুলো আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে আছে, আর রিগা আছে বিশ মাইল দক্ষিণে। এতক্ষণে আরও কাছে চলে এসেছে ওগুলো। আইসবার্গটা কিউটের জন্যে বিরাট একটা বাহনের কাজ করছে। যদি বার্গের সাথে থাকি, রাতের কোন এক সময় সোভিয়েত জাহাজগুলোকে পাশ কাটাব আমরা।’

‘বার্গের সাথে থাকা মানে আটকা পড়ে থাকা, নড়াচড়া করা যাবে না...’

‘কিছু আসে যায়? ওরা যদি আমাদের দেখতে না পায়? রিগায় আধুনিক রাডার রয়েছে বটে, কিন্তু আমরা কাছাকাছি পৌঁছলে স্ক্রীনে কী দেখতে পাবে ওরা? স্রেফ আরেকটা আইসবার্গ।’

‘বাহন হিসেবে আইসবার্গ?’ উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে ফেলল কাফম্যান। ‘ওয়ান্ডারফুল...’

‘ফুল!’ অ্যাকটিং মেটকে গাল পাড়লেন ক্যাপটেন। এঞ্জিন রুমের সাথে কথা বলার জন্যে ভয়েস-পাইপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কথা শেষ করে কাফম্যানের দিকে ফিরলেন। ‘চীফ এঞ্জিনিয়ার বলছে, এঞ্জিন রুমের কোথাও তেমন কোন ক্ষতি

হয়নি। গজগুলোর কাঁচ ভেঙে বা ফেটে গেছে, গরম বাষ্প ঝলসে গেছে একজনের হাত, ব্যস। ওদের ধারণা এঞ্জিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি, তবে চেক করে দেখব আমি। লোকগুলোকে ডেকে নিতে বলেছি, মনে আছে?’

‘এঞ্জিন চালু করবেন?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। ‘কাজটা উচিত হবে না। রিগার হাইড্রোফোনে ভাইব্রেশন ধরা পড়বে।’

রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কাফম্যানকে ক্যাপটেন জানানেন, ‘আর তারপর, পিছু হটব আমরা, যে-পথ দিয়ে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যাব সাগরে।’

ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল নিকিতা জুনায়েভ। ‘কিউট খুব কাছে চলে এসেছে, কর্নেল কমরেড! হাইড্রোফোনে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে!’

ট্রাভকিনকে পাশে নিয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জুনায়েভকে বলল, ‘শান্ত হও, জুনায়েভ। পাঁচ মিনিট পর পর রিপোর্ট করবে আমাকে-যাও!’

জুনায়েভ চলে যেতে ধীরে ধীরে কর্নেলের দিকে ফিরল ট্রাভকিন। ‘এখন তাহলে আবার এঞ্জিন চালু করতে পারি। আপনাকে আগেই বলেছি, এদিকের পানিতে পাওয়ার ছাড়া ভেসে থাকা সাংঘাতিক বিপজ্জনক...’

‘আমি মারা গেলে,’ কোমল সুরে বলল কর্নেল।

‘তারমানে?’

‘তার আগে এঞ্জিন চালু করা যাবে না। সর্বাধুনিক রাডার রয়েছে আপনার। ব্যবহার করুন! নিঃশব্দে ভেসে যেতে হবে

আমাদের, কারণ তাহলেই শুধু হাইড্রোফোন অপারেটররা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ ঠিকমত শুনতে পারে। কিউটের সঠিক পজিশন জানতেই হবে আমাকে।’

পাইপটা মুখে তুলে জানালার সামনে চলে এল কর্নেল। একা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাপটেন ট্রাভকিন। ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে চোখ রেখে কুয়াশা আর সাগরের আলাদা একটা জগৎ দেখতে পেল কর্নেল। ওখানে কোথাও, দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে আইসবার্গ। ঠিক এই মুহূর্তে রাডার অপারেটররা দৈত্যাকৃতি বার্গগুলোর কোর্স জানার চেষ্টা করছে। গ্রীনল্যান্ড কারেন্টের সাথে বিরতিহীন দক্ষিণ দিকে ভেসে চলছে ওগুলো।

সবাই এখন জাহাজে। এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ব্রিজে যার যেখানে থাকার কথা সবাই উপস্থিত। প্রতিটি লুক-আউট পয়েন্টে লোক পাঠানো হয়েছে। আইসবার্গ থেকে নামার জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ।

পিছনে হাত বেঁধে জানালা দিয়ে কিউটের পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান। উদ্বেগ আর উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি, সমস্ত শরীর টান টান হয়ে আছে। উত্তেজনা বোধ করা স্বাভাবিক, কারণ একই সাথে দুটো বিপজ্জনক কাজ সারতে যাচ্ছেন তিনি। বরফের ঢাল থেকে কিউটকে নামাবেন, তারপর বে-র দুই বাহুর মাঝখানের সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন সাগরে।

ক্যাপটেন আর কাফম্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানাও জাহাজের পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। বে ছাড়িয়ে আরও দূরে

চলে গেছে ওর দৃষ্টি, কুয়াশার ভেতর। বার বার আড়চোখে রানার দিকে তাকাল কাফম্যান। ক্যাফটেন যা করতে যাচ্ছেন তাতে তার সমর্থন নেই, কিন্তু অ্যাকটিং মেট হিসেবে ক্যাপটেনের সাথে তর্ক করাও তার সাজে না।

এঞ্জিনগুলো আরও শক্তি সঞ্চয় করল। একটু পরই নড়ে উঠবে জাহাজ। পিছু হটবে। প্রপেলার যদি পারে, বরফের ঢাল থেকে নামিয়ে আনবে জাহাজকে।

স্টার্নে, লুক-আউট পয়েন্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল নিয়াজ। হঠাৎ দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল সে।

‘স্টপ ইট, ফর গডস সেক!’ তারস্বরে চিৎকার করল সে। ‘বন্ধ করুন, এঞ্জিন বন্ধ করুন!’

‘কেন?’ বোমার মত ফাটলেন যেন ক্যাপটেন।

‘বাইরে তাকান,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘কুয়াশার ভেতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে আসছে!’

‘কি?’ চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন।

‘জানি না,’ রুদ্ধশ্বাসে বলল নিয়াজ। ‘বিরিট বড় কি যেন একটা...’

‘আমি জানি কি,’ ভারী গলায় বলল রানা। ‘মি. গোল্ডম্যান, প্ল্যানটা বাতিল করুন। জাহাজ নড়লে বিপদ বাড়বে...’

‘ঈশ্বর বাঁচাও,’ বিড়বিড় করে উঠল কাফম্যান। ‘রিগা! রিগা আসছে আমাদের ধাক্কা...’

কিন্তু না। রিগা নয়। রিগা মাত্র ষোলোশো টনী জাহাজ, কিন্তু কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা যেটা এগিয়ে আসছে তার ওজন কয়েক লক্ষ টন, বাইশতলা একটা বিল্ডিংয়ের মত উঁচু। সচল

একটা বিল্ডিং, ওপরের অংশ যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কিউটের মাস্তুলকে ছাড়িয়ে গেছে। ধীর গতিতে কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসছে। ভয়াল-দর্শন এক আইসবার্গ।

স্টার্নের লুক-আউট পয়েন্ট থেকে লোকগুলো আত্ননাদ করে উঠল। জানালার বাইরে তাকালেন গোল্ডম্যান। বাকি সবাই তাঁর গা ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

সচল পাহাড় ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল ওরা। কুয়াশা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে বে-র দিকে। বে থেকে এখনও অনেকটা দূরে ওটা, কিন্তু তবু মনে হলো মূর্তিমান বিভীষিকার চূড়া, যতটুকু দেখা যায়, ঝুঁকে রয়েছে ওদের মাথার ওপর। বে-র দুই বাহুর মাঝখানে সরু ফাঁকটা বুজে এল।

মাইকে কথা বললেন গোল্ডম্যান। বিপদ টের পেয়ে সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ‘হোল্ড অন টাইট! হোল্ড অন টাইট! মেজর কলিশন কামিং!’

খপ্প করে রানার কনুই খামচে ধরল কাফম্যান, ব্যথায় উচ্চ করে উঠল রানা। ‘মি. রানা, বে-র ভেতর দিকে তাকান, কি ওটা?’

প্রথমে জিনিসটাকে চেনা গেল না। পানির তলা দিয়ে ছুটে আসছে, উঁচু পিঠ জেগে রয়েছে পানির ওপর। হাঙর নয়, তিমি নয়, তবে কি সাবমেরিন?

‘আভারওয়াটার স্পার!’ ফিসফিস করে বলল রানা।

দুশো ফিট উঁচু আইসবার্গের প্রসারিত পায়ের পাতা বলা যেতে পারে, পানির তলা দিয়ে ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে বে-তে। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে এগিয়ে আসছে। আকৃতিটা আন্দাজ করার

চেষ্টা করল রানা, ডায়ামিটারে পঞ্চাশ ফিটের কম হবে না।

পায়ের পাতার পিছু পিছু আসছে শরীরটা। ব্রিজের লোকেরা রেইল আঁকড়ে ধরল। নিচে, ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোও অবশিষ্ট রেইল ধরে তৈরি হলো আত্নরক্ষার জন্যে। রানার মাথা সামান্য একটু নড়ে উঠল, আকাশ থেকে কি যেন একটা পড়তে দেখল ও।

ছোটখাট একটা বাড়ি খসে পড়ল যেন। পড়ল নবাগত আইসবার্গের মাথার দিক থেকে। অথচ এই আইসবার্গের সাথে বাইশতলা এখনও ধাক্কা খায়নি। বে-র বাইরে, সরু ফাঁকটার কাছাকাছি পড়ল সেটা, মিনার আকৃতি নিয়ে আকাশের দিকে লাফ দিল পানি। ‘খোদা!’ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘ওটা গোস্ট বার্গ...’

তারমানে, গোটা পাহাড়টা, কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, ধাক্কা লাগার মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। ঢাকা পড়ে যাবে বে, কবর হয়ে যাবে কিউটের। কাঠের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে ধাক্কা লাগার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। প্রকৃতির খেলা, ওদের কোন ভূমিকা নেই। দুই আইসবার্গ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে, ওরা শুধু যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্যাপটেন এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল বাইশতলা, ওটার বিশালত্ব চাক্ষুষ করার সুযোগ মিলল। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই দুই আইসবার্গ স্পর্শ করল পরস্পরকে।

সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে মনে হলো কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। শক ওয়েভের ধাক্কায যে যেখানে ছিল, ছিটকে পড়ল সবাই মেঝেতে। প্রথম ঝাঁকিতে সাড়ে ছয় হাজার টন কিউট লাফ দিয়ে উঠল যেন। জাহাজের প্রতিটি কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল, বান বান



শব্দে নাচতে শুরু করল পেয়ালা, বাসন, চামচ থেকে শুরু করে শাবল, কোদাল, ইত্যাদি সব। বন বন করে ঘুরতে শুরু করল কম্পাসের কাঁটা। ডেক থেকে ছিটকে পানিতে পড়ল তিনজন ত্রু, সাথে সাথে মারা গেল তারা। তারপর, হঠাৎ করেই, সব শব্দ থেমে গেল, স্থির হয়ে গেল জাহাজ।

ভৌতিক নিস্তব্ধতা নামল।

সংঘর্ষের আগেই বন্ধ করা হয়েছিল এঞ্জিন। কেউ কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। বে থেকে বেরবার সরু পথের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ফাঁকটার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। বাইশতলার নিরেট পাঁচিল বন্ধ করে দিয়েছে সেটা। বে পরিণত হয়েছে খাঁড়িতে। যেন একটা বোতলের ভেতর আটকা পড়েছে ওরা, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। ছোট একটা লেকে রয়েছে কিউট, যে লেক থেকে বেরবার কোন পথ নেই। বিশাল বাহনের ভেতরে বন্দী ওরা, ভেসে চলেছে দিনে বিশ মাইল গতিতে।

সংঘর্ষ ঘটলেও, ধসে পড়েনি গোস্ট বার্গ।

রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন মানুষের গলা শুনে ভারি অবাক হয়েছে।

‘আর কোন উপায় নেই, ক্যাপটেন,’ বলল রানা। ‘বার্গের সাথেই ভেসে যেতে হবে। কোন বিকল্প নেই।’

‘নেই,’ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। ‘শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া। অপেক্ষার শেষ হবে শালার আইসবার্গ মাথার ওপর ভেঙে পড়লে, তাই না?’

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘তাই।’

‘ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে!’ আবার দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল জুনায়েভ। সন্তুষ্ট, বিমূঢ় চেহারা, হাঁপাচ্ছে।

টু-শব্দ না করে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল বলটুয়েভ, হাইড্রোফোন সেকশনে নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জানবে।

কর্নেলকে ঢুকতে দেখে ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে মুখ তুলল অপারেটর।

‘জুনায়েভ বলল, তুমি নাকি আর কিছু শুনতে পাচ্ছ না? তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট নষ্ট?’

‘না। ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ইকো-ই আমরা পাচ্ছি না।’

‘কত দূরে?’

‘এক মাইল, কাছেও হতে পারে...’

‘দশ মিনিট আগেও তো তাই ছিল!’ জুনায়েভের দিকে কটমট করে তাকাল কর্নেল। ‘ব্যাপারটা কি? দশ মিনিট আগে এক মাইল দূরে ছিল কিউট। কয়েক সেকেন্ড আগে পর্যন্ত ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে। অথচ এখনও ওরা এক মাইল দূরে! কিভাবে সম্ভব? আমরা ভেসে আছি, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। মাঝখানের দূরত্ব আরও কমে আসার কথা!’

‘কিছু ঘটনা সত্যি...’

‘হতে পারে না, টেকনিক্যালি ইমপসিবল!’ মারমুখো হয়ে উঠল কর্নেল।

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছেও বিদঘুটে লাগছে...’

বুকে হাত বেঁধে অগ্নিদৃষ্টি হানল কর্নেল। ‘এমন নয় যে আমরা

যেমন কারেন্টের সাথে ভেসে চলেছি, ওরাও তেমনি ভেসে চলেছে। তা যদি হত, দূরত্ব একই রকম থাকত, কমত না বা বাড়ত না। কিন্তু ওরা শুধু স্রোতের টানে চলছে না, আমরা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি!’

‘জী, পরিষ্কার,’ আমতা আমতা করে বলল অপারেটর। ‘এক মিনিট আগেও...’

‘তাহলে ব্যাখ্যা করো!’ মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল অপারেটর।

‘বুঝতে পারছি না, কি ব্যাখ্যা করব...’

সমস্ত রাগ আর উত্তেজনা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল। অযোগ্য লোকদের কিভাবে শাস্তি করতে হয় জানে সে, কিন্তু কারও বিচার করার সময় এটা নয়। ‘ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা গরম কোরো না। তোমার যা কাজ করো তুমি, কানে প্লাগ ঢুকিয়ে বসে থাকো।’ জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। ‘চেক করার আরও উপায় আছে। এতই যখন কাছে ওরা, একটা হেলিকপ্টার পাঠালেই তো হয়।’ জুনায়েভ নির্দেশ পেয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, ‘পাইলটকে বলে দেবে কিউটকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তার ফেরার দরকার নেই।’

জোড়া লাগা দুই আইসবার্গের মাঝখানে, বিশাল বাহনের কোলে বসে রয়েছে কিউট। স্রোতের সাথে দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে ওরা। কতক্ষণ, কত ঘণ্টা ধরে ভেসে চলেছে, কেউ বলতে পারবে না। বরফের খাঁচায় বন্দী লোকগুলোর সময় জানার কোন উপায় নেই।

প্রথমে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এতই অবিশ্বাস্য, ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বাধ্য হয়ে নির্দেশ দিলেন, জাহাজে যত ঘড়ি আছে সব চেক করে দেখতে হবে। হুকুম তামিল হলো। দেখা গেল, অবিশ্বাস্য হলোও ঘটনা সত্যি। হাতঘড়ি, দেয়াল-ঘড়ি, টেবিল-ঘড়ি—সব বন্ধ হয়ে আছে। কারণটাও আন্দাজ করা গেল। দুই আইসবার্গ ধাক্কা খাওয়ার সময় যে শক ওয়েভ আর কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, এ তারই ফলশ্রুতি—সব ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে। জাহাজের কোথাও আর খুঁজতে বাকি রাখা হলো না, যদি একটা সচল ঘড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

কাজেই সময়ের ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে কাজ চালাতে হলো। লগ বুক লেখা হলো, ‘প্রায় উনিশশো ঘণ্টা...’ ‘সম্ভবত বাইশশো ঘণ্টা...’ এই রকম।

সময় জানতে না পারায় স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়তে লাগল। ওদিকে মাথার ওপর ঝুঁকে আছে গোস্ট বার্গের চূড়া, লক্ষ-কোটি টন বরফ নিয়ে। যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। যদি পড়ে, বাঁচার চিন্তা করা বাতুলতা। সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউট চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। লোকজনের কথা না বলাই ভাল।

তার ওপর, কারও কিছু করার নেই। করার নেই, করার সাহসও নেই। প্রতি মুহূর্তের স্বাভাবিক সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ডেকে কিছু বরফ এখনও রয়েছে, কিন্তু ফেলার সাহস হলো না—ভয়, কোদাল বা শাবলের আওয়াজ যদি আকাশ ছোঁয়া গোস্ট বার্গকে স্পর্শ করে, যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গোস্ট বার্গ! রানা আর নিয়াজ প্রতিবেশী আইসবার্গে উঠে এক চক্রর ঘুরে আসার পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল।

‘লক্ষণ যা দেখছি, গোস্ট বার্গ বলেই মনে হয়,’ আইসবার্গ থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিয়ে ক্যাপটেনকে বলেছিল রানা। ‘চুড়া থেকে বড় একটা টুকরো খসে পড়ল। তবু চেক করে দেখা দরকার...’

দেখার পর আর কোন সন্দেহ থাকল না, গোস্ট বার্গই বটে; এত বড় এর আগে দেখেনি রানা। দুশো ফিট উঁচু পাঁচিলের উল্টো পিঠটা, যে পিঠটা সাগরের দিকে মুখ করে রয়েছে, ঠিক যেন আরব্য রজনীর কোন দৃশ্য। ওখানে পৌছুবার জন্যে বে-র সরু ফাঁক গলে ঢুকে পড়া আন্ডারওয়াটার স্পার পেরোতে হলো ওদেরকে। পাঁচিলের গোড়ায় এসে সরু একটা কার্নিস পাওয়া গেল, সেটা ধরে সাবধানে উঠল ওরা। তারপর একটা বাঁক নিয়ে থমকে দাঁড়াল, চোখ তুলে যা দেখল তাতে আতঙ্কে কথা সরল না মুখে। অসংখ্য বিশাল আকারের গুহা আর ফাটল আইসবার্গের গায়ে, অথচ জাহাজ থেকে দেখে মনে হয়েছিল নিরেট বরফের পাহাড়। সারি সারি স্তম্ভ দেখল ওরা, কোনটা পঞ্চাশ ফিট উঁচু, কোনটা একশো বা তারও বেশি; স্তম্ভগুলোর ওপর বসানো রয়েছে বরফের ভারী ছাদ। আর নিচে, সী লেভেল থেকে অনেক উঁচুতে, যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে বিশাল একটা কুয়ো। পারে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া গেল না, অন্ধকার। তবে কান খাড়া করে হলল আওয়াজ শোনা গেল, বরফের গায়ে গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আছাড় খাচ্ছে। গোস্ট বার্গ, অন্তত আধ মাইল লম্বা, নিরেট তো নয়ই, প্রায় সম্পূর্ণটাই ফাঁপা। ঘামতে শুরু করা জেলিগনাইটের মত, যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।

‘ধাক্কা লাগার সময় ধসে পড়েনি কেন!’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘এটাই তো বৈশিষ্ট্য। প্রচণ্ড ধকল সহিতে পারে, আবার হঠাৎ সামান্য একটা শব্দেই হুড়মুড়...’

‘যথেষ্ট দেখেছি, এবার চলো ফেরা যাক...’

‘ইয়াল্লা, ওটা কি নিয়াজ?’

বিরাটকায় একটা স্তম্ভের মাথা থেকে কুয়াশা সরে গেছে, টাওয়ারের দুশো ফিট পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, আরও ওপর দিকটা কুয়াশায় ঢাকা। টাওয়ারটা চওড়া, ডায়ামিটারে একশো ফিটের কম না। গায়ে গরাদহীন জানালা, একটার ওপর আরেকটা, অনেকগুলো। জানালা না বলে গর্ত বলাই ভাল, টাওয়ারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি, টাওয়ারটা এখনও কিভাবে খাড়া রয়েছে সেটাই একটা বিস্ময়। ওপরের অংশ থেকে সরে গেল কুয়াশা, স্তম্ভিত হয়ে ওরা দেখল টাওয়ারটা বিশাল একটা ঝুল-বরফের প্রসারিত বাহুর ভার বহন করছে। প্রকাণ্ড বাহু আইসবার্গের মূল পাঁচিলের পিছন দিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রানা ঠিক বুঝতে পারল না, টাওয়ারটা কি শুধু বাহুর ভার বহন করছে, নাকি বাহু সহ গোটা পাঁচিলটার।

‘এভাবে বেশিক্ষণ টিকবে না,’ বিড়বিড় করে বলল ও। ‘চলো ফিরি।’

কি দেখেছে, মাত্র একজনকে বলল ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সবাই জেনে ফেলল ব্যাপারটা। এরপর থেকে উত্তেজনা আর উদ্বেগ অসহ্য হয়ে উঠল। কারও কারও এমন অবস্থা দাঁড়াল, সন্দেহ হলো পাগল হয়ে যাবে। বান্ধহেডের সাথে

কারও যদি কনুই ঠুকে যায়, সঙ্গীরা তার দিকে এমনভাবে তাকায়, পারলে যেন খুন করে ফেলে। কারও খিদে পাচ্ছে না। চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। কিছু করার না থাকায় স্নায়ুর ওপর চাপ আরও বাড়তে লাগল। আইসবার্গ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে ঘুরছে স্রোতের টানে, অথচ কেউ কিছু অনুভব করছে না। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে থাকলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে ওরা।

‘বিস্ফোরকের ব্যাপারে আমরা এত আগ্রহী কেন?’ রানার কেবিনে বসে রয়েছে ওরা, নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠলে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘আইসবার্গ থেকে যদি বেরুতে পারি, আরেকটা বিপদ দেখা দেবে,’ বলল রানা। ‘তখন আত্মরক্ষার জন্যে বিস্ফোরক লাগতে পারে। কিভাবে, কোথায়, কখন, আমাকে জিজ্ঞেস করো না। ক্যাপটেন গোল্ডম্যানের মত আশাবাদী নই আমি। ভেসে থাকা মাইন বা ওই ধরনের কিছুর কথা ভাবছি। কাফম্যানের সাথে আমার কথা হয়েছে।’

‘তোমার কি মনে হয়, এই জোড়া লাগা আইসবার্গ থেকে উদ্ধার পাব?’

‘যদি গোস্ট বার্গ ঘুরে আমাদের দক্ষিণে চলে যায়, তাহলে একটা আশা আছে,’ বলল রানা। ‘স্রোত ওটাকে টানবে, সেই টানে আবার সরে যেতেও পারে।’

বিনয় জিজ্ঞেস করল, ‘সত্যিই কি তুমি হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছ, রানা? গোস্ট বার্গে গিয়ে? গোল্ডম্যান তো বিশ্বাসই করছেন না।’

‘কারণ নিয়াজ শুনতে পায়নি আওয়াজটা। শুধু শুনিনি, আমার

মনে হয় এক পলকের জন্যে দেখেওছি ওটাকে, তারপরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়।’

‘তারমানে কর্নেল বলটু জানে আমরা কোথায়?’

‘সেটাই সম্ভব।’

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাতে কোন এক সময় গোস্ট বার্গ বিচ্ছিন্ন হলো। লগে লেখা হলো: ‘আন্দাজ বাইশাশো ঘণ্টায়।’ আইসবার্গের বিদায় পর্বটা দর্শনীয় কিছু হলো না। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল! শুনে ছাঁৎ করে উঠল প্রত্যেকের বুক। ব্রিজের পিছনের পোস্ট থেকে কাফম্যান একা ব্যাপারটা ঘটতে দেখল। বে-তে ঢুকে আটকা পড়েছিল আন্ডারওয়াটার স্পার, বিকট শব্দের সাথে ভেঙে গেল সেটা। গোস্ট বার্গ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বে-র সামনে থেকে পিছু হটে দূরে সরে গেল ধীরে ধীরে। আন্ডারওয়াটার স্পারের বাকি অংশটা বে-র পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলে পিছু নিল।

রানার সাথে ক্যাপটেন যখন ব্রিজে এলেন, পরিচিত দৃশ্যটা বদলে গেছে। জাহাজের পিছনে বে-র মুখ খুলে গেছে আবার। কুয়াশার ভেতর এখনও দেখা যাচ্ছে গোস্ট বার্গের কাঠামো, কিন্তু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। ক্যাপটেনের আচরণে এই প্রথম ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটল। যেচে পড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন তিনি।

কিন্তু ঘটনাখানেকের মধ্যেই কারও কোন পরামর্শ না নিয়ে নির্দেশ দিলেন, ‘এঞ্জিন স্টার্ট! সাগরে বেরিয়ে যাব আমরা!’

## দশ

কিউটের পিছনে পানিতে আলোড়ন তুলল প্রপেলার, সাদা ফেনার সাথে উথলে উঠল রাশ রাশ টুকরো বরফ। নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন, ধীরে ধীরে পিছু হটল জাহাজ। খানিকটা নেমে থেমে গেল আবার, এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো হলো। আরও জোরে ঘুরল প্রপেলার, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল ব্রিজ। উল্টোদিকে আবার গতি সঞ্চার হলো, ধীরে ধীরে বরফের ঢাল থেকে নেমে আসছে আইসব্রেকার।

সবশেষে পানিতে নামল বো, ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল পানি। বে-টা এতই ছোট, জাহাজ ঘোরাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পিছু হটে সরা ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে হবে।

বে-র দুই বাহুর মাঝখানে পৌঁছে গেল কিউট, কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই ফাঁকটা গলে সাগরে পড়ল ওরা। ডেক কাঁপছে, রেইল ধরে বো-র দিকে এগোল রানা। মাথার ওপর আপাতত কোন কুয়াশা নেই। চাঁদের আলোয় ভাসমান বরফের টুকরো দেখা গেল পানিতে। ধীরে ধীরে জাহাজ ঘুরিয়ে নিলেন ক্যাপটেন। সামনে ঘন কুয়াশা রয়েছে, আধ মাইল দূরে। রানার পাশে বো-র কাছে এসে দাঁড়াল নিয়াজ। ‘এই জেদের কোন মানে হয়? এখনও এগোচ্ছি, বার্গের সাথে থাকলেও এগোতাম। কাফম্যানকেও বিরক্ত মনে হলো। আচ্ছা, এই আলোক সজ্জার কি দরকার ছিল বলতে পারো?’

ক্যাপটেনের নির্দেশে জাহাজের সব ক’টা আলো জ্বলে দেয়া হয়েছে। পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর বো-র দিকে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো ফেলা হয়েছে। ক্যাপটেনের ধারণা, এভাবে আলো জ্বলে এগোলে, তার সাথে যদি অবিরাম ফগ-হর্ন বাজতে থাকে, রুশ জাহাজগুলো ধাক্কা দেয়ার কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না।

‘কিউটে মেরিলিন চার্ট আর ইভেনকো রয়েছে, আর কোন অজুহাত দরকার আছে ওদের? যাই ঘটুক না কেন, রিপোর্ট করার উপায় নেই যখন?’

কিন্তু রানার কথা কানে তোলেননি গোল্ডম্যান। তাঁর যুক্তি, অন্ধকারে রুশ জাহাজগুলোকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে পরে কর্নেল বলটুয়েভ বলার সুযোগ পাবে, সংঘর্ষের জন্যে আমেরিকানরাই দায়ী, কুয়াশার জন্যে কিউটকে তারা দেখতে পায়নি।

চোখে নাইট-গ্লাস তুলে দূরে তাকাল রানা।

‘কিছু দেখছ?’ উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল নিয়াজ।

‘শুধু পানি। আর কুয়াশা।’

‘কিছু দেখছেন?’ ব্রিজ থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে রানার আরেক পাশে দাঁড়াল কাফম্যান। ‘আপনার যা চোখ, আবার মাস্তুলের ওপর উঠলে পারতেন।’

ঘাড় ফিরিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকাল রানা। আশি ফুট উঁচুতে, ক্রস-ট্রীর ওপর একজন বসে রয়েছে, ফার হুডের তলায় হেডসেট। ক্যাপটেনের নির্দেশে ওখানে উঠতে হয়েছে বেচারাকে। কিউটের সামনে কোন বাধা দেখলে সাবধান করবে। ‘না, ধন্যবাদ। আবার! তাছাড়া, কুয়াশার ভেতর দেখার আছেটা কি?’

‘স্টার্নের কাছে, স্টারবোর্ড সাইডে কারলি ফ্লোট আছে,’ নিচু গলায় বলল কাফম্যান। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের পাশেই। চাবিটা মি. মুখার্জিকে দিয়ে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ।’

‘সাহায্যের দরকার হলে, হিগিন আছে,’ গলা আরও খাদে নামিয়ে বলল ক্যাফম্যান। ‘সবাই মিলে লঞ্চটাকে নামাতে পারব।’

‘হিগিন?’

‘ফ্লোটের কাছে লুক-আউট পয়েন্টে ডিউটি দিচ্ছে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমাকে বলবেন, ঠিক কি করবেন বলে ভাবছেন আপনি, মি. রানা?’

‘ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব,’ পরিস্কার করে কিছু বলল না রানা।

‘ক্যাপটেন এখনও কিছু জানেন না, জানলে আমার চাকরি নট হয়ে যাবে,’ রানার কানে কানে বলল কাফম্যান।

‘আইসবার্গ অ্যালিতে মরার চেয়ে বেকার হয়ে বেঁচে থাকা ভাল নয়?’

‘কিউট আলাদা হয়ে যাচ্ছে,’ বলল কর্নেল। ‘পাইলটের তোলা ছবিতে যে আইসবার্গটির কোলে উঠে পড়েছিল, সেটা থেকে নেমে আসছে।’

রিগার ব্রিজে, রাডারস্কোপ-এর হুডের সামনে ঝুঁকে রয়েছে বলটুয়েভ, স্কোপের সবুজাভ আভায় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে তার মুখ। কামানো মাথাটাও সবুজ রঙে চকচক করছে।

‘কত দূরে?’ অস্থিরতা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

হুড থেকে মুখ তুলে ব্রিজের অপর প্রান্তে তাকাল বলটুয়েভ। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন, হাত দুটো পিছনে এক হয়ে আছে, সারা শরীর আড়ষ্ট। ‘এবার আপনি এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারেন, ক্যাপটেন,’ হাঁক ছাড়ল কর্নেল। ‘এখন থেকে রাডারের সাহায্যে নজর রাখব ওটার ওপর।’ এবার হুডের সামনে ঝুঁকে জুনায়েভের প্রশ্নের উত্তর দিল, ‘মাঝরাতের মধ্যে-আশা করি মাঝরাতের মধ্যেই সমস্ত বামেলা চুকে যাবে।’

আইসবার্গ অ্যালি ধরে দক্ষিণ দিকে চলেছে কিউট। ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কাটছে বো, হাফ পাওয়ারে চালু রয়েছে এঞ্জিন। জাহাজের প্রতিটি আলো জ্বলছে। আরও একটা সুবিধে করে দেয়া হয়েছে কর্নেল বলটুয়েভকে, কিউটের শক্তিশালী ফগহর্ন করণ সুরে বাজছে বিরতিহীন।

হর্নের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে শুনে চিন্তিত হলো রানা। তারমানে কুয়াশার ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও আইসবার্গ আছে।

নির্দয় ঠাণ্ডার মধ্যে বো-র কাছে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। মাঝে মধ্যে লুক-আউট পয়েন্টগুলোর কাছ থেকে ঘুরে আসছে তিনজন, শুধু রানা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। চোখে নাইট-গ্লাস, হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেল। পিছনে পায়ের আওয়াজ।

‘আপনার কফি, মি. রানা।’

পিছনে হিগিনকে নিয়ে আবার হাজির হলো কাফম্যান। ফ্লাস্ক থেকে অ্যালুমিনিয়ামের মগে তরল আগুনের মত কফি ঢালল

হিগিন। তাড়াতাড়ি চুমুক দিল রানা, এরইমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। হিগিনকে তার পোস্টে পাঠিয়ে দিল কাফম্যান। নিয়াজকে কোথাও দেখা গেল না। ‘ক্যাপটেনের সাথে কথা বলে এলাম,’ বলল কাফম্যান। ‘বললেন, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি।’

‘তবু ভাল যে সন্তুষ্ট একজনকে পাওয়া গেল।’

‘যাই বলুন, বিপদের কোন আভাস এখনও...’

‘সব বিপদই কি আগাম নোটিশ দিয়ে আসে?’ বাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল রানা। কফি শেষ করে কাপটা কাফম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল ও, নাইট-গ্লাস তুলল চোখে। লেন্সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করছে চোখ। সাগরের একধারে সরু একটা চ্যানেল দেখা গেল, চাঁদের আলোয় সম্পূর্ণ সমতল আর শান্ত, প্রায় এক মাইল লম্বা। দু’দিকে ভাসমান বরফের টুকরো গিজগিজ করছে। চ্যানেলের শেষ মাথাটা ঢাকা পড়ে আছে ঘন কুয়াশায়। পোর্ট সাইডে প্রকাণ্ড একটা আইসবার্গ, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। মাথার দিকে কুয়াশা নেই, টেবিলের মত সমতল ছাদ। স্টারবোর্ডের দিকে শুধু ভারী কুয়াশা, সাদাটে মেঘের মত আকাশ থেকে সাগর পর্যন্ত ঝুলে আছে, লম্বায় চ্যানেলটাকে ছাড়িয়ে গেছে।

রানা সেদিকে নাইট-গ্লাস ঘোরাতে কাফম্যান বলল, ‘ওদিকে কুয়াশা ছাড়া দেখার কিছু নেই।’

‘রেডিও-জ্যামিং কি আগের মতই স্ট্রং?’

‘বেশি।’

‘অর্থাৎ উৎসের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা।’

সামনেটা বোতলের ঘাড়ের মত সরু-চ্যানেলের একদিকে সমতল ছাদ নিয়ে দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ, আরেক দিকে গাঢ়

কুয়াশার নিশ্চিদ্র স্তর। কোর্স সামান্য একটু বদলে দুই বিপদের মাঝখানে থাকার চেষ্টা করল জাহাজ। বিনয়কে নিয়ে বো-র কাছে ফিরে এল নিয়াজ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল বিনয়, শরীর গরম রাখার চেষ্টা। দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিয়াজ। ধীরে ধীরে নাইট-গ্লাস ঘুরিয়ে আবার স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। ওদিকে সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছে কুয়াশা। বোতলের গলায় যখন ঢুকবে কিউট, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে ওরা।

‘কি ওটা?’ আঁতকে উঠল নিয়াজ। ‘স্টারবোর্ডের দিকে, অনেকটা দক্ষিণে?’

সচল পাঁচিলের মত জিনিসটা, কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। নিয়াজ বলার আগেই ওটাকে দেখতে পেয়েছে রানা। পরিচিত শত্রু, আগের সেই গোস্ট বার্গটা।

বোতলের গলায় ঢুকে পড়েছে কিউট। পোর্ট বো-র দিকে এগিয়ে আসছে সমতল ছাদ নিয়ে আরেক দৈত্য। কুয়াশার ঘন স্তরের দিকে তাকাল রানা। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও। কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল রিগার বো, তেড়ে এল ওদের দিকে যুদ্ধ-জাহাজের মত।

‘আমেরিকান জাহাজটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে—আমাদের ডান দিকের কোর্স ধরে...’

‘কাজেই রেডি হোন,’ ট্রাভকিনকে নির্দেশ দিল কর্নেল বলটুয়েভ।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে রিগা। ঝুঁকে আবার রাডার স্কোপে চোখ রাখল ট্রাভকিন। কিউটের এগিয়ে আসা লক্ষ করছে সে। সময়ের নিখুঁত হিসেব দরকার হবে। ঠিক মুহূর্তটিতে কুয়াশা থেকে বেরুতে হবে জাহাজ নিয়ে, তা না হলে ব্যর্থ হবে সে। ‘কোর্স ঠিক রাখো,’ হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল।

মহুরবেগে এগোচ্ছে রিগা। সময়ের হিসেবে, কুয়াশা থেকে বেরুলেই সামনে পড়বে কিউট। রাডারস্কোপে ঝুঁকে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল ট্রাভকিনের, দরদর করে ঘামছে সে। পিছনে কর্নেল বলটুয়েভের উপস্থিতি আড়ষ্ট করে তুলছে তাকে।

‘আমি চাই কিউটের ঠিক মাঝখানে গুঁতো মারবে রিগা,’ ঢালাও হুকুম দিল কর্নেল।

রাডারস্কোপে ট্রাভকিন দেখল, কুয়াশা আর আইসবার্গের মাঝখানে, সরু বোতলের গলায় ঢুকছে কিউট। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল কর্নেল।

‘জাহাজ খোঁড়াচ্ছে কেন?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল সে। ‘আরেকটু জোরে ছোটাতে পারেন না?’

‘কুয়াশা থেকে আগেভাগে বেরুলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে,’ ভারী গলায় বলল ক্যাপটেন। ‘আপনি কি তাই চান?’

অন্ধকারে এগোচ্ছে রিগা, কোন আলো জ্বালা হয়নি। কুয়াশা চুইয়ে ক্ষীণ যে-টুকু চাঁদের আলো নামছে তাতেই সামনেটা খানিকদূর দেখতে পাচ্ছে বলটুয়েভ। এঞ্জিনের তেমন কোন আওয়াজ নেই, মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সাগর সম্পূর্ণ শান্ত।

‘স্পীড যা আছে তাই থাক,’ নির্দেশ দিল ট্রাভকিন।

‘এভাবে কতক্ষণ?’ জানতে চাইল কর্নেল।

‘যতক্ষণ দরকার।’

চেহারায়ে আক্রোশ ফুটে উঠলেও চুপ করে থাকল কর্নেল। নেভিগেশন সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই তার। অস্থিরতা বোধ করার কারণ, তার ইচ্ছে প্রথমবারই ধাক্কাটা লাগা চাই। ধাক্কা লাগলে কি ঘটবে, কল্লনার চোখে দেখার চেষ্টা করল সে। ষোলো হাজার টন ভার নিয়ে কিউটের ওপর চড়াও হবে রিগা। রিগার বাঁ দিকে থাকবে কিউটের বিচ্ছিন্ন স্টার্ন, ডান দিকে তোবড়ানো বো। কোন্টা আগে ডুববে? কিউটের পিছনটা, না সামনেটা?

‘কর্নেল! ব্রিজের পিছনে চলে যান! শক্ত করে রেইল ধরে থাকুন!’

ক্যাপটেনের কথামত তাই করল কর্নেল। হেলমসম্যান, কর্নেলের নিজের লোক, আরও জোরে আঁকড়ে ধরল হুইল। ব্রিজের সামনে কুয়াশা, সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল বলটুয়েভ। কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে দেখলেই বুঝতে হবে সামনে কিউট আছে। রিগার একেবারে বো-র সামনে দেখা যাবে ওটাকে। ভাবল, বানচোত ট্রাভকিন স্পীড বাড়ায় না কেন?

রাডারস্কোপের সামনে থেকে সরে এল ট্রাভকিন, শক্ত হাতে টেলিগ্রাফের হাতল ধরল। হাফ স্পীডের নির্দেশ দিল সে। তারপরই আবার ছুটে গেল স্কোপের দিকে। ‘কোর্স ঠিক রাখো।’

জানালার সামনে দিয়ে স্লান একটু আলো সরে গেল।

এঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় কুয়াশার ভেতর একটা আলোড়ন উঠল। ঘামের ধারা চোখে নেমে আসছিল, দ্রুত হাত ঝাপটা দিয়ে সেটা মুছল কর্নেল। কিউটের ফগহর্নের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এখন।



সরাসরি সামনের দিক থেকে আসছে।

রাডারস্কোপে চোখ রেখে নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। অকস্মাৎ সামনে থেকে উঠে গেল কুয়াশার পর্দা।

চাঁদের আলোয় ভেসে গেল ব্রিজ। নাক বরাবর সামনে চোখ ধাঁধানো আলো। কিউট।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রিগা, আকস্মিক গতি পেয়ে ছুটল। আইসব্রেকারের খোল দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দু'হাতে রাডারস্কোপ ধরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ট্রাভকিন, চোখ দুটো বিস্ফারিত। সময়ের হিসেবে তার কোন ভুল হয়নি।

স্পীড বাড়়াও! স্পীড বাড়়াও!—নিঃশব্দে আবেদন জানাচ্ছে ট্রাভকিন। ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল সে। আশা, কিউটের ক্যাপটেন তার আকুল আবেদনে সাড়া দেবে।—স্পীড বাড়়াও! সরে যাও সামনে থেকে! প্লীজ, প্লীজ!

স্পীড আগেই বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কুয়াশা থেকে রিগাকে বের করতে দেখেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রিগা সোজা ছুটে আসছে, সরাসরি আঘাত করবে কিউটের মাঝখানে। ব্রিজের পিছন থেকে দৃশ্যটা ভালভাবে দেখতে না পেলেও উল্লাসে উত্তেজনায় ছটফট করছে বলটুয়েভ।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মনে হলো, কিউট রক্ষা পেল না। আইসব্রেকারের মাস্তুল রিগার সামনে দেখা গেল, ব্রিজ ছাড়িয়ে গেছে। কোর্স না বদলে রিগার পথেই থাকল কিউট, গতি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।

‘ফুল স্পীড! ফুল স্পীড!’ ভয়েস পাইপে অনবরত চিৎকার করছেন গোল্ডম্যান।

কিউটের মাঝখানে নয়, পিছনে আঘাত করতে যাচ্ছে রিগা। কিউটকে এই স্পীডে পাবে, কর্নেল আশা করেনি। আইসব্রেকারের পিছনে উথলে ওঠা পানির দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল সে। চোখের পলকে রিগার বো-র সামনে থেকে স্যাঁৎ করে সরে গেল কিউটের স্টার্ন। এক ছুটে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল ট্রাভকিন। রেইল ধরে ঝুঁকে পড়ল সে।

ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার। ‘আপনি একটা অকর্মার ধাড়ি! এরপর আমি কমান্ডে থাকব।’ রাগে দিশেহারা, কি করবে বুঝতে পারছে না। পায়চারি শুরু করল সে, তারপর ছুটে এল ক্যাপটেনের দিকে—মারবে।

প্রকাণ্ড দেহটাকে দু'হাত দিয়ে ঠেকাল ট্রাভকিন, তারপর জোরাল একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এক পাশে। একহারা লোকটার গায়ের জোর দেখে তাজ্জব বনে গেল কর্নেল।

দাঁতে দাঁত চেপে গাল পাড়ল ট্রাভকিন, ‘আপনি একটা মাথামোটা আহাম্মক—দেখছেন না, আইসবার্গে ধাক্কা খাচ্ছি!’

ঝট করে সামনে তাকাল বলটুয়েভ। আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে এল সে। জানালা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে সমতল ছাদ নিয়ে একটা দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ।

ভরাডুবি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, বুঝতে পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল বলটুয়েভ।

কিউটের স্টার্নে ছিল রানা।

মনে হলো সংঘর্ষ ঠেকাবার উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে ধারণা হলো, রিগার বো কিউটের প্রপেলার গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। পরমুহূর্তে

দেখা গেল, প্রপেলারের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বো, মাত্র কয়েক গজের জন্যে মিস করল টার্গেট।

‘বার্গের সাথে ধাক্কা খাবে,’ পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘এসো, প্রার্থনা করি।’

স্টার্নে দাঁড়িয়ে নিস্পলক তাকিয়ে থাকল ওরা। শেষ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল রিগার ক্যাপটেন, রিসার্চ শিপের পিছনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি। ঘুরে যাচ্ছে জাহাজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখগতি রোধ করা সম্ভব হলো না। এই লাগল, এই লাগল ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন অলৌকিক ভাবে রিগার বো সম্পূর্ণ ঘুরে যাবার সময় পেল, সংঘর্ষ হলো না।

তারমানে বিপদ কাটল না। গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। নিয়াজ, বিনয়, আর হিগিনকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে সোজা ব্রিজে উঠে এল ও।

পিছনের জানালার কাছ থেকে ঘাড় ফেরালেন গোল্ডম্যান। ‘আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। রিগা আমাদের ডোবাবার চেষ্টা করল।’

‘আবার করবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় আপনি ওদের সাথে পারবেন না।’

‘প্রশ্নই ওঠে না।’ স্নান দেখাল ক্যাপটেনকে। ‘কিউটের টপ স্পীড মাত্র ষোলো নট।’

‘কাজেই যদি সম্ভব হয়, ওটাকে থামাতে হবে, ঠিক? কিউট, ক্রু, ইভেনকো রক্ষণ, আর ডকুমেন্টের কথা ভাবতে হবে আপনাকে।’

‘এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা কাফম্যান আপনাকে জানিয়েছে?’ হঠাৎ জানতে চাইলেন গোল্ডম্যান।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, কথা বলল না।

‘আপনার ধারণা, আমার জাহাজে কি ঘটছে না ঘটছে আমি জানি না, মি. রানা?’

‘রিগাকে থামাতে হবে, ক্যাপটেন,’ আবার বলল রানা।

‘যদি হয়, আমি হয়তো ভুল করে লগ বুকে ব্যাপারটা লিখব না।’ রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। তারপর মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, ‘স্টপ হার!’

কারলি ফ্লোট একটা ভেলা, কোন কারণে জাহাজ থেকে সবাইকে নেমে পড়তে হলে পানিতে ভাসানো হয়। একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, ডেটোনেশনের জন্যে তার জোড়া লাগিয়ে তোলা হলো ফ্লোটে। জায়গা মত ফিট করা হয়েছে টাইমার মেকানিজম, বিস্ফোরণের জন্যে দশ মিনিট মেয়াদ বেঁধে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে—তবে বন্ধ রাখা হয়েছে ঘড়ি, চালু করা হয়নি। ফ্লোটটাকে এখন বিস্ফোরণোন্মুখ মাইন বলা যেতে পারে।

পানিতে লঞ্চ নামাবার সময় জাহাজের গতি কমাতে হলো। সিদ্ধান্তটা স্নায়ু বিদীর্ণ করার জন্যে যথেষ্ট। কারণ, এখনও অনেকটা দূরে হলেও, আবার ধাওয়া করে ওদের ধরতে আসছে রিগা।

মাঝখানের দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে এমনিতেই কম ছিল, এখন আবার স্পীড কমাতে হলো কিউটকে।

শুধু যে পিছনে বিপদ তাই নয়, ব্রিজ থেকে সামনে তাকালেও

মনে ভয় ধরে যায়। স্টারবোর্ডের দিকে এখনও গাঢ় হয়ে রয়েছে কুয়াশার স্তর, আধ মাইল দূরের গোস্ট বার্গটাকে আবছা করে রেখেছে। পোর্ট সাইড আরও ভয়াবহ দৃশ্য উপহার দিল, সার সার আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পরিষ্কার পানি নিয়ে লম্বা হয়ে থাকা চ্যানেলটাকে সরু করে রেখেছে। আরও সামনে, নাক বরাবর, চ্যানেলের দুই পাশে, বিশাল দুই আইসবার্গ টাওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দলবদ্ধ আইসবার্গগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে গোল্ডম্যানকে।

‘ওভারটেক করতে কি রকম সময় নেবে রিগা?’ কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘দশ মিনিট—আন্দাজে বলছি।’

গম্ভীর গলায় নিয়াজ বলল, ‘আমার আন্দাজ পাঁচ মিনিট।’ স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ভুরু কঁচকাল সে। ‘ক্যাপটেন কোর্স বদল করছেন—লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বার্গগুলোর কাছে সরে যাচ্ছে জাহাজ।’

‘তাই যেতে বলেছি,’ বলল রানা। ‘কিউট আর গোস্ট বার্গের মাঝখানে যতটা সম্ভব চওড়া চ্যানেল থাকা দরকার।’

‘যাতে রিগা চওড়া অংশটা বেছে নিতে বাধ্য হয়? ক্যাপটেনের কি মাথা খারাপ হয়েছে...!’

‘তাহলে আমারও মাথা খারাপ হয়েছে। এসো, লঞ্চ নামা যাক।’

ডেভিট কেবলে ঝুলছে লঞ্চ। একজন ত্রুকে নিয়ে পাশেই অপেক্ষা করছে হিগিন। রানার পিছু পিছু একে একে লঞ্চ চড়ল বিনয় আর নিয়াজ।

‘মি. রানা, এখনও আপনি বলেননি ঠিক কি করার কথা ভাবছেন। রিগার বো-র তলায় ফাটাবেন ওগুলো? কিন্তু তা...’

‘তা সম্ভব নয়,’ কাফম্যানকে বলল রানা। ‘ফুল স্পীডে আসছে রিগা, বো-র তলায় জেলিগনাইট রেখে আসবে কে? ফর গডস সেক, দেরি না করে পানিতে নামান আমাদের! এভাবে সময় নষ্ট করলে মরতে হবে, মারতে হবে না।’

সময় কম। অথচ কাজগুলো জটিল, সময়সাপেক্ষ, ঝুঁকিপূর্ণ। উইঞ্চ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে পানির দিকে নিচু করা হলো লঞ্চ। সচল জাহাজ থেকে সাবধানে নামতে হবে পানিতে। কেবলের শেষ মাথায়, শূন্যে, জাহাজের পাশে, ঝুলতে লাগল লঞ্চ। নামছে, কিন্তু খুব ধীরে।

ওদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে রিগা। কুয়াশার ভেতর ঝাপসা, বিশাল একটা অশুভ আকৃতি। ফুল স্পীডে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ পেল ওরা। তাগাদার ওপর তাগাদা দিচ্ছে রানা, ‘তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!’

পানিতে নেমে দুলতে লাগল লঞ্চ, জাহাজের বো থেকে ঢেউ উঠছে।

এবার ফ্লোটটাকে নামাতে হবে। মুখ তুলে তাকাল ওরা, এরই মধ্যে নামতে শুরু করেছে ফ্লোট। সবাই জানে, নামাবার সময় ফ্লোট যদি জাহাজের গায়ে বাড়ি খায়, জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা কম-কম, তারমানে সম্ভাবনা আছে। এ-ধরনের দুর্ঘটনা একেবারে যে ঘটে না তাও নয়।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নেমে আসছে ফ্লোট। জাহাজের উঁচু কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ত্রুরা, একটু একটু করে রশি ছাড়ছে

তারা। হঠাৎ একজনের হাত থেকে ফসকে গেল রশি। কাত হয়ে পড়ল ফ্লোট।

‘ব্যাটা বলটুর লোক!’ প্রচণ্ড রাগে প্রলাপ বকল নিয়াজ। ‘আমাদের মারতে চায়।’

চরম বিপদের মধ্যেও মানুষ হাসতে পারে, প্রমাণ করল রানা।

কাত হয়ে গিয়ে দুলতে লাগল ফ্লোট, জাহাজের খোলে দড়াম দড়াম বাড়ি খেলো। যে-কোন মুহূর্তে বিপজ্জনক কার্গো ছিটকে পানিতে পড়তে পারে। লঞ্চে, ওদের মাথার ওপর পড়লেই বা কার কি করার আছে!

ধৈর্য হারিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। রিগা কোর্স বদলে চ্যানেলের চওড়া অংশে সরে যাচ্ছে। কিউটের স্টারবোর্ড সাইডে পজিশন নেবে ওটা। ‘খোদার দোহাই, তাড়াতাড়ি করো!’

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, চোখের পলকে। শূন্য থেকে খসে পড়ল ফ্লোট। সরাসরি ওদের মাথার ওপর নামছে।

মাথা থেকে তিন ফিট ওপরে ঝাঁকি খেয়ে থামল সেটা, এখনও কাত হয়ে আছে। এরপর নামার গতি আগের মত শ্লথ, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। ধীরে ধীরে সিধে হলো আবার।

নিরাপদেই নেমে এল ফ্লোট। ঘড়ি চালু করল বিনয়। গোস্ট বার্গ যখন ধাক্কা দেয়, ঘড়িটা বন্ধ ছিল, সেজন্যেই বোধহয় নষ্ট হয়নি ওটা। লঞ্চে সাথে আগেই বাঁধা হয়েছে ফ্লোটটাকে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, হুইল ধরে কাফম্যানের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল। উইঞ্চ কেবল খুলে নেয়া হলো। দ্রুত এগোল লঞ্চ, ক্রমশ দূরে সরে এল জাহাজের কাছ থেকে, হেলদুলে পিছু নিল ফ্লোট।

পিছন ফিরে রুশ রিসার্চ শিপের দিকে তাকাল নিয়াজ।

‘আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি!’

শান্ত সাগর, সগর্জনে ছুটল লঞ্চ, সোজা গোস্ট বার্গের দিকে যাচ্ছে। কিউটের পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে রিগার সামনের পথ লক্ষ্য করে। ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে কুয়াশা, ওদের টার্গেট গোস্ট বার্গের খাড়া পাঁচিল ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো। বিশাল একটা মহাদেশের মত তার বিস্তার।

বার্গের আরও কাছাকাছি পৌঁছে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল রানা। বার্গের গোড়ায়, ভিতের কাছে বড়সড় একটা গুহা রয়েছে। গুহার ভেতরটা অন্ধকার, চাঁদের আলো ঢুকছে না। আলো ঢুকছে না, কিন্তু তীব্রগতি শ্রোত তুমুল শব্দে ভেতরে ঢুকছে। রানা উপলব্ধি করল বার্গের ভেতর, পেটের মাঝখানে একটা লেক তৈরি হয়েছে। তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

‘আরও কাছাকাছি যাব আমরা-ফ্লোটটাকে ছেড়ে দেব আইসশেলফের কিনারায়।’

রানার চেয়ে আরও জোরে চিৎকার করল নিয়াজ, ‘অনেক দূরে চলে এসেছি, ফিরব কিভাবে? কিউটকে যদি ধরতে না পারি?’

‘সে ঝুঁকি নিতেই হবে,’ বলল রানা। ‘টানেলটা দেখছ? মুখে ছেড়ে দেব ফ্লোটটা। বার্গের ভেতর ঢুকে যেখানে খুশি ফাটুক।’

রানার প্ল্যানটা সাদামাঠা, কাজ হলেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। দু’দু’বার ধসে পড়া থেকে বেঁচে গেছে গোস্ট বার্গ। একবার দ্বিতীয় বার্গের সাথে জোড়া লাগার সময়, আরেকবার বিচ্ছিন্ন হবার সময়। তিন বারের বার হয়তো সত্যি ওটা ভেঙে পড়বে। জেলিগনাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৃতীয় ধাক্কাটা দিয়ে দেখতে চায় রানা। যদি ধসে, রিগার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে

চ্যানেল।

‘মাসুদ রানা, তোমার সলিল সমাধি ঠেকায় কে!’ উল্লসিত দানবের মত রিগার ব্রিজে লাফ-ঝাঁপ মারছে কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ব্যাটাচ্ছেলের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কফিন হিসেবে সাড়ে ছ’হাজার টন লোহা-লক্কড় পাচ্ছে! জোড়াও মিলেছে ভাল-ইভেনকো রক্তভ সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু, মাসুদ রানা ইসরায়েলের! যাও, একসাথে ঠাণ্ডা করবে!’

রাডারস্কোপের কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে উন্মাদটার দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপটেন ট্রাভকিন।

‘মাঝখানে দূরত্ব কমে আসছে!’ আনন্দে ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। পরমুহূর্তে চোখ পাকিয়ে তাকাল ট্রাভকিনের দিকে। ‘সময় ঘনিয়ে এলে আমি নিজে হুইল ধরব!’ ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে মুখ চেপে ধরল সে। ঝাপসা কুয়াশার ভেতর কিউটের কাঠামো দেখা গেল। ‘তুমি টেলিগ্রাফের চার্জে থাকবে, স্পীড কন্ট্রোল করবে,’ জুনায়েভকে বলল সে।

‘চ্যানেলটা লক্ষ করছেন?’ জিঙ্কোস করল ট্রাভকিন। ‘একেবারে সরু। জাহাজ নড়াচড়ার জায়গা পাবে কি না সন্দেহ।’ প্রতি মুহূর্তে পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর স্টার্নের দিকে ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে ক্যাপটেন। স্টারবোর্ডের দিকে বিশাল একটা আইসবার্গ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে কুয়াশা থেকে, রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে সে। তবু তো ট্রাভকিন জানে না, ওটা একটা গোস্ট বার্গ, ভেতরটা ফাঁপা-যে-কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। হঠাৎ কাঁপা গলায় বলল সে, ‘একটা লক্ষ্য! কিউট থেকে

রওনা হলো! আমাদের সামনে দিয়ে চ্যানেল ক্রস করছে!’

‘করক! আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। স্পীড বাড়ান!’

‘কি বলছেন! সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে! বুঝতে পারছেন না, আইসবার্গটার খুব কাছে চলে যাচ্ছি আমরা!’

‘ফুল পাওয়ার!’ ব্রিজে যেন বজ্রপাত ঘটল। জুনায়েভের দিকে মারমুখে হয়ে এক পা এগোল বলটুয়েভ। ‘ফুল পাওয়ার!’

## এগারো

ওদের মাথার ওপর বরফ-প্রাচীর খাড়াভাবে উঠে গেছে। সহস্র বরফ টুকরোর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে লক্ষ্য। সামনেই আইসশেলফ, ওখানে গোস্ট বার্গের গোড়া আলিঙ্গন করে আছে সাগর। স্পীড কমিয়ে দিল রানা, ধীরে ধীরে থেমে গেল লক্ষ্য। ছোট বড় বরফ টুকরোর মাঝখানে দুলাতে লাগল ওরা। ওদের বিশ গজ দক্ষিণে বিশাল গুহাটা, তেরছাভাবে ঢুকে গেছে বার্গের অভ্যন্তরে। কুল কুল শব্দে পানি ঢুকছে ভেতরে। চাঁদের আলোয় চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। বিপরীতমুখী কোন স্রোত নেই। দম নিয়ে নির্দেশ দিল, চড়া গলায়, ‘খুলে দাও ফ্লোটা!’

ছুরি নিয়ে তৈরি ছিল নিয়াজ। এক হাতে রশিটা ধরে, অপর হাতে ঘঁচ ঘঁচ করে ছুরি চালাল। শক্ত ফাইবার, সহজে কাটতে চায় না। তার পিছনে রানা আর বিনয় দেরি দেখে হটফট করছে। রানার হিসেবে, বিস্ফোরণ ঘটতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। তবে

হাতে ঘড়ি না থাকায় নিশ্চিত হবার উপায় নেই। হয়তো সাতমিনিট বাকি, কিংবা তিন মিনিট।

শেষ পর্যন্ত রশিটা কাটতে পারল নিয়াজ, কিন্তু কয়েকটা চিকন রোঁয়া রয়ে গেল, লঞ্চের সাথে আটকে রাখল ভেলাটাকে। অশ্লীল একটা গালি বেরিয়ে এল নিয়াজের মুখ থেকে। ইতিমধ্যে হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে রশি। তার সাহায্যে এগিয়ে এল বিনয়, হাতে নিজের ছুরি। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল রানা, হুইল ছেড়ে যেতে পারছে না। গুহামুখের প্রকাণ্ড হাঁ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ।

কেঁপে উঠল রানা, ‘কি করছ তোমরা!’

অনেক কষ্টে রশিটা আবার ধরতে পারল নিয়াজ। রোঁয়াগুলোর ওপর ছুরি চালাল বিনয়। বিদায় নিল ফ্লোট। হাতের এক ঝাপটায় থ্রটল খুলে দিল রানা, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল লঞ্চ, গোস্ট বার্গকে পিছনে রেখে দূরে সরে আসছে। চ্যানেল ধরে কোনোকোনি এগোল ওরা, সেই সাথে রিসার্চ শিপ রিগার আওয়াজ আরও জোরে বাজল কানে। কিউটের দিকে যাচ্ছে লঞ্চ, কিন্তু আইসব্রেকারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

স্টার্নে উবু হয়ে বসে পিছনে তাকিয়ে আছে বিনয়। ফ্লোটটা ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে দুলাচ্ছে। স্রোত ওটাকে গুহার ভেতর নয়, গুহার সামনে দিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গুহা-মুখের পাশে, বরফের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো ভেলা। মনে হলো ফিরে আসবে। কিন্তু না, ওখানেই থেমে থাকল। গাল-মন্দ করছে বিনয়, ঠোঁট নড়লেও কোন আওয়াজ নেই। তারপর, হঠাৎ করে, গুহার ভেতর থেকে কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মারল, চোখের পলকে সঁাৎ

করে ভেতরে সঁাধিয়ে গেল ফ্লোটটা।

হাঁফ ছাড়ল বিনয়।

লঞ্চ নিয়ে এগোতে গলদঘর্ম হচ্ছে রানা। বড় একটা বরফের চাঁই দেখে বন বন করে হুইল ঘোরাল, কাত হয়ে পড়ল দ্রুতগতি লঞ্চ, মনে হলো উল্টে যাবে, তারপর আবার সিঁথে হলো। ছোট বড় অসংখ্য বরফের টুকরো ভাসছে চ্যানেলে, মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটছে লঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত লঞ্চ চালানো মানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা। অথচ বাঁচার একমাত্র উপায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিস্ফোরকের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

ওদের ডান দিক থেকে এখনও মাথার ওপর ঝুঁকে রয়েছে গোস্ট বার্গ, সেটার বিস্তার ওদের সামনে দক্ষিণ বরাবর যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর।

হুইলের সাথে যেন কুস্তি লড়ছে রানা।

মনে হলো বহু দূরে একটা নিঃসঙ্গ আলো মিটমিট করছে। কিউটের পিছনে জ্বলছে ওটা। ওই একটাই, বাকি সব আলো কি মনে করে কে জানে নিভিয়ে দিয়েছেন গোল্ডম্যান। আইসব্রেকারের পিছনে হালকা খয়েরি ফেনা দেখা গেল, ওদের বাঁ দিকে। ঠাণ্ডা হুল-ফোটানো বাতাসে চোখ-মুখ নীল হয়ে গেল। বরফের টুকরোগুলোকে এড়াবার জন্যে ঐক্যবন্ধে ছুটছে লঞ্চ। আর পিছু পিছু ধেয়ে আসছে ষোলো হাজার টন রশ রিসার্চ শিপ রিগা-গোস্ট বার্গের প্রায় গা ঘেঁষে।

এবার সত্যি ভয় পেল ওরা। কেউ ভাবতেও পারেনি এমন হুট করে এত কাছাকাছি চলে আসবে রিগা। রিসার্চ শিপের স্পীড লিমিট সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল ওরা।

‘গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!’ হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ।

দূরে, কিউটের সামনে, দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছে। রানার মনে হলো, গোল্ডম্যান অনেক দেরি করে ফেলেছেন। চ্যানেলের মুখে, দু’পাশে অটল দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল প্রকাণ্ড দুটো আইসবার্গ-হঠাৎ করে দুটোই বিপরীতমুখী দুই স্রোতের মধ্যে পড়ে যেন জ্যাস্ত হয়ে উঠেছে। সচল হয়ে উঠে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে। কিউট যখন ওখানে পৌঁছবে, পথটা খোলা থাকবে না। নিয়াজ ভুল বলেনি, সত্যিই গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আঁতকে উঠে দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা। আকারে ছোটখাট একটা বাড়ি, ধাক্কা লাগার দরকার হবে না, ঘষা লাগলেই উল্টে যাবে লঞ্চ-এই সাইজের বরফ সামনে আরও দু’একটা দেখা গেল। ঘুর পথে এগোতে হলো ওদেরকে, ফলে আরও পিছিয়ে পড়ছে লঞ্চ। দু’একটা নয়, খানিক পরপর একটা করে, অনেকগুলো বড় বড় চাঁই সামনে। যে-কোন একটার সাথে ধাক্কা লাগা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তবু রানা বেপরোয়া, স্পীড না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে দিল। ওর এই দুঃসাহসের ফলও ফলল হাতেনাতে। কিউটের আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বল দেখল ওরা। তারমানে মাঝখানের দূরত্ব কমছে। স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। অবাক হয়ে গেল ও। গোস্ট বার্গের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে সামনে চলে এসেছে লঞ্চ।

‘পাওয়ার! আরও পাওয়ার!’ ফুঁসে উঠল কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ওভারটেক করো!’

কোন কথাই বলল না ট্রাভকিন। নিজের জাহাজে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। স্টারবোর্ড দিকের জানালা পথে বিশাল আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। এতক্ষণে ট্রাভকিন লক্ষ করল, আইসবার্গটার গোড়ায় একটা ফাঁক রয়েছে। তারমানে কি ফাঁকা ওটা? গোস্ট বার্গ?

চোখে ব্যাথা, পানি ঝরছে, ডুবে থাকা লম্বা বরফটা দেখতে পেল না রানা। লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফিটের কম নয়, লঞ্চের সামনে আড়াআড়িভাবে পড়ল। লঞ্চের বো ধাক্কা খেলো, লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, টুকরোটাকে টপকে যেতে শুরু করল লঞ্চ।

লঞ্চ উঁচু হতে শুরু করতেই একটা হার্টবিট মিস করল রানা। প্রপেলার ধাক্কা খাবে বরফের সাথে, দুমড়েমুচড়ে গিয়ে হয়তো লঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লঞ্চের বো উঠে গেল, তারপর নামতে শুরু করল। খোলের সাথে বরফের ঘষা অনুভব করল ওরা, তারপর কড়াৎ করে আওয়াজ হলো-মাঝখান থেকে ভেঙে গেল টুকরোটা। শূন্যে উঠে পড়ল প্রপেলার, উড়ে পেরিয়ে এল টুকরোটাকে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লঞ্চের পিছনটা। সেই সাথে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-পাঁচিলের ভেতর বিস্ফোরিত হলো ফ্লোটিং মাইন।

প্রথম দিকে একের পর এক ঘটনা যা ঘটল, সব গোস্ট বার্গের ভেতরে। যে টাওয়ারটা লক্ষ টন ঝুল-বরফের ভার বহন করছিল, প্রথমে ধসে পড়ল সেটা। তারপর সার সার স্তম্ভগুলো কাত হলো ধীরে ধীরে, বড় বড় টুকরোয় ভাগ ভাগ হয়ে খসল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে পড়তে লাগল বার্গের ভেতর লেকে। তারপর কাত হয়ে থাকা

স্তুম্বগুলো আছাড় খেতে শুরু করল। একেকটার ওজন হবে হাজার দু'হাজার টন।

স্তুম্বগুলোর মাথায় ছিল অসংখ্য চওড়া সেতু, তিনশো ফিট ওপর থেকে নেমে এল সেগুলো। লেকের কিনারায় বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ তুলে পড়তে লাগল একের পর এক। লেকের ভেতরটায় সচল হিমবাহের মহা আলোড়ন উঠল। টাওয়ার গেল, বিশাল ঝুল বরফ গেল, গোস্ট বার্গের পাঁচিলটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছিল অবলম্বনগুলো, সেগুলোও গেল। থাকল শুধু দীর্ঘ পাঁচিল। কিন্তু এবার অবলম্বনহীন পাঁচিলের একটা অংশও কাত হতে শুরু করল। সেই সাথে প্রকৃতির এক ভয়ঙ্করতম দৃশ্য উন্মোচিত হলো ধীরে ধীরে।

পাঁচিল কাত হলো ভেতর দিকে, রিগার উল্টোদিকে। দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে স্রেফ পাথর হয়ে গেল রিগার লোকজন। উঁচু পাঁচিল, খানিক আগে যেটা ওদের মাথার ওপর আকাশ ছুঁয়ে ছিল, কাত হয়ে ধসে পড়ল পিছন দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না বলটুয়েভ। দ্রাভকিনের দিকে তাকাল সে, ক্যাপটেনের চোখ কোটার ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

‘গোস্ট বার্গ...!’ পতনের একনাগাড় গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল দ্রাভকিন। ভয়েস-পাইপের দিকে ছুটে গেল সে, চিংকার করে বলল, ‘ভয়ের কিছু নেই...ভয়ের কিছু নেই...’

দ্রাভকিন ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারত রানা। রাশিয়ানরা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য চাক্ষুষ করছে, যা ঘটবে তার তুলনায় এ কিছুই না। মাত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে দানব প্রকৃতি।

‘শালার গোস্ট বার্গ পিছন দিকে পড়ল!’ আক্ষেপের সাথে চিংকার করে উঠল নিয়াজ। ‘কানা ভূতটা...’

‘চুপ থাকো!’ ধমকে উঠল রানা। ‘গাল দিও না বেচারাকে!’

বার্গের সামনে পানিতে আলোড়ন উঠল। ফুলে উঠল পানি, বড় বড় ঢেউ তৈরি হলো। কিন্তু এটা রানার উদ্বেগের কারণ নয়। তীব্র স্রোতের সাথে উঁচু পাহাড়ের মত ঢেউ আসবে-আসবেই, জানে ও। সবাই তাকিয়ে আছে পানির ওপরে, বার্গের দিকে। কিন্তু রানা ভাবছে পানির নিচের কথা।

বাঁচতে হলে দূরে পালাতে হবে। কিউটে না উঠতে পারলে নির্ঘাত মরণ। পিছনে কি ঘটছে ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা, সমস্ত মনোযোগ দিল লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ওপর। লঞ্চ থাকলে ডুবে মরবে সবাই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

রিগা তার কোর্স ধরে আগের মতই ছুটছে, ধসে পড়া গোস্ট বার্গটাকে পাশ কাটিয়ে আসছে। পাঁচিলের একটা মাথা, পিছন দিকে যেটা আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে এখনও, এবার সেটা ধসে পড়ল। বিশেষ কোন দিকে কাত হলো না, সম্ভবত ফাঁপা বলেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ফুটবল মাঠ আকৃতির বার্গের মেঝেতে।

লঞ্চ টন ধসে পড়া বরফের চাপে গোস্ট বার্গের আরেক প্রান্ত, আধ মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে, গম্বুজের আকৃতি নিয়ে ফুলে উঠতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে পাঁচিলের যে অংশটা এখনও খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা মস্ত একটা পাহাড়ের মত দেখতে, কিন্তু পানির তলা থেকে ধীরে ধীরে যেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার তুলনায় ওটা কিছুই না।

বিশাল এলাকা জুড়ে উথলে উঠল সাগর। সারফেস থেকে উঁচু



হয়ে উঠল পানি, যেন ভোজবাজির মত সী-লেভেল দ্রুতবেগে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল ডুবে থাকা নিরেট বরফ-পাঁচিল, সাগরের তলা থেকে যেন জেগে উঠছে একটা মহাদেশ। পাঁচিলের মাথা আর গা থেকে বিপুল জলরাশি জলপ্রপাতের মত নামছে। নায়াত্রাও বোধহয় হার মানবে এর কাছে।

পাঁচিলের সাথে মাথাচাড়া দিল অনেকগুলো টাওয়ার, কোন্টা কোন্টার চেয়ে আগে আকাশ ছুঁতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। একটা টাওয়ার রিগার ব্রিজ, তারপর মাস্তুল ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠে গেল, চওড়া পাঁচিলটা অনুসরণ করল সেটাকে, অন্যান্য টাওয়ারগুলোও পিছিয়ে থাকল না। রিগার ব্রিজ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল কর্নেল বলটুয়েভ আর ট্রাভকিন, পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়।

অসুস্থ বোধ করল কর্নেল। সেই সাথে অসময়োচিত একটা অস্বস্তি। অস্বস্তির কারণটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না সে। ট্রাউজার ভিজে গেছে, কিন্তু টের যে পাবে, সে-অনুভূতি তার নেই।

জলপ্রপাতের চওড়া একটা বিরতিহীন ধারা প্রচণ্ড গর্জনের সাথে রিগার ওপর পড়তে লাগল। শুধু যে পানি তা নয়, পানির সাথে বরফের চাঁইও রয়েছে। একেকটা একশো থেকে হাজার টন ওজনের। গুঁড়িয়ে গেল রেইল। তুবড়ে গেল খোল। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বরফ-পাঁচিল প্ল্যাটফর্মের সাথে ঘুরতে শুরু করল। দশ মিলিয়ন টন, কিংবা তারও বেশি বরফ, বিশাল এলাকা জুড়ে আলোড়িত হতে শুরু করেছে। টাওয়ার, পানি থেকে উঠে আসা পাঁচিল এখনও থামেনি, উঠে যাচ্ছে আরও ওপর দিকে। সেই

সাথে প্ল্যাটফর্মের সাথে একশো আশি ডিগ্রী কোণ রচনা করে ঘুরছে।

‘ভগবান!’ দু’হাতে মুখ ঢাকল বিনয়। ‘এ আমি কি দেখছি! পাতাল থেকে আরেকটা দুনিয়া উঠে আসছে!’

রানা মাত্র একবার, পলকের জন্যে, পিছন ফিরে তাকাল। ওর একমাত্র প্রার্থনা, খোদা, সময় মত যেন কিউটে উঠতে পারি। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে শ্রোতের মাথায় চড়ে ধেয়ে আসতে শুরু করবে চেউগুলো। ওদের পিছনে গোস্ট বার্গ উল্টে গেল।

বলা যায় গোটা আকাশটাই যেন ভেঙে পড়ল রিগার মাথায়। রিগার ব্রিজ থেকে ওরা দেখল ওদের মাথার ওপর বিশাল একটা ছায়া নেমে আসছে—ঘুরন্ত একটা ছায়া। নিজের অজান্তেই পারকার পকেট থেকে, শেষ মুহূর্তে, দাবা বোর্ডের খুদে সংস্করণটা বের করে দু’হাতে ধরে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ। কোন্ খেলায় কবে হেরেছিল, চালে কোথায় ভুল করেছিল সেটা বোধহয় জানার ইচ্ছে হয়ে থাকবে। প্রথম বড় আঘাতটা এল। পাঁচিলের অর্ধেকটা আছাড় খেলো রিগার ওপর, ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ তিন চার লক্ষ টন বরফে চাপা পড়ে গেল। রিগার কি ভাঙল বোঝা গেল না, বোঝার দরকারও ফুরাল। রিগা ছিল, ব্যস, অতীত হয়ে গেছে।

‘জাম্প!’ হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

কিউটের স্টার্ন ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, জাহাজের মাঝখানে থেমেছে। খোলের সাথে ঘন ঘন বাড়ি খেলো লঞ্চ। আগেই ওদেরকে আসতে দেখেছেন গোল্ডম্যান, জাহাজের স্পীড কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওপরের রেইল থেকে মই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ‘জাম্প!’ আবার গর্জে উঠল রানা।

একটা মই ধরে ঝুলে পড়ল নিয়াজ, বিনয়ও আরেকটা মই লক্ষ্য করে লাফ দিল। হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, সচল খোলের পাশে লঞ্চটাকে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কিউটের পিছনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সাগর। ফুলে ওঠা বিপুল জলরাশি ধেয়ে আসছে বিপুল বিক্রমে।

ওপরের রেইল থেকে নতুন আরেকটা রশির মই ছুঁড়ে দিল কাফম্যান। রানার বুক বাড়ি খেলো সেটা। মইটা ধরে হুইল ছেড়ে দিল ও। মুখ তুলে দেখল, রেইল টপকে জাহাজে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। রানার পায়ের নিচে থেকে সরে গেল লঞ্চ। মই আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল ও। রশিতে পা বাধল। মাথার ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল কাফম্যান, 'কুইক, মি. রানা! কুইক, কুইক, কুইক!'

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, চাপা একটা গর্জন শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। কিউটের স্টার্ন লক্ষ্য করে ছুটে আসছে পাহাড় সমান ঢেউ। ঢেউয়ের সাথে পিঁপে আকৃতির বড় বড় বরফের টুকরো। প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় ভারী টুকরোগুলো নাচছে। ঠিক এই ভয়ই করেছিল রানা। বরফের একটা টুকরো যদি ধাক্কা দেয়, খোলের গায়ে রক্ত মাংস লেপ্টে যাবে।

রেইলের ওপর ঝুঁকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল নিয়াজ, বিনয়, আর কাফম্যান। পাগল হয়ে গেল নিয়াজ রানাকে উদ্ধারের জন্যে। আবার মই বেয়ে নামতে চায় সে। তাকে বাধা দেবে কি, বিনয়ও ফুঁপিয়ে উঠে অনুসরণ করল তাকে। কাফম্যানের একার পক্ষে ওদেরকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না, অন্যান্য ত্রুরা সাহায্য

করল তাকে।

খোলের গায়ে ঝুলছে রানা। স্রোতের সাথে তীরবেগে ছুটে এল ঢেউ। শেষ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল কাফম্যানের গলা চিরে। আর কোন আশা নেই রানার। ওর জন্যে কারও কিছু করারও নেই। খোলের গায়ে মইয়ের শেষ মাথায় ঝুলে থাকল রানা। যমদূত এসে পড়েছে।

কিন্তু তবু সে মাসুদ রানা। আশা নেই জানে, জানে যতটুকুই ওঠার সুযোগ পাক ও, ঢেউ ওর নাগাল পেয়ে যাবে। কিন্তু হাল ছাড়ল না। এবং আশ্চর্য, ঢেউ এসে পড়ার আগেই অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এল রানা। এতক্ষণে আবার একবার কিউটের পিছন দিকে তাকাল ও।

মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে সবুজ একটা পাঁচিল ছুটে আসছে, এরই মধ্যে ওর মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে সেটা। প্রথম ঢেউয়ের চূড়ায় নিরেট বরফের চাঁইটা দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। একবার ভাবল, কি পাপ করেছে ও যে এই মৃত্যু ছিল কপালে! খোলের গায়ে ছাতু হয়ে যাবে শরীরটা।

ঢেউটা আঘাত করল কিউটের পিছনে। প্রায় এক ঝটকায় উঁচু করে তুলল স্টার্ন, সেই সাথে কিউটের সামনের অংশ, বো, ডুব দিল পানির তলায়। দস্তানা পরা হাত দিয়ে রশির মই কজিতে পৌঁচিয়ে নিল রানা, অন্তত লাশটা যেন ভেসে না যায়। কনুই ভাঁজ করে মাথার দু'পাশে তুলল-ক্ষীণ আশা মাথাটাকে বাঁচাতে পারলে বলা যায় না, হয়তো...

লিফটের মত ওপরে উঠে যাচ্ছে স্টার্ন।

ঢেউয়ের ধাক্কা খেলো রানা, ধারাল দাঁতের মত সারা গায়ে

কামড় বসাল ঠাণ্ডা পানি। কাঁধের ওপর অসহ্য চাপ অনুভব করল ও। মনে হলো মই থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে ওকে। কানের পাশে একটানা শৌ-শৌ গর্জন। ওর পাশে, খোলে বোমা ফাটল যেন, বরফের একটা মস্ত চাঁই ভেঙে চুরমার হলো। আচমকা রানা উপলব্ধি করল, গুঁড়ো বরফের স্তূপের ভেতর ঢাকা পড়ে গেছে গোটা শরীর। প্রচণ্ড বেগে খোলার গায়ে আছাড় খেয়ে চাঁইটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলার গায়ে চুম্বকের মত আটকে গেছে গুঁড়োগুলো, তারই ভেতর জ্যাস্ত কবর হয়ে গেছে ওর।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কিউট, ডেউয়ের মাথায় শূন্যে উঠে পড়েছে স্টার্ন, কিন্তু রানা জাহাজের খোলার গায়ে একই জায়গায় রয়েছে। জ্যাস্ত কবর হওয়াতেই বরং কিছুটা সময় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল ও। প্রবল স্রোত মই থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত ওকে, তা সম্ভব হলো না বরফের খোলসের ভেতর থাকায়।

এরপর বো উঠতে শুরু করল পানি থেকে। ধীরে ধীরে সিধে হলো কিউট। দ্বিতীয় ডেউটা আসছে। কিন্তু তার আগেই রেইলের কাছ থেকে ওরা সবাই মই ধরে টানাটানি শুরু করেছে। বরফের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এল রানা। ঠিক তখনই আবার উঁচু হতে শুরু করল স্টার্ন, আবার পানিতে ডুব দিল বো।

ত্রিশ স্রোত খোলার গায়ে চেপে রাখল রানাকে। ওপর থেকে ওরা বুঝতে পারল না রানা বেঁচে আছে কি না। মই টানছে না কেউ, রেইল ধরে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত সবাই।

রানা বেঁচে আছে, কিন্তু হুঁশ-জ্ঞান ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

মনে হলো, বাস্তবে এ-সব কিছুই ঘটছে না, গোটা ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন। তারপর নিজেকে তিরস্কার করল ও, ব্যাটা উজবুক! টের পাও না মই থেকে ছুটে গেছে হাত, ভেসে যাচ্ছ...

মাথার দু'পাশ থেকে ভাঁজ করা কনুই দুটো নিজের অজান্তেই খসে পড়ল। খোলার সাথে ঠক-ঠক, ঠকাঠক বাড়ি খেলো খুলি। তারপর আবার পানি থেকে উঠল বো। চোখের সামনে হঠাৎ আলোর বলকানি, তারপর অন্ধকার দেখল রানা। আলোর মধ্যে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একবার, নিখুঁতভাবে চোখ টিপে দিল একটা। তাকে চিনতে পেরে একটুও অবাক হলো না রানা।

সোহানা।

বহু দূর থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ বাংলায় চিৎকার করে বলল, 'ধরে থাকো, রানা, ধরে থাকো! আমরা তোমাকে টেনে তুলছি!' পরমুহূর্তে, নাকি মিনিট খানেক পর, বলতে পারবে না রানা, শক্ত কিসের সাথে যেন বাড়ি খেলো ও। অস্টোপাস? ওকে জড়িয়ে ধরছে কি ওগুলো?

হাত। মানুষের হাত।

চোখ মেলল রানা। চাঁদের আলো নিয়ে রাতের আকাশ-এ-ও কি স্বপ্ন? তারপর ডগা ভাঙা মাস্তুলটা দেখতে পেল। আগুপিছু দুলছে। কি যেন একটা খসে পড়ল ক্রস-ট্রী থেকে। মনে হলো ওর মুখের ওপর আছাড় খাবে। কিন্তু পড়ল ডেকের ওপর, ওর পাশে। না, কল্পনা নয়, ক্রস-ট্রী থেকে একজন লোকই পড়েছে। খুলি ফেটে গেছে লোকটার। মারা গেছে বোচারা।

কার মরার কথা কে মরছে!

সারা শরীর রক্তে জ্বজ্ব করছে। ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো ওকে। আবার চোখ মেলে রানা দেখল, নিয়াজ আর বিনয়ের চোখে পানি। ‘দূর বোকা! এমন ছেলেমানুষি করো তোমরা...’ জোর করে হাসতে গেল রানা, সেই সাথে জ্ঞান হারাল।

## বারো

ফুল স্পীডে ছুটছে কিউট। অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত বেগে।

ক্রস কারেন্টের মধ্যে পড়ে সব ক’টা আইসবার্গ সচল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে এগিয়ে এসে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হবে। প্রায় সবগুলো এগিয়ে আসছে কিউটের দিকে। তবে ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছেন সামনের দুই দৈত্যের দিকে। পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে সে-দুটো, বন্ধ করে দিচ্ছে চ্যানেলের মুখ। জাহাজের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইডে একের পর এক নতুন নতুন আইসবার্গ বেরিয়ে আসছে কুয়াশা ছিঁড়ে, কিন্তু সেদিকে তাকাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা কিছু হওয়ার হয়ে যাবে। হয় কিউট চ্যানেল থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে, না হয় দুই আইসবার্গের মাঝখানে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবে।

‘ফুল পাওয়ার!’ বারবার একই নির্দেশ দিচ্ছেন ক্যাপটেন।

ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। পোর্ট আর স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছানাঝা হলো তার চোখ।

সম্মোহিতের মত সামনে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান, কাফম্যানের উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে মনে হলো না। হঠাৎ পকেটে হাত ভরে রুমাল বের করলেন তিনি, কপালের ঘাম মুছে বললেন, ‘সাংঘাতিক গরম!’ পোর্টের দিকে তাকালেন না, তাকালে দেখতে পেতেন কেউ যদি একটা বোতল ছুঁড়ে মারে, আইসবার্গের গায়ে ভাঙবে সেটা।

সামনের ডেকে চাঁদের আলো নেই। জোড়া আইসবার্গের ছায়া পড়েছে। চোখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে আছে কাফম্যান আর হেলমসম্যান। গোল্ডম্যান জানেন, পোর্ট বা স্টারবোর্ডের দিকে তাকালে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন তিনি। বিপদ ভুলে থাকার জন্য হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘নাম্বার ওয়ানটার খবর কি?’

কিছুই বুঝতে না পেরে হেলমসম্যান আর কাফম্যান দৃষ্টি বিনিময় করল। ক্যাপটেন কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

‘কার কথা বলছেন, স্যার?’ বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল কাফম্যান।

‘নাম্বার ওয়ান। গাঁয়ার দি গ্রেট। চতুর নেকড়েটা, আর্কটিক যাকে অচ্যুত মনে করে ছোঁয় না। হাতের তালুতে আইসবার্গ নিয়ে খেলে। এখনও বুঝতে পারছ না কার কথা জিজ্ঞেস করছি?’ কথা বলতে বলতেই আবার সামনের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

‘মি. কাফম্যান,’ হঠাৎ ভারী গলায় বললেন ক্যাপটেন, ‘পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকাও!’ ক্যাপটেনের

সম্বোধনই কাফম্যানকে জানিয়ে দিল, অ্যাকটিং মেট থেকে মেট-এ পরিণত হয়েছে সে।

‘পেরিয়ে এসেছি!’ উল্লাসে কাফম্যানের গলা কেঁপে গেল।  
‘গেট থেকে বেরিয়ে এসেছি!’

‘মেইন্টেইন ইওর প্রেজেন্ট কোর্স।’

সামনে, বহুদূর আকাশে, স্নান একটা আলো দেখা গেল। আর্কটিকে ফিরে আসছে সূর্য। ভারী কুয়াশা থাকায় এই আলোর আভা দিনের পর দিন অদৃশ্য ছিল। পিছনের জানালা দিয়ে স্টার্নের দিকে তাকাল কাফম্যান। দুই আইসবার্গের মাঝখানে চ্যানেলের মুখ এত সরু, ছোট একটা লঞ্চও এখন গলবে না।

‘ক্লিয়ার ওয়াটার অ্যাহেড, মি. কাফম্যান,’ ক্যাপটেনের ভারী গলা ব্রিজের ভেতর গম গম করে উঠল। ‘আমরা বাড়ি ফিরছি।’

‘ইয়েস, স্যার!’ বলে স্যালুট ঠুকল মেট কাফম্যান।

‘কিন্তু তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, মি. কাফম্যান?’

‘ইয়েস, স্যার। মি. রানা জ্ঞান হারিয়েছেন, তবে ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে, দু’দিনের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারবেন তিনি। জখমগুলো সারতে অবশ্য আরও ক’টা দিন সময় নেবে...’

সাতই মার্চ, বুধবার, কুইবেকে নোঙর ফেলল কিউট। গ্যাংওয়েতে রানাকে বিদায় জানাল নিয়াজ আর বিনয়। জাহাজে করে আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ সেন্টারে ফিরে যাবে ওরা, নিজেদের কর্মস্থলে। পালা করে দু’জনের সাথে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। দু’জনই ওরা হাসছে।

জাহাজ থেকে প্রথমে নামল ইভেনকো রুস্তভ। রানার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় তার মুখে বিজয়ীর হাসি দেখা গেল। ভাবটা যেন, কেমন ঠক্ দিলাম! দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

গোল্ডম্যান, কাফম্যান, আর হিগিনের কাছ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে রানা। জেটি ধরে এগোল ও। জেটির শেষ মাথায় দুটো গাড়ি দেখল। গাড়ির পাশে জেনারেল ফচ, আর সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর উইলিয়াম অবসনকে দেখা গেল। ওদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে ইভেনকো রুস্তভ।

প্রথমে এগিয়ে এলেন জেনারেল ফচ। রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। কর্নেল উইলিয়াম অবসন আলিঙ্গন করল রানাকে। মাথা আর কাঁধে ব্যান্ডেজ, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা।

‘আপনার জন্যে হিলটনের একটা সুইট রিজার্ভ করা হয়েছে, মি. রানা,’ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন জেনারেল ফচ। ‘এয়ারপোর্টে একটা প্লেন রাখা হয়েছে, আপনার যখন খুশি...’ কুইবেকে আসার পথে আমেরিকান একটা জাহাজের সাথে মাঝ সমুদ্রে দেখা হয়েছিল কিউটের, ওয়ায়েরলেসে সব খবরই পেয়েছেন তিনি।

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘সরাসরি এয়ারপোর্টেই যাব আমি।’

‘মেরিলিন চার্ট...’

‘আমার কাছে, মি. ফচ,’ তাড়াতাড়ি বলল ইভেনকো রুস্তভ। পারকার পকেট থেকে টিউবটা বের করল সে। জেনারেল ফচ আর কর্নেল অবসনের সাথে তার পরিচয়, ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে। হঠাৎ রানার দিকে ফিরল রুস্তভ। ‘আগেই জানিয়েছি, আপনি আমেরিকান নন বলে আপনার ওপর ততটা বিশ্বাস আমি রাখতে পারিনি, মিস্টার রানা।’ টিউবটা বাঁকাতে শুরু করল সে। তালুর

ওপর এক টুকরো কোর পড়ল। আবার ঝাঁকাল রুস্তভ। এবার পড়ল মাইক্রোফিল্ম। ‘আপনি জানেন, এটাই আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। আপনাকে তাই আমি জানিয়েছিলাম।’ হাসতে লাগল সে। ‘কিন্তু এটার কথা আপনাকে আমি জানাইনি,’ বলে টিউবটা আবার ঝাঁকাতে শুরু করল। এবার আরও এক টুকরো কোর বেরল টিউব থেকে। তবু টিউবটা ঝাঁকাচ্ছে রুস্তভ। সবশেষে আরেকটা মাইক্রোফিল্মের মোড়ক বেরল ভেতর থেকে। ‘মি. রানা, এটাই হলো আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। প্রথমটা আপনি দেখেছেন, কিন্তু সেটা নকল—কাজেই আপনি দেখে থাকলেও কিছু আসে যায় না।’ যেন মস্ত এক রসিকতা করেছে, একা একাই হো হো করে হাসতে লাগল রুস্তভ।

রানার ইচ্ছে হলো বলে, বোকচন্দর, জাহাজে থাকতে টিউব টিউব করে জান দিচ্ছিলে বলে আমাদের সন্দেহ হয়, টিউবের ভেতর আরও একটা মাইক্রোফিল্ম আছে, এবং সেটাই আসল মেরিলিন চার্ট। তাই কৌতূহলী হয়ে টিউবটা আমরাও ঝাঁকাতে শুরু করি। বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় মাইক্রোফিল্ম। যদি জানতে, সেটা এখন আমার বগলের তলায় টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে! প্রথম মাইক্রোফিল্মের দুটো ফটোকপি তৈরি করি আমরা, সে-দুটো টিউবে ভরে রাখি, তারপর টিউবটা ফিরিয়ে দেয়া হয় তোমাকে। তোমার হাতে যে দুটো মাইক্রোফিল্ম শোভা পাচ্ছে, ব্যাটা হাড়ে-বজ্জাত, নকল চার্টের কার্বন কপি ওগুলো। কিছুদিন যাক, দুটোই যে নকল, টের পাবে বাছাধন। আমেরিকানরা তখন তোমার পাছায়...। কিন্তু কিছুই তাকে বলল না রানা। চেহারা নিলিঙ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে জেনারেল ফচকে বলল, ‘এয়ারপোর্ট

পর্যন্ত আমাকে একটা লিফট দেবেন, প্লীজ?’

‘ও, শিওর, গ্যাডলি!’ জেনারেল ফচ নয়, সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল অবসন রানার হাত ধরে একটা গাড়ির দিকে এগোল। গাড়িতে ওঠার আগে, কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ইভেনকো রুস্তভকে ভেঙচাল ও।

এয়ারপোর্টে যাবার পথে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মটা রাশিয়ানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজটা ঢাকায় পৌঁছেও সারা যায়। সোভিয়েত দূতাবাসে যেতে হবে ওকে।

খুক করে কেশে কর্নেল অবসন বললেন, ‘কি ভাবছেন, মি. রানা?’

রানা হাসল। কিছু বলল না।

‘আপনি শুনে খুশি হবেন, মি. রানা,’ আবার বলল কর্নেল অবসন, ‘আমাদের প্রেসিডেন্ট এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত সব জেনেছেন। তিনি যে খুশি হয়েছেন, ধন্যবাদ দিয়েছেন, এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সেটা আপনাকে জানাবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।’

‘কেউ বলতে পারবে না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেননি,’ মৃদু হেসে বলল রানা।

‘ধন্যবাদ, মি. রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ।’ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল কর্নেল অবসন, ‘ভবিষ্যতে যদি কোন দরকার হয়, আশা করি আবার আমরা আপনার সাহায্য পাব...?’

‘ভবিষ্যৎই সে-কথা বলতে পারে...’

‘না, প্লীজ, এড়িয়ে যাবেন না,’ আবেদনের সুরে বলল অবসন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। ‘আপনাকে যেন সিরিয়াস মনে হচ্ছে?’

‘সিরিয়াস? হ্যাঁ, অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে কি, জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে আমার হাতে। কিন্তু যোগ্য লোকের অভাবে...’

‘সি.আই.এ-তে যোগ্য লোকের অভাব?’ হেসে উঠল রানা।

কর্নেল গম্ভীর। ‘বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হাতে মাঝে মাঝে এমন টপ সিক্রেট কাজ থাকে, নিজেদের কোন এজেন্টকে বিশ্বাস করে সে-কাজ দেয়া চলে না। সেই রকম একটা কাজের কথা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই আমি...’

হাতজোড় করল রানা। ‘এখন? মাফ করুন!’

হেসে ফেলল কর্নেল। ‘ঠিক আছে, পরে একসময়। আমিই যোগাযোগ করব। তার আগে একটু বলে রাখি, কাজটা করে দেয়ার অনুরোধ শুধু আমার তরফ থেকে নয়, প্রেসিডেন্টের তরফ থেকেও পাবেন আপনি। আশা করি প্রত্যাখ্যান করবেন না।’

‘দেখা যাবে।’

এরপর রানাকে আর বিরক্ত করল না অবসন।

\*\*\*

রানা-১৪২  
দ্বিখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

**মরণখেলা-২**  
কাজী আনোয়ার হোসেন

বয়স-দ্বীপ খাই. শাই. ফাইডে  
অবীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল রানা—  
গেনটা ল্যাণ্ড করতে লাগলেই বেঁচে যাবে ওরা,  
কিন্তু সিজানী ইভেনফো দ্রুততরক নিয়ে  
চলে যাবে মাগালের দাইরে।

কিন্তু তা হবার নয়।  
নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো দটে, কিন্তু কিছুদূর  
এগিয়েই বিফোরিত হলো গেন।

কাছেই অপেক্ষা করছে কর্নেল বলাটুনেভ।  
রানা জানে, প্রথম সুযোগেই ওকে  
ছিঁড়ে ছুটি ছুটি করে ফেলবে কর্নেল।

শুভ হলো মেক টিম নিয়ে পলায়ন,  
রানার জীবনের তরঙ্গরতম অভিযান।

সেবা বই  
প্রিয় বই  
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০  
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আঠারো টাকা